শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

প্রবন্ধাবলী

জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসস্বামী

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের

নিত্য শুদ্ধ-ধারাবস্থিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাম্নায় দশমাধস্তনবর

১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজানুকম্পিত

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী

শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ-সম্পাদিত

[সেবানুকূল্য—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত বুক-ট্রাস্টের পক্ষে
শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ-কর্তৃক প্রকাশিত
ও শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা প্রেস, শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, নবদ্বীপ (নদীয়া) হইতে মুদ্রিত।

আদি সংস্করণ—
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের
আবির্ভাব-বাসর।
মাঘী কৃষ্ণ-৩য়া তিথি, ৩ গোবিন্দ, ৫১৩ গৌরাব্দ,
৯ ফাল্গুন, ১৪০৬ বঙ্গাব্দ (ইং ২২।২।২০০০)

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে প্রকাশিত
গ্রন্থাবলীর প্রাপ্তিস্থান ঃ—

১। শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) পঃ বঙ্গ।

২। শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ
কংসটীলা, পোঃ ও জেলা-মথুরা (উঃ প্রঃ)।

৩। শ্রীবিনোদ বিহারী গৌড়ীয় মঠ
২৮, হালদার বাগান লেন (কলিকাতা-৪)।

৪। শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠ
মিলনপল্লী, পোঃ-শিলিগুড়ি (দার্জ্জিলিং)।

৫। শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ
পোঃ তুরা (ওয়েষ্ট গারোহিল্‌স্), মেঘালয়।

৬। শ্রীনরোত্তম গৌড়ীয় মঠ
পশ্চিম খাগড়াবাড়ী, পোঃ ও জেলা-কোচবিহার।

নিবেদন

বিশ্ব-বিশ্রুত "শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি"র প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামক-আচার্য্য "শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের প্রবন্ধাবলী" প্রকাশ করিতে পারিয়া আমরা ধন্যাতিধন্য। বিগত ২৫শে মাঘ, ১৩৯১ বঙ্গাব্দ (ইং ৮।২।১৯৮৫) আমরা তাঁহার তত্ত্ব-সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা-সমন্বিত চরিত-গ্রন্থ আদি সংস্করণ-রূপে প্রকাশ করিয়াছিলাম। কিন্তু এই মহাপুরুষের প্রচারিত বিষয়সকল, যাহা বিশেষ করিয়া তাঁহার বিভিন্ন লেখনীর মাধ্যমে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার সহিত পরিচিত না হইতে পারিলে তাঁহার অপ্রাকৃত সঙ্গলাভ সম্ভব হয় না। 'পাষণ্ড-গজৈকসিংহ'-নামে একবাক্যে গৌড়ীয় সারস্বত-সমাজে যিনি সুপরিচিত, যাঁহার অতুল তেজস্বিতা, গুরুদেবৈকনিষ্ঠা, সুদৃঢ় সৎসম্প্রদায়-আনুগত্য, সকল ভক্তিসিদ্ধান্তে বিশেষ পারদর্শিতা, সর্ব্বসংশয়-ছেদনে অসীম সামর্থ্য প্রভৃতি যাঁহার লেখনীর প্রতি ছত্রে ছত্রে পরিস্ফুট হইয়াছে, সেই শ্রীল কেশব গোস্বামী মহারাজের লেখনীসমূহের সংরক্ষণ এক বিশেষ 'সম্প্রদায়-সেবা' বলিয়াই মনে করি। বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সর্ব্বকালের জন্যই শুদ্ধবৈষ্ণব-সমাজের নিকট এই প্রবন্ধাবলী যে মহামহোপদেশক-স্বরূপ, তাহা পাঠক-মাত্রই উপলব্ধি করিবেন।

"প্রবন্ধাবলী-লেখকের পরিচয় না পাইলে তাঁহার প্রবন্ধের প্রতি সেরূপ রুচি হওয়া স্বাভাবিক নহে।" তজ্জন্য আমরা প্রবন্ধকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রবন্ধের আরম্ভেই পৃথক্ ভাবে প্রদান করিয়াছি। ইহাতে পাঠকবর্গ শ্রীগুরুতত্ত্ব এবং তাঁহার অতিমর্ত্ত্যত্বের এক রূপরেখা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবেন, সন্দেহ নাই।

লিখালিখি ও তত্ত্বসিদ্ধান্তের নূতন ভঙ্গিতে ব্যাখ্যা-ক্ষেত্রে তাঁহার অতুলনীয় ক্ষমতা তাঁহাকে তাঁহার সতীর্থ ও অনুকম্পিতগণের মধ্যে এক বিশেষ গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। গতানুগতিক ধারায় না চলিয়া মূলতত্ত্ব-সিদ্ধান্তের অন্তর্নিহিত ভাবধারা বজায় রাখিয়া তাঁহার লেখনী সর্ব্বদাই একপ্রকার বৈশিষ্ট্য স্থাপন করিয়াছে। "সম্প্রদায়-রক্ষাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রেষ্ঠসেবা"—ইহা বিশেষরূপে অনুভব করিয়াই তিনি তাঁহার বলিষ্ঠ লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। মায়াবাদী, সহজিয়া, স্মার্ত্ত, জাতগোঁসাই প্রভৃতি শুদ্ধভক্তি-বিরোধী-দিগের প্রতি তিনি চিরদিন খড়্গহস্ত ছিলেন। তাঁহাদিগকে জগৎ হইতে সমূলে উৎপাটনের ভীষ্ম-প্রতিজ্ঞা করিয়াই তিনি ব্যক্তিগত সমালোচনা-পরিমুক্ত হইয়া অন্বয়-ব্যতিরেকভাবে বাদ-প্রতিবাদমুখে তত্ত্বসিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠার বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধ-নিবন্ধ আলোচনা-মাত্রেই এক অদ্ভুত অলৌকিক নূতনত্ব অনুভূত হইয়া থাকে।

তত্ত্ববিচার-ক্ষেত্রে সামান্যতম বিরোধেও তাঁহার লেখনী কাহারও সহিত কোনপ্রকার মীমাংসায় যায় নাই। তাঁহার সে-অনমনীয় মনোভাব "শপথ ও সত্যপাঠ"-প্রবন্ধে পরিব্যক্ত হইয়াছে,—"মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্, ইহা আপাত সত্যবাদী দুর্নৈতিকগণের জন্য উপদেশ। চক্ষের সমক্ষে যাহা সত্য বলিয়া দেখিব, তাহা গোপন করিব কেন? জনসাধারণের সমক্ষে তাহার মুখোস খুলিয়া পারমার্থিক সংবাদ পরিবেশন করিব; কোন কথা গোপন করিব না। ইহাতে যদি নিজের ঘরের লোকের এমন কি, আপন ভাই-বন্ধুবর্গের কোন গোপনীয় কথা জানা থাকে, তাহাও গোপন না করিয়া প্রকাশ্যভাবে জানাইব—অন্যান্য সম্প্রদায়, অপসম্প্রদায়, নবীন-সম্প্রদায়ের ত' কা কথা।" পাঠকগণ, এইসকল কিছু মাৎসর্য্যপর সমালোচনা-মূলক উক্তি নহে—পরদুঃখদুঃখী, পরিণামদর্শী অভিভাবকের শাসন-মুখে সদুপদেশ—তৃণাদপি সুনীচতা। নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিলে ইহাতে তাঁহার পরম উদারতা ও মহাবদান্যতা উপলব্ধি হইয়া থাকে। ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের অপেক্ষা থাকিলে —লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার প্রতিষ্কাযুক্ত হইলে শুভানুধ্যায়ী সাধু-গুরু-শাস্ত্রের আত্মকল্যাণ-জনক বাক্য বা সমালোচনা কটু ও মর্ম্মভেদী বলিয়াই মনে হইয়া থাকে। এইজন্যই শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে—"নিরপেক্ষ নহিলে ধর্ম্ম না যায় রক্ষণে।" শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার 'অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে' এ-সম্বন্ধে জানাইয়াছেন—"ধর্ম্মরক্ষকগণ সর্ব্বতোভাবে নিরপেক্ষ হইবেন, অর্থাৎ কোনপ্রকার লোকাপেক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া ধর্ম্মকে কুণ্ঠিত হইতে দিবেন না।" 'বৈকুণ্ঠপ্রিয়' শ্রীকেশব গোস্বামী প্রভু সকলপ্রকার লোকাপেক্ষার অতীত হইয়াই যাবতীয় অপ-উপ-ছল ধর্ম্মাদির বিচার তীব্রভাবে খণ্ডন করিয়া গৌড়ীয়-গগন নির্ম্মুক্ত রাখিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার আশ্রয়েই ভক্তিসাধকগণ ভক্তিসিদ্ধান্ত-ভাস্করের স্নিগ্ধ-মরীচিমালায় পরিপুষ্ট হইতে পারিবেন। অপরদিকে "দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ। উলূকে না দেখে যেন সূর্য্যের কিরণ॥"

তিনি শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, ষড়্‌গোস্বামী ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত-প্রচারিত রীতি-আদর্শের সর্ব্বতোভাবে অনুবর্ত্তন ও সংরক্ষণ করিয়াছেন। তত্ত্ব-সিদ্ধান্ত-বিচারস্থলে তথাপি তিনি শ্রীল প্রভুপাদের সিদ্ধান্ত-বাণীকেই প্রাধান্য দিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুরুবর্গের বিচারধারা অনুসরণ করিয়াছেন—"আমি পূর্ব্ব গোস্বামীগণকে চিনি না, জানি না; আমি জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের বিচারধারাকেই অভ্রান্ত সত্য বলিয়া মানি। আমি শ্রীল প্রভুপাদের আলোকেই পূর্ব্ব গোস্বামিবর্গকে জানিবার, বুঝিবার চেষ্টা করিব; তাঁহার ব্যাখ্যা-বিবৃতিরই সর্ব্বাগ্রে শ্রেষ্ঠত্ব মানিয়া লইব। 'আচার্য্যের যেই মত, সেই মত সার। অন্য আর মত যত যাউক ছারখার॥'—ইহাই আমার বিচার।" প্রভুপাদের বিচারালোকেই পরমার্থ-বিষয়ক সকল জটিল প্রশ্ন ও কুটতর্কাদির শাস্ত্রসিদ্ধান্ত-সম্মত সদুত্তর-দানে তাঁহার অলৌকিক পারদর্শিতার জন্য তিনি সারস্বত-গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজে যুগপৎ নয়কোবিদ ও

ন্যায়কোবিদরূপে পরিচিত ছিলেন। এই 'প্রবন্ধাবলী'তে সেই প্রভুপাদৈকনিষ্ঠ, নয়কোবিদ ও ন্যায়কোবিদ 'কৃতিরত্ন' প্রভুর সহিত পরিচিত হইতে পারা যাইবে।

শ্রীল কেশব গোস্বামী প্রভুবরের কতিপয় প্রবন্ধ ও কবিতা পূর্ব্বে তৎকালীন একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশে" প্রকাশিত হইয়াছিল। পরবর্ত্তীকালে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র-রূপে "শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা" ১৩৫৫ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাস (ইং ১৪।৩।১৯৪৯) শ্রীশ্রীগৌর-জয়ন্তী-বাসর হইতে লোকলোচন-গোচর হইতে থাকে। ইহাতেই প্রভুবরের বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়। শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার বিংশ বর্ষ তথা তাঁহার নিত্যলীলায় প্রবেশ-বর্ষ, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ (ইং ১৯৬৮) পর্য্যন্ত এইরূপে তাঁহার প্রবন্ধসকল একের পর এক প্রকটিত হইয়াছিল। আমরা সেই সকল প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন বিষয়ানুসারে বিভাগ করিয়া প্রকাশের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা পাইয়াছি। প্রবন্ধ-সূচীতে এবং মূল-প্রবন্ধেও সেই সকল বিভাগ স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রতিপ্রবন্ধ-শেষে যে-যে গ্রন্থ হইতে তাহা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার পরিচয় (Reference) প্রদত্ত হইয়াছে। সুতরাং ইহাতে পাঠকগণের গবেষণামূলক আলোচনায় যে বিশেষ সুবিধা ও সহায়তা হইবে, সন্দেহ নাই। এতদ্ব্যতীত শ্রীগুরুপাদপদ্ম যে-সকল গ্রন্থ সম্পাদনা এবং রচনা করিয়াছিলেন, সেই-সকল গ্রন্থে বিভিন্ন তত্ত্ব ও তথ্যপূর্ণ যে-সব ভূমিকা লিখিয়াছিলেন, তাহাও এই প্রবন্ধাবলীতে পৃথক্ বিভাগে প্রকাশ করা হইল। পাঠকবর্গ এইসকল প্রবন্ধের বিশেষ শিক্ষামূলক দিক্ লক্ষ্য না করিয়া পারিবেন না। পাঠকগণের আলোচনায় সুবিধার জন্য প্রয়োজনে পাদটীকাও ইহাতে সংযোজন করা হইয়াছে।

পরিশেষে এইসকল পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত ও প্রুফ্-সংশোধনাদি ব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারীর এবং 'কম্পোজ' এবং মুদ্রণে শ্রীলক্ষ্মীকান্ত দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রবোধানন্দ দাস ব্রহ্মচারী এবং শ্রীপ্রেমপ্রদীপ দাস ব্রহ্মচারীর নিরলস সেবা-চেষ্টা সত্যই প্রশংসনীয়। বহু চেষ্টা-সত্ত্বেও গ্রন্থখানি নির্ভুল হইতে পারিল না। যে-সকল ভুল আছে, তাহা অত্যন্ত সাধারণ বলিয়া ভ্রম-সংশোধনের তালিকা দেওয়া হইল না।

শ্রীল গুরুপাদপদ্মের আবির্ভাব—
মাঘী কৃষ্ণ-তৃতীয়া তিথি
৩রা গোবিন্দ, ৫১৩ শ্রীগৌরাব্দ, মঙ্গলবার
৯ই ফাল্গুন, ১৪০৬ বঙ্গাব্দ (ইং ২২।২।২০০০)

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব দাসানুদাস—
শ্রীভক্তিবেদান্ত বামন

প্রবন্ধ-সূচী

প্রভুপাদ-বিরহসূচক প্রবন্ধ—

১। বিরহ-মাঙ্গল্য — পত্রাঙ্ক—১
২। শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ — ৩
৩। শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-বাসরে বিরহ স্মৃতি — ৭
৪। শ্রীল প্রভুপাদের পত্র ও তাহার ব্যাখ্যা — ১৩

স্বতীর্থ-বিরহসূচক প্রবন্ধ—

৫। স্বধামে অতীন্দ্রিয় প্রভু — ১৫
৬। পরলোকে শ্রীহরিসাধন ব্রজবাসী — ২১
৭। স্বধামে শ্রীপাদ বরদরাজ ব্রহ্মচারী — ২৪

চরিত-মূলক প্রবন্ধ—

৮। বেদান্তাচার্য্য শ্রীরামানুজ — ২৯
৯। শ্রীল ঠাকুর সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ — ৩৫
১০। শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী — ৪০

দার্শনিক বিচারপর প্রবন্ধ—

১১। অদ্বৈতবাদ নিরাস (জন্মাষ্টমীতে দার্শনিক আলোচনা) — ৪৬
১২। মায়াবাদীর ব্রহ্মজ্ঞান — ৫৯
১৩। ব্রহ্ম—খণ্ডবস্তু — ৬৫
১৪। বস্তু আলোচনা — ৬৭
১৫। বস্তু-বিচারে বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব — ৬৯
১৬। বেদ-বর্ষ — ৭১
১৭। দশমে দশম লক্ষণ — ৭৩
১৮। গৌড়ীয়ের ত্রয়োদশ-বর্ষ — ৭৫
১৯। গৌড়ীয়ের বিংশ বর্ষ — ৭৯

সমালোচনামূলক প্রবন্ধ—

২০। জীব-সেবা ও জীবে দয়া — ৮১
২১। কালের গতি — ৮৫
২২। শপথ ও সত্যপাঠ — ৮৯
২৩। সাউড়ী-শালার ভিতে গলদ — ৯১
২৪। কলির ভগবান্ — ৯৬
২৫। অষ্টম বর্ষের সূচনা — ৯৮

২৬। নবম বর্ষের বিদায় পত্রাঙ্ক—৯৯
২৭। গৌড়ীয়ের রুদ্র বর্ষ ১০৩
২৮। শ্রীপত্রিকার উদ্দেশ্য ১০৬
২৯। সপ্তদশ বর্ষে বিজ্ঞান ১০৭
৩০। শ্রীনিম্বাদিত্য ও নিম্বার্ক এক নহেন ১১৩

উপদেশমূলক প্রবন্ধ—

৩১। সেশ্বর ছাত্র ১১৫
৩২। ভগবদনুশীলন ১২০
৩১। বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীর ত্রুটি ও তৎসংশোধন চেষ্টা ১২৩
৩২। অশিষ্টাচার ১২৫

বিশেষ উপদেশমূলক প্রবন্ধ—

৩৩। বৈষ্ণব চিনিতে হইবে ১২৮
৩৪। শাস্ত্রীয় সাধুসঙ্গ ১৩২
৩৫। দ্রষ্টা নহে, দৃশ্য হওয়াই সেবকের কার্য্য ১৩৬
৩৬। গৌড়ীয়ের ষোড়শ বর্ষ ১৩৮

সম্প্রদায় বিজ্ঞানপর প্রবন্ধ—

৩৭। গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীবলদেব ১৪১

প্রতিবাদমূলক প্রবন্ধ—

৩৮। অপদেবতার উপদ্রব নিবারণ ১৪৭
৩৯। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্রের উত্তর ১৫৫
৪০। হিন্দু সাধু-সন্ন্যাসি-নিয়ন্ত্রণ আইনের প্রতিবাদ ১৬৩
৪১। জগন্নাথ-মন্দিরে ছুঁৎমার্গ (?) ১৬৭
৪২। ত্যাগীর গৃহ-প্রবেশে কালাবৃত্তি ১৬৯
৪৩। যদুবংশে একলব্য ১৭৫
৪৪। চালনী ও সূচ ১৯২

স্মৃতি জ্যোতিষপর প্রবন্ধ—

৪৫। শ্রীজন্মাষ্টমীর বিশুদ্ধ-বিচার ১৯৭
৪৬। শ্রীরাম-নবমী-ব্রত ২০৬
৪৭। চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত ২১১
৪৮। চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত ২১৩
৪৯। কার্ত্তিক ব্রত ২১৬

৫০। পুরুষোত্তম ব্রত পত্রাঙ্ক—২১৮
৫১। অতিবাড়ীর স্মার্ত্তাচার ২২৩
৫২। রথযাত্রার তিথি বিচার ২২৬
৫৩। শ্রীশ্রীঝুলনযাত্রার তিথি বিচার ২৩৩

অভিধেয় বিচারাত্মক প্রবন্ধ—

৫৪। শিক্ষাষ্টক ২৪০
৫৫। উত্তমা ভক্তি ২৪৭
৫৬। শ্রীগীতোপনিষদে আত্মনিবেদন ২৫২

পরিক্রমা-বিষয়ক প্রবন্ধ—

৫৭। পরিক্রমা শ্রীবদরিকাশ্রম ২৫৬

কাল-বিচারাত্মক প্রবন্ধ—

৫৮। গৌড়ের অষ্টাদশ-বর্ষ ২৬৬
৫৯। দ্বাদশ-বর্ষ ২৬৯

সাময়িক প্রসঙ্গাত্মক প্রবন্ধ—

৬০। সংস্কৃত ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব ২৭২

গ্রন্থ-বিষয়ক প্রবন্ধ—

৬১। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা সম্বন্ধে বক্তব্য ২৭৬
৬২। 'শ্রীভক্তিবিনোদ প্রবন্ধাবলী'-গ্রন্থের ভূমিকা—নিবেদন ২৮০
৬৩। 'শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ'-গ্রন্থের ভূমিকা—নম্র নিবেদন ২৯১
৬৪। 'প্রেম-প্রদীপ'-গ্রন্থের ভূমিকা—প্রদীপশিখা ২৯৩
৬৫। জৈবধর্ম্মের প্রথম প্রস্তাবনা ২৯৭
৬৬। জৈবধর্ম্মের দ্বিতীয় প্রস্তাবনা ৩০১
৬৭। শ্রীচৈতন্য পঞ্জিকার আদর্শ ৩০৩
৬৮। 'শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টক' সম্বন্ধে দুই-একটি কথা ৩০৮
৬৯। 'গৌড়ীয় গীতিগুচ্ছে'র ভূমিকা—নিবেদন ৩১২
৭০। 'শ্রীরূপানুগ-ভজন-সম্পৎ'-গ্রন্থের ভূমিকা—আমার বক্তব্য ৩১৫
৭১। 'সাংখ্য বাণী'র ভূমিকা—সংখ্যাদ্বারা দার্শনিক শিক্ষা ৩১৭
৭২। 'মায়াবাদীর জীবনী'-গ্রন্থের ভূমিকা—আমার বক্তব্য ৩২৯

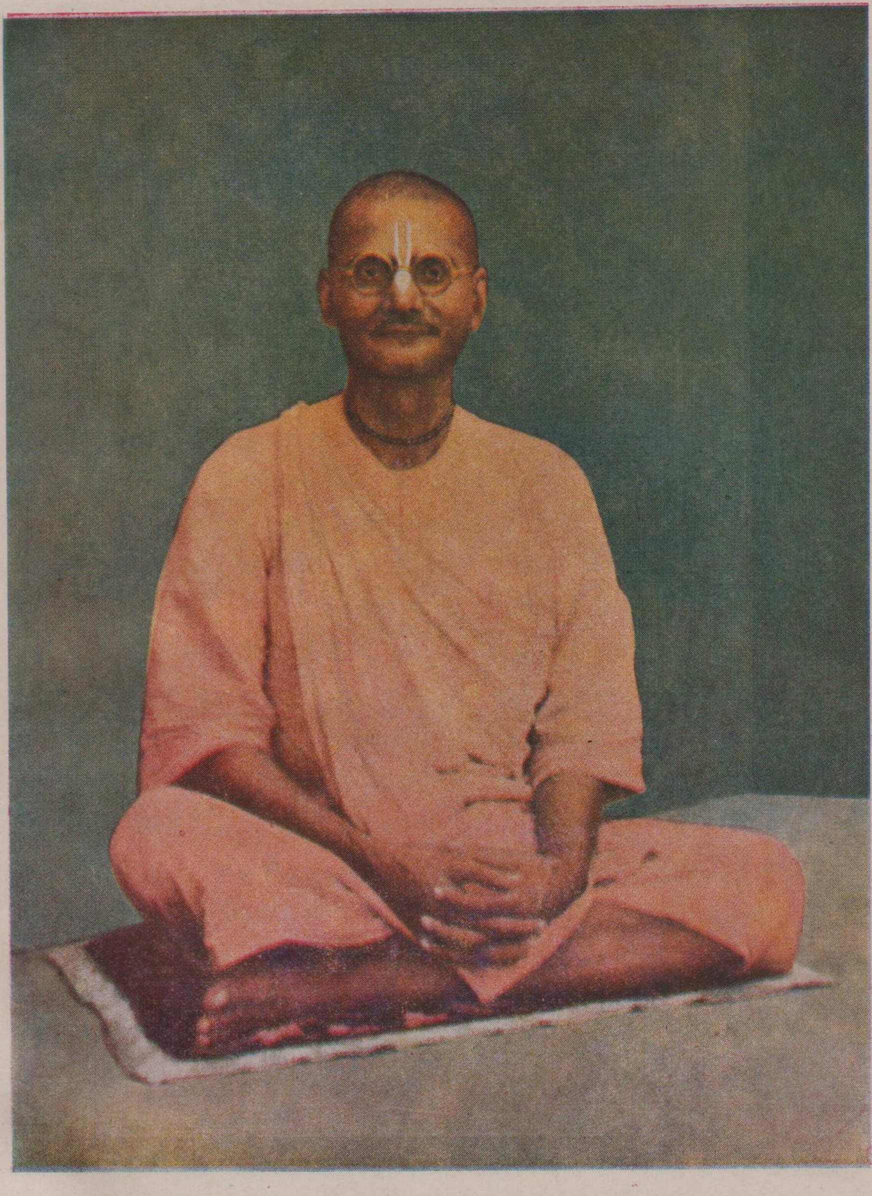

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

‘শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি’র প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

সংক্ষিপ্ত জীবনী

যাঁহাদের মতে অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ব্যতীত জীবাদি দ্বিতীয় বস্তুর স্বতন্ত্র অধিষ্ঠান নাই, সেই নির্ভেদ-ব্রহ্মবাদিগণ বস্তু মাত্রকেই ‘ব্রহ্ম’ বলিয়া ধারণা করেন। ইঁহাদের মতে গুরু ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন এবং ইঁহারা উপাস্য, উপাসক, উপাসনার নিত্যত্ব বা পৃথক্ সত্তা অস্বীকার করেন। মায়াবাদী জ্ঞানিগণ তত্ত্ববস্তুকে নির্ব্বিশেষ বলিয়া জানেন, কিন্তু শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু তত্ত্বকে সবিশেষ ও অচিন্ত্যভেদাভেদ অর্থাৎ যাবতীয় বস্তু যুগপৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন ও ব্রহ্মেই অবস্থিত, কিন্তু শক্তিগত পার্থক্যে একই বস্তু ভিন্ন ভিন্ন শক্তি-পরিচয়ে পৃথক্ ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন।

অচিন্ত্য-দ্বৈতাদ্বৈত-সিদ্ধান্ত স্বীকৃত হইলে শ্রীগুরুতত্ত্বও ভগবান্। শুদ্ধভক্ত-গণের দৃষ্টিতে শ্রীগুরুদেব ভগবৎ প্রকাশ-বিগ্রহ হইলেও তিনি তাঁহার প্রিয়তম দাস। তিনি মর্ত্ত্য বা অনিত্য নহেন; তিনি ভগদ্দাসরূপে ভিন্ন হইয়াও কৃষ্ণাভিন্ন মুকুন্দপ্রেষ্ঠ; তজ্জন্য তিনি ভগবান্ হইতেও পরতর। শাস্ত্রে কোন কোনস্থলে গুরুদেব ভগবানের প্রিয়সখারূপে বর্ণিত হইয়াছেন। যিনি কৃষ্ণ-তত্ত্ববিদ্ তিনিই সদ্‌গুরু—জগদ্‌গুরুরূপে নিত্যপ্রতিষ্ঠিত।

শ্রীবলদেব-নিত্যানন্দাভিন্ন গুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী করুণায় তদাশ্রিত ভক্তের ভগবৎ-ভাগবত-সেবাধিকাররূপ সৌভাগ্যের উদয় হয়। তিনি ভগজ্জীবের প্রতি কৃপা-পরবশ হইয়া ভক্তি ও ভগবত্তত্ত্ব বিস্তার করেন বলিয়া ব্যাসাভিন্ন-বিগ্রহরূপে অনন্ত বিশ্বে সম্পূজিত। ভগবানের প্রিয়-স্বরূপ গুরুদেব জগতে প্রকট থাকিয়া অনাদিবহির্ম্মুখ জীবগণকে উদ্ধার-পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠধামে সেবাধিকার প্রদান করেন বলিয়া তিনি ভবপারের তরণী ও কর্ণধার-স্বরূপ। তাঁহার কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তোষণপর বৃত্তির দ্বারা তিনি ভগবানকে জগজ্জীবের নিকট প্রকাশ করেন আবার শ্রীহরিও তাঁহার প্রকাশবিগ্রহ গুরুদেবকে জীবকল্যাণের নিমিত্ত দান করেন। বিষয় ও আশ্রয়-বিগ্রহের সহিত পরস্পর মধুর ও অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক বর্ত্তমান; এইজন্য “মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ”-বাক্যের অবতারণা ও বিষয়-আশ্রয়-তত্ত্বের প্রতি নিষ্ঠা প্রদর্শন।

অস্মদীয় গুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ ১২ই মাঘ ১৩০৪ বঙ্গাব্দ (ইং ২৪।১।১৮৯৮), সোমবার কৃষ্ণ তৃতীয়া-তিথিকে ধন্য করিয়া এ জগতে আবির্ভূত হন। তিনি পূর্ব্ববঙ্গের বরিশালজেলার অন্তর্গত বানারীপাড়ার সুপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী পরমভাগবত শ্রীযুত শরৎচন্দ্র গুহঠাকুরতা এবং শ্রীমতী ভুবনমোহিনী দেবীকে জনক-জননীরূপে স্বীকার করিয়াছিলেন। বাল্যকালে ইঁহার নাম ছিল—শ্রীবিনোদবিহারী। চারি ভ্রাতার মধ্যে ইনি দ্বিতীয় ছিলেন। বয়োজ্যেষ্ঠ শ্রীপ্রমোদ-বিহারীর (যিনি পরবর্ত্তী-কালে রেজিষ্টার্ড গৌড়ীয় মিশনের প্রেসিডেন্ট-আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমী মহারাজ) সহিত শৈশবকালে বিভিন্ন খেলাধূলার মধ্যেও ইঁহাদের ভাবী সামাজিক কর্ত্তব্যবোধ ও ধর্ম্মীয় জীবনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইতে থাকে।

শ্রীবিনোদবিহারী পাঠশালা ও উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিবার পর উত্তরপাড়া কলেজে ভর্ত্তি হন। কলেজে অধ্যয়নকালে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁহার কুলগুরু শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর অষ্টাঙ্গ যোগপুষ্ট নবীন-ব্রাহ্ম-মতাবলম্বী-নির্ব্বিশেষ বিচার পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীধাম মায়াপুরে সদ্গুরুর পদাশ্রয় করেন। ঐ সময় তিনি শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি গ্রন্থ মনযোগসহকারে আলোচনা করিতেন। তিনি তাঁহার কলেজের অধ্যাপকগণকেও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইতেন এবং বিভিন্ন তত্ত্ব-সিদ্ধান্ত লইয়াও তাঁহাদের সহিত রীতিমত বাদ-প্রতিবাদ ও বিচার হইত। তখন তাঁহাকে তাঁহাদের জমিদারীও দেখাশুনা করিতে হইত। পরে ১৯১৯ খৃঃ হইতে তিনি জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের নিকট সম্পূর্ণ আনুগত্য-বুদ্ধিতে দীক্ষিত হইয়া শ্রীচৈতন্যমঠ ব্রজপত্তনে স্থায়িভাবে অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহার নিকট ধর্ম্মতত্ত্ব ও শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করেন। মায়াপুর চৈতন্যমঠে অবস্থানকালে তাঁহার গুরুপাদপদ্মের ইচ্ছানুসারে তিনি উক্ত মঠের পরিচালক সেবকগণের মধ্যে প্রধান সেবকসূত্রে (Manager-এর) গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহার গুরু-প্রদত্ত ব্রহ্মচারী নাম—উপদেশক পণ্ডিত শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন।

শ্রীবিনোদবিহারীকে চৈতন্যমঠ তথা শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত যাবতীয় শাখামঠসমূহের ভূসম্পত্তি সংরক্ষণের দায়িত্ব প্রদান করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছিলেন, কারণ পূর্ব্বে প্রজাগণের নিকট হইতে মহাপ্রভুর সেবার নিমিত্ত মঠ-মিশনের প্রাপ্য অর্থাদি আদায় করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। গুরুসেবৈকনিষ্ঠ কৃতিরত্ন প্রভুর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় খাজনাদি আদায় হইবার পর সুষ্ঠুভাবে সেবাদি চলিতে থাকে। মঠবাস-জীবনে প্রথমদিকে এমনই অভাব ছিল যে, অন্নের পরিমাণ কমাইয়া সজিনাশাক দ্বারা কোনরূপে উদরপূর্ত্তি করিয়াও তাঁহারা গুরুসেবা-নিষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যমঠ ও পরবর্ত্তীকালে বাগবাজার গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠিত হইবার পরও শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্নপ্রভু

প্রভৃতি মুষ্টিমেয় যে কয়েকজনকে শ্রীল প্রভুপাদ 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করিতেন, শ্রীবিনোদ-বিহারী তাঁহাদের অন্যতম। ইহা নিঃসন্দেহে তাঁহার প্রতি গুরুপাদপদ্মের অপ্রাকৃত স্নেহ-বৈশিষ্ট্যের নিদর্শন।

বিভিন্ন দায়িত্ব ও সেবায় নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও শ্রীল কৃতিরত্ন প্রভু বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ-গীতা-ভাগবতাদি শাস্ত্রানুশীলনে বিশেষ তৎপর ছিলেন। তাঁহার বেদান্তালোচনায় প্রবল আগ্রহ ও বৈদান্তিক বিচার-বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাকে ঐ বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করেন। তিনি তাঁহার গুরুপাদপদ্মের সহিত বিভিন্ন স্থানে প্রচারে থাকাকালে বিভিন্ন মঠে, সভা সমিতিতে যে-সকল গভীর দার্শনিক তত্ত্ববিচারপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন তাহা তৎকালীন দৈনিক সাপ্তাহিক, সাময়িক-সংখ্যা, পারমার্থিক শ্রীপত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া তাঁহার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। কটক সচ্চিদানন্দ মঠে, দার্জ্জিলিং গৌড়ীয় মঠে অবস্থানকালে র‍্যাভেন্‌সা কলেজ, বারলাইব্রেরী প্রভৃতিতে প্রদত্ত মায়াবাদ-নিরসন বক্তৃতা আজও তাঁহার মহিমা বিস্তার করিতেছে।

এ-সম্বন্ধে তিনি নিজে লিখিয়াছেন, তাঁহার ভাষায় এস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে,— "শ্রীচৈতন্যমঠে (মায়াপুর) কাঁঠালতলার অফিসে বসিয়া আছি, এমন সময়ে (অনুমান ১৯৩৪/৩৫ সাল) 'বিদ্যাভূষণ' ও 'বিদ্যাবিনোদ' উপাধিধারী দুই ব্যক্তি আমার নিকট আসিয়া নিবেদন করেন যে, "আপনি ত' বেদান্তের পণ্ডিত, আমরা গৌড়ীয় মিশনের মুখপত্র সাপ্তাহিক 'গৌড়ীয়'-পত্রে একটী বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করিব, আপনি তাহাতে 'মায়াবাদ'-সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ দিবেন।" * * যাহা হউক, ইঁহাদের প্রার্থনায় 'মায়াবাদের জীবনী রচনা করিয়াছিলাম। শ্রীবিদ্যাবিনোদ কয়েকমাস পরে আসিয়া আমার নিকট হইতে প্রবন্ধটী লইয়া গেলেন। * * আমি বলিলাম,—"শ্রীল প্রভুপাদ কি এই প্রবন্ধ দেখিয়াছেন?" শ্রীবিদ্যাবিনোদ তদুত্তরে বলেন,—আমি নিজেই প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া প্রভুপাদকে শুনাইয়াছি; তিনি উহা শুনিয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।"

"যতদিন পৃথিবীতে শঙ্কর দর্শন প্রচলিত থাকিবে, ততদিন শুদ্ধভক্তির ব্যঘাত জন্মিবে"—প্রভুপাদের এই উক্তি বাস্তবে রূপায়িত করিবার জন্য অর্থাৎ অদ্বৈতবাদ বা নিরাকারবাদ, শূন্যবাদ, জগৎ হইতে সমূলে উৎপাটনের নিমিত্তই শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারীজী মায়াবাদের বিরুদ্ধে তাঁহার বলিষ্ঠ লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি বেদান্ত-দর্শনের ১০/১২ খানি ভাষ্য সংগ্রহপূর্ব্বক তুলনামূলক আলোচনা করেন। আচার্য্য শঙ্করের ব্রহ্মসূত্রের মৌলিক সিদ্ধান্ত বেদান্ত-দর্শনের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ; 'ব্রহ্ম' বলিতে নিরাকার, নির্ব্বিশেষ, নির্গুণস্বরূপ ব্রহ্ম নহেন; যেহেতু উক্ত শব্দত্রয় ব্রহ্মসূত্রের কুত্রাপি উল্লিখিত হয় নাই; নির্গুণ ব্রহ্মে দয়া-গুণের প্রকাশ অসম্ভব; ব্রহ্মের সগুণত্ব অস্বীকার করাই নাস্তিকতা বা আসুরিক চিন্তা; সুতরাং অদ্বৈতবাদীর ব্রহ্ম শূন্যের ন্যায় মিথ্যা

কল্পনাবিশেষ বলিয়া প্রতিবাদ করিয়াছেন ; তিনি মহাপ্রভুর নাম-ভজনের শিক্ষা অবলম্বন-পূর্ব্বক ব্রহ্মসূত্রের বিচার ও ব্যাখ্যা প্রদর্শনের প্রয়াস পাইয়াছেন। 'ব্রহ্ম' বলিতে শব্দব্রহ্ম বা 'শ্রীনামব্রহ্মকে লক্ষ্য করে। 'শ্রীমন্মহাপ্রভুর নাম-প্রেমধর্ম্মই বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয়' —ইহাই তাঁহার বিশেষ প্রচার্য্য বিষয় ছিল।

১৯৩৭ সালের ১লা জানুয়ারী শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের অপ্রকট-লীলা-আবিষ্কারের পর গৌড়ীয় মঠ-মিশনে নানাপ্রকার গণ্ডগোল উপস্থিত হয়। শ্রীল গুরুপাদপদ্ম এই বিবাদ-বিসম্বাদ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া চৈতন্য মঠ হইতে কলিকাতায় শুভবিজয় করেন। ১৯৪০ সালে বাগবাজারের অন্তর্গত ৩৩।২, বোসপাড়া লেনস্থ ভাড়া বাড়ীতে বৈশাখী-তৃতীয়-দিবসে "শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি" স্থাপন করেন। ১৯৪১ সালের ভাদ্র-মাসের পূর্ণিমা-তিথিতে গৌরসুন্দরের সন্ন্যাসক্ষেত্র কাটোয়া-নগরীতে শ্রীল প্রভুপাদের অন্তগৃহীত ত্রিদণ্ডি-যতি পরমপূজনীয় শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক **ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ** নামে পরিচিত হন।

সন্ন্যাস-গ্রহণের পর শ্রীল কেশব গোস্বামী ভাড়াগৃহে অবস্থিত নবদ্বীপস্থ নিজমঠ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে (পরবর্ত্তিকালে নিজস্ব জমিতে প্রতিষ্ঠিত স্থায়ী মঠ) প্রবর্ত্তন করেন ও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আচরিত বিমল প্রেমধর্ম্মের কথা বিতরণ করিতে থাকেন। ১৯৪৩ সালে চুঁচুড়া-সহরে তৎকর্ত্তৃক "শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ" স্থাপিত হয়। এইরূপে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ক্রমে ক্রমে শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ (মথুরা), শ্রীসিদ্ধবাটী গৌড়ীয় মঠ (বর্দ্ধমান), শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ (ধুবড়ী), শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠ (মেদিনীপুর), শ্রীগোপালজী গৌড়ীয় প্রচারকেন্দ্র (বালেশ্বর), শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ (কোকড়াঝাড়) প্রভৃতি স্থাপনপূর্ব্বক শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারীজীউর সেবা প্রকাশ করেন। জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের অনুষ্ঠিত ৮৪ ক্রোশ ব্রজমণ্ডল পরিক্রমার বহুকাল পরে তিনিই প্রথম ১৯৪৪ সাল হইতে বিরাট আকারে শ্রীব্রজমণ্ডল, ক্ষেত্রমণ্ডল, বারাণসী, বৈদ্যনাথ, দ্বারকা, অযোধ্যা-নৈমিষারণ্য, সেতুবন্ধ-রামেশ্বর, কন্যাকুমারী, ত্রিবান্দ্রম, শ্রীরঙ্গম্, শিবকাঞ্চী-বিষ্ণুকাঞ্চী, মহাবলী-পুরম্, পক্ষীতীর্থ, অবন্তিকা-নাসিক, কেদার-বদ্রীনাথ প্রভৃতি ভারতীয় তীর্থ-স্থানাদি দর্শন ও পরিক্রমামুখে তথায় ঊর্জ্জব্রতাদি পালন করিয়াছেন। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের প্রবর্ত্তিত নবদ্বীপ ধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসবাদি বন্ধ হইবার পর অস্মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্মই তাহা পুনরায় বিরাটভাবে আরম্ভ করিয়াছিলেন, যাহা আজও একই ভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে।

এতদ্ব্যতীত শ্রীল গুরুপাদপদ্ম গৌর-পদাঙ্কপূত কয়েকটী স্থানে শ্রীচৈতন্য-পাদপীঠ স্থাপনপূর্ব্বক তথায় সেবাপূজা সংরক্ষণ করিয়াছেন। জগদ্‌গুরু শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, ষড় গোস্বামী ও তদনুগত রূপানুগ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব মহাজনগণের

রচিত শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী, সর্ব্বোপরি তৎসম্পাদিত গভীর দার্শনিক বিচার-সম্বলিত ও তুলনামূলক আলোচনাপূর্ণ "মায়াবাদের জীবনী বা বৈষ্ণব-বিজয়" প্রকাশ করিয়া নির্ব্বিশেষবাদ নিরাসপূর্ব্বক বিশুদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। অর্থাৎ শ্রীগৌর-বাণী-বিনোদ-ধারায় অবস্থিত হইয়া শ্রীগুরুবর্গের নির্দ্দেশ ও মনোভীষ্ট—(১) মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন, (২) ভক্তিগ্রন্থ প্রচার, (৩) শ্রীবিগ্রহ-সেবাপ্রকাশ, (৪) শ্রীনবদ্বীপ-ধাম পরিক্রমানুষ্ঠান, (৫) লুপ্ততীর্থাদি উদ্ধার প্রভৃতি সর্ব্বতোভাবে পালন ও সংরক্ষণ করিয়াছেন।

জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ প্রিয়পার্ষদ অস্মদীয় শ্রীল শ্রীগুরু-পাদপদ্মের অলৌকিক ভগবদ্ভাব ও গুরুনিষ্ঠা এবং শ্রীগৌড়-ব্রজ-ক্ষেত্রমণ্ডলে অবস্থান-পূর্ব্বক শ্রীধাম ও ধামেশ্বরের সেবাপ্রচার, এককথায় শ্রীগৌর-ধাম, শ্রীগৌর-কামই তাঁহার ব্রত ও জীবন-স্বরূপ ছিল। শ্রীল প্রভুপাদের মঠাদি সংরক্ষণ ও প্রচারের আদিকাল হইতে তাঁহার যে-সকল প্রিয়জন বিশেষ সহায়ক ছিলেন, তন্মধ্যে আমাদের শ্রীগুরুদেব অন্যতম। শ্রীগুরুবর্গের সেবা ও ভগবৎসেবা তদীয় অন্তরঙ্গ সেবকদের আনুগত্যেই লাভ হয়, ইহা সাধু-শাস্ত্র-সম্মত বাক্য। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের আচার-প্রচার ও তাঁহার মনোভীষ্ট, তদনুকম্পিত বিশ্রস্ত সেবকের আনুগত্য ব্যতীত কখনই অনুধাবনের বিষয় হয় না। আমরা শ্রীগুরুদেবের মাধ্যমেই শ্রীল প্রভুপাদের মহিমা-মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারি। তাঁহার পরমপ্রিয় সেবকের মঠ-মন্দির সংরক্ষণে, বিশেষতঃ জমি জমা সুরক্ষা-ব্যাপারে আপ্রাণ প্রচেষ্টা ও কঠোর দায়িত্ব-পালনই শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করিয়াছিল।

শ্রীগুরুদেবের প্রকটকালে বহুবার সন্ন্যাস-গ্রহণের জন্য আদিষ্ট হইয়াও মিশনের সেবায় উৎসর্গীকৃতপ্রাণ শ্রীল গুরুপাদপদ্ম তাঁহার সতীর্থগণের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। যাঁহার সূক্ষ্ম-শুভ্রবসন-পরিহিত সৌম্যশান্ত-স্নিগ্ধ-সহাস্যবদন শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে গৌড়ীয় মঠ-মিশনের বয়োজ্যেষ্ঠ প্রাচীন সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিবৃন্দ করজোড়ে উপদেশ-নির্দ্দেশ-অপেক্ষায় দণ্ডায়মান থাকিতেন, যিনি সমগ্র মিশনে 'বিনোদ দা'-নামে জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ প্রত্যেকেরই গৌরবের পাত্ররূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তিনিই আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম—গৌড়ীয় মঠের স্বনামধন্য উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, কৃতিরত্ন প্রভু। যিনি, গুরু শ্রীরামানুজাচার্য্যকে বাঁচাইতে প্রাণান্তপণ শিষ্য কুরেশের আদর্শ প্রদর্শনপূর্ব্বক কুলিয়া নবদ্বীপ-পরিক্রমাকালে নিজের জীবন বিপন্ন করিয়াও শ্রীল প্রভুপাদের সন্ন্যাস-বেশ গ্রহণ ও বদল করিয়া পাষণ্ডীগণের অত্যাচার হইতে তাঁহাকে নিভৃত নিরাপদ স্থানে রক্ষা করিয়াছেন এবং শ্রীল প্রভুপাদও যাঁহার ঐকান্তিক সেবানিষ্ঠার আদর্শ লক্ষ্য করিয়া আবেগভরে যাঁহার সহিত মিলন ও মিশন পরিচালনা সম্পর্কে গোপন আলোচনার জন্য উৎকণ্ঠিত থাকিতেন, যিনি তাঁহার গুরুপাদপদ্ম শ্রীল প্রভুপাদের নামোচ্চারণ করিতে গিয়া 'প্রভু' বলিতেই

কাঁদিয়া ব্যাকুল হইতেন, তিনিই অস্মদীয় পরমারাধ্যতম জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্-ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ।

বিগত ১৯শে আশ্বিন, ১৩৭৫, রবিবার (ইং ৬।১০।১৯৬৮)—শ্রীকৃষ্ণের রাসপূর্ণিমা তিথিতে গৌড়ীয়-আচার্য্য-ভাস্কর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস-চূড়ামণি ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ প্রিয়পার্ষদ আচার্য্য-কেশরী ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ স্বীয় চরণাশ্রিত সেবকবৃন্দ, সতীর্থ সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারি-গৃহস্থভক্ত ও গুণমুগ্ধ সজ্জনগণকে বিরহ-সাগরে নিমজ্জিত করিয়া নিজাভীষ্ট শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদবিহারীজীউর সায়ংকালীন নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হন।

শ্রীল গুরুপাদপদ্মের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র ও প্রচারাদি-বৈশিষ্ট্যের সামান্য দিক্‌দর্শন করা হইল মাত্র। আমাদের ন্যায় পতিত জীবের উদ্ধারের নিমিত্ত যিনি প্রণিপাত প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, সেই পরদুঃখী শ্রীগুরুদেবের স্নেহ-শাসনপূর্ণ বাণী যাহাতে আমাদের পাষাণতুল্য হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিলাভ করে, তাঁহার অপ্রকট লীলাবিষ্কারের পর পারমার্থিক দুনিয়ায় যে হরিকথার দুর্ভিক্ষ ও বহুমুখী নাস্তিকতারূপ ধর্ম্মসঙ্কট দেখা গিয়াছে তাহা হইতে তিনি আমাদের সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন এবং তাঁহার অনুগতাভিমানিগণের প্রতি অপ্রাকৃত স্নেহদৃষ্টিপাত ও কৃপাশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন। আমরা যেন তাঁহার বাণীর যথার্থ অনুসরণ ও তাৎপর্য্য উপলব্ধিপূর্ব্বক নিজদিগের জীবন ধন্য করিতে পারি, ইহাই তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে সকাতর প্রার্থনা।

—শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা ৩৪শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা।

"অচিরে তিমির নাশিয়া '**প্রজ্ঞান**'।
তত্ত্বান্ধ-নয়নে করেন বিধান॥
সেই ত' '**প্রজ্ঞান**' বিশুদ্ধা ভকতি।
উপজায় হরি-বিষয়িণী মতি॥"

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

প্রবন্ধাবলী

বিরহ-মাঙ্গল্য

আজ প্রচুর হর্ষ ও আনন্দের মধ্যে বিষাদ-বেদনাই জাগিয়া উঠিতেছে। হৃদয়ের বেদনা হৃদয়ে অবরুদ্ধ রাখিতে চেষ্টা করিলেও দীর্ঘনিঃশ্বাস তাহা ব্যক্ত করিয়া ফেলে। সেই নিঃশ্বাস-বায়ু বিলোড়িত ও বিক্ষোভিত হইয়া শব্দে পরিণত হইয়াছে। সেই শব্দই ক্রন্দন। তাহার ভাষা অস্ফুট, অর্দ্ধস্ফুট; কণ্ঠ রুদ্ধ ও গদ্গদ। তথাপি অবগুণ্ঠিতা বিরহ-বেদনা ব্যক্ত হইলেই কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইবে মনে করিয়া শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম ও তাঁহার একনিষ্ঠ সেবক ঠাকুর শ্রীল নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভুর অদর্শনজনিত ক্লেশলাঞ্ছিত লেখনী আজ কম্পিতপদে ধীরে ধীরে মন্থর গতিতে অগ্রসর হইতেছে।

যিনি সর্ব্বাকর্ষক কৃষ্ণকেও আকর্ষণ করিয়া হৃদয়ে অবরুদ্ধ করিয়াছিলেন, যিনি সর্ব্ব-শক্তিমান্ ভগবানকে প্রিয়ত্বে পরাভূত করিয়া স্বেচ্ছায় অন্যের চিত্তে সমর্পণ করিতে সমর্থ, যিনি শ্রীহরির যাবতীয় গুণসমূহ সমাহরণ করিয়া নির্গুণ-ব্রহ্মবাদিগণকে বঞ্চিত করিয়াছেন, সেই শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীল প্রভুপাদ জগদ্গুরুরূপে শ্রীচৈতন্যবাণী ও শ্রীব্যাসবাণীর সার্থকতা সম্পাদনের জন্য পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে শ্রীপুরীধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। যিনি মাদৃশ বিষয়ি-ধুরন্ধর দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির পতিতাধমের কেশাকর্ষণ করিয়া স্বীয় পাদপঙ্কজ-ধূলিসদৃশ করিয়াছিলেন, যিনি কারুণ্য-গুণে ঈশ্বর অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, সেই শ্রীগুরুপাদপদ্ম পরমহংস-কুলের আদর্শ মহাপুরুষ দৈন্যবশে জগতের নিকট আত্মস্বরূপ আচ্ছাদন করিতে গিয়া আপনাকে **"ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর"** নামে পরিচয় দিয়াছেন—সংক্ষেপে বিশ্ববাসী তাঁহাকে **"শ্রীল প্রভুপাদ"** বলিয়াই সাদর সম্বোধন জ্ঞাপন করিতেন।

যাঁহার পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় সমগ্র ভারত কেন সমগ্র বিশ্ব বিমোহিত হইয়াছে, যাঁহার দার্শনিক বিচার-নৈপুণ্য দর্শন করিয়া সুদূর পাশ্চাত্যের মহামনিষীবৃন্দ চমৎকৃত হইয়া পদানত হইয়াছেন, যাঁহার পরপক্ষ-নিরাসপর যুক্তিসমূহ বজ্রের ন্যায় কঠোর বলিয়া বিরোধী-সম্প্রদায় সর্ব্বদাই ভয়ে আতঙ্কিত থাকিত, যাঁহার অচল অটল অধোক্ষজ সেবা-সিদ্ধান্তসমূহ হিমগিরির অত্যুচ্চ শিখর নত করিয়াছে, আজ তাঁহার আত্মগোপন-জনিত বিরহ-ব্যথা বহু ব্যক্তিকে ব্যথিত করিয়াছে।

যাঁহার অপ্রাকৃত ললিতলাবণ্য মূর্ত্তি পার্থিব যাবতীয় সৌন্দর্য্যকে লজ্জিত করিয়াছে, যাঁহার হৃদয় সিদ্ধান্ত-বিরোধ-খণ্ডনে পাষাণ অপেক্ষা কঠোর হইলেও যিনি কাহারও সামান্য সেবা-সৌষ্ঠব সন্দর্শন করিলে অত্যন্ত আনন্দিত হইতেন, যিনি "অল্প সেবা বহু করি' মানে" বৈষ্ণবের এই মহান্ গুণের প্রধান প্রতিমূর্ত্তি-স্বরূপ, যিনি আমাদের অতি অল্প সেবা দেখিয়া কতই না প্রশংসা করিয়াছেন, তিনি আবার সামান্য ত্রুটী দেখিয়া প্রভূত হিতকথাপূর্ণ অমৃততুল্য গালি বর্ষণ করিয়াছেন। যিনি তাঁহার অন্তরঙ্গ বিশ্রম্ভসেবক পরমপূজ্যপাদ **শ্রীমন্ নরহরি ব্রহ্মচারী, সেবাবিগ্রহ** প্রভুকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার প্রিয়তম আকর-মঠরাজ শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় সেবাভার সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্তে ও মহানন্দে দূরাতিদূর দেশে অবস্থান করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নাই, আজ তাঁহারা উভয়েই মাদৃশ ঘৃণিত পতিতাধমের সঙ্গ অত্যন্ত বিষবৎ মনে করিয়া এমন দেশে চলিয়া গেলেন যে, তাঁহাদের সন্ধান পাওয়াও আমার পক্ষে দুঃসাধ্য।

হে নরহরি দা! আপনি সকলের নিকট "ঠাকুর মহাশয়" বলিয়া পরিচিত। আপনার সুমঙ্গল শ্রীনাম গ্রহণ করা মাত্রই আপনার সেবার নৈরন্তর্য্যের কথা সকলেরই স্মরণ-পথে আসিয়া পড়ে। আপনি স্বয়ংই শ্রীল প্রভুপাদের প্রিয়তম শ্রীচৈতন্য মঠ-স্বরূপ। আপনার নিকট থাকিলে সর্ব্বদা মনে হইত, আমরা শ্রীচৈতন্য মঠেই অবস্থান করিতেছি। আপনি অক্রোধ পরমানন্দ-স্বরূপে যে সেবার আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাই শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির একমাত্র লক্ষ্য। আপনি আপনার অভীপ্সিত **শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার** সেবা দর্শন করিয়া আমাদের প্রতি কৃপা বর্ষণ করুন। কোনও সময়ে অপরাধ করিলে আমাকে শাসন করুন।

আমার সেবার ত্রুটী দেখিয়া ভর্ৎসনা করিবার জন্য আদর্শ পুরুষের যেরূপ অভাব, আবার সামান্য সেবা-চেষ্টা দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়া উৎসাহ দিবার লোকেরও সেইরূপ অভাব। হে শ্রীল ঠাকুর মহাশয়! হে শ্রীল প্রভুপাদ! আপনারা উভয়েই আমার পরজীবনের একমাত্র কাণ্ডারী। আপনারা উন্নততম পরজগতে নিজ নিজ উন্নততম সেবানন্দে মগ্ন থাকিলেও মাদৃশ পতিতের কথা স্মরণ করিয়া প্রচুর আশীর্ব্বাদ করুন—প্রচুর আশীর্ব্বাদ করুন—প্রচুর আশীর্ব্বাদ করুন। ইহাই আজ আপনাদের পাদ-সরোজে সকাতর প্রার্থনা।

হে শ্রীল প্রভুপাদ! আপনি আপনার প্রিয়তম সংবাদপত্রগুলিকে "বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ" বলিয়া আখ্যা দিয়াছিলেন। বৈকুণ্ঠ হইতে পূর্ব্বাচার্য্যবর্গ আপনার নিকট যে-সমস্ত সংবাদ মর্ত্ত্যে প্রেরণ করিতেন, তাহাই আপনার প্রিয় পত্রগুলিতে প্রকাশিত হইত বলিয়া উহা বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ। আজ আপনি আমাদিগকে আপনার পরমোচ্চতম স্থান হইতে সংবাদ প্রেরণ করুন—আমরা উহা প্রকাশ করিয়া আপনার "বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ" আখ্যার স্বার্থকতা সম্পাদন করি।

—শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা ১ম বর্ষ। ১ম সংখ্যা
ফাল্গুন ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ ইং ১৪।৩।১৯৪৯

শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ

বিরহে আলোচ্য বিষয়

২৩শে অগ্রহায়ণ, ৯ই ডিসেম্বর, * শুক্রবার শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-তিথি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিরহ-দিবসে শিষ্যের কি কর্ত্তব্য, তাহা স্থির হওয়া আবশ্যক। স্মার্ত্ত-বিধানের ক্রিয়া-কলাপ বৈষ্ণব-রীতি অনুসারে যতদূর যাহা করা প্রয়োজন, তাহা সকলেই অবশ্য করিবেন ও করিয়া থাকেন। আমরা বর্ত্তমানে সে বিষয়ে অধিক আলোচনা না করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের মনোভীষ্টের কথা সকলকেই স্মরণ করিতে অনুরোধ করি। বিশেষতঃ এই দুর্ভাগার বিরহ-তিথির কথা স্মরণ করিয়া তাহার হৃদয়ে যে বিষয়টী সর্ব্বতোভাবে জাগরূক হইতেছে, তাহারই দুই একটী কথা আর্ত্তি-নিবেদনস্বরূপ জ্ঞাপন করিতেছি। সাধারণতঃ বিরহে সান্ত্বনার আবশ্যক। বিরহ-ব্যথিত হৃদয় সান্ত্বনা পাইলে সঞ্জীবিত থাকে। নচেৎ পুনঃ পুনঃ বিরহ-যাতনা তাহাকে দশম-দশায় উপনীত করায়। যিনি যতটা পরিমাণ শ্রীগুরুপাদপদ্মে আসক্তচিত্ত ছিলেন, তিনি ততটুকুই তাঁহার বিরহ অনুভব করিবেন।

শ্রীল প্রভুপাদের বঞ্চনা লীলা

শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদের দুরবস্থা এবং স্বাতন্ত্র্যের প্রতি আঘাত না করিয়া সকলের স্বাভাবিক মঙ্গলের উদ্দেশ্যে শিক্ষাভিমানিকে কৃপা করিয়া বঞ্চনা করিয়াছেন। এইরূপ দৃষ্টান্ত দেখিয়া শ্রীগুরুদেবের অসমোর্দ্ধ দূরদর্শিতার কথা চিন্তা করিয়া তাঁহারই শ্রীপাদপদ্মে চির-বিক্রীত হইতেছি। যাহারা একান্তই বঞ্চিত হইতে ইচ্ছুক, শ্রীগুরুদেব তাহাদিগকে কি করিতে পারেন? স্বতন্ত্রতায় হাত দিলে জৈব-সত্তার প্রতি কশাঘাত করা হয়। ইহা ভগবদিচ্ছার একান্ত বিরুদ্ধ। সুতরাং ভগবৎ-সেবার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনকারী শ্রীগুরুপাদপদ্মে ভগবদিচ্ছার বিরোধ অস্বাভাবিক। তথাপি বঞ্চনা-দ্বারাও অনুগতজনকে কৃপা করিয়া তিনি 'কৃপা-বারিধি' নামের সার্থকতা করিয়াছেন। এইরূপ বঞ্চনার গূঢ়-রহস্য অনুধাবন করিবে কে? পার্থিব-বস্তুর ভোগবাসনায় প্রমত্ত আমাদের হৃদয়ের গতিরোধ করিবার সর্ব্বোত্তম উপায়—"বঞ্চয়েৎ দ্রবিণাদিভিঃ।" শ্রীগুরুদেবের অর্থে ও দ্রব্যে আমাদের ভোগবাসনা চরিতার্থ করিবার প্রবৃত্তিকে আজ তাঁহার বিরহাগ্নিতে ভস্মীভূত করাই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য। শ্রীল প্রভুপাদের প্রকট-কালে তিনি আমাদের প্রচুর দ্রবিণাদি দ্বারা কৃপা করিয়াছেন। আজ তাঁহার অপ্রকটে তাহা লাভের ব্যাঘাত হওয়ায় বিরহ-যাতনা অধিক বলিয়া মনে হইয়া থাকে। **এইরূপ বিরহ অপেক্ষা 'শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদের যে শিক্ষা দান করিতেন, সেই শিক্ষা লাভ হইতে বঞ্চিত হইয়াছি।'—এইরূপ অভাব-অনুভূতি উন্নততর বিরহ।**

---

* ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ, ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দ।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের পারমহংস্য উক্তি

শ্রীগুরুপাদপদ্ম হৃদয়ের দুর্ব্বলতা লক্ষ্য করিয়া প্রচুর প্রতিষ্ঠায় বিভূষিত করিয়া আমাকে সেবায় নিযুক্ত করিয়াছেন। প্রতিষ্ঠাসূচক উৎসাহ-বাণী আমার মানব ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিকর হওয়ায়, দুর্ভাগ্যক্রমে শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে তাঁহার ঐরূপ বাণী আকাঙ্ক্ষা করিয়া আমার ইন্দ্রিয়-তর্পণ করাইয়া লইয়াছি। শুধু তাহাই নয়, মূঢ় মন শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেই বঞ্চনামূলক উৎসাহ-বাণীর উদ্দিষ্ট-বস্তু বলিয়া নিজেকে জ্ঞান করিয়া দম্ভের চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে। ইহাতে আমি শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা—"তৃণাদপি" শ্লোকের সমাধি দান করিয়াছি। শ্রীগুরুদেবের অতিমর্ত্ত্য মুক্ত-স্বরূপে "যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে" —বাক্যের সার্থকতা নিত্য বর্ত্তমান। 'যাঁহা নদী দেখে, তাঁহা মানয়ে কালিন্দী'—শ্রীগুরু-পাদপদ্মের ইহা স্বভাব। তজ্জন্য আমাদের ন্যায় পূতিগন্ধময় পার্থিব-জগতের যাবতীয় আবর্জ্জনাযুক্ত নদী-নালা মহাভাগবতের দৃষ্টিতে পরম পবিত্র কালিন্দীস্বরূপ দৃষ্ট হইলেও আমরা তাহাকে কালিন্দী বলিয়া মনে করিতে পারি না। আমার হৃদয়ের ময়লা আমি সর্ব্বতোভাবে পরিজ্ঞাত আছি। যে-কোন শৈলই গিরিগোবর্দ্ধন নহে। আমার দম্ভ-রূপ অত্যুচ্চ প্রস্তরসদৃশ শৈলকে মহাভাগবত গোবর্দ্ধন দর্শন করিলেও আমার পক্ষে তাহা গোবর্দ্ধন নহে। শ্রীগুরুপাদপদ্ম প্রচুর প্রশংসা করিয়া আমার উন্নতি সাধনের বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। আমি তাঁহার হৃদয়ের গূঢ়তম অবস্থা বুঝিতে না পারিয়া তাহাতেই স্ফীত হইয়া শ্রীগুরুদেবের নিকট উহার দাবী করিতেছি। তাঁহার অবর্ত্তমানে সেই স্তব-স্তুতি-মূলক বাক্য শ্রবণ করিয়া মনরূপ ষষ্ঠ-ইন্দ্রিয়ের তর্পণ হইতেছে না ভাবিয়া বিরহ অনুভব করিতেছি। কিন্তু আজ শ্রীল প্রভুপাদের ভূ-কম্পিত কঠোর বজ্র-গম্ভীর শিক্ষা-বাক্যসমূহ স্মরণ করিয়া আমার দম্ভশৈলের বিনাশসাধন করাই বিরহ-দিবসের কর্ত্তব্য।

শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষাসার

শ্রীল প্রভুপাদ সিংহ-স্বরে বজ্রদণ্ডে হৃৎকম্প-ভাষায় আমাদিগকে যে-সমস্ত শিক্ষা দিয়াছেন, তাহার মধ্যে একটী প্রধান শিক্ষা আজ আমার হৃদয়ে জাগরূক হইতেছে। আমাদের ভবিষ্যৎ দুর্দ্দৈবের কথা চিন্তা করিয়া আমাদের উদ্ধারের জন্য সাধন-মার্গের উন্নততম শিক্ষাসমূহের তাঁহার অন্যতম শিক্ষা—**সাধু-বৈষ্ণব-সঙ্গে থাকিয়া হরিনাম কীর্ত্তনের দ্বারা কৃষ্ণের প্রীতিবিধান করা। ভজন বলিতে কৃষ্ণকীর্ত্তনই একমাত্র ভজন। ইহাই শ্রীরূপ-রঘুনাথের শিক্ষা।** গোপনে তথাকথিত নির্জ্জনে বসিয়া আলস্যের প্রশ্রয় দিয়া ইন্দ্রিয়-তর্পণ করাকে কখনই ভজন বলিয়া শাস্ত্রকারগণ শিক্ষা দেন নাই। ইন্দ্রিয়-তর্পন-পরায়ণ প্রতিষ্ঠাকামী অলস ব্যক্তিসকল ভজন কাহাকে বলে জানিতে না পারিয়া, হরিনামের পরিবর্ত্তে অন্ধকূপ-সদৃশ গৃহের কোণে বসিয়া শ্রীল প্রভুপাদের

ভাষায় 'কাছি টানাকে'ই হরিনাম বলিয়া মনে করিয়া অধঃপতিত হইতেছে। কৃষ্ণশক্তির অভাবহেতু দুর্ব্বলতাবশে অলস ব্যক্তিসকল কৃষ্ণসেবা-তৎপর গুরুদাস্যকে কর্ম্ম বলিয়া মনে করিয়া, শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-দিবসে তাঁহার হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করিতেছে। কর্ম্ম ও ভক্তির তারতম্য তাহারা বুঝিতে পারে না। সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা কৃষ্ণসেবা যদি কর্ম্ম হয়, তাহা হইলে সর্ব্বেন্দ্রিয়ের পক্ষাঘাত হওয়াই কি ভগবদ্ভক্তি? আজ শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-তিথিতে হৃদয়-দৌর্ব্বল্যগ্রস্ত প্রতিষ্ঠাকামী জীব-সমূহের গুরুদ্রোহীতার কথা স্মরণ করিয়া হৃদয় ব্যথিত হইতেছে। শ্রীল প্রভুপাদ 'নির্জ্জন' বলিতে দুর্জ্জন-সঙ্গ ত্যাগ ও সজ্জনসঙ্গ গ্রহণকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত 'নির্জ্জন' শব্দের যে-কোন অর্থ-ই শাস্ত্রবিরুদ্ধ, যুক্তিবিরুদ্ধ ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের মনোভীষ্ট প্রচারের বিরুদ্ধ। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রার্থনা—আপনারা ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসস্বামী অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আন্তরিক ইচ্ছার প্রতিকূল আচরণ না করিয়া অনুকূলভাবেই তাঁহার মনোভীষ্টের সহায়ক হইবেন। শ্রীল প্রভুপাদ আমাদের মঙ্গল বিধানার্থ তাঁহার যে মনোভীষ্ট উপদেশ-গীতি সংরক্ষণ করিয়াছেন, আজ সেই গীতিটীই এই বিরহ-তিথি বাসরে আমাদের একমাত্র জীবাতু হউক।—

দুষ্ট মন, তুমি কিসের বৈষ্ণব?
প্রতিষ্ঠার তরে, নির্জ্জনের ঘরে,
তব হরিনাম কেবল কৈতব॥
জড়ের প্রতিষ্ঠা, শূকরের বিষ্ঠা,
জান না কি তাহা মায়ার বৈভব।
কনক-কামিনী, দিবস-যামিনী,
ভাবিয়া কি কাজ, অনিত্য সে-সব॥
তোমার কনক, ভোগের জনক,
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।
কামিনীর কাম, নহে তব ধাম,
তাহার মালিক কেবল যাদব॥

* * *

ব্রজবাসিগণ, প্রচারক-ধন,
প্রতিষ্ঠা-ভিক্ষুক তারা নহে 'শব'।
প্রাণ আছে তাঁ'র, সে হেতু প্রচার,
প্রতিষ্ঠাশা-হীন 'কৃষ্ণগাথা' সব॥
'শ্রীদয়িত দাস' কীর্ত্তনেতে আশ,
কর উচ্চৈঃস্বরে 'হরিনাম-রব'।

কীর্ত্তন-প্রভাবে, স্মরণ হইবে,
সে-কালে ভজন নির্জ্জন সম্ভব ॥

শ্রীল প্রভুপাদ পরম উন্নতোজ্জ্বল-রসে শ্রীশ্রীরাধাদাস্য লাভ করিবার উদ্দেশ্যে আমাদের শিক্ষাসার-স্বরূপ উক্ত গীতিটী স্বর্ণাক্ষরে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারই বিরহ-দিবসে ইহা আমাদের একমাত্র কীর্ত্তন-প্রভাবে স্মরণীয়।

উক্ত গীতিটীর চরমে শ্রীল প্রভুপাদ জানাইয়াছেন—"কীর্ত্তন-প্রভাবে স্মরণ হইবে, সেকালে ভজন নির্জ্জন সম্ভব।" ইহা দ্বারা কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, এমন কোন একটী কাল উপস্থিত হইতে পারে—যে সময়ে তথাকথিত নির্জ্জন-ভজন সম্ভবপর। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের 'সে-কালে ভজন নির্জ্জন সম্ভব' উক্তির দ্বারা তিনি **'সে কাল'টী** নিরূপণ করিয়াছেন **কীর্ত্তন-প্রভাবে**। অর্থাৎ কীর্ত্তন-প্রভাবে স্মরণ হইবে এবং নির্জ্জন-ভজনও হইবে। 'নির্জ্জন' শব্দের অর্থ পূর্ব্বেই জানাইয়াছি,—দুর্জ্জন-সঙ্গ ত্যাগ। প্রকৃত অসৎসঙ্গ ত্যাগ—হরিকীর্ত্তন ব্যতীত কোন প্রকারেই হইতে পারে না। অসৎসঙ্গ ত্যাগের একমাত্র প্রণালী—হরিকীর্ত্তন এবং ভগবল্লীলাদি স্মরণেরও একমাত্র প্রণালী—হরিকীর্ত্তন। সুতরাং 'সেকালে ভজন নির্জ্জন সম্ভব' বলিলে—সৎসঙ্গে থাকিয়া হরি-কীর্ত্তন করাই নির্জ্জন-ভজন বুঝাইতেছে। গীতিটীর উপক্রম, উপসংহারাদি বিচার করিলে উহাই একমাত্র প্রতিপন্ন হয়।

এসম্বন্ধে পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যবর্গের উপদেশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি,—

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ—

১। নির্জ্জন-ভজনের ছলনায় সর্ব্বদা অলস জীবন যাপন করা, নিষ্কিঞ্চনতার ছলনায় অনর্থক দারিদ্র্য আনয়ন করা ও হরিকীর্ত্তনে বাধা দেওয়া আবশ্যক নহে।

(পত্রাবলী ২য় খণ্ড, ১০০ পৃষ্ঠা)

২। কীর্ত্তন-মুখেই শ্রবণ হয় এবং স্মরণের সুযোগ উপস্থিত হয়। সেই কালেই অষ্টকাল-লীলা-সেবার অনুভূতি সম্ভব। (পত্রাবলী ২য় খণ্ড ১১৯ পৃষ্ঠা)

শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ ঃ—

আমার নিকট বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম কর, কৃত্রিমভাবে লীলা-স্মরণাদি করিতে গেলে অনর্থের ভূত ও মায়াপিশাচী আরও ভাল করিয়া তোমার ঘাড়ে চাপিয়া বসিবে।

(গৌড়ীয় ১৪শ খণ্ড, ২১৮ পৃষ্ঠা)

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ঃ—

সাধু লোকের সঙ্গ করিলে নিঃসঙ্গত্বরূপ ফলোদয় হয়।

(সজ্জনতোষণী ১৫শ খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ১ম পৃষ্ঠা)

শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ ঃ—

১। নির্জ্জন-ভজনের ছলনায় অলস হইও না।

২। অনবধানের সহিত লক্ষ লক্ষ মালা টানা অপেক্ষা বৈষ্ণব-সেবার জন্য বাগান-চাষ ও গাছে জল দেওয়া অধিক মঙ্গলজনক। বৈষ্ণব-সেবার ফলে নামে অকপট রুচি হইবে।

৩। বৈষ্ণবের অনুকরণ করিও না, পুড়িয়া মরিবে, তাঁহার অকপট সেবা যাচ্ঞা কর।

৪। সাধারণ চোরের কখনও মঙ্গল হয়, কিন্তু গুরু-বৈষ্ণবের অর্থভোগকারীর কখনও মঙ্গল হয় না।

৫। আনুগত্যই শ্রেষ্ঠ সদাচার, স্বতন্ত্রতাই ভ্রষ্টাচার।

৬। কৃত্রিম স্মরণ-পদ্ধতি রূপানুগ পথ নহে।

৭। শ্রীনাম-কীর্ত্তন-মুখে স্বাভাবিক স্মরণই গৌড়ীয়গণের সিদ্ধান্ত।

(গৌড়ীয় ১৭ বর্ষ ৫০৪-৫ পৃষ্ঠা)

—শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা ১ম বর্ষ। ১০-১১ সংখ্যা।

শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-বাসরে

বিরহ-স্মৃতি

শ্রীব্যাসপূজায় কৃপা-প্রার্থনা

"তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥"

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের (মঃ ২২।২৫) এই বাক্যের প্রতিধ্বনিস্বরূপ দেখিতে পাই—"শ্রীব্যাসপূজাই যুগপৎ গুরু ও কৃষ্ণসেবা" (গৌঃ ৪র্থ বর্ষ, ৫৯০ পৃঃ)। সুতরাং পরম-পূজ্য জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-তিথিতেই ব্যাসপূজা অনুষ্ঠিত হওয়ার বিধি গৌড়ীয় আচার্য্যগণের উপদেশ-অনুসারে জানিতে পারা যায়। এই ব্যাসপূজা উপলক্ষে গুরুদেবের অঙ্গস্বরূপ পারমার্থিক পত্রিকার সেবার জন্য আদিষ্ট হওয়ায় নিজের নিতান্ত অযোগ্যতার বিষয় সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিয়া বিপদ গণিতেছি। মাননীয় গুরুদাসগণই এরূপস্থলে বিপদুদ্ধারণ বান্ধব। গুরুদাসগণের আনুগত্য করাই গুরুসেবার পরাকাষ্ঠা। গুরু-দাসগণের সকলের পাদপদ্মে আমার নিষ্কপট সাষ্টাঙ্গ প্রণতি জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহা-দের প্রতি সতীর্থ-ভ্রাতৃবোধে **'সখ্য'** আচরণ করিয়া যে ভ্রাতৃবিরোধের আবাহন করিয়াছি, শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর হইতেই তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া নিজ জীবনকে ধিক্কার দিতেছি। ব্যাস-পূজার পূজারী গুরুদাসগণ! আপনারা আমার প্রতি কৃপা-

কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া—আমার অযোগ্যতা দেখিয়া উপেক্ষা না করিয়া গুরুগৌরাঙ্গ-গুণ-গানরূপ **'দাস্যে'** নিযুক্ত করুন, ইহাই আপনাদের পাদপদ্মে কাতর প্রার্থনা।

গুরুদেবের স্বরূপ

ব্যাস ও বৈয়াসকির আনুগত্যে গুরুদাসগণ শাস্ত্রের "গৌরজন-সঙ্গ কর গৌরাঙ্গ বলিয়া", "আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ" প্রভৃতি বাক্যদ্বারা আমাকে শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সম্বন্ধে "সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈঃ" জানাইলেও "কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য" ইত্যাদি জ্ঞান করিতে উপদেশ দিয়াছেন। কবিরাজ গোস্বামীও "গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে" বলিয়া জানাইয়া "গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥"—উপদেশ করিয়াছেন। মহাজন-গণের ও শাস্ত্রের দৃষ্টান্ত-অনুসারে গুরুদেব ভগবৎ-স্বরূপেই প্রমাণিত হইতেছেন। এবম্-প্রকার শ্রীগুরুদেবের দাসগণকে তদভিন্নজ্ঞানে শিক্ষা-গুরু বলিয়াই মনে হইতেছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী—"শিক্ষাগুরুকে ত' জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।" —কীর্ত্তন করিয়াছেন। গুরুর নিত্য সেবকগণ! আপনাদের ভৌম-জগতে অবতরণ কেবল মাদৃশ পাপ-পঙ্কিলে পতিত নরাধমকে উদ্ধার করিবার জন্য। আপনাদের অতি-মর্ত্ত্যবাণী হইতে শ্রীগুরুদেবের অতিমর্ত্ত্যতার কথা শ্রবণ করিয়াও তাহাতে আমার মর্ত্ত্য-বুদ্ধির কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই; বিবর্ত্ত বা অসূয়াই তাহার মূল-কারণ।

বাণী-কীর্ত্তনই প্রভুপাদের মনোঽভীষ্ট

'বাণী' কেবলমাত্র 'কর্ণ'-নামক একটী ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলিয়া অন্য ইন্দ্রিয়-চতুষ্টয় এ-ক্ষেত্রে হীনবীর্য্য। অতীন্দ্রিয় বস্তুতে ইন্দ্রিয়-সংস্পর্শ সম্ভবপর নহে। ইন্দ্রিয়-সংস্পর্শ যতদূর হ্রাস হইবে, ততদূরই আমাদের পক্ষে মঙ্গল। সেই জন্যই শ্রবণ-কীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠতা। আপনাদের শ্রীমুখ-বিগলিত অপ্রাকৃত বাণী-কীর্ত্তন শ্রবণ (?) করিয়াও যখন গুরুদেবের প্রতি মর্ত্ত্য-বুদ্ধি নষ্ট হয় নাই, তখন অন্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ক্রিয়াশীলা ভক্তির অন্য অনুষ্ঠানসমূহ আমার নিকট নিষ্ক্রিয় হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? বর্ত্তমানযুগে যে-কোন ভক্ত্যঙ্গই অনুষ্ঠিত হউক না কেন, তাহা কীর্ত্তনাখ্যা-ভক্তি সহযোগেই করা প্রয়োজন এবং শ্রবণ-কীর্ত্তন ব্যতীত অন্য ভক্ত্যঙ্গ থাকিলেও তাহা কীর্ত্তন ব্যতীত সুফলপ্রদ নহে। তাই আপনাদের অপার করুণায় একমাত্র কীর্ত্তনকেই নিরপেক্ষ শ্রেষ্ঠ সাধন বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছি। **শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি প্রচারাখ্যা ভক্তিই শ্রীচৈতন্য-মনোঽভীষ্ট 'ভাগবত মত' এবং মঠ-মন্দির নির্ম্মাণ, শ্রীবিগ্রহ-সেবাদি-পরিচালন প্রভৃতি অর্চ্চনাখ্যা ভক্তিই 'পাঞ্চরাত্রিক মত'।** ভাগবত-প্রচারই শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবের অন্তরুদ্দেশ্য (ontological aspect) বলিয়া আপনারা আমাকে জানাইয়াছেন। **কীর্ত্তনই কীর্ত্তনের ফল। কীর্ত্তনই সেবা—কীর্ত্তনই প্রেম।** শ্রীল জীবপাদ ক্রমসন্দর্ভে লিখিয়াছেন—"যদ্যপ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা তদা কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি-সংযোগেনৈব ইত্যুক্তম্"। শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং বলিয়াছেন—"পাঞ্চ-

রাত্রিক **process** (প্রণালী) অনুসারে **representative** (প্রতিনিধি) থাকেন থাকুন, মন্দির করা হউক, ঠাকুর থাকুন ; কিন্তু **better class—higher class** যাঁহারা, তাঁহাদের প্রচার-কার্য্য। বৈকুণ্ঠনামের সর্ব্বত্র প্রচারই মহাপ্রভুর মনোহভীষ্ট। * * * * আমাদের প্রচার-প্রণালী এইরূপ হউক্—প্রচুর পরিমাণে **pamphlet** করা হউক, মঠ-মন্দির না হয় না-ই হইল।" তিনি তাঁহার শেষ বক্তৃতাতেও আমাদিগকে বিশেষভাবে সাবধান করিয়া জানাইয়াছেন—"আমরা কিছু জগতে কাঠ-পাথরের মিস্ত্রী হইতে আসি নাই, আমরা শ্রীচৈতন্যদেবের বাণীর পিয়ন মাত্র।" যে-কোনও একাঙ্গ সাধন কিংবা বহু অঙ্গ সাধন লোকে স্বতন্ত্রভাবে করে করুক্ ; কিন্তু আমরা একমাত্র কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিই প্রভুপাদের অনুজ্ঞা-অনুসারে পালন করিব।

বাণী-শ্রবণের কর্ণ প্রস্তুত প্রয়োজন

শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি মনুষ্য-বুদ্ধি থাকার দরুণ তাঁহার কোন কথাই আমার কর্ণে প্রবেশ করে নাই। তাই তিনি প্রায়ই বলিতেন,—"আগে কান তৈয়ারী হউক্, পরে ভাগবত-সিদ্ধান্ত-শ্রবণের যোগ্যতা হইবে।" কথাটা এখন মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি। তাঁহার নিকট (১৯৩৭ সাল পর্য্যন্ত) প্রায় অষ্টাদশ-বর্ষকাল থাকিয়াও তাঁহার "শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ" ; "অনুসরণ ও অনুকরণ" "আসল ও নকল", **"Ontology ও Morphology"**, "পারমার্থিক ও ব্যবহারিক" প্রভৃতি এবং গৌড়ীয়ের "বপু ও বাণী" আমার কর্ণে প্রবেশ করে নাই বা তাহার পার্থক্য উপলব্ধি হয় নাই। তাই গুরুদাসগণের নিকট প্রার্থনা—তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে আমার কান প্রস্তুত করিয়া দেন। কাণ প্রস্তুত না হইলে "উপদেশো হি মূর্খানাং প্রকোপায় ন শান্তয়ে।"—এই বাক্যের বিষয়ীভূত হইয়া পড়িব।

শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রাকৃত দেহ

আমার দুর্দ্দৈববশতঃ শ্রীল প্রভুপাদের দেহকে অপ্রাকৃত চিদানন্দময় নিত্যবিগ্রহরূপে দর্শন করিবার যোগ্যতা আমার কখনও হয় নাই ; যদিও আপনারা উহা আমাকে পুনঃ পুনঃ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার প্রতি আমার এ-প্রকার প্রাকৃত-বুদ্ধি দেখিয়া সহাস্যে মাঝে মাঝে অসুস্থতার অভিনয় করিতেন। আমি দুর্ব্বুদ্ধি-বিশিষ্ট হইয়া আমার প্রাকৃত হস্ত-পদাদি লইয়া তাঁহার শ্রীঅঙ্গ-সেবার জন্য তাঁহাকে স্পর্শ করিতে গেলেই তিনি স্বতন্ত্রভাবে থাকিয়া তাঁহার মায়া-দেহটী অগ্রসর করিয়া দিয়া আমার আসুরিক প্রবৃত্তিকে মুগ্ধ করিতেন। বস্তুতঃ তাঁহার চিন্ময় দেহে কোনপ্রকার ব্যাধি-বিকার ছিল না। আমি তখন তাহা কিছুমাত্র বুঝিতে পারি নাই। আমার ন্যায় যথাসর্ব্বস্ব কামী, যোগী রাবণের পক্ষে মায়াসীতা স্পর্শ ব্যতীত চিচ্ছক্তি-স্বরূপিণী রামাঙ্ক-লক্ষ্মী সীতাদেবীকে স্পর্শ করিবার যোগ্যতা কোথায় ? আমি শঙ্করের জীবন-সম্বন্ধেও এই প্রকার লীলার কথা শ্রবণ করিয়াছি। শঙ্কর যখন মণ্ডন-মিশ্রের স্ত্রী 'উভয়ভারতী'র

নিকট বিচারে পরাস্ত হন, তখন তিনি তাঁহার শরীর পদ্মপাদের নিকট এক পর্ব্বতগুহায় রক্ষা করিয়া জনৈক রাজার মৃত শরীরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাই শ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্যত্ব সম্বন্ধে কিছুই উপলব্ধি করিতে না পারায়, তাঁহার নিকট হইতে কপট-কৃপা লাভ করিয়া চিরদিনই বঞ্চিত হইয়াছি। ইহা তাঁহার চেতনময়ী বাণীতে কর্ণপাত না করার ফল। ইহাই আমার চরম দুর্ভাগ্য।

আচার্য্যের নির্য্যাণ-লীলা

শ্রীল প্রভুপাদ যখন দেখিতে পাইলেন—তাঁহার সেবকাভিমানী এহেন দুর্জ্জন দম্ভে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল, প্রতি পদে প্রতি মুহূর্ত্তে আমার চিত্ত ক্রমশঃ তাঁহার সহিত সমজ্ঞান করিতে করিতে তাঁহারই আসন গ্রহণের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল, তখনই মাদৃশ নিত্যবদ্ধ প্রস্তরতুল্য কঠিন, অভ্রের ন্যায় অদাহ্য, অগ্নিতুল্য শুষ্ক চিত্তবৃত্তি-বিশিষ্ট পাপিষ্ঠকে শিক্ষা দিবার জন্য বজ্রাপেক্ষা কঠিন, অগ্নি অপেক্ষাও দহনশক্তি-বিশিষ্ট আকস্মিক এক মহা নিদারুণ লীলা আবিষ্কার করিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার লীলা-সংগোপনের অব্যবহিত পূর্ব্বে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে যখন তাঁহার আবির্ভাব-ক্ষেত্র শ্রীপুরীধামে চটকপর্ব্বতে পুরুষোত্তম মঠে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন তিনি আমার বিমুখতা দেখিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন,—"আমার কথা আর কেহ বুঝিতেছে না, কেহ গ্রহণ করিতেছে না। সুতরাং **এ-জগতে থাকা আর প্রয়োজন নাই—চলিয়া যাওয়াই ভাল।"** তখন তাঁহার করুণার কথা বুঝিতে না পারিয়া প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। আমার দুর্ভাগ্য, তাই তিনি ১৩৪৩ সালের ১৬ই পৌষ বৃহস্পতিবার নিশান্তে হঠাৎ বজ্রাঘাত করিলেন। তিনি আমাকে অহংগ্রহোপাসক ও ভোগী দেখিয়া "বৈরাগ্যযুগ্ ভক্তিরস" শিক্ষা দিবার জন্য 'সন্ন্যাস-বেশ' গ্রহণ করিতে বহুবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ তখন তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। তাই তিনি আমার দৈহিক ও দেহে আত্মবুদ্ধি-বিনাশপর বৈরাগ্য শিক্ষার জন্যই নির্য্যাণ-লীলা প্রদর্শন করিলেন। শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু তাঁহার স্বকৃত সিদ্ধান্তরত্নাখ্য ভাষ্য-পীঠকের প্রথম-পাদের শেষে ভাগবতের ঋষভদেবের নির্য্যাণ-প্রসঙ্গ বিচারকালে "সাম্পরায়-বিধিরপি প্রাতীতিক্যেব তাবতৈব তদাবেশ-পরিক্ষয়াৎ" বাক্যের টিপ্পনীতে লিখিয়াছেন,—"সাম্পরায়বিধির্দ্দেহত্যাগপ্রকারঃ। তাবতৈবেতি প্রাতীতিক্যেন তাদৃশানাং দেহত্যাগেন শুশ্রূষূণাং (শিষ্যাণাং) নৃণাং দেহাবেশ-ত্যাগাদিত্যর্থঃ।" অর্থাৎ ঋষভদেব সাক্ষাৎ ভগবান্ হইলেও তিনি পারমহংস্য-ধর্ম্মানুকরণ করেন, ইহাতে তাঁহার দেহত্যাগাদি লীলা—তাঁহার শিষ্য বা সেবকগণের দেহাসক্তি ত্যাগ করাইবার জন্যই জানিতে হইবে।

নির্য্যাণে প্রবোধ-বাক্য

গুরুপ্রেষ্ঠগণ আমাকে প্রবোধ দিবার জন্য শ্রীভাগবতের একাদশ স্কন্ধের একত্রিংশৎ অধ্যায়ে শ্রীহরির নির্য্যাণ-প্রসঙ্গে ব্যাসসূনু শ্রীশুকদেবের উক্তিসমূহ জানাইয়াছেন—

"রাজন্ পরস্য তনুভৃজ্জননাপ্যয়েহা,
মায়াবিড়ম্বনমবেহি যথা নটস্য।" (ভাঃ ১১।৩১।১১)

আচার্য্যদেবের চিদানন্দময় নিত্যদেহ নট-পুরুষের ন্যায় স্বরূপতঃ অবিকৃত থাকিয়াই জাগতিক রঙ্গমঞ্চে আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জন্ম-মরণাদির অভিনয় করিয়াছেন। সাধারণ জীবের জন্ম-মরণাদি দুঃখময়, কিন্তু অতিমর্ত্ত্য আচার্য্যের চিন্ময় বিগ্রহের আবির্ভাব-তিরোভাবাদি সুখময়। ঐন্দ্রজালিক দর্শকবৃন্দের (বিস্ময় উৎপাদনের জন্য তাহাদের) সমক্ষেই একটী লোককে অস্ত্রদ্বারা আঘাত করিয়া হত্যা করিতে দেখা গেলেও তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা মনে করিয়া বিজ্ঞগণ তাহার জন্য অনুতাপ ভোগ করেন না। কিন্তু অজ্ঞ বালকগণ তাহা দেখিয়া ক্রন্দন করিয়া থাকে। আচার্য্যের এই নিদারুণ অপ্রকট লীলা সে-প্রকার হইলেও আমার ন্যায় অজ্ঞ তাহাতে অবিশ্বাস করিয়া সান্ত্বনা লাভ করিতে পারে নাই। তাই তাঁহার এই লীলা সুখময়ী হইলেও আমার নিকট অতীব দুঃখময়ী হৃদয়-বিদারক বলিয়া প্রতীতি হইতেছে। গুরুদাসগণ ইহাতে বিরহান্তপ্ত হইলেও আমার তাহাতে শূদ্রের ন্যায় শোকই হইতেছে। আপনাদের নিকট শ্রবণ করিয়াছি, বিচ্ছেদ বা বিরহ সেবা-সৌষ্ঠব বর্দ্ধিত করে এবং উদ্দীপনের বস্তুসকল নয়ন-পথে আসিলেই উত্তরোত্তর সেব্যের প্রতি আসক্তি দৃঢ়তর হয়। তাহাতে সেব্যের আনন্দের প্রচুর পরাকাষ্ঠাই লক্ষ্য করা যায়। আর শোকে বদ্ধজীব অভিভূত হইয়া নিস্তেজ হইয়া পড়ে—শক্তি-সামর্থ্য লোপ পায়—কাতর হইয়া পড়ে এবং সেবার (?) অভাব-হেতু তাহার আনন্দবর্দ্ধনরূপ কোন ক্রিয়াই দৃষ্ট হয় না। তাই আমি অজ্ঞ মূঢ়ের ন্যায়—শূদ্রের মত শোকে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি। আমার কোনরূপ উৎসাহ হইতেছে না। "হৃষীকেন হৃষীকেশ-সেবনং" আমার পক্ষে দুরূহ হইয়া পড়িল।

আচার্য্যের ভক্ত-বাৎসল্য

শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-তিথিতে তাঁহার তিরোভাবের কথাই সর্ব্বদা মনে উঠিতেছে। তাই হরিষে বিষাদ গণিতেছি। মঙ্গলময় শ্রীল প্রভুপাদ আমার এইপ্রকার দুরবস্থা দর্শন করিয়া আমাকে উৎসাহিত করিবার জন্যই প্রতিবৎসর বিরহ-তিথি অতিক্রম করিয়াই পুনঃ প্রকট-তিথি প্রদর্শন করিতেছেন। তাঁহার প্রেষ্ঠগণের ভিতর দিয়াই তাঁহার পুনর্দ্দর্শন লাভ করিবার আশায় আপনাদের পাদপদ্মে আসিয়া উপনীত হইয়াছি। মিলন না হইলে হৃদয়ের তীব্র যাতনার অবসান হয় না। তাই শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তগণকে কৃপা করিয়া তাঁহাদের বিরহ-কাতরতায় সান্ত্বনা দিবার জন্যই অপ্রকট কালের অনতিকাল পরেই প্রকট-লীলা প্রদর্শন করিলেন। ইহা তাঁহার যে কতবড় দয়া ও ভক্ত-বাৎসল্যের পরিচয়, তাহা ভাষা বর্ণনা করিতে অক্ষম।

আচার্য্যের শ্রীধামে আগমন

আমাদের মধ্যে বাণীর অনাদর আশঙ্কা করিয়া অভিমানভরে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার নিত্যপ্রিয় রাধাকুণ্ড-তীরে চলিয়া আসিবার মানসে গভীর তুষ্ণীম্-ভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন। বিষ্ণুদূত বৈষ্ণবগণ তাঁহার অন্তরুদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে মস্তকে ধারণ করিয়া বহুপ্রকোষ্ঠ-সমন্বিত একটী বিশিষ্ট সুসজ্জিত রথে* আরোহণ করাইয়াছিলেন। প্রভুপাদ সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ও সুন্দর প্রকোষ্ঠে তাঁহার প্রিয় সেবকগণসহ প্রবেশ করিলে অন্যান্য সেবকগণও তাঁহার অনুগমনে যথাযোগ্য কক্ষে আরোহণ করিয়াছিলেন।

ভূলোকাগত গোলোক-রথ শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীল প্রভুপাদকে পাইয়া অতিক্রুতবেগে অনিমেষে নিরবচ্ছিন্ন-ভাবে শ্রীকৃষ্ণধামে† আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। পথে কেবলমাত্র 'বিদ্যা-বেদনের' রণক্ষেত্রে‡ সারথি রথের গতি সঙ্গোপন করিলে লব্ধবেদনজ্ঞান আচার্য্যপাদের বাল্যলীলার আদি জ্ঞানোন্মেষ-লীলাক্ষেত্রের কথা স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য তিনি আমাকে আহ্বান করিয়া বাধ্ব-ঋষির ন্যায় নিঃশব্দে আমাকে অনেক কথা জানাইয়াছিলেন। কিন্তু আমার অজ্ঞানতাবশতঃ তখন আমি তাহার কিছুই বুঝিতে না পারিলেও 'অপ্রাকৃত বাণী-বিগ্রহের বাণী প্রাকৃত কর্ণের দ্বারা শ্রবণ করিবার চেষ্টা বৃথা'—তাহা সম্পূর্ণরূপেই উপলব্ধি করিয়াছিলাম। শ্রীবাণী-বিগ্রহ শ্রীল সরস্বতীপ্রভু কৃষ্ণধাম হইতে তদভিন্ন গৌরধামে শ্রীস্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সহিত দেখা করিয়া তাঁহাকে তাঁহার আগমন-বার্ত্তা জ্ঞাপন করেন এবং শ্রীধামমায়াপুরে চন্দ্রশেখর-আচার্য্য-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠে আচার্য্য-প্রকটিত শ্রীরাধাকুণ্ড-তীরে আসিয়া শ্রীল বাবাজী মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহারই নিকটে কুণ্ডতীরে সেবাকুঞ্জে এ অধমের সংগৃহীত বিবিধ পুষ্পমাল্য-চন্দনাদি উপায়ন-সমভিব্যাহারে হতভাগ্যের দ্বারা লাবণ্যযুক্ত হইয়া শ্রীরাধা-মদনমোহনের প্রেষ্ঠরূপে সমাধিস্থ হইলেন। এবং আমাকে তাঁহার আনুগত্যে যুগল-সেবা করার অধিকার দিবার জন্য নিত্যকাল তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। এক্ষণে গুরুদাসগণের নিকট প্রাথনা, তাঁহারা কৃপা করিয়া যেন গুরু-পাদপদ্ম-মনোভীষ্ট-সেবার কিঞ্চিন্মাত্রও যোগ্যতা আমায় প্রদান করেন।

নমঃ ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্ত-স্বরস্বতীতিনামিনে॥

নমস্তে গৌরবাণী শ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগ-বিরুদ্ধাপসিদ্ধান্ত-ধ্বান্তহারিণে॥

---

* Special Train এ। † কৃষ্ণনগরে। ‡ রাণাঘাটে

শ্রীল প্রভুপাদের পত্র ও তাহার ব্যাখ্যা

আমরা শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের শ্রীকরকমলাঙ্কিত একখানি পত্র পাঠকবর্গকে উপহার দিয়াছিলাম। সময় ও স্থানাভাবহেতু ঐ পত্রখানিতে যে উপদেশ-সার নিহিত আছে তাহা প্রকাশ করিতে পারি নাই। আমাদের অনেক সহৃদয় পাঠকবর্গ উহা জানিতে আগ্রহ প্রকাশ করায় উহা সংক্ষেপে নিবেদন করিতেছি।

সন ১৩২২ সালের ১১ই শ্রাবণ তারিখে লিখিত একখানি পত্রের উত্তরে জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদ ইং ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ২রা আগষ্ট তারিখে তাঁহার ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসগ্রহণ-লীলার দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে উক্ত পত্রখানি লিখিয়াছিলেন। তাই পত্রখানিতে শ্রীল প্রভুপাদের পূর্ব্বাশ্রমের নাম স্বাক্ষর করা রহিয়াছে। তাঁহার অতি শৈশব হইতেই অতিমর্ত্ত্য জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা ক্রমশঃ তাহা আলোচনা করিব। পাঠ, বক্তৃতা, প্রবন্ধাদি অপেক্ষা মহাজনগণের পত্রই প্রকৃত প্রাণস্পর্শী হয়। অবশ্য সাক্ষাৎ উপদেশের কথা স্বতন্ত্র। যদিও উহা কোনও ব্যক্তিবিশেষকে লেখা হয় তথাপি উহাতে এত চেতনাশক্তি নিহিত থাকে যে, তাহা সমষ্টি জীবনকেও আকর্ষণ করিয়া মঙ্গলের পথে অনায়াসে আনয়ন করিতে পারে। আমরা তজ্জন্যই শ্রীল প্রভুপাদের পত্র মুদ্রিত করিয়াছি। অনেক সময় পত্র-প্রকাশক মহাজনের নামে পত্র প্রকাশ করিয়া নিজের ধারণাগুলি প্রক্ষিপ্ত করিয়া পত্রের পবিত্রতা নষ্ট করিয়া থাকেন। আমরা তজ্জন্য মহাপুরুষের স্বহস্ত-লিপিই মুদ্রিত করিয়াছি এবং ভবিষ্যতেও এইরূপ করিতে যত্নের ক্রুটী করিব না। বর্ত্তমানে সকলের স্মরণের জন্য উক্ত পত্রখানি এখানে মুদ্রিত-অক্ষরে পুনরায় প্রকাশ করিলাম।—

শ্রীশ্রীগৌরহরিঃ শরণম্

শ্রীমায়াপুর ব্রজপত্তন
২।৮।১৫

শুভাশীষাং রাশয়ঃ সন্তুবিশেষাঃ —

আপনার ১১।৪।২২ তারিখের প্রেরিত পার্শ্বেল প্রাপ্ত হইয়াছি এবং দ্রব্য গ্রহণ করিয়াছি। শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট কিয়দংশ ও অত্রস্থ ভক্তধামবাসীগণকে কিয়দংশ প্রদান করিলাম। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় **আমি বিগত ২২ বর্ষকাল কোন প্রকার আম্রফল প্রসাদ পাই নাই** এবং আম্রসত্ত্বাদি ব্যবহার করি না। আপনার ভবিষ্যৎ-জ্ঞাতকারণ নিবেদন করিলাম। শ্রীমান্ মধুসূদনের পত্র পাইয়াছি। শ্রীযুক্তা সরোজবাসিনীর পত্রও পাইয়াছি।

সজ্জন-তোষণী নাম্নী একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ হইতেছেন। তাহাতে হরিকথা ব্যতীত অন্য বাজে কথা নাই। অনেক ভক্তপাঠ্য প্রবন্ধাদি তাহাতে

সন্নিবিষ্ট থাকে। আপনারা উহা যথারীতি পাঠ করিতে পারেন। উহা পাঠ করিলে অন্য জ্ঞানী ও কর্ম্মীসঙ্গে কষ্ট পাইতে হয় না। আশা করি আপনার ভজন কুশল।

নিত্যাশীর্ব্বাদক—

শ্রীবিমলাপ্রসাদ সিদ্ধান্ত সরস্বতী

আমরা পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় প্রকাশিত উক্ত পত্রের স্থূল ও স্পষ্ট মুদ্রিত অংশের প্রতি পাঠক-বর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ইহা সর্ব্বত্রই উপদেশপূর্ণ হইলেও আমরা উক্ত স্পষ্ট মুদ্রিত স্থলের একটী উপদেশ আলোচনা করিব।

প্রথমতঃ "আমি বিগত ২২ বর্ষকাল কোন প্রকার আম্রফল প্রসাদ পাই নাই"—এই কথার মধ্যে শ্রীল প্রভুপাদের আত্মজীবনের যুক্ত-বৈরাগ্য, নিষ্কামসেবা, কৃষ্ণার্থে ভোগ-ত্যাগের পরম আদর্শ নিহিত রহিয়াছে। একদিন শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীধাম মায়াপুরে গৌর-জন্মস্থানে যোগপীঠের সেবকখণ্ড গৃহমধ্যে সন্ধ্যাবেলায় পদচারণ করিতেছেন এমন সময় মনে মনে ভাবিলেন, এখন একটী পাকা আম পাইলে সেবা করা যাইত। তখন আদৌ আমের সময় নহে। অনুমান পৌষ বা মাঘ মাস চলিতেছে। কিয়ৎক্ষণ পরে মন্দিরের পূজারী একটী পাকা আম হাতে করিয়া লইয়া শ্রীল প্রভুপাদের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পূজারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আম কোথায় পাইলেন?" পূজারী বলিলেন—"এই মাত্র একটী বালক এই আমটী আমাকে দিয়া বলিয়া গেল যে এখনই ইহা সরস্বতী ঠাকুরকে দাও।" শ্রীল প্রভুপাদ ইহা শুনিবামাত্র এত দুঃখিত হইলেন যে দরদর ধারে তাঁহার অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল এবং গদ্গদ স্বরে আমটী ফেরৎ দিয়া পূজারীকে বলিলেন—"এখনই ইহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভোগে লাগাইয়া আপনারা প্রসাদ পাইবেন।" পূজারী ইহার মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারিলেন না; কিন্তু মনে মনে ভাবিলেন ইহার মধ্যে নিশ্চয়ই একটী গূঢ় রহস্য আছে।

ভক্তের ইচ্ছা ভগবান্ সর্ব্বদাই পূরণ করিবার জন্য ব্যস্ত। কারণ ভক্ত কোনদিনই তাঁহার প্রীতি ব্যতীত নিজ-কামনা পূরণের জন্য কিছুই প্রার্থনা করেন না। এরূপ স্থলে ভক্তের যদি কিছু প্রার্থনীয় হইয়া পড়ে ভগবান্ তৎক্ষণাৎ স্বয়ং তাহা পূরণ করেন। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ মনে মনে ভাবিলেন—"এই অসময়ে আমার হৃদয়ে আম খাইবার কামনার উদ্রেক হওয়ায় শ্রীভগবানকে কষ্ট দিয়াছি, তাঁহাকে আমার নিজ ভোগের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিবার জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছে; তাঁহাকে আমার কর্ম্মচারীরূপে ব্যবহার করিয়াছি। ইহা অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে; সুতরাং জীবনে আর আম খাইব না। ভগবানের প্রীতির জন্যই আম সমর্পিত হইল।" তদবধি তিনি আর আম গ্রহন করেন নাই। উহাই উক্ত পত্রে গুপ্তভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাই কৃষ্ণ-প্রীত্যর্থে ভোগ-

ত্যাগ। লোকশিক্ষার জন্য নিত্যমুক্ত-পুরুষ শ্রীল প্রভুপাদের কোনও কামনা না থাকিলেও এইরূপ একটী লীলা স্বীকার করিয়া সকলকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। এইরূপ নিষ্কাম জীবনের আদর্শ আর কোথাও দেখা যায় না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বিচার ব্যতীত অন্য কোনও ধর্ম্মে এরূপ সর্ব্বোচ্চ চিন্তাস্রোত দৃষ্ট হয় না। তজ্জন্যই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন—

কৃষ্ণভক্ত—নিষ্কাম, অতএব 'শান্ত'।
ভুক্তি-মুক্তি সিদ্ধি-কামী, সকলি 'অশান্ত'॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৪৯)

—শ্রীগৌঃ পত্রিকা ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা।

সতীর্থ-বিরহসূচক প্রবন্ধ—

স্বধামে অতীন্দ্রিয় প্রভু

অবরুদ্ধ বিরহ-প্রকাশ ও নির্য্যাণ-দিবস

যাঁহারা শ্রীধাম-মায়াপুরের ধামসেবার বৈশিষ্ট্যের সংবাদ রাখেন, তাঁহারা সকলেই শ্রীল অতীন্দ্রিয় ভক্তিগুণাকর প্রভুর পরিচয় অবগত আছেন। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা অবগুণ্ঠিতা নবাগতা কুলবধুর ন্যায় নির্জ্জনে নিভৃতে ভক্তবর শ্রীল অতীন্দ্রীয় প্রভুর বিরহ আর কতদিন লোক সমাজের অবগতির অন্তরালে রাখিবেন? উচ্ছ্বাসময়ী বেদনা আজ আপনা হইতেই প্রকাশিতা হইতেছে। তাঁহার বিরহবার্ত্তা আলোচনা করিতে গিয়া তাঁহার শুদ্ধবৈষ্ণবোচিত গুণাবলী আমাদিগকে মুগ্ধ করিতেছে। তাঁহার আচার-বিচার ও ব্যবহার তাঁহাকে চির-স্মরণীয় করিয়া রাখিবে। তিনি বিগত তেরশত পঞ্চান্ন (১৩৫৫) সালের ৩০শে চৈত্র তারিখে বর্ষান্তে দেহান্তলীলা প্রকাশ করিলেন। এই সৌরবর্ষ অশ্রুবর্ষণযোগেই সমাপ্ত হইল।

বৈষ্ণবের বিরহস্মৃতি আত্মশোধক

বৈষ্ণবের বিরহস্মৃতি আমাদের হৃদয়ে যাবতীয় ময়লা মুছিয়া মায়ামোহের মত্ততা হইতে মুক্ত করিয়া দেয়। তাঁহার সেবোন্মুখী সেবা-প্রবৃত্তিগুলি আমাদের জীবন-পথে অন্ধের যষ্টির ন্যায় অবলম্বন হইয়া থাকে। তাই আজ অতীন্দ্রিয় প্রভুর বহু গুরুসেবা প্রণালীর মধ্যে দুই একটী মাত্র আলোচনা করিয়া আত্মশোধন করিব।

বড়বাবুর চাকুরী-জীবন

তিনি ই, আই, রেলওয়ে কোম্পানীর অধীনে ধানবাদ বিভাগের ডিষ্ট্রিক্ট ট্র্যাফিক সুপারিনটেণ্ডেণ্ট (District Traffic Superintendent) আফিসের চিফ ক্লার্ক (cheif clerk) পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া বিশেষ কৃতিত্বের সহিত আফিসের যাবতীয় কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া যেটুকু সময় লাভ করিতেন, তাহাদ্বারাই শ্রীল প্রভুপাদের সেবার ও প্রচারের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেন। তাঁহার পদমর্য্যাদার দিকে লক্ষ্য করিয়া ধানবাদবাসী, ধামবাসী প্রভৃতি সকলেই তাঁহাকে "বড়বাবু" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। তিনি স্বনামে তত পরিচিত না হইলেও "বড়বাবু" নামে সকলের নিকট আদরের সহিত সুপরিচিত। চাকুরী-জীবনে সংগৃহস্থের কর্ত্তব্যবোধে যতটুকু তাঁহার স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের জন্য প্রয়োজন, তাহার অতিরিক্ত কোন ব্যয়-বাহুল্যের দ্বারা তাহাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য এক কপর্দ্দকও খরচ করিতেন না। সর্ব্বদাই মঠের সন্ন্যাসী-বৈষ্ণবগণের সেবার জন্য এবং তাঁহাদিগকে ধানবাদে আনাইয়া শ্রীল প্রভুপাদের প্রচার-বৈশিষ্ট্য লোক সমাজে কীর্ত্তন করাইতেন ও নিজেও কীর্ত্তন করিতেন। তাঁহার সেবাচেষ্টায় ধানবাদবাসী বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের চরণাশ্রয় করিয়া ধন্য হইয়াছেন এবং সেবার সুযোগ পাইয়া প্রচুর সেবোন্মুখী-সুকৃতি অর্জ্জন করিয়াছেন। ধানবাদে শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতী-বাণী প্রচারের মূল-পুরুষ এই বড়বাবু শ্রীল অতীন্দ্রিয় ভক্তিগুণাকর।

বড়বাবুর জীবন্ত চেতন-মৃদঙ্গ সংগ্রহ

বড়বাবু শ্রীগুরুদেব শ্রীল প্রভুপাদের সেবার জন্য যে জীবন্ত চেতন-মৃদঙ্গসমূহ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাই তাঁহাকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিবে। তিনি চিরতরে চর্ম্মচক্ষুর অন্তরালে বিচরণ করিলেও, আমরা তাঁহার অকৈতব সেবার কথা আলোচনা করিলে, তিনি আমাদের হৃদয়ে সর্ব্বদা অবরুদ্ধ থাকিবেন। তাঁহার সংগৃহীত জীবন্ত-মৃদঙ্গসমূহ মধ্যে মাত্র একটির কথা আমরা এখানে আলোচনা করিয়া নিরস্ত হইব। শ্রীল প্রভুপাদ সেই মৃদঙ্গটী লাভ করিয়া এমনভাবে তাহার বাদনধ্বনি করিয়াছিলেন, যাহার অপ্রাকৃত শব্দ প্রাচ্যদেশ অতিক্রম করিয়া সুদূর পাশ্চাত্য-দেশ পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। সেই "মৃদঙ্গবাদ্য, শুনিতে মন, অবসর সদা যাচে।" জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তির 'সার' গান করিতে এই অপ্রাকৃত চেতন-মৃদঙ্গের সহায়তা গ্রহণ করিয়া আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন। তাই মৃদঙ্গযন্ত্র সারঙ্গ-যন্ত্রে মিলিত হইয়া অপূর্ব্ব "অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ" আখ্যা লাভ করিল। শ্রীল অতীন্দ্রিয় প্রভু এই চেতন-মৃদঙ্গ শ্রীল অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ প্রভুর সংগ্রাহক।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনিষ্টিটিউটের মূল-ইন্ধন

বড়বাবুর চাকুরী-জীবন শেষ হইবামাত্রই তিনি শ্রীধাম মায়াপুরে স্থায়ী বাসস্থান নির্ম্মাণ করিলেন। স্ত্রী-পুত্রের গ্রামবাসে পারমার্থিক মঙ্গললাভের কোনও সম্ভাবনা নাই

দেখিয়া শ্রীশ্রীগৌর-জন্মভিটার সংলগ্নস্থানে শ্রীধামে ইষ্টক-নির্ম্মিত দ্বিতলগৃহ স্থাপন করিয়া সপরিবারে বসবাস করিতে লাগিলেন। ইহা তাঁহার বাহ্য উদ্দেশ্য হইলেও মূল উদ্দেশ্য ছিল শ্রীধামে বাস করিয়া সর্ব্বদা শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা করা। তিনি শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালাবধি তাঁহার সেবার কখনও ত্রুটী করেন নাই। একদিন তাঁহার পুত্রত্রয়ের মধ্যে নিমাই ও সীতানাথ একটু বড় হইয়া বিল্বপুষ্করিণী গ্রামের উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়ে পড়িতে যাইত। তাহাতে তিনি দুঃখিত হইয়া আমাকে বলিয়াছিলেন—ছেলেগুলি আজকালকার আসুরিক শিক্ষালাভ করিয়া অধঃপাতে যাইতেছে। আপনি কি ইহার একটী ব্যবস্থা করিতে পারেন না? তখনই তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া শ্রীল প্রভুপাদের নিকট এই কথা নিবেদন করিতেই তিনি একটী সেশ্বর উচ্চ-ইংরাজি-বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করেন এবং তাহা তৎক্ষণাৎ কার্য্যে পরিণত করা হয়। দুঃখের বিষয় তখন শ্রীল প্রভুপাদের গণ্যমান্য বহু সেবকাভিমানী ইহাতে ঘোরতর আপত্তি করিয়া তাহাতে অসহযোগ-বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। কালচক্রে আজ সেই আদর্শ-বিদ্যালয়ের তাঁহারাই নিয়ন্তা। আজ সেই বিদ্যালয়ের বহু ছাত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবায় সর্ব্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করার সুযোগ লাভ করিয়াছে। বলাবাহুল্য বৈষ্ণববর এই শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনিষ্টিটিউটের উন্নতিকল্পে প্রভূত চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। উক্ত বিদ্যালয় হইতে অন্যান্য ছাত্রদের সহিত তাঁহার প্রথম পুত্র নিমাইচরণও প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়।

অতুলবাবুর সত্যানুরাগ

বড়বাবুর পিতৃদত্ত নাম শ্রীঅতুলচন্দ্র এবং শ্রীগুরুদত্ত নাম শ্রীঅতীন্দ্রিয়। অতুলবাবুর সৎসাহসিকতার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের কিছুকাল পরে শ্রীধাম মায়াপুরে ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের তাণ্ডব-নৃত্য শ্রীধামকে প্রকম্পিত করিয়া তুলে। এমন কি শ্রীল প্রভুপাদের একনিষ্ঠ ঐকান্তিক সেবকগণের নির্ব্বিবাদ-সেবাধিকার সর্ব্বতোভাবে ব্যাহত হইতে লাগিল। ফলে কতকগুলি গুরুদ্রোহী পাষণ্ডী কিশোরী-ভজা, কর্ত্তাভজা ও ভজনখাজা-সম্প্রদায় শ্রীমায়াপুর-চন্দ্রকে রাহুর ন্যায় গ্রাস করিয়া ফেলিল। শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার হইতে লাগিল। এমন সময়েও তিনি নির্ভীকভাবে তথায় অবস্থান করিয়া সেই দানবগণের কার্য্যের কঠোর প্রতিবাদ করেন। সত্যের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তিনি একদিকে একা, অপরদিকে অন্যূন পাঁচ শত ভজন-খাজা দানব। অসুরগণ সদলবলে ব্যূহ রচনা করিয়া যখন শ্রীঅভিমন্যুর ন্যায় তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল, তখন তিনি অনন্যোপায় হইয়া পাষণ্ডদলনবানা, দুর্জ্জন-চপেটিকা শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং দানবদলনকল্পে তাঁহার চির আদরের প্রাকারবেষ্টিত ইষ্টক-নির্ম্মিত দ্বিতল বাসগৃহ উক্ত সমিতিকে নির্ব্যূঢ়স্বত্বে দান করেন। তিনি ৮৬ বৎসর কাল জগতে প্রকট থাকিয়া ধর্ম্ম-জগতের যে অভিজ্ঞতা লাভ

করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি স্পষ্টই জানিতে পারিয়াছিলেন যে, জগতের দুর্দ্দৈব মোচন করিতে একমাত্র শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতিই সক্ষম। শ্রীধাম মায়াপুরের আপাত কল্মষ নাশ করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছানুরূপ তাঁহার স্বরূপের পূর্ণ-অভিব্যক্তি করিতে একমাত্র শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতিই উপযুক্ত শুদ্ধ বৈষ্ণব-সঙ্ঘ। পরম পূজনীয় শ্রীল অতীন্দ্রিয় ভক্তি-গুণাকর প্রভু সরল অন্তঃকরণে নিজ বাসগৃহের মায়ামোহ ত্যাগ করিয়া একখণ্ড দানপত্র দলিল সম্পাদন করিয়া কৃষ্ণনগরে রেজিষ্টারী করিয়াছেন।

অতীন্দ্রিয় প্রভুর সঙ্কলিত "গৌড়ীয়-কণ্ঠহার"

অতুলবাবু পিতৃদত্ত নাম অপেক্ষা গুরুদত্ত নামের দ্বারাই আত্মপরিচয় দিতেন। তিনি শ্রীঅতীন্দ্রিয় দাসাধিকারী বলিয়া সর্ব্বত্র নিজনাম ব্যক্ত করিতেন। তাঁহার ভক্তি-সাহিত্যানুরাগ দর্শন করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতের পণ্ডিতগণের উপকারার্থে তিনি একখানি অপূর্ব্ব-গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছেন। গৌড়ীয়গণ তাহা তাঁহাদের কণ্ঠের হার-স্বরূপ পরিধান করেন বলিয়া উক্ত গ্রন্থের নাম **'গৌড়ীয়-কণ্ঠহার'**। এই কণ্ঠহার গুরুতত্ত্ব হইতে প্রয়োজনতত্ত্ব পর্য্যন্ত ১৮টী তত্ত্বরত্নে গ্রথিত এবং তাহাতে প্রমাণ-তত্ত্ব নামক একটী দোলক ও গুর্ব্বাশীর্ব্বাদে মধ্যমণি সন্নিবিষ্ট আছে। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার গ্রন্থ-খানি সঙ্কলন করিতে যে কত যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছে, তাহা যাঁহারা উক্ত গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন তাঁহারাই অনুভব করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবেন। শ্রীল প্রভুপাদ ইহার পরিচয় দিতে গিয়া যে "সূত্র"-শীর্ষক ভূমিকা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা সকলেরই অবগত হওয়া কর্ত্তব্য। নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল।

গৌড়ীয়-কণ্ঠহারের "সূত্র"-শীর্ষক ভূমিকা

শ্রীল ঠাকুর মহাশয় শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকায় গাহিয়াছেন—

সাধু-শাস্ত্র-গুরু-বাক্য, হৃদয়ে করিয়া ঐক্য,
সতত ভাসিব প্রেম-মাঝে।

"গৌড়ীয়-কণ্ঠহারে" এই বাক্যের সার্থকতা সংরক্ষিত হইয়াছে। শ্রীগুরুদেব শাস্ত্রবাক্য ব্যতীত অন্যকথা কীর্ত্তন করেন না, 'শাস্ত্র' শ্রীগুরুমুখ ব্যতীত অন্যত্র কীর্ত্তিত হন না। শ্রীগুরুদেব 'সাধু' বা পূর্ব্ব মহাজনগণের বর্ত্মানুবর্ত্তন ব্যতীত অন্য বিষয়ের উপদেশ প্রদান করেন না। সাধুগুরুর আচরণই—শাস্ত্র, সাধুগুরুর শ্রীমুখবিগলিত শ্রৌতবাণীই—শাস্ত্র: 'শাস্ত্রই'—'সাধু', 'শাস্ত্রই'—'গুরু', 'সাধুই'—'শাস্ত্র' বা 'ভাগবত', 'গুরুই'—'শাস্ত্র' বা আদর্শ মূর্ত্ত-ভাগবত। সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্য একসূত্রে গাঁথা, পরস্পরে এক মহান্ ঐক্যতান। প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি-সহযোগে এই 'ঐক্য' আত্মার সেবোন্মুখ-বৃত্তিতে উপলব্ধির বিষয় হয়। "গৌড়ীয়-কণ্ঠহারে"র যাবতীয় সিদ্ধান্ত সাধু বা মহাজনগণের আচারসম্মত—শাস্ত্র-সম্মত—গুরু বা আচার্য্যানুমোদিত শ্রৌত-বিচার।

এই "গৌড়ীয়-কণ্ঠহার" এইরূপ একটী ঐক্যতানের সূত্রে গ্রথিত হইয়াছে। অষ্টাদশটী ভক্তিসিদ্ধান্তরত্ন ও তন্মধ্যে একটী দোলক ও মধ্যমণি লইয়া—এই কণ্ঠহারটী রচিত। রত্ন-সমূহ সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-পর্য্যায়ে গুম্ফিত এবং স্থান-নির্দ্দেশ ও ভাষানুবাদসহ গ্রথিত। গৌড়ীয়গণ এই কণ্ঠহার তাঁহাদের কণ্ঠের ভূষণ করিয়া নিত্যকাল প্রেমামৃত আস্বাদন করুন্—ইহাই বিনীত প্রার্থনা।

ভক্তিগুণাকরের গুরুভক্তি

ভক্তিগুণাকর প্রভু গৌড়ীয়-কণ্ঠহার গ্রন্থখানি রচনা করিয়া শ্রীশ্রীগুরুদেবকেই উহা অর্ঘ্য-স্বরূপ উৎসর্গ করেন। প্রাকৃত গ্রন্থ-লেখকগণের উৎসর্গের পাত্র, ভঙ্গী ও ভাষা অপেক্ষা বৈষ্ণববরের তৎপক্ষে কোটীগুণে উন্নততম বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হইয়াছে। তিনি যে ভাব ও ভাষায় গুরুপাদপদ্মে ভক্ত্যর্ঘ্য বিতরণ করিয়াছেন, তাহা ধীরভাবে পাঠ করিলে লেখকের হৃদয়ের গভীর উন্নততম-উজ্জ্বল-গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা সমূহরূপে প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। আমরা তাঁহার হৃদয়ের স্বষ্ঠু পরিচয় দিতে অক্ষম—তাঁহার লেখনীই তাঁহার পরিচয় দিবে। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

গৌড়ীয়-কণ্ঠহারের "ভক্ত্যর্ঘ্য"-শীর্ষক উৎসর্গ পত্র

পরমারাধ্য-পরমাভীষ্টদেব পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য-বর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী চিদ্বিলাস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীশ্রীকরকমলেষু—

পরমার্চ্চনীয় প্রভুপাদ,

আপনি সাক্ষাৎ ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী—কীর্ত্তনাখ্যভক্তি,—ইহা আপনার কৃপায় আমার ন্যায় হরিবিমুখ ব্যক্তিও প্রত্যক্ষ করিয়াছে। কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের—"কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"—এই বাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ আপনি। ভবদাবদগ্ধ জীবকুলকে অনুক্ষণ হরিকথা শান্তি-সলিল-সেচনে সুস্নিগ্ধ করিবার জন্যই এই প্রপঞ্চে সম্প্রতি আপনার আবির্ভাব। আপনি অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-প্রকাশ কীর্ত্তন-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাশ্রয়; আপনি কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ বাস্তব-সত্য।

আপনার শ্রীমুখে অনুক্ষন বীর্য্যবতী—দীপ্তিমতী সিদ্ধান্ত-সুধা-সরিৎ প্রবাহিতা। আপনি অপার-অতল-ভক্তিসিদ্ধান্ত-রত্নাকর। তাহাতে অবগাহন-সামর্থ্য মাদৃশ ক্ষুদ্রজীবের নাই। তবে আপনি আপনার স্বভাবসুলভ বদান্যতাক্রমে যে সকল রত্ন বেলাভূমিতে নিক্ষেপ করিয়াছেন, তাহারই কয়েকটী মাত্র আহরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। আপনার শ্রীমুখ-বিগলিত হরিকথামৃত-তরঙ্গিণী-শ্রৌতবাণী শ্রীগৌড়ীয়-পত্রে প্রবাহিতা। তাহা হইতেই আমি অষ্টাদশটী রত্নগুচ্ছ সংগ্রহ করিয়া আপনার কৃপাসম্বর্দ্ধিত শ্রী * * * প্রমুখ সতীর্থ-গণের সাহায্যে এই 'কণ্ঠহার' রচনা করিয়াছি।

হে স্বরূপদামোদরানুগবর, হে গৌড়ীয়বর্য্য, এই 'কণ্ঠহার' আপনার প্রীতি আকর্ষণ করিলেই বুঝিব যে, ইহা গৌড়ীয়গণের কণ্ঠভূষণের যোগ্য হইয়াছে। এই 'কণ্ঠহার' আপনার শ্রীকরকমলে সমর্পণ করিতেছি—আপনার বস্তুই আপনার করে 'ভক্ত্যর্ঘ্য'-রূপে অর্পণ করিতেছি; আপনি গ্রহণ করুন্। আপনার করপল্লবস্পর্শ-প্রসাদোদ্ভাসিত রত্নহারের দ্যুতি মাদৃশ বহুজীবের অবিদ্যা-অন্ধকার বিদূরিত করিবে, সন্দেহ নাই।

হে মুকুন্দপ্রেষ্ঠ, আমি নিতান্ত অযোগ্য হইলেও আমার একটী আশাবন্ধ আছে যে, আপনার শ্রীকরকমলে যে বস্তু সমর্পিত হয়, তাহা নিশ্চয়ই শ্রীহরিকর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া থাকে। আশা করি, আপনার শ্রীকরকমলস্থ রত্নমালা কৃষ্ণপাদ-পঙ্কজান্ত নীরাজন করিয়া গৌড়ীয়-গণের কণ্ঠশোভা বর্দ্ধন করিবে। গৌড়ীয়গণ সেই প্রসাদ নিত্যকাল কণ্ঠে ধারণ করিয়া আমার প্রতি যে আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিবেন, তাহাই আমার একমাত্র আকাঙ্ক্ষিত বস্তু।

প্রভো, আপনি প্রসন্ন হউন্, আপনার প্রসাদেই ভগবানের প্রসাদ। কীর্ত্তনাখ্যা-ভক্তিই আমার সাধ্য-সাধন হউক্। আপনি জয়যুক্ত হউন্।

শ্রীরাধাষ্টমী-বাসর
শ্রীগৌরাব্দ, ৪৪০

ভবদীয় চরণসেবাভিখারী অযোগ্য-দাসাভাস
শ্রীঅতীন্দ্রিয় দাসাধিকারী

জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদের আনন্দাশীর্ব্বাদ

আমরা অনেক সময় শ্রীল প্রভুপাদের সেবা করিয়া থাকি। সেব্যের সুখ বিধানই সেবকের সেবার উদ্দেশ্য। কিন্তু প্রকৃত-প্রস্তাবে তিনি সুখী হইয়াছেন কি, সেবা করিয়া আমিই সুখী হইয়াছি ইহাই বিবেচনার বিষয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিই হইয়া থাকে। কিন্তু শ্রীল ভক্তিগুণাকর প্রভুর উৎসর্গ-পত্রের উত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি তাঁহার প্রতি যে কতদূর প্রীত হইয়াছেন তাহা ইহা পাঠ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। কবে আমরা শ্রীল প্রভুপাদের এইরূপ কৃপাভাজন হইতে পারিব, তাহার অপেক্ষায় জীবন ধারণ করিতেছি। তাঁহার কৃপাপাত্রগণের একান্ত কৃপা-লাভ করিতে পারিলেই গুরুকৃপা লাভ হইবে। তাই প্রার্থনা—হে অতীন্দ্রিয় প্রভো! হে বৈষ্ণববৃন্দ! আপনারা মাদৃশ পতিতের প্রতি সর্ব্বতোভাবে করুণা করুন্ যাহাতে আপনাদের আনুগত্যে শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপালেশ লাভ করিতে পারি।

অতীন্দ্রিয় প্রভুর প্রতি শ্রীল প্রভুপাদের পত্র

শুদ্ধভাগবতবর শ্রীমদ্ অতীন্দ্রিয় দাসাধিকারী ভক্তিগুণাকরেষু—

স্নেহবিগ্রহ,

আপনার গুম্ফিত "কণ্ঠহার" পাইয়া আমার যে কত আনন্দ হইল, তাহা বর্ণন করি-বার ভাষা আমার নাই। তবে গৌড়ীয়ের কণ্ঠহার নিষ্কপট-গৌড়ীয়-শুদ্ধভক্ত-গুরুবর্গের

গলায় পরাইয়া দিয়া আমি যে হরিভজন-সেবার অধিকার পাইব, তাহা আপনি স্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত করিয়াছেন। অনেকে গৌণী-বিদ্ধা-ভক্তিকে আশ্রয় করিয়া হরিসেবার পরিবর্ত্তে ভগবানকে 'ভোগের বস্তু' মনে করেন, তাঁহারাও এই 'হার' কণ্ঠে ধারণ করিলে তাঁহাদের স্বরূপের অভিজ্ঞান হইবে এবং আমাদের ন্যায় কাঙ্গালের সহ বিদ্বেষ করিতে বিরত হইতে পারেন, মনে হয়।

শ্রীনামহট্টের ঝাড়ুদার-পরিচয়ে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় যে অপ্রাকৃত লীলার প্রাকট্য সাধন করিয়াছেন, তাঁহার প্রপঞ্চ মার্জ্জনসেবার উপকরণরূপ শতমুখীসূত্রে আমাদের শত শত জনের মহাজনানুগমন এবং দুঃসঙ্গানুকরণ-বর্জ্জন-কার্য্য জগতের অপ্রিয় হইলেও উহাই আমাদের চরম কল্যাণ উৎপন্ন করিবে।

শ্রীরাধাবির্ভাব-বাসর
শ্রীচৈতন্যাব্দ, ৪৪০

পতিতপাবন-নিত্যদাস নিরাশীর্নির্ণমন্ক্রিয়
শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী

—শ্রীগৌঃ পত্রিকা ১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা।

পরলোকে শ্রীহরিসাধন ব্রজবাসী

দেহত্যাগের স্থান ও কাল

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত নিবেদন করিতেছি যে বিগত ৭ই আষাঢ় ১৩৫৭, ইং ২২শে জুন ১৯৫০, বৃহস্পতিবার, নিশান্তে তিন ঘটিকার সময় শ্রীশ্রীগঙ্গাদেবীর পশ্চিম উপকূলে ষোল-ক্রোশ নবদ্বীপ-ধামের অন্তর্গত শ্রীকোলদ্বীপ-ধামে (বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপে) সর্ব্বসজ্জন-পরিচিত, অত্যন্ত স্নিগ্ধ, নিরন্তর শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবাপরায়ণ, পরমভাগবত **শ্রীশ্রীমদ্ হরিসাধন দাস ব্রজবাসী** মহোদয় ঐহিক লীলাসমূহ চিরতরে সম্বরণ করিয়া আমাদিগকে অকূল বিরহ-সাগরে নিমজ্জিত করিয়াছেন। আমরা তাঁহার সেবাময় জীবনের আদর্শ ক্রিয়া কলাপ আর প্রত্যক্ষ করিতে পারিব না।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উজ্জ্বল নক্ষত্র-পঞ্চক

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবাময় আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্রসমূহ ক্রমে-ক্রমে একটী একটী করিয়া খসিয়া পড়িতেছে। প্রথমতঃ—শ্রীনামভজনানন্দী পরমভাগবত **শ্রীশ্রীমদ্ রামদাস ব্রহ্মচারী**, দ্বিতীয়তঃ—সেবাজীবন অক্লান্ত পরিশ্রমী বৃদ্ধ **শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দ ব্রজবাসী** (নিতাই ঠাকুর), তৃতীয়তঃ—শ্রীল প্রভুপাদের শ্রেষ্ঠসেবক ও নিজজন, অজাতশত্রু **শ্রীশ্রীল ঠাকুর নরহরি,** চতুর্থতঃ—আর্ত্ত, শরণাগত, গুরুসেবৈকনিষ্ঠ, পরমবিশ্রম্ভ

সেবক **শ্রীশ্রীমদ্ অনঙ্গমোহন ব্রহ্মচারী বাবাজীবন,** পঞ্চমতঃ — আমাদের চির আদরের এই **"সাধন প্রভু"** ।

বৈষ্ণবের বিচ্ছেদই আমাদের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা দুর্দ্দিন। একে-একে উক্ত মহাজন-পঞ্চকের কথা স্মরণ হইলে হৃদয় এত ব্যথিত হয় যে, শীঘ্রই তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণই শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে হয়। তাঁহারা আমার ন্যায় ঘৃণিত ও অযোগ্য ব্যক্তিকে সাদর আহ্বান করিয়া তাঁহাদের নিত্যসেবায় নিযুক্ত করুন্—ইহাই তাঁহাদের পাদপদ্মে কাতর প্রার্থনা।

সাধন প্রভুর নিরপেক্ষতা

হরিসাধন ব্রজবাসী শ্রীল প্রভুপাদের দীক্ষিত, আশ্রিত ও স্নিগ্ধ সেবকগণের অন্যতম। তিনি পঁচিশ বৎসরের অধিককাল শ্রীগুরুপাদপদ্মের ঐকান্তিক সেবাকল্পে সংসারের যাবতীয় মায়া-মমতা পরিত্যাগপূর্ব্বক মঠবাসী হইয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটলীলা-সম্বরণের কিছুকালপর শৃগাল-বাসুদেব, নৈশাসুর, অঘাসুর, রজকাসুর, রৈবতাসুর, কালনাগ, ত্রিদণ্ড-গ্রাহী রাবণানুচর তাড়কা-পতিদের প্রতাপে আত্মবিনাশ না করিয়া তিনি 'শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতিই একনিষ্ঠ গুরুসেবকগণের ভজনানুকূল স্বজাতীয়াশয়স্নিগ্ধ প্রতিষ্ঠান' জ্ঞান করিয়া তাহাতে সর্ব্বান্তঃকরণে যোগদান করেন।

সেবার নৈরন্তর্য্য

তাঁহার দৈনন্দিন সেবার তালিকা আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, তিনি সেবায় কিরূপ 'নৈরন্তর্য্য' লাভ করিয়াছিলেন। নিশান্তে রাত্র ৪ ঘটিকার সময় গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে স্নান করিয়া সমিতির প্রাপ্ত ও প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহগণের জাগরণ করাইতেন। তৎপর মঙ্গলারাত্রিক শেষ করিয়া ঠাকুরের অর্চ্চন-পূজাদির বৈধ সেবাকর্ম্ম সমস্তই নিজ-হস্তে করিতেন। ভোরে উষঃ-কীর্ত্তন করিয়া সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলী ও মঠবাসী সেবকগণের নিকট শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করিতেন। তৎপর পূজার্চ্চন সমাপন করিয়া শ্রীবিগ্রহের ও মঠবাসী সেবকগণের স্বহস্তে রন্ধন করিয়া ঠাকুরের মাধ্যাহ্নিক ভোগ দিয়া আরতি করিতেন। পরে সকলের প্রসাদ-সেবা হইলে নিজে প্রসাদ গ্রহণ করিয়া শ্রীবিগ্রহগণের শয়ন দিয়া উচ্চস্বরে একলক্ষ শ্রীনাম কীর্ত্তন করিতেন। অপরাহ্ণবেলায় অর্চ্চনের রীতি-অনুসারে পুনরায় ঠাকুর জাগাইয়া বৈকালি-ভোগ দেওয়ার পর পুনরায় ঠাকুর ও তাঁহার সেবকগণের নৈশ ভোগের আয়োজন ও তাহার রন্ধন-কার্য্যে লিপ্ত হইতেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন—"আমি শ্রীরাধারাণীর আনুগত্যে রান্না করিয়া থাকি; সুতরাং রান্না খারাপ হইবে কেন? যাহারা নিজেদের কৃতিত্বে রান্না করে, তাহা-দের উহা ভোগে লাগে না ও তাহা ভাল হয় না।" রন্ধন-কার্য্য সমাপন করিয়াই সন্ধ্যার পূর্ব্বে শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠের নিয়মানুসারে তিনি প্রত্যহই কীর্ত্তন ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

পাঠ করিতেন। তাঁহার সুমধুর সুললিত ভাটিয়াল স্বরের পাঠ শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলী স্ত্রী-পুরুষ সকলেই মুগ্ধ হইতেন। পাঠ সমাপন করিয়া সন্ধ্যা-আরতি করিতেন। পরে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজীউর নৈশ-ভোগ দিবার পর শয়ন দিয়া সকলের প্রসাদ পাইবার পর নিজে প্রসাদ সেবা করিতেন। ইহাতে রাত্র কোনও দিন ৯টা, কোনও দিন ১০টা বাজিয়া যাইত। তৎপর কিছুক্ষণ ইষ্টগোষ্ঠী করিয়া নিজ ভজনানুকূল লীলা-স্মরণাদিতে মগ্ন থাকিতেন।

বার্দ্ধক্যেও সেবোৎসাহ

সাধন প্রভুর ন্যায় ৬৫ বৎসরের বৃদ্ধের পক্ষে অক্লান্তভাবে দিবারাত্র এরূপ সর্ব্বান্তঃকরণে পরম উৎসাহের সহিত সেবার এইপ্রকার আদর্শ অতীব বিরল। প্রতিপদে প্রতিক্ষণে প্রতি সেবোপকরণেই আমরা তাঁহার অভাব অনুভব করিয়া বড়ই মর্ম্মাহত হইতেছি। ভগবান্ কি এরূপ সেবকের সঙ্গ আর মিলাইবেন !!

নিরভিমান ও বৈরাগ্য

ব্রজবাসী প্রভুর দৈন্য ও বৈরাগ্যময় জীবনের কথা স্মরণ করিলে হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হয়। তাঁহার জীবনে কোনও দিনই ভাল পরিধান, ভাল ভোজন, ভাল স্থানে শয়ন ইত্যাদি কোনও কিছুরই ভোগ-বিলাস আদৌ লক্ষ্য করা যায় নাই। আমরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কোনও সময়ে একখানা বড় কাপড় পরিধানের জন্য দিতে চাহিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাতে আপত্তি জানাইয়া ৬ হাত বা ৭ হাত অল্প বহরের মোটা কাপড় চাহিয়া লইতেন। কোনও সময় সাত আট বৎসরের বালক তাঁহার নিকট আসিয়া ঠাকুরের প্রসাদাদি কিছু প্রার্থনা করিলে তিনি উক্ত বালককেও 'আপনি' বলিয়া গৌরব-সূচক সম্বোধনে কথা বলিতেন। ইহা আমাদের গুরুপাদপদ্ম শ্রীল প্রভুপাদের আদর্শে দেখা যাইত।

সেবা-সাহায্য

যদি কেহ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আনুগত্যে থাকিয়া পারমার্থিক জীবনযাপন করিতে ইচ্ছা করিতেন, তাহা হইলে তিনি অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিতেন এবং সর্ব্বতো-ভাবে তাহাকে যত্ন করিয়া তাহার ভজনের প্রচুর সাহায্য করিতেন। শ্রীবিগ্রহ-সেবার্চ্চনের দ্বারা কি-প্রকারে শ্রীভগবানের প্রেম-প্রসাদ লাভ করা যায়, তাহা তিনি মঠের বহু সেবককেই শিক্ষা দিয়াছেন।

সাধন প্রভুর শেষ শিক্ষা

সর্ব্বশেষ তাঁহার একটী হৃদয়বিদারক কথা স্মরণ করিয়া অত্যন্ত উদ্বেগ অনুভব করিতেছি। তিনি শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে থাকিয়াই তাঁহার শেষ সেবাময় জীবন অতি-

বাহিত করিতেছিলেন। বিশেষ প্রয়োজনবশতঃ নবদ্বীপে গঙ্গাতীরে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে যাইবার জন্য আলোচনা হইতে থাকিলে তিনি তাহাতে অনিচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াও বলিয়াছিলেন যে, "বৈষ্ণবদের আদেশ হইলে আমি নিশ্চয়ই যাইব। আমি আমার স্বতন্ত্র ইচ্ছার প্রশ্রয় দেওয়াকে বৈষ্ণব-সেবা বা আনুগত্য-ধর্ম্ম বলিয়া মনে করি না"। এ-অধম তাঁহাকে আহ্বান করিয়া গঙ্গাতীরে নবদ্বীপে বাসের সুযোগের কথা স্মরণ করাইয়া দিলে তিনি আমাকে অতি সুন্দর একটী শিক্ষা দিয়া যান। তিনি বলিলেন—"আমি আপনার আদেশ পালনে সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছি। বৈষ্ণবের আদেশ পালনেই ভগবানের সেবা এবং তাহাই প্রকৃত অর্চ্চন। যে-স্থানে বৈষ্ণবগণ থাকেন, সেই স্থানই নবদ্বীপ বা বৃন্দাবন। বৈষ্ণবের সেবা করিলেই কোটী কোটী জন্মের গঙ্গাস্নানের ফললাভ অপেক্ষা অনেক বেশী কিছু পাওয়া যায়। সুতরাং আমাকে ভৌম নবদ্বীপ ও ভৌম গঙ্গার কথা বলিয়া বঞ্চিত করিবেন না। আমার এইস্থান হইতে অন্যত্র যাইবার আন্তরিক ইচ্ছা নাই। তবে আপনার আদেশ হইলে আমি এক্ষণই ইহা পালন করিতে প্রস্তুত আছি।" আমার ন্যায় দুর্ভাগার পক্ষে ইহাই তাঁহার শেষ শাসন ও শেষ শিক্ষা। আমার ন্যায় নিষ্ঠুর পাষাণ-হৃদয় তাঁহার শেষ ইচ্ছা বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে নবদ্বীপে পাঠাইয়াছিল। তাই তিনি আমার ন্যায় নির্ম্মম-হৃদয় দুর্ভাগাকে দুঃসঙ্গ-জ্ঞানে চিরতরে তাঁহার সেবাধিকার হইতে বঞ্চিত করিলেন। নবদ্বীপ হইতে তাঁহার শেষ পত্রখানিও আমাকে বড়ই ব্যথিত করিতেছে। পরম সুহৃদ্ শ্রীল ঠাকুর নরহরিও আমাকে এরূপ বঞ্চনা করিয়া একটী সুদীর্ঘ পত্রদ্বারা তাঁহার শেষ নির্দ্দেশ জ্ঞাপন করেন। আমার তাহাই বর্ত্তমানে একমাত্র জীবাতু। সাধন প্রভো! আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া আপনার আনুগত্যময় সেবা-কুঞ্জে স্থান দিবেন—ইহাই একমাত্র প্রার্থনা।

—শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা ২য় বর্ষ; ৫ম সংখ্যা।

স্বধামে শ্রীপাদ বরদরাজ ব্রহ্মচারী

আমরা বিশেষ দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, শ্রীপাদ বরদরাজ ব্রহ্মচারী গত ৬ই মাঘ ২০শে জানুয়ারী বৃহস্পতিবার পক্ষবর্দ্ধনী মহাদ্বাদশী বাসরে প্রাতঃ ৬।১২ মিঃ স্বধাম গমন করিয়াছেন। তিনি জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রিয় শিষ্যবর্গের অন্যতম। ৫০ বৎসরের অনধিক কাল মধ্যেই তিনি যে গুরু-গৌরাঙ্গের সেবা প্রচেষ্টা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা সকলেরই আদর্শস্থানীয়। তাঁহার ত্যাগ, বৈরাগ্য, বৈষ্ণব-সেবা-প্রবৃত্তি সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছে। বিশেষতঃ শ্রীবিগ্রহের শৃঙ্গারাদি বিবিধ সেবা-কৌশল তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

বরদরাজ প্রভুর বৈরাগ্যের উদাহরণ

বরদরাজ ব্রহ্মচারীজীর যৌবনের ত্যাগ ও বৈরাগ্যের একটি আদর্শ দৃষ্টান্ত আমার স্মরণপথে সর্ব্বদাই জাগিতেছে। তাঁহার প্রতি স্নেহ ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য আমি নিম্নে তাহা লিপিবদ্ধ করিতেছি,—

বরদরাজ পিতা-মাতার একমাত্র পুত্র ; বাল্যকালেই তাঁহার পিতৃ-বিয়োগ হয়। সুতরাং মাতার অত্যন্ত আদর ও স্নেহেতে পরিবর্দ্ধিত হইলেও সংসারের অনিত্যতা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেন। একদিন মাতাকে সংসার পরিত্যাগের প্রস্তাব করিয়া তাঁহার অনুমোদন লাভ করিতে পারেন নাই ; তথাপি অনিত্য সংসারের প্রতি আসক্ত না হইয়া মাতার অজ্ঞাতসারে শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠে চলিয়া আসেন এবং শ্রীল প্রভুপাদের চরণাশ্রয় করিয়া অন্তিমদশা পর্য্যন্ত তিনি হরি-গুরু-বৈষ্ণব সেবাতে নিমগ্ন থাকেন এবং গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। তাঁহার জননী একমাত্র-পুত্রের অদর্শনজনিত বিরহে অত্যন্ত কাতর হইয়া শ্রীধাম মায়াপুরে আসিয়া তাঁহাকে সংসারে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য প্রচুর যত্ন করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তিনি মাতাকে যে প্রবোধ দিয়াছিলেন তাহার দুই একটী কথা যাহা স্মরণ আছে, নিম্নে লিখিলাম।—

মাতার প্রতি উপদেশ

শ্রীমন্মহাপ্রভু শচীমাতাকে যে শিক্ষা দিয়াছিলেন তাহাই সমস্ত জীবের আদর্শ শিক্ষা। তিনি বলিয়াছিলেন—

"আনের তনয় আনে রজত কাঞ্চন।
আমি আনি দিব মাতা কৃষ্ণ প্রেমধন॥

শ্রীবরদরাজ ব্রহ্মচারী এই আদর্শ শিক্ষা অবলম্বন করিয়া মাতাকে প্রচুর সান্ত্বনা দিয়াছিলেন। পার্থিব ধন-সম্পত্তি, স্ত্রী-পুরুষ কাহাকেই প্রকৃত সান্ত্বনা প্রদান করিতে পারে না। বদ্ধজীব ক্ষুদ্র অর্থের কাঙ্গাল হইয়া অসীম অর্থ অর্থাৎ পরমার্থ পরিত্যাগ করে। তাহাতে তাহাদের প্রকৃত মঙ্গল কখনই হইতে পারে না। স্বামী-পুত্র সকলেই অস্থায়ী, সুতরাং অস্থায়ী বস্তুর প্রতি মমতা স্ত্রী-লোকের পক্ষে অত্যন্ত দুঃখ-দায়ক। স্বয়ং কৃষ্ণকে পুত্ররূপে জানিতে পারিলে সাধারণ পুত্রের প্রতি মমতা আপনা হইতেই কমিয়া যাইবে। যিনি বাৎসল্য-ভাবে ভগবানকে গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার আর পুত্র-বিয়োগের আশঙ্কা নাই, সুতরাং কোন মাতাকেই কখনও পুত্রবিচ্ছেদ-জনিত যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। মনুষ্যমাত্রই মৃত্যুমুখে পতিত হয়—" অদ্য বা বর্ষ-শতান্তে মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবঃ।" সুতরাং যাহার মৃত্যু ধ্রুব, তাহার প্রতি আসক্তি করিয়া লাভ কি ? যিনি নিত্য সনাতন তাঁহার ভজন করাই মনুষ্য জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য ইত্যাদি, নানা কথা মাতার

প্রতি উপদেশ করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়াছিলেন। যোগ্য পুত্রের যোগ্যা মাতা, পুত্রের পারমার্থিক জীবনের বিরোধী না হইয়া দুঃখিতান্তঃকরণে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

মাতার দেহত্যাগ

শোকাতুরা জননীর একমাত্র পুত্রের বিরহ-যন্ত্রণা তাঁহাকে অধিককাল জীবিত রাখে নাই। অনুমান ২।৩ বৎসর পরেই মাতা দেহত্যাগ করেন। বরদরাজের খুল্লতাত শ্রীচৈতন্য মঠে তাঁহার মাতৃবিয়োগের সংবাদ পত্রদ্বারা অবগত করান। আমি সেই পত্র-খানি গোপন করিয়া বরদরাজ ব্রহ্মচারীর চিত্ত যাহাতে শোকে অভিভূত না হয়, তজ্জন্য সাধারণকে লক্ষ্য করিয়া ২।১ কথা প্রত্যহই উপদেশ করিতাম। আমি মাঝে মাঝে বলিতাম—"কাহারও মাতৃবিয়োগ হইয়াছে, সুতরাং সকলেই চিত্ত স্থির করিবেন, দুঃখিত হইবার কারণ নাই, সকলকেই মরিতে হইবে, সুতরাং হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবাই মনুষ্য জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। শোকে, স্নেহ-মমতায় অভিভূত না হইয়া চিরদিন হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় নিযুক্ত থাকাই মনুষ্য-জীবনের একমাত্র সফলতা।" তখন আমরা শ্রীচৈতন্য মঠে মাত্র ৫।৬ জন সেবক বাস করি। আমার ঐরূপ উক্তি শুনিয়া সকলেই পরস্পরের দিকে তাকাইয়া ইতস্ততঃ চিন্তা করিতেন। প্রত্যেকেই মনে করিতেন যে তাঁহার মাতৃ-বিয়োগ হইয়াছে; কিন্তু কেহই তাহাতে স্থির বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেন না। ক্রমশঃ ৯ দিন গত হইয়া দশম দিবস উপস্থিত হইয়াছে। এখন আর সে-কথা গোপন রাখা চলে না; কারণ আগামী কল্য গোস্বামি-শাস্ত্রমতে তাঁহার শ্রাদ্ধের দিন, সুতরাং বাধ্য হইয়া আমি তখন বরদরাজকে তাঁহার মাতৃবিয়োগের কথা জানাইলাম। আশ্চর্য্যের বিষয় বরদরাজ অচল, অটল; এবং হাসিমুখে আমাকে তাঁহার মাতার মৃত্যুর দিন জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম, আগামীকল্য একাদশ দিবস, তাঁহার শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। তুমি প্রস্তুত হও। পরদিবস হরিভক্তিবিলাস ও সৎক্রিয়াসার দীপিকা অনুসারে তাঁহার মাতার পারলৌকিক কার্য্য যথাবিধি সুসম্পন্ন করা হইল।

বরদরাজের অর্থের প্রতি অনাসক্তি

শ্রাদ্ধের পর শ্রীপাদ বরদরাজ ব্রহ্মচারী মহাশয় আমাকে বলিলেন—"আমার পিতৃ-বিয়োগের পর, মাতা আমার জন্য বারশত টাকা আমাদের গৃহের অভ্যন্তরে ভূ-গর্ভে প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছেন। উহা আমি ব্যতীত অন্য কোনও ব্যক্তি অবগত নহে। সুতরাং আপনি অনুমতি করুন আমি ঐ অর্থ এখানে (মঠে) লইয়া আসি। আমি তাঁহার ঐ প্রস্তাব অনুমোদন না করিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলাম যে, আমাদিগকে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর আদর্শ গ্রহন করিতে হইবে—

"বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।
মলিন মন হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ॥" (চৈঃ চঃ অঃ ৬।২৭৮)

উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, আমরা গৃহ হইতে প্রচুর অর্থ লইয়া গুরুপাদ-পদ্মে সমর্পণ করিলে অনেক সময় এইরূপ মনে হয় যে, আমি গুরুদেবকে প্রচুর অর্থ দিয়া সাহায্য ও ধন্য করিয়াছি। অতএব গুরুদেব আমার অন্যায় আব্দার শুনিতে বাধ্য। চিত্তে এইপ্রকার মলিনতা আসিবার প্রচুর সম্ভাবনা থাকে, সুতরাং মন এই প্রকারে মলিন হইলে ভগবদ্ভজনে অগ্রসর হওয়া যায় না। ইহা ছাড়া সামান্য বারশত টাকার লোভে পড়িয়া তুমি পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান, সংসারে একদিনের জন্যও প্রত্যাবর্ত্তন করিলে মায়া তোমাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতে পারে। বিশেষতঃ তোমার তথা-কথিত আত্মীয়-বর্গ তোমার অর্থ-সম্পত্তির সচ্ছলতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তোমাকে সংসারে আবদ্ধ রাখিতে চেষ্টা করিবে। সুতরাং সামান্য অর্থের প্রতি মমতা না করিয়া ভগবদ্ভজনে মনোনিবেশ করাই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ আমরা তোমাকেই চাই, আমরা অর্থের লোলুপ নহি। তুমি মঠে থাকিলে ঐরূপ প্রচুর অর্থ আপনা হইতেই আসিবে।

বরদরাজ ব্রহ্মচারী এই উপদেশের সার উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া চিরতরে ঐ অর্থের মমতা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। আমার প্রায় চল্লিশ বৎসরের মঠবাসের অভিজ্ঞতায় প্রায় অধিকাংশ ব্রহ্মচারীকেই বাড়ী যাতায়াত করিতে দেখিয়াছি, কিন্তু শ্রীপাদ বরদরাজ ব্রহ্মচারী তাহাদের ঐ আদর্শ বিন্দুমাত্রও গ্রহণ না করিয়া একদিনের জন্যও গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই।

শ্রীল গুরুপাদপদ্মের তিরোধানের পর

ইংরাজী ১লা জানুয়ারী ১৯৩৭ সালে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম লৌকিক লীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার পর মহাপুরুষের বিয়োগ-হেতু ধর্ম্মাধর্ম্ম সমস্ত বিশ্বেই একটী বিরাট বিপ্লব দেখা দিয়াছিল। এই বিপ্লবের মধ্যেও ব্রহ্মচারিজীর হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা কিছুমাত্র খর্ব্ব হয় নাই। তিনি পূজ্যপাদ কুঞ্জবিহারী ভাগবতরত্ন মহোদয়ের আনুগত্যে থাকিয়া দক্ষিণ কলিকাতা গৌড়ীয় মঠে প্রচুর দায়িত্বপূর্ণ সেবা করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা ঐ মঠে যাতায়াত করিতেন, তাঁহারাই ব্রহ্মচারীজীর মধুর ব্যবহার, হাসিমুখে আলাপ-আলোচনা, মধুর কীর্ত্তন ও হরিকথা শ্রবণ করিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয় মিসনের স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই প্রীতি আকর্ষণ করিয়া তাঁহার সেবার জীবন অতিবাহিত হইয়াছে।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেম-ধর্ম্ম প্রচারিণী সভার ভারপ্রাপ্তি

পরলোকগত সেবক শশীভূষণ মজুমদার ১০৬ নং হাজরা রোড কলিকাতা—(২৬) ঠিকানায় শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমধর্ম্ম প্রচারিণী সভা স্থাপন করেন এবং স্থানীয় লোক তাঁহার ঐ

কার্য্যে সহায়তা করেন। তিনি দেহত্যাগ করিলে স্থানীয় অধিবাসিগণ সকলে একত্রিত হইয়া উক্ত সভার কার্য্যভার শ্রীবরদরাজ ব্রহ্মচারীর উপর ন্যস্ত করেন। তদবধি তিনি ঐ স্থানের কার্য্যভার লইয়া তথায় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ ও রাধাগোবিন্দের সেবা প্রকাশ করেন। তাঁহার সেবাচেষ্টায় উক্ত সভার কার্য্য সুচারুরূপে সু-সম্পন্ন হইতেছিল। দুঃখের বিষয় তিনি কয়েকমাস পূর্ব্ব হইতেই শারীরিক অসুস্থতার অভিনয় করিয়া চলিতেছিলেন। এই সময় তিনি তাঁহার দেহাবসানের সময় সম্মুখীন হইয়াছে সন্দেহ করিয়া ঐ স্থানের সেবা-ভার পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজের উপর ন্যস্ত করেন। ব্রহ্মচারী-জীর দেহান্তের পর হইতেই উক্ত গিরি মহারাজ উক্ত স্থানের সেবাকার্য্য পরিচালনা করিতেছেন।

গুরুসেবায় অর্থদান

ব্রহ্মচারীজী স্বতন্ত্রভাবে মঠ পরিচালনের ভার গ্রহণ করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের প্রচারিত উৎসবাদি উক্ত প্রেমধর্ম্ম প্রচারিণী সভার অঙ্গরূপে প্রচলন করেন। তাঁহার প্রতি জনসাধারণ প্রচুর শ্রদ্ধা করিয়া তাঁহার প্রয়োজনানুরূপ অর্থ হইতেও অধিক অর্থ প্রদান করিতেন। ইহাতে তিনি সেবাখরচ বাদে প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার উক্ত সঞ্চিত অর্থের অধিকাংশ তিনি শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-সেবায় দান করেন এবং অতি সামান্য অর্থ-ই তাঁহার নিজ প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহাদির সেবার জন্য পূজ্যপাদ গিরি মহারাজের হস্তে সমর্পণ করেন। ইহাতেও তাঁহার অর্থের প্রতি অনাসক্তি প্রকাশ পায়।

বরদরাজ প্রভুর বিরহ উৎসব

বিগত ২রা ফাল্গুন, ১৪ই ফেব্রুয়ারী, সোমবার পূজ্যপাদ গিরি মহারাজ শ্রীল বরদরাজ ব্রহ্মচারী প্রভুর বিরহ উৎসব বিরাটভাবে সুসম্পন্ন করেন। এই উৎসবে কলিকাতার বহু গন্যমান্য ব্যক্তি যোগদান করিয়াছিলেন। চুঁচুড়া হইতে গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকগন এবং নারমার মোহিনী বাবু প্রভৃতি, আরও অন্যান্য স্থানের অনেক সেবক ও মহারাজগণ এই উৎসবে শ্রদ্ধায় যোগদান করেন। বেলা ১০ টা হইতে রাত্রি ১০ টা পর্য্যন্ত অজস্রভাবে সহস্র সহস্র লোকদিগকে প্রসাদ বিতরণ করা হয় এবং সকলেই বরদরাজ প্রভুর প্রচুর প্রশংসা করিতেছিলেন। আমরা শ্রীবরদরাজ ব্রহ্মচারী প্রভুর আদর্শ সকলকে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করি।

—শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা ৭ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা।

চরিতমূলক প্রবন্ধ—

বেদান্তাচার্য্য শ্রীরামানুজ

শ্রীল আচার্য্যের জন্ম-পরিচয়

বর্ত্তমান সংখ্যায় আমরা বেদান্তাচার্য্য শ্রীরামানুজ স্বামীর সম্বন্ধে আলোচনা করিতে অনুপ্রাণিত হইয়াছি। কারণ তিনি এই চৈত্র-মাসেই শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে আবির্ভূত হন। সে আজ প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বেকার কথা। তাঁহার স্থিতিকাল ১০১৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১১৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ১২০ বৎসর।

রামানুজের পিতার নাম কেশব ভট্ট, মাতার নাম কান্তিমতী। কান্তিমতী যামুন মুনিবরের পৌত্রী এবং শৈলপূর্ণের জ্যেষ্ঠা ভগিনী। শৈলপূর্ণ যামুনাচার্য্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। রামানুজ পেরেম্বুদুর গ্রামে ১০১৭ খৃষ্টাব্দে মাতৃকুক্ষি হইতে ভূমিষ্ঠ হন। পেরেম্বুদুর গ্রামের অন্য নাম ভূতপুরী বা মহাভূতপুরী। মাতুল শৈলপূর্ণ কেশব-তনয়ের অমানুষিক লক্ষণাদি বিচার করিয়া সঙ্কর্ষণশক্তির অবতার জানিয়া তাঁহার নাম রাখিলেন শ্রীলক্ষ্মণ দেশিক। ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের অনুজ বলিয়া তাঁহার অন্য জগদ্‌বিখ্যাত নাম শ্রীরামানুজ। তামিল ভাষায় তাঁহার গৌরবময় পরিচয় 'ইলায়া পেরুমল'।

আচার্য্যের জন্ম, মাস ও ঋতুর তথ্য

আচার্য্যের আবির্ভাবের তিথি মাসাদির বিচারে দেখা যায় তাহাদের মধ্যেও বিশেষ উদ্দেশ্য নিহিত আছে। আমরা নিম্নে তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। আচার্য্য শ্রীল রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ছিলেন। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বৈষ্ণবগণ পঞ্চরাত্রের অনুগত। শ্রীহয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্রে প্রাকৃত কালের অন্তর্গত ঋতু, মাস, তিথি, বার প্রভৃতির প্রাকৃত নিরীশ্বর নামের পরিবর্ত্তে বৈষ্ণব-তোষণের নিমিত্ত বিষ্ণুপর নামের দ্বারা তাহাদের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। মদীয় শ্রীগুরুদেব জগদ্‌গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এই আদর্শে বিশেষ মৌলিকতার সহিত শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা প্রতি বৎসর বৈষ্ণবগণের হিতের জন্য প্রকাশ করিতেন। আজকালও উহা কতক পরিমাণে সেই আদর্শে কেহ কেহ প্রকাশ করিতেছেন। তাহাতে দেখা যায় বর্ত্তমান চৈত্রমাসের নাম 'বিষ্ণু', বসন্ত ঋতুর নাম 'মাধব' এবং পঞ্চমী তিথির নাম 'শ্রীধর'। সুতরাং আচার্য্য শ্রীরামানুজ **মাধব** ঋতুতে, **বিষ্ণু** মাসে, **শ্রীধর** তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন।

বিষ্ণুমাসে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া **বিষ্ণুপূজক** রামানুজ তাঁহার পূর্ব্বাচার্য্য **বিষ্ণু-চিত্তের** পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া **'বিষ্ণুপুরাণ'**-দ্বারা শুষ্ক-জ্ঞান-বিনাশিনী **বিষ্ণুভক্তির** অবলম্বনে **'বিষ্ণুপূজা'**ই জীবের একমাত্র কৃত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করেন। অধিকন্তু এই মাধব বসন্তে মধু চৈত্রমাসে 'মধুর কবি' নামক মধুর কবিতা লেখক জনৈক আল্‌বরও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের আদর্শ আচার্য্য বিষ্ণুবাহনের অবতাররূপে অবতীর্ণ হন। সে আজ যীশুখ্রীষ্টের জন্মের ৩২৬৬ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা হইলেও রামানুজ তাঁহার কাব্য-মাধুর্য্যে ও আচার-বিচারে আকৃষ্ট হইয়া অহংগ্রহ-উপাসনার ধ্বংস সাধন করিয়া জগতের প্রভূত কল্যাণ বিধান করিয়াছেন। ধন্য এই মধু চৈত্রমাস—যিনি বিষ্ণুমাস নাম ধারণের স্বার্থকতা করিয়াছেন।

রামানুজের জন্মতিথি শ্রীপঞ্চমীর তথ্য

পঞ্চমী অর্থাৎ শ্রীধর তিথি। রামানুজের এই শ্রীধর তিথিতে আবির্ভূত হইবার কারণ অনুসন্ধান করিলে আমরা একটী বিশেষ তথ্যের সন্ধান পাই। শ্রীধর শব্দের অর্থ 'শ্রী' ধারণ অর্থাৎ স্বীকার করিয়াছেন যিনি, তিনি শ্রীধর। বেদব্যাস বলেন—"রামানুজং শ্রীঃ স্বীচক্রে।" অর্থাৎ শ্রী (লক্ষ্মীদেবী) বিষ্ণুতত্ত্বের মূল-পুরুষ শ্রীনারায়ণের প্রধান সেবিকা। তিনি শ্রীরামানুজকে তাঁহার সম্প্রদায়ের প্রধান সেবক আচার্য্যরূপে স্বীকার করিয়াছেন। তিনি শ্রীধর তিথিতে ভূমিষ্ঠ হইয়া ব্যাসের ভবিষ্যদ্বাক্যের স্বার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন। সেই হেতু রামানুজ শ্রীসম্প্রদায়কে নিত্যকালের জন্য ধারণ করিয়া 'শ্রীধর' আচার্য্যস্বরূপে শ্রী-বৈষ্ণব সমাজে পূজিত হইতেছেন। ধন্যা এই পঞ্চমী তিথি যিনি শ্রীধর-তিথি নামে খ্যাত হইয়াছেন।

আচার্য্যের আবির্ভাব কালের অবস্থা বর্ণন

ভারত ধর্ম্মের জন্য বিখ্যাত। ধর্ম্মই ভারতের জীবন। ভারতবাসীর এমন দিন হইয়াছিল, যে সময় তাঁহারা সর্ব্বদা গভীর ঈশ্বর চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই পরলোকে দৃঢ় বিশ্বাসী, ঈশ্বরে প্রগাঢ় ভক্তি-সমন্বিত, ভগবানের নিত্য বিগ্রহে আস্থা-সম্পন্ন। তাঁহারা সমস্বরে বেদ-বেদান্ত, পঞ্চরাত্র-ভাগবত, পুরাণ-ইতিহাস, স্মৃতি-মহাভারত প্রভৃতি যাবতীয় শাস্ত্রের পূজা প্রদানে মুক্তহস্ত এবং তাহাদের মর্য্যাদা গানে মুক্তকণ্ঠ। কিন্তু দুর্দ্দমনীয় কালের করাল চক্রের অব্যর্থ আবর্ত্তনে ভারতের সে সৌভাগ্য-সূর্য্য ক্রমে ক্রমে অস্তমিত হইতে লাগিল। শুভদিনের নির্ম্মল আকাশ কঠোর নাস্তিকতার ঘন ঘটায় আবৃত হইয়া পড়িল। বেদ-বেদান্ত, ভাগবত পুরাণাদির উজ্জ্বল চর্চ্চালোক অদ্বয়বাদের অমান্ধকারে নিস্প্রভ হইতে লাগিল; মানবের হৃদয়পটে শাস্ত্র-সম্বন্ধে বিবিধ সন্দেহের প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত হইল। ক্রমশঃ শ্রীবেদব্যাসের নির্ম্মিত ভগবদ্-ভক্তির প্রশস্ত সহজ সরল সরণি শুষ্ক-জ্ঞান-কন্টকে সমাকীর্ণ হইয়া দুর্গম পথে পরিণত

হইল। 'সমগ্র জগৎ মিথ্যা ও অসৎ' এইরূপ চিন্তা-রাক্ষসী সকলকে গ্রাস করিয়া ফেলিল; "অহং ব্রহ্মাস্মি" মন্ত্রের কদর্থ-বীজ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া দম্ভ-দ্রুমের অরণ্য নির্ম্মাণ করিল। ফলে পিতা-মাতা, গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা বিনষ্ট হইল; ধর্ম্মভাব দূরে পলায়ন করিল; বিশ্ব ঘোর তমসাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। এমন কি অদ্বৈতবাদ বা মায়াবাদের অত্যাচারে সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা, পাপ কার্য্যে উৎসাহ, নরহত্যাদিতে নির্ভয়, পরনারী হরণে নির্লজ্জভাব প্রভৃতি পৈশাচিক প্রবৃত্তির তাণ্ডব নৃত্যে ধরিত্রী উদ্বিগ্না ও ব্যথিতা হইতেছিলেন। এমন সময় ভক্তি-ভাব-বিভাবিত ভুবন-মঙ্গল বিশিষ্টাদ্বৈত চিন্তাস্রোতের পূর্ণাস্তিক্য-দর্শনের প্রবল বন্যা আনয়নকারী আচার্য্য-কেশরী ভাষ্যকার শ্রীরামানুজ অবতীর্ণ হইলেন।

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীরামানুজ চরিতকার শ্রীমদ্ রামকৃষ্ণানন্দ স্বামী তাঁহার সুলেখনী নিঃসৃত ভাষায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহাও সুসঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। তাহার কিয়দংশ পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিম্নে উদ্ধার করিলাম।

রামকৃষ্ণানন্দ স্বামীর লিখিত কাল বিচার

কালধর্ম্মানুসারে শঙ্কর কথিত বেদ-চতুষ্টয়সার মহাকাব্য চতুষ্টয়ের দুরর্থ করিয়া তন্মতাবলম্বী অনেক সন্ন্যাসী-বেশধারী ইন্দ্রিয়পরবশ মানব আপনাদের ও সমাজের উপর বহু অনর্থ আনিয়া ফেলিলেন। 'অহং ব্রহ্মাস্মি' বাক্যে তাহারা সার্দ্ধত্রিহস্ত পরিমিত, সপ্ত-ধাতুময়, বিষ্ঠামূত্রবাহী, জন্মমৃত্যু-জরাব্যাধির নিবাসভূমি, সঙ্কীর্ণদৃষ্টি, অধ্রুব নশ্বর জীবন, অতীতানাগত বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, এবং অকৃতবুদ্ধি মনুষ্যই অনাদি, অনন্ত, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বাশ্রয়, পরমানন্দধাম, অচ্যুতব্রহ্ম, এরূপ স্থির করিলেন। পদ্মপত্র যেরূপ জললগ্ন হইতে পারে না, ব্রহ্মবস্তুতেও সেইরূপ পুণ্য-পাপ, আচার-অনাচার, সত্য-মিথ্যা প্রভৃতি কিছুই সংশ্লিষ্ট হইতে পারে না। আমিই সেই ব্রহ্ম,—সুতরাং আমি যাহাই করিনা কেন আমাতে কোনও দাগ লাগিতে পারে না। এতদপেক্ষা পৈশাচিক সিদ্ধান্ত আর কি হইতে পারে? এরূপ ধারণার বশবর্ত্তী ব্যক্তিসকল যে শীঘ্রই আপনাদের স্বদেশের সর্ব্বনাশের কারণ হইবে, তাহা কি আর বুঝিতে বিলম্ব হয়? বস্তুতঃই উক্ত স্বকপোল-কল্পিত কদর্থ-কারিগণ শঙ্কর-কথিত অদ্বৈতবাদের মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ধারণা করিতে না পারিয়া পুনরায় ভারতবর্ষে দুর্নীতি, হিংসা, দ্বেষ, অসত্য প্রভৃতির রাজ্য স্থাপন করিল। সুখ, শান্তি, ও সত্যের অভাব সর্ব্বত্রই পরিলক্ষিত হইতে লাগিল; সেই অভাব দূর করিবার জন্যই এই মহাপুরুষ অবতীর্ণ হইলেন।

শ্রীমৎ প্রজ্ঞানানন্দ স্বামীর অভিমত

গোঁড়া অদ্বৈতবাদী শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ বেদান্ত-দর্শনের ইতিহাস লেখক। তাহাতে আচার্য্য লক্ষ্মণ দেশিকের আবির্ভাব কাল-সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহাও পাঠক-

বর্গের আলোচনা করা বিশেষ প্রয়োজন। বিরুদ্ধ-বাদিগণের দৃষ্টিতেও রামানুজের মহিমা যেরূপভাবে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে তাহা হইতেও আমরা অনেক কিছু অবগত হইতে পারি। শাঙ্কর-মতবাদিগণের মধ্যে যাহারা তাঁহার মহিমায় উদ্‌ভ্রান্ত, সাম্প্রদায়িকতায় দুষ্ট, তাহারা অন্যের কোনও দোষ না থাকিলেও যেকোনপ্রকার একটা কিছু আরোপ করিয়া শঙ্কর-মতের প্রাধান্য স্থাপনে কৃতসঙ্কল্প। সুতরাং রামানুজের বিজয় গান তাহাদের নিকট বিষবৎ মনে হইলেও রামকৃষ্ণানন্দজীর মতের প্রতিবাদ করিতে গিয়া স্বামীজী লিখিতে বাধ্য হইয়াছেন যে—"বাস্তবিক রামকৃষ্ণানন্দ স্বামীজীর লেখায় চিন্তাশীলতা আছে, কিন্তু ঐতিহাসিকতা নাই। জীবন-চরিতকারগণ রামানুজের আবির্ভাবের পূর্ব্বতন অবস্থা যেরূপ বর্ণন করেন, তাহা আদপেই সঙ্গত মনে হয় না। কারণ, তাঁহাদের মতে শাঙ্কর-মত যখন **সাধারণ-বুদ্ধি লোকের নিকট বিকৃত হইয়াছে,** যখন বেদান্তের গভীর আত্মতত্ত্ব দেহাত্মবাদে পর্য্যবসিত হইয়াছে, তখনই রামানুজের আবির্ভাব। (বস্তুতঃ) যখন দক্ষিণ ভারতে—কেবল দক্ষিণ ভারতে নহে, সমস্ত ভারতেই যখন শাঙ্কর-মত প্রবল, (প্রকৃতপক্ষে) তখন রামানুজের আবির্ভাব। অন্যত্র আরও লিখিয়াছেন— "আমাদের (অদ্বৈতবাদিগণের) দৃঢ় ধারণা রামানুজের যুগে শাঙ্করমতে কোনও ব্যাপক গ্লানির উদ্ভব হয় নাই, বরং বিদ্বন্‌-মণ্ডলীর মধ্যে শাঙ্কর মতের প্রাধান্য ও প্রাবল্যের যুগেই রামানুজের আবির্ভাব।" শাঙ্কর মতবাদিগণের বিন্দুমাত্রও গ্লানি ও পতন হইতে পারে, ইহা যেন স্বামীজীর পক্ষে স্বীকার করা অত্যন্ত ক্লেশদায়ক। তিনি অতি কষ্টে সত্যের খাতিরে লিখিয়াছেন—"শঙ্করের প্রতিপক্ষগণের মধ্যে রামানুজের ন্যায় প্রতিভা আর কাহারও হয় নাই। বিচার-মল্লতায় রামানুজ অন্যান্য আচার্য্যগণের অগ্রণী। তার্কিকের শিরোমণি রামানুজ শাঙ্করমত খণ্ডন করিয়া ভক্তিবাদের স্থাপনে যেরূপ বদ্ধপরিকর, সেরূপ অন্য কোনও আচার্য্যকে দেখিতে পাওয়া যায় না। শঙ্করের প্রতিপক্ষরূপে যে সকল আচার্য্যের আবির্ভাব হইয়াছে, রামানুজ তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।" আমরা শ্রীমৎ প্রজ্ঞানানন্দ স্বামীজীর ঘোর সাম্প্রদায়িকতাপূর্ণ গোঁড়ামী দেখিয়া অবাক হইতেছি। তিনি বেদান্ত-দর্শনের ইতিহাস লিখিতে গিয়া যে ঐতিহ্য-জ্ঞানের ও শঙ্কর-প্রেমের পরিচয় দিয়াছেন তাহা অত্যন্ত হাস্যাস্পদ। এমন কি ঐ গ্রন্থের প্রকাশক শ্রীযুত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় শঙ্কর-প্রেমে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াও স্বামীজীর শত শত ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছেন।

লক্ষণদেশিকের বাল্য জীবনের সমালোচনা

শঙ্কর-প্রেমিক স্বামীজী আচার্য্য কেশব-তনয় শ্রীলক্ষণ দেশিকের বাল্য-জীবনের মধ্যে কোনও প্রকার প্রতিভা দর্শন করিতে পারেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন—"তাঁহার শৈশব-কালের বিশেষ কিছুই জানা যায় না। শৈশবে এমন কিছুই অসাধারণত্ব দেখা যায় নাই, যাহাতে তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনের সূচনা করিতে পারে।" অথচ এই স্বামীজী অপেক্ষা

অনেকগুণে শ্রেষ্ঠ মায়াবাদী পণ্ডিত মাননীয় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয় তাঁহার অনূদিত ও সম্পাদিত শ্রীভাষ্যের 'আভাস'-ভূমিকায় লিখিয়াছেন —"রামানুজের শিশুজীবনের ঘটনাবলী বড়ই মনোহর এবং কৌতূহলোদ্দীপক। * * * ফলকথা **শৈশবেই তাঁহার বিমল প্রতিভালোকে ভবিষ্যৎ জীবনের কর্ত্তব্য-পথ উদ্ভাসিত হইয়াছিল**।" এস্থলে আমাদের বক্তব্য প্রজ্ঞানানন্দ স্বামীজীর উল্লিখিত কথাগুলি বেদান্ত-দর্শনের ইতিহাসের ২য় খণ্ডে ১৩৩৩ সালের ভাদ্র তারিখে প্রকাশিত হয়। ইহার প্রায় দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে ১৩২২ সালের চৈত্র মাসে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতজীর শ্রীভাষ্যের অনুবাদের আভাস-ভূমিকা প্রকাশিত হয়। স্বামীজী উহা ভালরূপে অধ্যয়ন করিলেও পরশ্রীকাতরতা, হিংসা-দ্বেষবশে বেদান্তের আচার্য্য-শার্দ্দূল শ্রীরামানুজের বাল্য-জীবনের কোনও প্রতিভা দর্শন করিবার চক্ষু তাঁহার প্রস্ফুটিত হয় নাই। ইহাই অদ্বৈত-বাদিগণের গোঁড়ামী ও নীচ সাম্প্রদায়িকতা।

আমরা আচার্য্যের বাল্য জীবনের অসামান্য প্রতিভার কথা নিয়ে আলোচনা করিয়া স্বামীজীর লেখনী যে কতদূর অসংযত এবং সাম্প্রদায়িকতা দোষে কলুষিত, তাহা প্রমাণ করিব।

আচার্য্যের বাল্যজীবনে সাধুসঙ্গ

অতীব শৈশবকাল হইতেই লক্ষণ দেশিকের সাধুসঙ্গ লাভের চেষ্টা পরিলক্ষিত হইত। বালচপলতাপ্রযুক্ত রামানুজ তাহার সমবয়স্ক শিশুগণের সহিত খেলাধূলা করিতে প্রায়ই বাড়ীর বাহিরে যাইতেন। একদিন পথিমধ্যে অকস্মাৎ কাঞ্চীপূর্ণ নামক একজন পরম ভাগবত বৈষ্ণবের সাক্ষাৎ লাভ হয়। পরস্পর দর্শন মাত্রেই যেন চুম্বকের ন্যায় উভয়েই উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। কাঞ্চীপূর্ণ বালকের অন্তর্নিহিত অমানুষিক প্রতিভা-ময়ী বুদ্ধি দর্শন করিয়া প্রায়শঃ তাহার নিকট আসিতেন এবং বালককে প্রভূত ভুবন-মঙ্গল-ময় উপদেশ দান করিতেন। বালক তাহা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় শ্রবণ করিয়া তাহা নিজ জীবনে প্রতিফলিত করিতে চেষ্টা করিতেন। ক্রমশঃ কাঞ্চীপূর্ণের প্রতি তাঁহার প্রচুর প্রীতি ও শ্রদ্ধা জন্মিল। বালক প্রতিভা-বলে তাঁহাকে একজন মহাপুরুষ বলিয়া জানিতে পারিলেন। কাঞ্চীপূর্ণ কাঞ্চীনগরস্থ শ্রীশ্রীবরদরাজের একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। তিনি প্রত্যহ নিজগ্রাম পুণামেলি হইতে শ্রীবরদরাজের সেবার জন্য কাঞ্চীপুর নগরে যাইতেন। পথিমধ্যে রামানুজের প্রতি প্রগাঢ় স্নেহহেতু তাহার সহিত প্রায়ই দেখা করিতে আসিতেন। একদিন কেশব-তনয় তাহার পিতামাতার আদেশ না লইয়াই কাঞ্চীপূর্ণকে তাহার গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া ভিক্ষা করাইলেন। নিজ হস্তে তাঁহাকে উত্তমরূপে ভোজন করাইয়া বালক তাঁহার পদসেবা করিতে উদ্যত হইলেন। কাঞ্চীপূর্ণ বালকের নিরভিমানে বৈষ্ণবসেবা করিবার প্রবৃত্তি দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইলেন। কাঞ্চীপূর্ণ তাঁহার স্বভাব-সুলভ দৈন্যবশে বলিলেন—"লক্ষণ! তুমি অতি সদ্‌ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভূত ব্যক্তি, আর আমি

অতি নীচ শূদ্র জাতি। সুতরাং তোমার এরূপ কার্য্যে অগ্রসর হওয়া উচিৎ নয়, সমাজ তোমাকে নিন্দা করিবে।" ইহা শুনিয়া বালক অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বলিলেন—"প্রভো, বৈষ্ণব কখনও শূদ্র হইতে পারেন না। আপনি মহাভাগবত, বিশ্ববাসীকে শিক্ষা দিবার জন্য দৈন্য করিয়া নীচ কুল গ্রহণ করিয়াছেন মাত্র। আপনার কুল আপনাকে সজাতীয়তা স্বরূপে কোনও প্রকার দাবী রাখিতে পারেন না। আরও নিবেদন করি—আমাদের পূর্ব্বতন একজন আলোয়র চণ্ডাল কুলে আবির্ভূত হইয়া সমগ্র ব্রাহ্মণ-কুলের উপাস্য হইয়াছিলেন। তাঁহার নাম শ্রীতিরুপ্পান আলোয়র। তিনি সর্ব্বদাই শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করিতেন।" রামানুজের এইরূপ বৈষ্ণবোচিত নিরপেক্ষ সুতীক্ষ্ণ বিচার দর্শন করিয়া কাঞ্চীপূর্ণ অত্যন্ত মুগ্ধ হইলেন এবং তাহার বিশেষ প্রশংসা করিলেন।

বালকের এইরূপ প্রতিভার পরিচয় সর্ব্বত্র প্রকাশিত হইতে লাগিল। বলাবাহুল্য কাঞ্চীপূর্ণের সঙ্গফলেই রামানুজের হৃদয়ে যে ভক্তির বীজ রোপিত হইয়াছিল সম্ভবতঃ তাহাই একটী বিরাট বৃক্ষাকারে পরিণত হইয়া শুষ্ক-জ্ঞান-সন্তপ্ত শত শত নরনারীর হৃদয়ে শান্তি-ছায়া দানে সমর্থ হইয়াছিল।

আচার্য্যের বিদ্যাভ্যাস

আচার্য্যের বিদ্যাভ্যাসের কাল উপস্থিত হইল। পিতা কেশব দীক্ষিত পুত্রের প্রতিভা লক্ষ্য করিয়া তাহার শিক্ষার জন্য তদানীন্তন কালের সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ শিক্ষিত পণ্ডিত ব্যক্তির নিকট তাহাকে প্রেরণ করা কর্ত্তব্য স্থির করিলেন। তৎকালে কাঞ্চীপুর নগরে যাদবপ্রকাশ নামক একজন জগদ্বিখ্যাত বৈদান্তিক পণ্ডিত বাস করিতেন। অদ্বৈতবাদী যাদবপ্রকাশ তখন পণ্ডিত কুলের মধ্যে অদ্বিতীয়, অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধ্যাপক। তাঁহার গৌরবে শাঙ্কর-মতবাদিগণ গৌরবান্বিত এবং তাঁহাকেই তখন কেন্দ্র করিয়া মায়াবাদ মহাদম্ভে কালযাপন করিত। দ্রাবিড়-কুল-শশি কেশব-তনয় পিতার ইচ্ছাক্রমে অগত্যা তাঁহাকেই তাহার অধ্যাপকস্বরূপে গ্রহণ করিলেন। "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া" এই গীতোক্ত বিধি অনুসারে আচার্য্য রামানুজ যাদবপ্রকাশের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। আচার্য্য যাদবপ্রকাশও তাহাকে প্রাপ্ত হইয়া বিশেষ সৌভাগ্যবান্ মনে করিলেন। বিশেষতঃ তাহার ঐকান্তিক শাস্ত্রানুশীলন, বিনয়-নম্র ব্যবহার, অসাধারণ প্রতিভা ও অকপট গুরুসেবা দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। লক্ষণ অতি অল্পকাল মধ্যেই অধ্যাপকের যাবতীয় পাণ্ডিত্য অধিকার করিয়া লইলেন। এখন রামানুজের পাণ্ডিত্য সর্ব্বত্রই ছড়াইয়া পড়িল। বিখ্যাত বিদ্বৎসমাজ তাঁহার গভীর জ্ঞান, প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি, অলৌকিক প্রতিভা দর্শন করিয়া বিস্মিত হইতে লাগিলেন। এমন কি অধ্যাপক অপেক্ষা ছাত্রেরই অধিক মহিমা ঘোষিত হইতে থাকায় যাদবের মনোবিকার উপস্থিত হয় এবং শ্রীমান্ লক্ষণকে বিশেষ ঈর্ষার চক্ষে দেখিতে

লাগিলেন। বালক অত্যন্ত বিনয় সহকারে যাদবের শাস্ত্রব্যাখ্যায় বহুস্থলে ভ্রান্তি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন, ইহাও সর্ব্বত্র প্রকাশ পাইতে লাগিল। ফলে যাদবের ঈর্ষানল ক্রমশঃ দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

বৈষ্ণবের পাদোদকে গ্রহ-শান্তি

অপর একদিন কাঞ্চীনগরের অধিপতির প্রিয়তমা কন্যা দুর্ভাগ্যক্রমে এক দুর্দ্দান্ত পিশাচ-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন। রাজ-অমাত্যবর্গের ও দেশস্থ পণ্ডিতমণ্ডলীর পরামর্শানুসারে নৃপতি সর্ব্ববিদ্যা-বিশারদ ও বহু তন্ত্রমন্ত্রে পারদর্শী আচার্য্য যাদব প্রকাশকে আনাইয়া কন্যাবরের গ্রহশান্তি করাইবার জন্য আহ্বান করিলেন। আচার্য্য যাদব বহু চেষ্টা করিয়াও রাজ-দুহিতার কোনও উপকার করিতে পারেন নাই। অধিকন্তু সেই ব্রহ্ম-রাক্ষস নানা প্রকারে যাদবকে তিরস্কার ও ভীতি প্রদর্শন করিতে লাগিল এবং যাদবের ও তাহার নিজের পূর্ব্ব জীবনের কথা ব্যক্ত করিতে লাগিল। যাদব পূর্ব্বজন্মে একটী 'গোসাপ' ছিলেন। অজ্ঞাতসারে কোনও বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিয়া ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মলাভ করেন এবং ব্রহ্মদৈত্য ও পূর্ব্বজন্মে ব্রাহ্মণকুলে মায়াবাদীর গৃহে জন্মলাভ করিয়াছিল। বৈষ্ণব বিদ্বেষ-ফলে তাহার প্রেতযোনি লাভ হইয়াছে। সে আরও চিৎকার করিয়া ঘোষণা করে যে পরম বৈষ্ণব লক্ষ্মণ দেশিকের পাদোদক পান করিতে পারিলেই সে উদ্ধার লাভ করিবে এবং রাজ-তনয়াকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে। রাজন্যবর্গ প্রেতাত্মার আদেশে তাহাই করিলেন। রামানুজের পাদোদক পান করাইয়া ব্রহ্ম-রাক্ষসের মুক্তি ও রাজকন্যার শান্তি বিধান করাইলেন। ইহাতে যাদব প্রকাশের মাৎসর্য্যপূর্ণ চিত্ত যে কি প্রকার হিংসা ও দ্বেষানলে দগ্ধ হইতে লাগিল তাহা সহজেই অনুমেয়।

—শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা।

শ্রীল ঠাকুর সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ

ঠাকুরের বিরহ-স্মরণে প্রবৃত্তি

সচ্চিদানন্দ বস্তু লোকলোচনের অন্তরালে থাকিলে আমরা তাঁহার প্রকাশের বিষয় ধারণা করিতে পারি না। যাহা চক্ষুর অন্তরালে থাকে, তাহাকেই আমরা অপ্রকটিত অবস্থা বলি। বস্তুতঃ শুদ্ধসত্ত্ব বস্তুর অভাব বলিয়া কোন ব্যাপার নাই। অভাবের অভাবদ্বারা যখন সাধ্যবস্তুর প্রতীতি হয়, তখনই তাহাকে আমরা নিত্য সনাতন বলিয়া আখ্যা দিয়া থাকি। সুতরাং সচ্চিদানন্দ বস্তু নিত্য ও সনাতন। সচ্চিদানন্দ-অনুবাদের ঠাকুর **ভক্তিবিনোদই** বিধেয়। তাঁহার সম্বন্ধে প্রতি-নিয়তই বিভিন্নভাবে আলোচনা হইলেও,

অদ্য **সচ্চিদানন্দের** বিরহে তাঁহার লীলার কয়েকটী বৈশিষ্ট্যকে আশ্রয় করিয়া আমরা তাঁহার পাদসেবনরূপ স্মরণে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ঠাকুর বর্ত্তমান আষাঢ় মাসের দ্বাদশ দিবসে আত্মগোপন করেন, সে আজ পঞ্চত্রিংশৎ বর্ষ অতীতের স্মৃতি।

অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ-বস্তু-বিচারে শব্দই সমর্থ

আমরা চিরদিনই শুনিয়া আসিতেছি ও আলোচনা করিতেছি—"অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।" "যাহা কৃষ্ণ, তাঁহা নাহি মায়ার অধিকার।" এইসকল বাক্য আমাদের মানসক্ষেত্রে গ্রথিত থাকিলেও হৃদ্গত অভিব্যক্তি নাই। যে-সাধনে সনাতন বস্তুর হৃদয়-প্রাকট্য হয়, সে সাধনের প্রথম ইঙ্গিতই উক্ত বাক্যদ্বারাই আমাদিগকে সাবধান করিতেছে। শ্রীল ঠাকুরের বিষয় আলোচক-সূত্রে আকাশোত্থ শব্দ বা বাক্যসমূহকে আশ্রয় করিয়া আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হওয়া 'সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের' শিক্ষার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ হইতেছে। আমার 'ইদম্ জ্ঞান' 'তদ্ জ্ঞানের' দ্বারা বিদমিত না হইলে আমার চিত্তগত ভাষা কখনই শ্রীল ঠাকুরকে প্রকাশ করিতে পারিবে না। সুতরাং এক্ষেত্রে স্তব্ধ হইয়া থাকাই আমার পক্ষে মঙ্গলদায়ক হইলেও শ্রীল ঠাকুরের আশ্বাসবাণী আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করিতেছে। তিনি বলেন, অপ্রাকৃত-তত্ত্ব-বিচারে শব্দই একমাত্র সমর্থ।

ঠাকুরের কথিত শব্দ-তত্ত্বের স্বরূপ

শব্দ বলিতে আকাশোত্থ শব্দ নহে, বৈয়াকরণিকগণের ওষ্ঠ, দন্ত বা কণ্ঠোত্থ শব্দ নহে, বৈজ্ঞানিকগণের বায়ু-বিলোড়নোত্থ শব্দ নহে, বা সাধারণ দার্শনিকগণের বিশ্বস্ত লোকের বাক্যরূপ শব্দও নহে। এ শব্দ ভ্রম-চতুষ্টয় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্—নিত্য, শুদ্ধ, পূর্ণ, মুক্ত, অতিমর্ত্ত্য, বেদ ও আম্নায়-বাণী। এই বাণী-পরম্পরা বদ্ধজীবগণের উদ্ধারকল্পে তাহাদের বিশুদ্ধ-চিত্তে প্রকাশিতা হন। এই বাণী যাঁহার ভাগ্যে উদিতা হইয়াছেন, তিনিই সকল সিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠিত হইতে সক্ষম হইয়াছেন। সিদ্ধান্তবাণীর প্রকাশই শ্রীল ঠাকুরের আবির্ভাবের প্রধান বৈশিষ্ট্য। যিনি **নদীয়া-প্রকাশ**, তিনিই **সিদ্ধান্ত-বাণী-প্রকাশ।**

ঠাকুর প্রাচীন-নদীয়ার প্রকাশক-সূত্রে অর্চ্চনীয়

শ্রীল ঠাকুর মহাশয় নদীয়া-শশী শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও আদিলীলাক্ষেত্র নদীয়ার প্রকাশক-সূত্রে তিনিই **নদীয়া-প্রকাশ।** তাই আমরা নদীয়া-প্রকাশের সেবা, পূজা, ও তাঁহার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া অর্চ্চন করিয়া থাকি। শ্রীনাম-হট্টে বা অপ্রাকৃত স্বরূপগঞ্জে স্বানন্দ-সুখদ কুঞ্জে নিত্য বিগ্রহে ঠাকুর সেব্য-সেবক-ভাবে বর্ত্তমান আছেন এবং "মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে"—বাক্যটী স্মরণ করাইয়া দিতেছেন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সিদ্ধান্ত-বাণীর জনক

তিনি সরস্বতীরূপা যে বাণী প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই সিদ্ধান্ত-বাণী বা **সিদ্ধান্ত-সরস্বতী**। আমরা ঠাকুরের জীবনী হইতে, তাঁহার নিখিল গ্রন্থাদি হইতে এবং তাঁহার সাক্ষাৎ বাণী-পরম্পরা হইতে ইহাই জানিয়াছি যে, আম্নায়-বাণীর আশ্রয় ব্যতীত বা শব্দ-প্রমাণ ব্যতীত সচ্চিদানন্দ-ভক্তির বিনোদন হইতে পারে না। **তাই শ্রীল ঠাকুরের পূজা—অর্থাৎ তৃপ্তিসাধনকে লক্ষ্য করিয়া সিদ্ধান্ত-বাণীরই পাদপদ্মে অর্ঘ্য বিতরণ করি।**

"তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥" (চৈঃ চঃ মঃ ২২।২৫)

ঠাকুরের আত্মীয় ও পরিচিতের লক্ষণ

শ্রীল ঠাকুরের দ্বিতীয়াশ্রমের অতি নিকট-আত্মীয়-পরিচয়াকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণের মুখে অনেক সময় শুনিয়াছি—তাঁহারা শ্রীল ঠাকুরের কাছে অতি নিকটে ছিলেন এবং তাঁহার পরিচয় সম্বন্ধে তাঁহারা অভিজ্ঞ। এইরূপ কথা মদীয় পরমারাধ্য আচার্য্যদেব শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শুনিবামাত্রই বলিতেন—"তাঁহার নিকটে থাকা বা তাঁহার পরিচয় সম্বন্ধে জানা দূরের কথা, তাঁহারা তাঁহাকে দেখিতেও পান নাই।"—এই সমস্ত বাক্যের সফলতা ও সার্থকতা আমরা শ্রীল ঠাকুরের নিজ-লিখিত "জৈবধর্ম্ম"-গ্রন্থের প্রমেয়ান্তর্গত জীব-বিচারের অধ্যায়ে (১৫শ অধ্যায়ে) এইরূপ দেখিতে পাই—"বাক্য ও মন উভয়ই জড়-সম্বন্ধে উৎপন্ন। তাহারা অধিক চেষ্টা করিয়াও চিদ্বস্তু স্পর্শ করিতে পারে না। যথা বেদ বলিয়াছেন—যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" ঠাকুর সর্ব্বদাই আমাদিগকে সাবধান করিয়াছেন—স্থূল-ইন্দ্রিয় ও সূক্ষ্ম-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা চিদ্বস্তুর জ্ঞান অসম্ভব। **শ্রীল ঠাকুর স্বয়ং সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ।** তাহাতে অচিদ্বস্তুর আচ্ছাদন কোথায়? সুতরাং বাহ্য ইন্দ্রিয়-সমষ্টিযুক্ত স্থূলশরীর বা সূক্ষ্মশরীর তাঁহার নিকটে থাকিতে পারে না বা তথা হইতে তাঁহার পরিচয় জানাও যুক্তিবিরুদ্ধ; সুতরাং অত্যন্ত অসম্ভব। তিনি নিত্য-মুক্ত, অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষ, তাঁহার সম্বন্ধে মায়াবদ্ধ মর্ত্ত্যজীব ধারণা করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম।

ঠাকুরের অতিমর্ত্ত্যত্বের অনুভূতি

শ্রীল ঠাকুর উক্ত গ্রন্থে উক্ত অধ্যায়ে জীব-বিচার সম্বন্ধে যে বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অতিমর্ত্ত্যতা ও সর্ব্বজ্ঞতা প্রকাশ পায়। জড়-বিলাসে ভীত হইয়া চেতন-বিলাস হইতে নিরস্ত থাকার অযৌক্তিকতা তিনি বিভিন্নভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি জানাইয়াছেন—অনুমিতিকার্য্যে হেতুত্ব বিষয়ে 'ব্যাপ্তিজ্ঞান' ও 'পরামর্শ' উভয়ই প্রয়োজন।

এরূপক্ষেত্রে শুক্তিতে রজত ও রজ্জুতে সর্পভ্রম-দ্বারা জৈব-জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদনের যুক্তিও ন্যায়-বিরুদ্ধ হইতেছে। শ্রীল ঠাকুরের উক্ত বিচারের চমৎকারিতা হইতে তাঁহার অতিমর্ত্ত্য আচার্য্যত্ব অনুভব করিতেছি।

শ্রীল ভক্তিবিনোদের আচার্য্যত্ব

দার্শনিক বিচার-জগতে 'আচার্য্য' বলিলে আমরা যাহা বুঝিয়া থাকি, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তদ্‌হিসাবেও আচার্য্য। তাঁহার বেদান্তভাষ্য, উপনিষদ্‌ভাষ্য, সহস্র-নাম-ভাষ্য, গীতাভাষ্য প্রভৃতি ভাষ্যসমূহ হইতে তিনি আচার্য্য-সমাজে নিঃসন্দেহে শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত আছেন, ইহা আমরা সহজে অনুভব করিতে পারি। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের বৈদান্তিক সামাজিকতা লইয়া যে অমূলক বিবাদ উত্থাপিত হইয়াছিল, তাহা শ্রীল আচার্য্য বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু বিনষ্ট করিয়াছেন ; তাহার পর ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদই-সমাজ-সংস্কারের শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ। শ্রীল ঠাকুরের আজও বহু গ্রন্থ অপ্রকাশিত থাকায় তাঁহার লেখনীর পূর্ণ অভিব্যক্তি আমরা দেখিতে পাইতেছি না। সজ্জনগণ তদ্বিষয়ে যত্ন করিলে জগতের বহুল পরিমাণে হিত সাধন হইবে।

শ্রীল সচ্চিদানন্দের পরোপকার বিচার

আচার্য্যের শিক্ষা হইতে আমরা পরোপকার সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ করিয়াছি, তাহা সদসদ্-বিলক্ষণ-অনির্ব্বচনীয় বস্তুদ্বারা আচ্ছাদিত বা বিম্বিত বস্তু হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। জীবকে সত্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার নিত্য সত্ত্বায় আস্থা স্থাপন করানই ঠাকুরের ভাষ্যসমূহের উদ্দেশ্য। 'পর'-শব্দে অনাদি শ্রেষ্ঠ বস্তুকে লক্ষ্য করে। যে-কার্য্যের দ্বারা আমাদের শ্রেষ্ঠতা বিনষ্ট হয়, তাহাকে পর-উপকার বলা যায় না। নিত্যানন্দময় বস্তুই শ্রেষ্ঠ। জীব নিত্যানন্দে প্রতিষ্ঠিত হইলেই পর-উপকারের ফল লাভ করিল। জ্ঞাতার অভাবে জ্ঞান স্বীকারের সার্থকতা কি এবং জীবের পক্ষে তাহা কি-প্রকারে মঙ্গলদায়ক হয় ? আনন্দস্বরূপ বলিয়া স্তব্ধ হইয়া উহার প্রাপ্য-প্রাপকের বিনাশ-সাধনে আনন্দ কাহার ? উপকারই বা কাহার ? সুতরাং শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ উক্ত প্রকার কোন উপকারকে উপকার না বলিয়া অপকার আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। ব্যবহারিক মিথ্যা বস্তু হইতে পারমার্থিক সত্যানন্দ, মিথ্যা নিরানন্দের প্রতীক।

পরিবর্ত্তনশীল ফল-লাভ পর-উপকারের লক্ষ্য নহে

যাহার ফলের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে পরিবর্ত্তন-যোগ্যতা লক্ষ্য করা যায়, তাহার অনুসন্ধিৎসা বা আনুগত্য করা শ্রীল ঠাকুরের শিক্ষা বা 'পরোপকার'-সংজ্ঞা হইতে বিলক্ষণ। ফল-বিচারে তিনি আনন্দের প্রাপকস্বরূপে তত্ত্ব-বস্তুকেই জ্ঞাপন করিয়াছেন। জীব তাহাতে অভিলাষ করিয়াই স্থূল-সূক্ষ্ম-প্রাকৃতিক তত্ত্বকেই অঙ্গীকার করায় প্রয়োজন-

বিচারে যে অনিত্যতা আনয়ন করিয়াছে, তাহা শ্রীল ঠাকুরের পরোপকার সম্বন্ধে শিক্ষার বহির্ভূত হইতেছে। ঐপ্রকার ফল ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হইয়া ক্ষীণভাব ধারণ করে। এমন কি, পরে অনুশোচনাদ্বারা প্রাপ্য নষ্ট হইয়া যাওয়ায় উহা হেয় বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

প্রয়োজন-বস্তু সাধনাধীন নহে—কিন্তু কৃপাধীন

ঠাকুরের যাহা প্রয়োজন বিচার, তাহা যে-সাধনে লাভ করা যায়, তাহা সাধন ও সাধ্য উভয় পর্য্যায়যুক্ত। যাহা সাধনের দ্বারা লাভ করা যায়, তাহাই সাধ্য অর্থাৎ সাধনাধীন। কিন্তু ঠাকুরের শিক্ষা হইতে আমরা সাধ্যবস্তু-সম্বন্ধে যে কথা সিদ্ধান্তবাণী-মুখে শ্রবণ করিয়াছি, তাহা সাধনাতিরিক্ত বস্তু হওয়ায় তত্ত্ববস্তুর কৃপা-সাপেক্ষ হইতেছে। অথচ তাঁহাকে ব্যক্ত করিতে গেলে 'সাধ্য'-শব্দরূপ ভাষামল প্রবিষ্ট হইবেই। সুতরাং ইহা সম্যগ্‌রূপে আরাধনায় প্রকাশ পায়। বেদান্তসূত্র বলেন—"অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানা-ভ্যাম্" —অর্থাৎ সম্যগ্‌রূপে শ্রীমতী রাধারাণীর আনুগত্য-প্রভাবে তত্ত্ববস্তু বিশুদ্ধসত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত জীবসমূহের প্রত্যক্ষ ও অনুমানের অর্থাৎ অনুশীলন ও ধ্যানের বস্তু হইয়া থাকে। যেখানে জড়-প্রতীতি ও মিথ্যাজ্ঞান, সেখানেই চেতনের ইচ্ছাশক্তির অপব্যবহার বিধায় তত্ত্ববস্তুর সম্যক্ আরাধনা বা শুদ্ধভক্তির অভাব।

তত্ত্ববস্তুর অনুশীলনই অভিধেয়

বেদান্তের 'প্রকাশশ্চ কর্ম্মণ্যভ্যসাৎ' সূত্র হইতে আমরা যে অনুশীলনের কথা জানিতে পারি, তাহা কর্ম্ম বা অধ্যাস প্রভৃতি বৃত্তি হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্। উক্ত সূত্র জ্ঞান-মাত্রই ফলপ্রাপ্তির উপায়চ্ছেদ মন্ত্র। আমরা কোন বিষয়ে জ্ঞান-কুশলতা লাভ করিলেই যেরূপ ফললাভ করিতে পারি না অর্থাৎ তাহার প্রকৃষ্ট অনুশীলনই ফললাভের উপায় হয়, তদ্রূপ জ্ঞানই আমাদিগকে তত্ত্ববস্তুর কাছে লইয়া যাইবে না; তাহার সুষ্ঠু ও পুনঃ পুনঃ অনুশীলনেই তত্ত্ববস্তু প্রকাশিত হন। এইজন্যই উক্ত সূত্রে 'প্রকাশশ্চ'—অর্থে তত্ত্ববস্তুর প্রকাশ। 'কর্ম্মণি অভ্যাসাৎ' —অর্থে পুনঃ পুনঃ অনুশীলন হইতে ফলপ্রাপ্তি, এইরূপ বুঝিতে হইবে। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রতিগ্রন্থের অভিধেয়-অধ্যায় বিচার করিলে আমরা উক্ত তত্ত্বের অনুসন্ধান পাইব।

বীরনগরে ঠাকুরের আবির্ভাব

শ্রীল ঠাকুর সচ্চিদানন্দ সম্বন্ধে আমাদের কোন বিষয় বলিতে যাওয়া অপেক্ষা আমরা যদি সিদ্ধান্তবাণী-প্রকাশের আশ্রয় গ্রহণ করি, তাহা হইলেই আমরা শ্রীল ঠাকুর-সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় অবগত হইতে পারিব। জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার সম্বন্ধে জৈবধর্ম্মের

উপোদ্ঘাতে যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই শ্রীল ঠাকুরের সম্বন্ধে আমাদের জানিবার বিষয়। তিনি জানাইয়াছেন—চৈতন্যবস্তু (মহাপ্রভু) ও অদ্বৈত-বস্তুর (অদ্বৈত প্রভুর) আবির্ভাব-ক্ষেত্রই সচ্চিদানন্দ বস্তুর আবির্ভাব-ক্ষেত্র। আত্মতত্ত্বে এইপ্রকার আশ্চর্য্যজনক বৈশিষ্ট্যময় একত্ব সর্ব্বদাই লক্ষ্য করা যায়। বলহীন স্থলে আত্মপ্রকাশ অসম্ভব বিধায় **বীরনগরে** তিনি আবির্ভাব-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

অপ্রাকৃত তত্ত্বেই বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সামঞ্জস্য

প্রবন্ধ বিস্তারের ভয়ে আমরা তাঁহার সম্বন্ধে আরও অধিক কথা আলোচনা করিয়া আত্মশোধন করিবার ইচ্ছা থাকিলেও অদ্য তিরোভাব-দিবসে তাঁহার আবির্ভাবের উল্লেখ-মাত্র করিয়াই নিরস্ত হইলাম। ইহা প্রাকৃত-বিচারে অসামঞ্জস্য হইলেও ঠাকুরের লিখিত তত্ত্বসূত্রের "বিরুদ্ধধর্ম্মং তস্মিন্ ন চিত্রম্" সূত্র আলোচনা করিলে জানিতে পারি যে, অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ বস্তুতে বিরুদ্ধ-ধর্ম্মের সুষ্ঠুরূপ সামঞ্জস্য নিত্য বর্ত্তমান। এতদ্ব্যতীত মহাজনগণের আবির্ভাব-তিরোভাব একই উদ্দেশ্যে হইয়া থাকে। তাই বিরহ-দিবসও উৎসব দিবস; মঙ্গল বিধানের জন্য মঙ্গলময়ী তিথি—অমাবস্যা।

নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দ-নামিনে।
গৌরশক্তি-স্বরূপায় রূপানুগবরায় তে ॥

—শ্রীগৌঃ পত্রিকা ১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা।

শ্রীল গোপাল-ভট্ট গোস্বামী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পারিষদ্ ষড়্গোস্বামীর অন্যতম শ্রীগোপালভট্, তাঁহার পরিচয় শ্রীভক্তিরত্নাকর-গ্রন্থকার এইরূপে লিখিয়াছেন—

শ্রীমদ্গৌর-পদারবিন্দ-মধুপ শ্রীভট্টগোপাল হে
মায়াবাদতমঃ-প্রভাকর-কৃপাসিন্ধো দ্বিজেন্দ্রপ্রভো।
শ্রীমদ্ব্যেঙ্কটভট্ট-নন্দন মহাসদ্ভক্তিভূষাঢ্য হে
সংসারভয়মর্দ্দন-প্রণতহৃন্মোদপ্রদ ত্রাহি মাম্ ॥

হে শ্রীমদ্ গৌরপাদপদ্ম-মধুকর শ্রীগোপালভট্ট প্রভো! আপনি মায়াবাদ-অন্ধকার বিনাশিভাস্কর, কৃপাসিন্ধু ও দ্বিজশ্রেষ্ঠ। আপনি শ্রীমদ্ব্যেঙ্কটভট্ট নন্দন, মহাপ্রেমভক্তি-বিভূষণ, ভবব্যাধি-নাশন ও শরণাগত-হৃদয়ানন্দ-প্রদ। আপনি আমাকে ত্রাণ করুন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র তীর্থ-যাত্রার ছলে দক্ষিণদেশে গমন করিয়া শ্রীবেঙ্কটভট্ট-গৃহে চাতুর্ম্মাস্য যাপন করেন। তৎকালে শ্রীগোপাল বালক মাত্র। 'শ্রী'-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব বেঙ্কট-ভট্ট শ্রীমন্মহাপ্রভুকে নিজ গৃহে নিমন্ত্রণ করেন। শ্রীচৈতন্যদেব বেঙ্কট-গৃহে শুভ-বিজয় করিলে বেঙ্কট-ভট্ট শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম প্রক্ষালন করিয়া সবংশে সেই শ্রীচরণামৃত পান করেন।

বালক গোপাল শ্রীচরণ-বারি পান করিয়াই প্রেমে মত্ত হইয়া পড়েন। বহু যত্ন করিয়াও তাহা সংবরণ করিতে পারেন নাই। সে-বিষয় ভক্তিরত্নাকর প্রথম তরঙ্গে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে —

অন্যত্র ব্যক্ত গোপাল বেঙ্কট-তনয়।
প্রভু পাদোদক পানে হৈল প্রেমোদয়॥
করয়ে যতন কত স্থির হৈতে নারে।
বিপুল পুলক অঙ্গে ঝলমল করে॥
কিবা গোপালের শোভা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর।
জিনিয়া চম্পক চারু বর্ণ মনোহর॥
কিবা মুখপদ্ম দীর্ঘ নয়নযুগল।
কিবা ভুরু ভাল নাসা তিলক উজ্জ্বল॥
নিজগৃহে শ্রীগোপাল প্রাণনাথে পাঞা।
পিতার আজ্ঞায় সেবে মহাহৃষ্ট হৈয়া॥

শ্রীগোপাল প্রভুর সেবায় বিশেষ প্রীতিলাভ করিতেন। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস রূপ দেখিয়া তাঁহার প্রাণে বড়ই কষ্ট হইত। তজ্জন্য মনে মনে বিধাতাকে বলিতেন,—

বিধাতার প্রতি কহে গদগদ ভাষে।
ওরে বিধি কেনে জন্মাইলি দূরদেশে॥
নদীয়া-বিহার-সুখে করিয়া বঞ্চিত।
দেখাইলি প্রভুর এ-বেষ বিপরীত॥
ব্রজেন্দ্র-নন্দন প্রাণনাথ রাধিকার।
করাইলি তাঁহারে সন্ন্যাস-অঙ্গীকার॥
এত কহি ভাসে দুই নেত্রের ধারায়।
ত্যজয়ে নিঃশ্বাস দীর্ঘ অগ্নিশিখা প্রায়॥
পুনঃ কহে বিধিরে, করিব কিবা রোষ।
জানিনু কেবল এ আপন কর্ম্মদোষ॥ (ভঃ রঃ—১ম তরঙ্গ)

রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের শচীনন্দন-রূপে নবদ্বীপ-বিলাস দেখিতে না পাওয়ায় এবং তদুপরি তাঁহার সন্ন্যাস-বেষ দর্শনে গোপালের চিত্তে সুখ হয় নাই, তাহা জানিয়া

অন্তর্য্যামী শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার প্রতি বিশেষ কৃপা করেন। তিনি গোপালকে নিদ্রায় আকর্ষণ করিয়া স্বপ্নে নবদ্বীপধাম দর্শন করাইলেন। প্রভুর অদ্ভুত নবদ্বীপ-বিলাস দর্শন করিয়া এবং শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দ ও শ্রীমদ্ অদ্বৈত প্রভুদ্বয়ের কৃপালিঙ্গন প্রাপ্ত হইয়া গোপালের নিদ্রাভঙ্গ হইল। নিদ্রাভঙ্গে ব্যাকুল হইয়া তিনি সাক্ষাদ্দর্শনের জন্য শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের শ্রীচরণপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন। তাহার উৎকণ্ঠা লক্ষ্য করিয়া তিনি অন্তরে লুক্কায়িত নিজ শ্যামসুন্দর গোপবেশ প্রকট করেন।—

ভুবন মোহয়ে সে না রূপের ছটায়।
চাঁচর কেশের ঝুঁটা পিঠেতে লোটায়॥
চন্দন তিলক ভালে ভুরু কামফণি।
সতী-মন হরে দীর্ঘ নয়ন-চাহনি॥
কত শত শরৎ চান্দের মদ নাশে।
কি নব ভঙ্গীতে হাসি অমিয়া বরিষে॥
পরিধেয় ত্রিকচ্ছ বসন অনুপম।
ভূষণে ভূষিত অঙ্গভঙ্গী মনোরম॥
মালতীর মালা গলে দোলে অনিবার।
দেখি গোপালের মনে হৈল চমৎকার॥
(ভঃ রঃ—১ম তরঙ্গ)

গোপাল ঈদৃশ রূপ দর্শন করিয়া মহাপ্রভুর শ্রীচরণে ভূমিলুণ্ঠিত দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া উঠিলে প্রভুকে পুনরায় স্বর্ণ-বর্ণে পরিণত সন্ন্যাসীর বেষে দেখিতে পান। প্রভু গোপালকে তখন ইঙ্গিত করিলেন, "তুমি অচিরেই বৃন্দাবনে গমন করিয়া শ্রীরূপ-সনাতনের দুর্লভ সঙ্গ-লাভ করিবে এবং সকলে মিলিয়া আমার মনোভীষ্ট স্থাপন করিবে।"

শ্রীগোপালের গৌর-সেবা দর্শন করিয়া পিতা বিশেষ উল্লসিত হইয়া পুত্রকে শ্রীচৈতন্য-চরণে সমর্পণ করিলেন। চারিমাসকাল সকলে প্রভুপদসেবায় পরমানন্দে অতিবাহিত করিলেন। চাতুর্ম্মাস্যান্তে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিদায়-কালে সগোষ্ঠী ব্যেঙ্কটভট্ট অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করিতে থাকেন—

ত্রিমল্ল, ব্যেঙ্কট, শ্রীপ্রবোধানন্দ তিনে।
বিচারয়ে প্রভু বিনা রহিব কেমনে॥
মো সবার সঙ্গে পরিহাস কে করিবে।
কাবেরী-স্নানেতে সঙ্গে কেবা লৈয়া যাবে॥
রঙ্গনাথে কেবা বা করিবে সঙ্কীর্ত্তন।
কে দিবে অধমে সে দুর্লভ ভক্তিধন॥
আসিবে অসংখ্য লোক কাহার দর্শনে।
এ-সব ভবন শূন্য হবে প্রভু বিনে॥ (ভঃ রঃ—১ম তরঙ্গ)

ব্যেঙ্কট, প্রবোধানন্দ ও ত্রিমল্ল ভট্ট — তিন ভাই একত্রে এইরূপে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের বিরহে অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিতে থাকেন।

শ্রীমদ্‌গৌরসুন্দর শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে ভট্ট-গৃহে অবস্থান-কালে ভট্টকে পরিহাস করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীনারায়ণের তত্ত্ব বুঝাইয়াছিলেন।—

প্রভু কহে, —ভট, তোমার লক্ষ্মী ঠাকুরাণী।
কান্ত-বক্ষঃস্থিতা, পতিব্রতা-শিরোমণি॥
আমার ঠাকুর কৃষ্ণ—গোপ, গো-চারক।
সাধ্বী হঞা কেনে চাহে তাঁহার সঙ্গম॥
এই লাগি' সুখভোগ ছাড়ি' চিরকাল।
ব্রত-নিয়ম করি' তপ করিল অপার॥ (চৈঃ চঃ মঃ ৯।১১১-১১৩)

লক্ষ্মীদেবী কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবালাভের আশায় শ্রী-বনে দীর্ঘকাল তপস্যা করেন। শ্রী-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণ লক্ষ্মী-নারায়ণের উপাসক। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রহস্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বের পারতম্য জানাইবার জন্য এই ভঙ্গীতে প্রশ্ন করেন। ভট্ট উত্তর করিলেন—কৃষ্ণ নারায়ণ একই স্বরূপ। সুতরাং কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবায় লক্ষ্মীদেবীর পাতিব্রত্য ধর্ম্ম নষ্ট হইবে না। কৃষ্ণেতে বৈদগ্ধ্যাদি লীলা অধিক থাকায় এবং 'রাসাদি বিলাসে অধিকার পাইবেন'—বুঝিয়া লক্ষ্মীদেবী কৃষ্ণসঙ্গম বাঞ্ছা করেন।

শ্রীগৌরসুন্দর বলিলেন,—"কৃষ্ণসঙ্গ-বাঞ্ছা দোষজনক নহে, তাহা আমি জানি ; কিন্তু লক্ষ্মী-ঠাকুরাণী রাসে অধিকার পান নাই কেন ? শ্রুতিগণের যেস্থলে তপস্যা-ফলে রাসে অধিকার হইল, সেস্থলে লক্ষ্মীদেবী বঞ্চিত হ'ন কেন!" ভট্ট বলিলেন,—"আমি ক্ষুদ্র জীব, ঈশ্বরের সমুদ্র-গম্ভীর-লীলায় প্রবেশের যোগ্যতা আমার নাই। আপনি স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্র, নিজ-লীলার মর্ম্ম নিজেই জানেন। আপনি যাঁহাকে কৃপা করেন, তাঁহারই তাহা অবগত হইবার সৌভাগ্য হয়। ভট্টকে শরণাগত দেখিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু তত্ত্ব-উপদেশ আরম্ভ করিলেন। —

"প্রভু কহে,—কৃষ্ণের এক সজীব লক্ষণ। স্বমাধুর্য্যে সর্ব্বচিত্ত করে আকর্ষণ॥
ব্রজলোকের ভাবে পাইয়ে তাঁহার চরণ। তাঁরে ঈশ্বর করি' নাহি জানে ব্রজজন॥
কেহ তাঁরে পুত্র-জ্ঞানে উদূখলে বান্ধে। কেহ সখাজ্ঞানে জিনি' চড়ে তাঁর কান্ধে॥
ব্রজেন্দ্র-নন্দন বলি' তাঁরে জানে ব্রজজন। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে নাহি কোন সম্বন্ধ-মানন॥
ব্রজলোকের ভাবে যেই করয়ে ভজন। সেই ব্রজে পায় শুদ্ধ ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
শ্রুতিগণ গোপীগণের অনুগত হঞা। ব্রজেশ্বরী-সুত ভজে গোপীভাব লঞা॥
বাহ্যান্তরে গোপীদেহ ব্রজে যবে পাইল। সেই দেহে কৃষ্ণসঙ্গে রাসক্রীড়া কৈল॥
গোপজাতি কৃষ্ণ, গোপী প্রেয়সী তাঁহার। দেবী বা অন্যস্ত্রী কৃষ্ণ না করে অঙ্গীকার॥

লক্ষ্মী চাহে সেই দেহে কৃষ্ণের সঙ্গম। গোপী-রাগানুগা হঞা না কৈল ভজন॥
অন্য দেহে না পাইয়ে রাসবিলাস। অতএব 'নায়ং' শ্লোক কহে বেদব্যাস॥
নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাং চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ॥"
(চৈঃ চঃ মঃ ৯।১২৭-১৩১, ১৩৩-১৩৭, ১৩২)

"ব্রজবাসিগণ কৃষ্ণকে 'নন্দনন্দন' বলিয়া জানেন। পরমৈশ্বর্য্যশালী 'পরমেশ্বর' বলিয়া তাঁহার সহিত যে একটী অন্য সম্বন্ধ আছে, তাহা তাঁহারা মানেন না। ব্রজবাসিদিগের দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই চারি প্রকারের কোন ভাব গ্রহণ করিয়া যিনি পরমতত্ত্বকে ভজন করেন, তিনি চরমাবস্থায় ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণকে শুদ্ধরূপে ব্রজধামে প্রাপ্ত হন।

"শ্রুতিগণ শ্রীকৃষ্ণের রাসমণ্ডলে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিয়া যখন সফলকামা হইলেন না এবং কেবল হৃদ্গত গোপীভাব লইয়াও যখন প্রবেশ করিতে পারিলেন না, তখন বাহ্যে গোপীদেহ ও অন্তরে গোপীভাব গ্রহণ করত গোপীগণের অনুগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের রাসে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ—গোপজাতি, গোপীগণই তাঁহার প্রেয়সী, সুতরাং ঐশ্বর্য্যময়ী দেবীরূপে, কি অন্য স্ত্রীরূপে কৃষ্ণসঙ্গম পাওয়া যায় না। লক্ষ্মীদেবী নিজ দেব-দেহে কৃষ্ণের সঙ্গম প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু গোপীগণের স্বাভাবিক অনুরাগের অনুগত হইয়া ভজন করেন নাই। এইজন্যই গোপী হইতে পৃথক্ দেহে রাসবিলাস লাভ করিতে পারেন নাই। এতন্নিবন্ধন ব্যাসদেব "নায়ং সুখাপো ভগবান্" এই শ্লোকটি লিখিয়াছেন। (অর্থাৎ যশোদাপুত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিমান্ দেহিদিগের পক্ষে যেরূপ সুলভ, আত্মভূত জ্ঞানিদিগের পক্ষে সেরূপ নন।) ব্যেঙ্কট-ভট্টের মনে একটি অভিমান ছিল এই যে,—পরব্যোমস্থ নারায়ণই স্বয়ং ভগবান্, তাঁহার ভজনই সর্ব্বোপরিতন উপাসন-স্তরবিশেষ; সুতরাং শ্রী-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণের ভজনই সর্ব্বোপরি—এই বৃথা গর্ব্ব খণ্ডনের অভিপ্রায়ে মহাপ্রভু পরিহাস-দ্বারা এই বিচারটী উঠাইয়াছিলেন।" (অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য)

শ্রীচৈতন্যচন্দ্র তিন ভাই-সহ গোপালকে প্রবোধ দিয়া দক্ষিণদেশ ভ্রমণপূর্ব্বক নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কিন্তু গোপাল প্রভু-বিচ্ছেদে নিতান্ত কাতর হইয়া পড়েন। কেবল তাঁহার এইমাত্র আশা ছিল যে, প্রভু বিদায়কালে বলিয়া গিয়াছেন—'গোপাল! শীঘ্রই তোমার বাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।' এই আশাবন্ধ হৃদয়ে পোষণ করিয়া গৌর-প্রেমে মত্ত গোপাল গৌর-গুণগাঁথা কীর্ত্তনে মগ্ন থাকিতেন। মায়াবাদ খণ্ডন-কার্য্যে গোপালের যে স্বতঃসিদ্ধ পাণ্ডিত্য, তাহা দেখিয়া শিষ্ট ব্যক্তিগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ভাবিতেন যে, অল্পবয়সে তাহার এত পাণ্ডিত্য কোথা হইতে আসিল? কেহ কেহ বলিতেন, গোপালের খুল্লতাত শ্রীপ্রবোধানন্দ গোপালকে অধ্যয়ন করাইয়া সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ করিয়াছেন। গোপাল যে শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী-পাদের কৃপাপাত্র, তাহা শ্রীহরিভক্তি-বিলাসের ১ম বিলাসের ২য় শ্লোকে কথিত হইয়াছে,—

ভক্তের্বিলাসাংশ্চিনুতে প্রবোধানন্দস্য শিষ্যো ভগবৎপ্রিয়স্য।
গোপালভট্টো রঘুনাথদাসং সন্তোষয়ন্ রূপ-সনাতনৌ চ॥

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের প্রিয় শ্রীল প্রবোধানন্দের শিষ্য গোপালভট্ট, রঘুনাথ এবং রূপ-সনাতন প্রভুর সন্তোষ বিধান করিয়া হরিভক্তিবিলাস নামক গ্রন্থ সঙ্কলন করিতেছে।

কিছুকাল পরে গোপালের মাতা-পিতা গোপালকে বৃন্দাবনে যাইবার আজ্ঞা প্রদান করিয়া পৃথিবী পরিত্যাগ করেন। গোপালও পরমানন্দে ব্রজে গিয়া রূপ-সনাতনের সঙ্গে মিলিত হন।

এ'দিকে অন্তর্য্যামী শ্রীগৌরসুন্দর এ বিষয় অবগত হইয়া ভক্তগণকে কহিয়াছিলেন—

বহুদিন ব্রজের সংবাদ না পাইয়া।
না জানিয়ে আমার কেমন করে হিয়া॥

ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই ব্রজ হইতে গোপালের বৃন্দাবন-আগমন সংবাদ লইয়া বার্ত্তাবহ আসিয়া উপস্থিত। তখন প্রভু পরম আনন্দে গোপালের কথা ভক্তগণের নিকট বর্ণন করেন—

দক্ষিণ-ভ্রমণে অতি আনন্দ অন্তরে।
চারিমাস রহিনু ব্যেঙ্কটভট্ট-ঘরে॥
গোপালভট্ট ব্যেঙ্কটভট্টের নন্দন।
অল্পকালে সকল শাস্ত্রেতে বিচক্ষণ॥
পাইয়া পিতার আজ্ঞা গোপাল উল্লাসে।
করিল আমার সেবা অশেষ বিশেষে॥
পরম দয়ালু কৃষ্ণ তারে কৃপা কৈলা।
সেই এ গোপালভট্ট বৃন্দাবনে আইলা॥
প্রাণের সমান মোর রূপ-সনাতন।
তাহার গমনমাত্রে লিখিনা লিখন॥ (ভক্তিরত্নাকর-১ম তরঙ্গ)

প্রভু রূপ-সনাতনের গুণে মগ্ন হইয়া উত্তর দিলেন—

পাইল আনন্দ গোপালের আগমনে॥
নিজ ভ্রাতাসম ভট্ট-গোপালে জানিবে।
মধ্যে মধ্যে শুভ সমাচার পাঠাইবে॥
যে যে গ্রন্থ বর্ণিলা, বর্ণিবা যত আর।
অচিরে সে-সব হ'বে সর্ব্বত্র প্রচার॥ (ভঃ রঃ—১ম তরঙ্গ)

শ্রীরূপ-সনাতনের গোপাল-সহ অদ্ভুত প্রণয় হইল। তাঁহার মনে বৈষ্ণবস্মৃতি সঙ্কলন করিবার বাসনা হওয়ায় **শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু গোপালের নামে হরিভক্তিবিলাস প্রকাশ করেন।**

শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামীর শ্রীবিগ্রহসেবা প্রকাশের ইচ্ছা হওয়ায় শ্রীরূপের- প্রাণধন শ্রীগোবিন্দদেব শ্রীরূপকে স্বপ্নাদেশ দিয়া শ্রীরাধারমণের সেবা প্রকট করাইলেন। গোপাল শ্রীরাধারমণের সেবায় সতত নিমগ্ন থাকিতেন এবং শ্রীরূপ-সনাতন-সঙ্গে গৌর-গুণগাথা গাহিয়া আনন্দ-পরিপ্লুত হইতেন।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের লীলা-রচয়িতা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুকে নিজ প্রসঙ্গ বর্ণন করিতে শ্রীগোপালভট্ট প্রভু নিষেধ করিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে তাঁহার নাম মাত্র উল্লিখিত আছে। অন্য কোন কথা লিখিত হয় নাই। তাঁহার লীলামৃত শ্রীভক্তিরত্নাকর-গ্রন্থে শ্রীঘনশ্যাম দাস-কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

কিছুকালপরে শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু শ্রীগোপালভট্টের কৃপাপ্রাপ্ত হইয়া গোস্বামীদিগের প্রকাশিত ভক্তিগ্রন্থ-রত্নসকল প্রচার করেন।

—শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা ২য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা।

দার্শনিক বিচারপর প্রবন্ধ—

অদ্বৈতবাদ নিরাস

(শ্রীজন্মাষ্টমীতে দার্শনিক আলোচনা)

"দোষ অন্বেষণে সেবা?"

অদ্য জন্মাষ্টমীবাসরে আমার দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, আমার ছিদ্রান্বেষণরূপ বৃত্তি প্রশান্তি লাভ না করিয়া তাহার বিকাশ হইতেছে। কারণ, পরদোষান্বেষণই যাহার বৃত্তি এবং যে-বৃত্তি নিসর্গতা অতিক্রম করিয়া স্বরূপগত স্বভাবে অবস্থিতা, তাহার পক্ষে কৃষ্ণাবির্ভাব-জনিত আনন্দবাসর ও কৃষ্ণবিরহ-জনিত ক্লেশ — উভয় ক্ষেত্রেই সেই বৃত্তির পরিবর্ত্তন না হইয়া তাহা উৎফুল্ল-চিত্তে ব্যক্ত হইয়া থাকে। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের লিখিত 'ক্রোধ ভক্তদ্বেষিজনে' প্রভৃতি উপদেশাবলীর যে স্বাভাবিক অর্থ গুরুমুখে শ্রবণ করিয়াছি এবং আচার্য্যের আচারে লক্ষ্য করিয়াছি তাহাতে মাদৃশ ছিদ্রান্বেষীর পক্ষেও নিরাশার কথা দূরে থাকুক, তাহা পরম আশার ও উৎসাহেরই বিষয়। শ্রীল প্রভুপাদ যাহার যে বৃত্তি যাহাতে যে-ভাবে আছে, তদ্দ্বারাই কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ সেবা করা যাইতে পারে — এপ্রকার

উপদেশ দিয়া, শুধু তাহাই নহে উক্ত বৃত্তিগুলি কি-প্রকারে সেবায় নিযুক্ত হইতে পারে, তাহা নিজে আচরন করিয়া বা করাইয়া মাদৃশ ছিদ্রান্বেষীকে শিক্ষা দিয়াছেন ও দিতেছেন।

প্রতিকূলচিন্তায় প্রাতিকূল্যে মগ্ন হইবার সম্ভাবনা

শ্রীল রূপ-গোস্বামিপাদ বলেন, অনুকূল অনুশীলনই জীবমাত্রের কৃষ্ণসেবা-লাভের একমাত্র উপায়। প্রতিকূল বিষয় হইতে তফাৎ থাকাই শ্রীল রূপপাদের উক্তির উদ্দেশ্য। পরপক্ষ-নিরসন-ব্যাপার অথবা কৃষ্ণভজন-বিরোধী আচার বা শিক্ষা হইতে দূরে থাকা একই কথা ; তবে পরপক্ষ বা ভজনবাধক ইন্দ্রিয়োত্থ জ্ঞানসমূহ স্তব্ধ করিতে গিয়া তাহাতেই মগ্ন হইয়া যাওয়ার উদাহরণও আমাদের ইতিহাস-পুরাণাদিতে অভাব নাই। এইজন্যই তিনি "আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা" ও "প্রাতিকূল্যস্য বিবর্জ্জনম্" প্রভৃতি উপদেশ করিয়াছেন। অদ্য এই মাধবী-তিথিতে এই তিথির সুষ্ঠু সেবকগণের পাদপদ্মে আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, তাঁহারা যেন আমার প্রতি সর্ব্বদাই কৃপাদৃষ্টি রাখেন, যেন আমি ইন্দ্রিয়োত্থ জ্ঞানরূপ পরপক্ষের নিরাস করিতে গিয়া তাহাতেই মগ্ন হইয়া না পড়ি।

অনন্তবাসুদেব-দাস্যই জন্মাষ্টমী-সেবা

অসুরকুল-চূড়ামণি দানবাধিপতি কংস কৃষ্ণবিনাশের জন্য সর্ব্বতোভাবে যুক্তিজাল বা কারাগার সৃষ্টি করিলেও, জ্ঞানমাত্র ভূমিকায় অবস্থিত থাকিয়া কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-সেবার ধ্বংস সাধন করিতে প্রয়াস পাইলেও তাহা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়, ইহাই ঐতিহ্যের দ্বারা প্রমাণিত এবং শাস্ত্রযুক্তিসঙ্গত। অদ্বৈতবাদী জ্ঞানি-সম্প্রদায় কৃষ্ণবিনাশের যত প্রকার বিচার-কারাগারের সৃষ্টি করুন না কেন, তাহাতে কার্ষ্ণ বসুদেব এবং স্বয়ং কৃষ্ণ বাসুদেব আবদ্ধ হন নাই। কৃষ্ণকে তাঁহার শত্রু হইতে রক্ষা করা কার্ষ্ণ বসুদেবের একমাত্র কর্ত্তব্য। ভাগবতের ঐতিহ্য হইতে জানা যায়, বসুদেবের কৃষ্ণরক্ষারূপ সেবার অন্যান্য সেবক ব্যতীত সহস্রফণ অনন্তদেবও সাহায্য করিয়াছিলেন। তাই আমি শ্রীজন্মাষ্টমী-দিবসে শ্রীল অনন্ত বাসুদেবের দাস্য-লাভেচ্ছায় এই মহাপুণ্য-তিথিতে কৃষ্ণকে নন্দালয়ে নির্ব্বিঘ্নে অর্থাৎ কেবলাদ্বৈতবাদের মিথ্যা প্রবঞ্চনা ও হিংসাদ্বেষের হস্ত হইতে নিরাপদে পৌঁছাইয়া দিবার লীলার স্মরণ করিব। ইহা আমার জন্মাষ্টমী-সেবা।

দেবতা ও অসুরের পার্থক্য

যাহারা কৃষ্ণত্ব এবং তাঁহার নিত্য সেব্যত্ব স্বীকার করে না, তাহারাই প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে কৃষ্ণবিনাশচেষ্টাকারী কংস বা তাহার দাস। আমি সুধীসমাজে বিনীত-ভাবে বিচার প্রার্থনা করিয়া নিবেদন করিতেছি যে, তাঁহারা যেন একটু নিরপেক্ষতা

অবলম্বন করিয়া আমার বক্তব্যসমূহের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করেন। ভারতীয় হিন্দুমাত্রই শাস্ত্র, গুরু ও ঈশ্বর বিশ্বাস করিয়া থাকেন। ঐ তিনটী তত্ত্বের বিশ্বাসকেই আস্তিকতা বা দৈব ভাব বলে। উহাতে আস্থা স্থাপন না করা বা তাহাতে সন্দেহ উত্থাপন করা বা উহাদের সম্মানের হানি করাই নাস্তিকতা বা আসুরিক ভাব। সুতরাং দেবাসুরের পার্থক্য আমাদের পক্ষে সহজে অনুমেয় এবং শাস্ত্রজ্ঞ ঐতিহ্য হইতে নির্দ্দেশিত। বিচারে যদি এরূপ প্রমাণ হয় যে, কেবলাদ্বৈতবাদিগণ শাস্ত্র, গুরু ও ভগবান্—এই তিনটী তত্ত্ব অথবা এই তিনটি তত্ত্বের অনুগত তত্ত্বসমূহকে মিথ্যা ও ভ্রমাত্মক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে দেবাসুরের কোন্ শ্রেণীভুক্ত করা প্রয়োজন, সুধী-সমাজ বিচার করিবেন।

কেবলাদ্বৈতবাদিমতে ব্যাস ভ্রান্ত (?)

'শাস্ত্র' বলিতে শাসন-বাক্য যাহাতে আছে তাহাকেই শাস্ত্র বলে। শাসনবাক্য বা উপদেশসমূহ বেদে স্পষ্টভাবে ও বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত আছে বলিয়া বেদই একমাত্র শাস্ত্র অথবা বেদানুগ-বিচার-সম্বলিত যাহা, তাহাকেও শাস্ত্র বলে। ইহাতে আস্তিক হিন্দু-সম্প্রদায়ের মধ্যে মতভেদ লক্ষিত হয় না। বেদের সার ও শিরোভাগের নাম 'বেদান্ত'। ভারতে বহু দর্শনের প্রচলন থাকিলেও আস্তিক্যসমাজে বেদান্ত-দর্শনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দর্শন বলিয়া স্বীকৃত হওয়ায় বেদান্তদর্শনের উপর ধার্ম্মিক আচার্য্যগণ সকলেই শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। কেবলাদ্বৈতবাদগুরু আচার্য্য শঙ্কর শারীরক-ভাষ্য প্রণয়ন করিতে গিয়া শারীরক-সূত্রের যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করেন নাই। পরন্তু তিনি সূত্রের ভ্রম প্রদর্শন করাইয়া ব্যাসকে ভ্রান্ত বলিয়া প্রকারান্তরে বেদ ও বেদান্তকে বা শাস্ত্রসমূহকেও ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। এই সম্বন্ধে পূর্ব্বে বহু বিচার প্রদর্শিত হওয়ায় প্রবন্ধ বিস্তারের ভয়ে তাহাদের পুনরুল্লেখ করিলাম না।

কেবলাদ্বৈতবাদী শাস্ত্র-সম্মানের হানিকারক বলিয়া নাস্তিক

কেবলাদ্বৈতবাদের বিচার বিশ্লেষণ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহারা বেদান্তের মূল উদ্দেশ্যের বিশেষ হানি করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। বেদান্ত ভগবানের নিত্য স্বরূপ ও নিত্য শরীর স্বীকার করেন বলিয়াই উহার অন্য নাম শারীরক। মায়াবাদাশ্রয়ী বা কেবলাদ্বৈতবাদী উক্ত নামের সার্থকতা বিনাশের জন্য বহুল যত্ন করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে "বেদ মানিব কেন" এই প্রকার বেদের প্রতি সন্দেহ উত্থাপন করিতেও দেখা যায়। যেস্থলে এপ্রকার বেদ-সম্বন্ধে সন্দেহ উত্থাপিত হইতেছে, সে-ক্ষেত্রে বেদসম্মানের হানি হওয়ায় আমরা তথায় আস্তিক্যের গন্ধও আছে বলিয়া স্বীকার করিতে নারাজ। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, "বেদরূপ-নিঃশ্রেয়স্ মধ্যে

কখনও তারতম্য থাকিতে পারে না, উহা নির্ব্বিশেষ হইতে বাধ্য, উহা অদ্বৈততত্ত্বই হইয়া থাকে। দ্বৈততত্ত্ব তারতম্যরহিত হইতে পারে না। সুতরাং তাহা নিঃশ্রেয়স্ হইবে কিরূপে ?" বেদের উক্ত প্রকার অভিধান স্বীকার করিলে তাহা 'সোণার পাথরবাটি'র মত একদিকে বেদ উপদেশক বলিয়া সবিশেষ, অন্যদিকে নির্ব্বিশেষ বলিয়া শূন্য-জ্ঞাপক। বেদকে এইপ্রকার শূন্যজাতীয় অভাবপোষক সত্তাহীন জ্ঞান করিলে তাহার মান থাকে কি ? বেদ শাসন করেন ; যাঁহাতে শাসনবাক্যসমূহ সন্নিবেশিত আছে তিনিই শাস্ত্র, তিনিই সবিশেষ তত্ত্ব, তিনিই গুরু বা উপদেশক। শাস্ত্রই গুরুরূপে মঙ্গলবিধান করেন। শাসকের নির্ব্বিশেষত্ব হইলে শাস্ত্রের হানি হইয়া থাকে এবং শাসনযোগ্য বস্তুরও অভাব ঘটিলে উহার প্রয়োজনীয়তা থাকে না। কেবলাদ্বৈতবাদী আত্মঘাতী হইতে পারে, শাস্ত্র কখনও আত্মঘাতী হইতে পারেন না। নির্ব্বিশেষত্বই যদি বেদের মত হয়, তবে বেদ স্বয়ং নির্ব্বিশেষ হইয়া নিজ অস্তিত্ব-শূন্যতার পরিচয় দিবে। আমি সম্মুখে দাঁড়াইয়া সভামধ্যে বলিতেছি—'আমি নাই'। ইহাতে আমার উন্মত্ততাই জ্ঞাপিত হয়। বেদ কখনও তাঁহার নিত্য সত্তা বর্ত্তমান থাকাতে তাহার অস্বীকার করিতে পারেন না। যদি তর্কস্থলে সেরূপ করা প্রকাশ পায় তাহা হইলে জানিতে হইবে, উহা মায়াবাদীর কল্পিত বেদ মাত্র— ভগবদুক্ত অপৌরুষেয় বেদ নহে। উহাতে তাহাদের স্বকপোলকল্পিত বাক্যসমূহের মিথ্যা উদ্গার মাত্র গ্রথিত আছে বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে।

আচার্য্য শঙ্করের গুরুত্ব-বিচার

আচার্য্য শঙ্করের অজ্ঞানবোধিনী-গ্রন্থে গুরুর স্বরূপ বলিতে গিয়া যাহা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে কোন ব্যক্তিরই শিষ্য হইবার অভিলাষ থাকে না, বা তাদৃশ গুরুকরণ স্বীকার করিলেও তাদৃশ গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস থাকা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আচার্য্য-শঙ্কর উক্ত গ্রন্থে যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা সুধী পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিম্নে উদ্ধার করিলাম। ইহা পাঠ করিলেই নিরপেক্ষ পাঠকবর্গ আপনারা কেবলাদ্বৈতবাদের গলদ কোথায় বুঝিতে পারিবেন। উক্তি যথা :—"তস্মাদেবাচার্য্যাদ্ ব্রহ্মাত্মজ্ঞানাবাপ্তিঃ কথমাচার্য্যোঽজ্ঞো বা স্যাৎ। যদ্যজ্ঞো ন ব্রহ্মাত্মৈকত্বজ্ঞানমুপদেষ্টুং শক্নুয়াৎ। অথ বিজ্ঞঃ তদা ব্রহ্মাত্মজ্ঞানেন ব্রহ্মৈব ভবতি। ততঃ অজ্ঞানং তৎকার্য্যদেহদ্বয়নিবৃত্তেঃ। তদা দেহাদিসংবন্ধাভাবাৎ তু ন শিষ্যাদিশাসনং হ্যুপপদ্যতে। **অথানবগতো ব্রহ্মাত্মভাবং স্যাৎ।** তস্মাদ্দেহাদিসংবন্ধোঽঙ্গীকর্ত্তব্যোঽভ্যুপেতব্যঃ। তদা জ্ঞানাদজ্ঞানতত্তৎকার্য্য-নিবৃত্তিঃ তস্মাদাচার্য্যাধীনং জ্ঞানমপেক্ষতে ইত্যত্র নায়ং দোষঃ" অর্থাৎ—"জিজ্ঞাস্য এই যে, আচার্য্য অজ্ঞ কি বিজ্ঞ হইবেন ? যদি তিনি অজ্ঞ হন, ব্রহ্মাত্মকত্ব জ্ঞানোপদেশ করিতে (অজ্ঞতাপ্রযুক্ত) অক্ষম। আর যদি তিনি বিজ্ঞ হন, তবে ব্রহ্মাত্মজ্ঞানের দ্বারা তিনিই ব্রহ্ম হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহার অজ্ঞান ও তৎকার্য্য স্থূল-সূক্ষ্ম-শরীরদ্বয় নিবৃত্ত হইয়াছে

এবং তিনি (ব্রহ্মজ্ঞানহেতু) দেহাদিসম্বন্ধশূন্য হওয়ায় শিষ্যাদিকে শাসন বা উপদেশ দিতে অক্ষম। **অতএব 'অনবগতঃ' অর্থাৎ অনবগত (মূর্খ বা ব্রহ্মজ্ঞানশূন্য) ব্যক্তিই শিষ্যকে ব্রহ্মাত্মভাব উপদেশ করিবেন।** উক্তপ্রকার আচার্য্যেরই (অজ্ঞানোত্থ) শরীরাদি সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হইবে। তাদৃশ আচার্য্যের নিকটে উপদেশ লাভ করিয়া অজ্ঞান ও অজ্ঞানকার্য্যের নিবৃত্তি করিতে হইবে। ইহা হইতেই জানা যায়, জ্ঞানরূপ মোক্ষলাভ আচার্য্যাধীন এবং আচার্য্য-শিক্ষাসাপেক্ষ। জ্ঞান উক্তপ্রকার গুরুসাপেক্ষ ও তদধীন হওয়ায় দোষ নাই।" ইহাই শঙ্করের উক্তি।

গুরুত্বে ভ্রান্তিই মহাদোষ

উক্ত উদ্ধৃত বচনসমূহ হইতে 'অথানবগতো ব্রহ্মাত্মভাবং স্যাৎ' কথাদ্বারা শঙ্কর গুরুর স্বরূপ যে-প্রকার অনবগত, মূর্খতাযুক্ত ও অজ্ঞান-শাসিত বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তাহাতে কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি নিজ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় তাদৃশ গুরুর আশ্রয়গ্রহণ করিবেন না। যে সম্প্রদায়ের গুরুর প্রতি এবম্প্রকার ভক্তিশ্রদ্ধা যে, তাঁহাকে বদ্ধ বলিয়া মানিতেই হইবে, তাদৃশ সম্প্রদায়কে ভারতীয় হিন্দুসমাজ আস্তিক বলিবেন কি? বেদসার-ভাষ্য শ্রীমদ্ ভাগবত 'অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানাঃ' প্রভৃতি শ্লোকে আমাদিগকে ঐপ্রকার গুরুব্রুবের আশ্রয়-গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। কেবলাদ্বৈতবাদী মোক্ষ-কামনায় অনবগত অজ্ঞ গুরুর চরণাশ্রয় করিতে গিয়া নিজেও অজ্ঞতার পরিচয় দিয়া অন্ধকূপে পতিত হইয়া মূলেই ভুল করিয়া সর্ব্বতোভাবে দোষ কয়িয়াছেন।

ভ্রান্ত গুরুর শিক্ষাও ভ্রমপূর্ণ। সুতরাং তাদৃশ গুরুমুখ-নিঃসৃত 'তত্ত্বমসি,' 'অহং ব্রহ্মাস্মি', সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম', বা 'সোহহম্' প্রভৃতি বাক্যসমূহের ভ্রমপূর্ণা ধারণাই সরল-হৃদয় মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী শিষ্যের অন্তঃকরণে প্রকাশিতা হইবে। শঙ্করদেব 'একমেবাদ্বিতীয়ম্ বাক্যের কদর্থ করিতে গিয়া বাধ্য হইয়া গুরুতত্ত্বে ঐপ্রকার ভ্রান্তি প্রবেশ করাইয়াছেন। তাহাতে আস্তিক সম্প্রদায় তাঁহার বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করিতে পারিতেছেন না।

কেবলাদ্বৈতবাদীর ঈশ্বরতত্ত্ব জীবতত্ত্বেরই অন্তর্ভুক্ত

কেবলাদ্বৈতবাদী ভগবৎ-তত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা আলোচনা করেন, তাহা অতীব অনুপাদেয় ও হেয় হইতেছে। ব্রহ্মের সগুণাবস্থানকেই ঈশ্বর বা ভগবান্ বলিয়া থাকেন। তাহাতে ঈশ্বর জীব-কোটির মধ্যেই পরিগণিত হন, ব্রহ্মের পরিচ্ছিন্নাবস্থা বা প্রতিবিম্বাবস্থাকেই জীব ও ঈশ্বর বলিয়া থাকেন। পরিচ্ছেদের বৃহদংশের নাম ঈশ্বর ও ক্ষুদ্রাংশের নাম জীব। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ঈশ্বরও জীব, জীবও জীব। জীব-শ্রেণীভুক্ত ঈশ্বরত্বের উপাসনা কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি করিয়া থাকেন? আস্তিক সমাজ ঈশ্বরত্ব বা ভগবত্তাকে জীবকোটির ভিতরে মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহেন। তাহা ছাড়া উক্তপ্রকার ঈশ্বরের

ঈশ্বরত্বেরও চরমে হানি হওয়ায় নিত্যত্বের প্রতিযোগী হইতেছে। আমরা এতৎপ্রসঙ্গের বিস্তারিত আলোচনা পরে করিব।

শাস্ত্র, গুরু ও ভগবান্ না মানিয়া মায়াবাদী নাস্তিক

এখন দেখা যাইতেছে যে শাস্ত্র, গুরু ও ভগবান্ এই তিনটী তত্ত্বে কেবলাদ্বৈতসেবী মায়াবাদিগণ কপটতামূলে বিশ্বাস প্রদর্শন করিলেও বস্তুতঃ তাঁহারা উক্ত বিশ্বাস হইতে সম্পূর্ণরূপে দূরে অবস্থান করিতেছেন। বৃক্ষের কোন শাখায় অবস্থান করিয়া সেই শাখার মূলদেশ ছেদন করিলে ভূপতিত হইয়া জীবন নাশই হইয়া থাকে। বিচার-ক্ষেত্রে শাস্ত্র, গুরু ও ভগবানের উপর নির্ভর করিতে গিয়া তাঁহাদের মূল ছেদন করতঃ কেবলাদ্বৈতবাদী পতিত হইয়া নাস্তিক হইয়াছেন। আস্তিক-সম্প্রদায় উহা হইতে সম্পূর্ণভাবে পৃথক্ আছেন।

নির্ব্বিশেষবাদীর বসুদেবদাস্য ব্যতীত গতি নাই

অদ্বৈত মানিতে গিয়া জীব, ব্রহ্ম ও বিশ্বের বিচারে জীব-বিশ্বে যে মিথ্যাত্বের আরোপ করা হইয়াছে, তাহাতে কেবলাদ্বৈতবাদীর কৃষ্ণবিরোধই মূল-ব্যাধিরূপে প্রকাশ পায়। মিথ্যাত্ব স্থাপন করিতে গিয়া এবং ব্রহ্মের নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ-স্বরূপ বর্ণন করিতে গিয়া যে-প্রকার ভ্রমে পতিত হইয়াছেন তাহা হইতে উদ্ধারলাভের উপায় **অনবগত** আচার্য্যের আশ্রয় নহে, পরন্তু কার্ষ্ণতত্ত্ব বসুদেবের পদাঙ্কানুসরণ একমাত্র পথ।

প্রতিবিম্ববাদের হেয়তা

প্রতিবিম্ববাদী বলিয়া থাকেন, প্রতিবিম্ব যে-প্রকার মিথ্যা সেই প্রকার ভেদ ও বিশেষাদিবশতঃ সুখ-দুঃখানুভূতি মিথ্যা; কারণ, জলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রের কম্পন ও জল-কম্পনে চন্দ্রের বহুত্ব প্রতিভাত হইলেও চন্দ্র নিশ্চল ও এক। এবম্প্রকার কেবলাদ্বৈতবাদীর উদাহরণ দ্বারা ব্রহ্মৈকত্ব স্থাপন ও জীব-বিশ্বের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন হয় না। কারণ, উক্ত উদাহরণটী বিশ্লেষণ করিলে তাহার সত্যতা বুঝা যাইতে পারে। ব্যাপক বস্তু, নিরাকার বস্তু, অপরিসীম বস্তুর প্রতিবিম্ব সম্ভব নহে। আকাশের যে-প্রকার প্রতিবিম্ব হয় না, কিন্তু আকাশস্থ পরিচ্ছিন্ন চন্দ্র-সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কের প্রতিবিম্বাবস্থা লক্ষ্য করা যায়; সুতরাং অপরিচ্ছিন্ন ব্যাপক অসীম ব্রহ্মের প্রতিবিম্বাবস্থা অসম্ভব হইতেছে। এতদ্ব্যতীত পরিচ্ছিন্ন জ্যোতিষ্ক-পদার্থ ও স্বচ্ছ জল-পদার্থ উভয়ের দর্শন-সংযোগত্ব-হেতু একই বিশ্বভূত হওয়ায় প্রতিবিম্ব সম্ভব হইয়াছে। সেইরূপ অজ্ঞান যদি স্বচ্ছ জলস্থানীয় বলিয়া কল্পনা করা যায়, তবে বিম্বস্বরূপ ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব জগৎকে এবং জীবকে চক্ষু-সংযোগ-স্থানে ধরিলে অজ্ঞান, ব্রহ্ম ও জীব—এই তিনটী তত্ত্ব বিশ্বরূপ একটী তত্ত্বেতে

পরিণত হয়। উক্ত তিনটীর কোনটীকে বাদ দিলে প্রতিবিম্বের সম্ভাবনা নাই। কেবলা-দ্বৈতবাদিগণ অজ্ঞান ও ব্রহ্ম উভয়ের নিত্যতা স্বীকার করিয়া ব্রহ্মস্বরূপধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত আধেয়স্বরূপ অজ্ঞান-প্রসূত জীব ও বিশ্বকে স্বীকার করিবেন কি? তাহা ছাড়া বিম্ব—নিত্য চেতন ব্রহ্ম, প্রতিবিম্ব—মিথ্যা, অচেতন জীব ও বিশ্ব। জীব ও বিশ্ব প্রতিবিম্ব-স্থানীয় বিধায় উভয়ই অজ্ঞান অর্থাৎ অচেতন, জড় ও মিথ্যা। বিশ্বের জড়ত্ব প্রত্যক্ষসিদ্ধ কিন্তু জীবের জড়ত্ব প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে, বরং চেতনত্বই প্রত্যক্ষসিদ্ধ। জীবরূপ অচেতনের চক্ষু-সংযোগের দ্বারা দৃশ্যত্বের অসদ্ভাব-হেতু প্রতিবিম্বের প্রতিযোগী হইতেছে। মিথ্যাভূত জীব অজ্ঞানপ্রসূত বিধায় অচেতন বা জড় হইয়া পড়িতেছে।

জীবত্বে জড়ত্ব হেতু ভোক্তৃত্ব কোথায়

ব্রহ্ম অজ্ঞানে প্রতিবিম্বিত হইয়া জীবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। এই প্রতিবিম্ব জীব বদ্ধা-বস্থাতে সুখ-দুঃখের ভোক্তা হইতেছে। ব্রহ্ম কিন্তু সুখ-দুঃখের অতীত। জীব যদি স্বরূপতঃ অর্থাৎ মুক্তাবস্থাতে ব্রহ্মই হন, তাহা হইলে দেখা যাইতেছে প্রতিবিম্বিতাংশ অজ্ঞানরূপ অচেতন জড়ই সুখ-দুঃখের ভোগ করিয়া থাকে। জড়বস্তু সুখ-দুঃখের ভোক্তা, ইহা প্রত্যক্ষ-জ্ঞানেরও বহির্ভূত বলিয়া অযৌক্তিক বিধায় হাস্যাস্পদ সিদ্ধান্ত। জীবের সুখদুঃখ-ভোগ দেখা যাইতেছে—কেহ রাজা, কেহ প্রজা, কেহ পণ্ডিত, কেহ মূর্খ, কেহ কেহ সবল, কেহ দুর্ব্বল এইরূপ দেখা যাইতেছে এবং চেতনাযুক্ত জীবের বিভিন্নতা, বৈশিষ্ট্য ও দ্রষ্টৃত্ব ও শ্রোতৃত্ব প্রভৃতি সর্ব্বতোভাবে প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে। সুখ-দুঃখের অনুভূতি, উচ্চাবচের জ্ঞান, ভেদ-বৈশিষ্ট্যের ধারণা, বস্তু ও শব্দের দর্শন শ্রবণ প্রভৃতি চেতন জীবেতেই লক্ষ্য করা যায়। অচেতন পদার্থ যথা মৃত্তিকা, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ প্রভৃতি জড় বস্তুতে উক্ত চেতনের অনুভূত ব্যাপারসমূহ লক্ষ্য করা যায় না সুতরাং প্রতিবিম্ব বিশ্বের অচেতনত্ব হইলেও জীব তৎশ্রেণীভুক্ত হইয়া অচেতন হইবে না।

পারমার্থিকও মিথ্যা

কেবলাদ্বৈতবাদী পরমার্থবিচারে পরাঙ্মুখ হইয়া বলেন, বিচারমাত্রই কেবল ব্যবহারিক। শাস্ত্র স্বয়ং ব্যবহারিক, তাহার উক্তিও ব্যবহারিক, ব্যবহারিকতা বাদ দিলে উক্ত মতবাদিগণের আর কিছুই বলিবার থাকে না বা যাহা থাকে বলিয়া কল্পিত হয়, তাহাতে ব্যবহারিক পরমার্থত্বই প্রতিপন্ন হয়। ব্রহ্মে ব্যবহারিক যুক্তিতে যে পারমার্থিকতা প্রদর্শিত হয়, তাহাতে সত্য ব্রহ্মও মিথ্যা হওয়ায় সাধনাসিদ্ধি হইতেছে।

জীব ব্রহ্মের সাদৃশ্য—ঐক্য নহে

ব্রহ্ম সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলেই ব্যবহারিকভাবে বলিতে হয়; তবে তিনি অপ্রমেয়, অবিতর্ক্য, আর জীবকেও ব্যবহারিকভাবে বলিতে হয় প্রমেয়, পরিচ্ছিন্ন ও বাক্য-মনের

গোচরীভূত। সুতরাং ব্যবহারিক হিসাবেই উক্ত মতবাদিগণের বিচার স্বীকৃত হইলেও জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য প্রতিপন্ন হয় না। ব্যবহারিক হিসাবে যাহা পৃথক্ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তাহা তাদৃশ পারমার্থিক হিসাবেও পৃথক্ না হইবার সঙ্গত কারণ ব্যবহারিকভাবে কিছুই লক্ষিত হইতেছে না। সুতরাং জীব-ব্রহ্মের ঐক্য কোন প্রকারেই সাধিত হয় না। 'অহং ব্রহ্মাস্মি' বাক্যের দ্বারা ঐক্য প্রতিপাদিত হয় না, কারণ 'নীলোৎপল-নয়ন' বা 'চন্দ্রবদন' বলিলে নয়নের নীলোৎপলতা বা বদনের চন্দ্রত্ব না বুঝাইয়া সাদৃশ্যই প্রমাণিত হইতেছে। উপমানের অঙ্গীকার না করিয়া কেবল উপমেয়ত্ব মাত্র স্বীকার করায় যুক্তির প্রাখর্য্য হয় না। 'অহং ব্রহ্মাস্মি' মন্ত্রেতে ব্রহ্ম-সাদৃশ্যই উপমিত হয়। তাহাতে অহং পদের লোপ করিয়া কেবল ব্রহ্মের স্থাপ্যত্ব-বিচার সঙ্গত নহে।

ব্রহ্মের ব্যবহারিকতায় বাক্য ব্যাঘাত

ব্যবহারিক শব্দের অর্থ ত্রিকালসত্তাশূন্যত্ব। তাহা হইলে পারমার্থিক শব্দে ত্রিকাল-সত্তাযুক্তত্বই বুঝা যাইতেছে। ব্রহ্মেতে যদি ব্যবহারিক ধর্ম্ম অর্থাৎ ত্রিকালসত্তাশূন্যত্ব আছে এরূপ বলা হয়, তাহা হইলে নির্ধর্ম্মকব্রহ্মে ধর্ম্মারোপ হয় এবং তাহাতে বাক্য-ব্যাঘাতও জন্মাইতেছে। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কালত্রয়ে অবর্ত্তমান বস্তু 'আছে'—একথা বলিলে কালান্তর্গত ব্যাপারই ঘুরিয়া ফিরিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। কোনও বস্তু 'আছে' বা 'নাই' বলিতে গেলেই কালান্তর্গতত্ব বুঝায়। তাহাতে পারমার্থিক শব্দের কালান্তর্গতত্ব প্রকাশ পায়।

অজ্ঞান বা অবিদ্যা

ব্যবহারিক বিচারের মধ্যে যে মিথ্যাত্বের কল্পনা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মূলে অজ্ঞান বা অবিদ্যাই বর্ত্তমান। 'অজ্ঞান' বলিতে কেবলাদ্বৈতবাদিগণ 'সদসদ্বিলক্ষণ অনির্ব্বচনীয়' তত্ত্বকেই নিরূপণ করেন। আচার্য্য শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন' "অবস্তু অনির্ব্বাচ্যা অবিদ্যা অস্তি" অর্থাৎ অজ্ঞানরূপ অবিদ্যা অবস্তু অর্থাৎ মিথ্যা। উহা সৎ ও অসৎ হইতে বিলক্ষণ বিধায় অনির্ব্বচনীয় কাল্পনিক তত্ত্বমাত্র। ব্রহ্ম এক, নির্ধর্ম্মক, নির্ব্বিশেষ ও অদ্বিতীয় বস্তু।

অবিদ্যার পারমার্থিক সত্যতা

শঙ্কর বলেন অবিদ্যা-হেতুই আত্মার বন্ধন হয়। আত্মা ও ব্রহ্ম একই বস্তু। "স আত্মা কীদৃশঃ ?"—প্রশ্নের উত্তরে শঙ্কর বলেন, "চিৎসদানন্দাদ্বিতীয়ম্ অখণ্ডং অচলং অজং অক্রিয়-কূটস্থানন্তং স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপং স্বপ্রকাশং ব্রহ্ম স আত্মা" অর্থাৎ সেই আত্মা চিৎস্বরূপ, সদানন্দস্বরূপ, অদ্বিতীয়, অখণ্ড, অচল ও অজ অর্থাৎ জন্মরহিত, অক্রিয়,

কূটস্থ অর্থাৎ বিকাররহিত, অনন্ত, স্বয়ং জ্যোতিঃ ও স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম। এবম্বিধ ব্রহ্মস্বরূপ আত্মা যদি "সাবিদ্যা তৎকৃতে বন্ধঃ" এবম্বিধ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে আত্মার নিষ্কৃতি কোথায় ?

বিষয়-আশ্রয়-বিচারে শঙ্কর অন্যত্র বলিয়াছেন "স্বাশ্রয়া স্ববিষয়া * * * অবিদ্যা" অর্থাৎ আত্মাই বিষয়, অবিদ্যা তাহার আশ্রয়। অবিদ্যার এবম্প্রকার আশ্রয়ত্বহেতু চিৎ-সদানন্দ আত্মা বা ব্রহ্ম তৎকর্ত্তৃক আবৃত নহে। অবিদ্যার উক্ত ধর্ম্মত্বহেতু আত্মার উহা অনুভাব্য হইতেছে। যদি 'স্বাশ্রয়া' হেতু 'সানুভাবগম্যা' হয়, তবে ব্যবহারিক বিচারে অনুভবসিদ্ধ বস্তুর অভাব-প্রতিযোগিত্বই সিদ্ধ হইতেছে। সুতরাং অবিদ্যা মিথ্যা হইলে তদ্ধর্ম্মোথ ব্যাপারসমূহের ত্রিকালসত্তাশূন্যত্বের প্রতিযোগী হইয়া মিথ্যাবস্তুই সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়।

তাহা ছাড়া কেবলাদ্বৈতবাদগুরু একটা উদাহরণ দিয়া বলিয়াছেন—অবিদ্যা ব্রহ্মেতেই অবস্থান করিয়া ব্রহ্মকে আবরণ করিতেছে, যথা "যথা গর্ভান্ধকারেণ আগারগর্ভম্ আচ্ছাদ্যতে তথা চিদ্রূপং কূটস্থং আত্মানং স্বস্বরূপং আচ্ছাদ্যমিব বিক্ষিপতে" অর্থাৎ গৃহ-মধ্যস্থ অন্ধকার যে-প্রকার গৃহকেই আচ্ছন্ন করে, সেপ্রকার ব্রহ্মাশ্রিত অবিদ্যা ব্রহ্মকে আচ্ছন্ন করে। এ-প্রকার উদাহরণদ্বারা ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব প্রমাণিত হয় কি ? ব্রহ্মান্তর্গত অবিদ্যা বা জ্ঞানান্তর্গত অজ্ঞান ব্রহ্ম বা জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিবার যোগ্যতা রাখিলে এবং অজ্ঞান ও অবিদ্যাকে ব্রহ্মের আশ্রয়ত্ব স্বীকার করিলে উহা ব্রহ্মের ন্যায় ত্রিকালসত্য-স্বরূপ পারমার্থিক হইয়া পড়ে।

অবিদ্যার অসঙ্গত অভিধান-হেতু মিথ্যাত্বের হানি

মায়াবাদীর পূর্ব্বোক্ত অবিদ্যা-সংজ্ঞার বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করিলে আমরা কতিপয় দোষ লক্ষ্য করিতে পারি। অবিদ্যা বা প্রপঞ্চ (১) সদ্‌বিলক্ষন, (২) অসদ্-বিলক্ষণ ও (৩) অনির্ব্বচনীয় বলা হইয়াছে। প্রত্যেক অভিধানটী পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে বিচার করা যাইতেছে যথা :—

(১) প্রপঞ্চ বা অবিদ্যাকে সদ্‌বিলক্ষণত্ব বা সংসম্পৃক্তত্ব সিদ্ধান্ত করিলেও মিথ্যা বলা যায় না, কারণ প্রত্যক্ষের দ্বারাই বহু বস্তুর সত্তা উপলব্ধি করা যায়, যথা তন্মধ্যে বৃক্ষপ্রস্তরাদি। সুতরাং উহারা সদ্বস্তু। সদ্বস্তুর প্রকাশ্য বৈশিষ্ট্য ও ভেদ লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং বৃক্ষের সদ্‌বিবিক্তত্ব বা বিলক্ষণত্ব প্রস্তরের মিথ্যাত্বজ্ঞাপক নহে। এবম্প্রকার এক সদ্বস্তু অন্য সদ্বস্তু বিলক্ষণ স্বতঃসিদ্ধ। সুতরাং সদ্‌বিলক্ষণত্ব মিথ্যাত্বের অনুমাপক হইলে সিদ্ধসাধনতা (দোষ) হইবে।

(২) অসদ্‌বিলক্ষণত্ব-হেতুও মিথ্যাত্ব প্রমাপক নহে, কারণ অসদ্‌বিলক্ষণত্বে আমাদের অত্যন্তাভাবত্ব প্রকাশ করে না ; ইহা মায়াবাদিগণেরই সিদ্ধান্ত। সুতরাং প্রপঞ্চকে অত্যন্ত অসদ্ বলা যায় না। সুতরাং তাহাতে অসদ্ প্রতিযোগিত্ব দেখা যাইতেছে।

(৩) অনির্ব্বচনীয় বলিয়া প্রপঞ্চ মিথ্যা হইতে পারে না। জগৎকে যাঁহারা সত্য বলিয়া স্বীকার করেন তাঁহারা উহা অনির্ব্বচনীয় এরূপ সংজ্ঞা দেন না, কারণ উক্ত বিশেষণের অপ্রসিদ্ধি উদ্ভব দোষ হইয়া থাকে। মায়াবাদীর উদ্দিষ্ট মিথ্যাত্ব যদি 'অনির্ব্বচনীয়' সংজ্ঞায় প্রকাশিত হইবার যোগ্যতা লাভ করে, তবে উক্ত 'অনির্ব্বচনীয়' বিশেষণ পদ দ্বারাই বিশিষ্টতা লাভ করায় 'অনির্ব্বচনীয়' শব্দের নিরর্থকতা সিদ্ধ হইতেছে। সুতরাং 'অনির্ব্বচনীয়' শব্দের দ্বারা যাহা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা মায়াবাদ-হৃদয়ে জাগরিত হইতেছে, তাহা অনিচ্ছাসত্ত্বেও উক্ত শব্দের দ্বারাই বাচ্য হইয়া পড়ায় জগতের সত্যতা প্রতিপন্ন হইতেছে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, অবিদ্যার যাহা সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে উহাই অবিদ্যার স্বরূপমিথ্যাত্ব-বিনাশের কারণ।

সদ্ভিন্নে ও অসদ্ভিন্নে অনির্ব্বচনীয়ত্বে গৌরব

পুনশ্চ যদি সৎ ও অসদ্‌ভিন্নত্বই অনির্ব্বচনীয় হয় অর্থাৎ অনির্ব্বচনীয়ত্বকে পৃথগ্‌ভাবে মিথ্যাত্বের হেতু বলা না হয়, তাহা হইলে মাত্র অসদ্‌ভেদ বলিলে যাহা লক্ষ্য করে তাহাতে অনির্ব্বাচ্যত্ব স্বীকৃত হইলে ব্রহ্মকেও মিথ্যা বস্তুর ন্যায় অনির্ব্বাচ্য বলিতে হয়। এই প্রকার ব্রহ্মে অনির্ব্বাচ্যত্বের আপত্তি হওয়ায় সদ্‌ভিন্ন বলা হইয়াছে; কিন্তু নির্ধর্ম্মক ব্রহ্মে যদি **অসদ্‌ভেদরূপ** অভাবাত্মক ধর্ম্ম না থাকে, তবে সদ্‌ভেদ বলিবারও কোন আবশ্যকতা না থাকায় গৌরব হইতেছে।

জ্ঞান-নিবর্ত্ত্যত্ব মিথ্যাত্ব নহে

ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞান-নিবর্ত্ত্য মিথ্যা প্রপঞ্চ। সুতরাং জ্ঞান-নিবর্ত্ত্যত্বই মিথ্যাত্ব, ইহা সঙ্গত নহে, কারণ বাল্যের জ্ঞান যৌবনজ্ঞানাপ্তিতে নিবৃত্ত হয়। ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত, অনুমান ও অনুভবসিদ্ধ। বাল্যজ্ঞানের নিবর্ত্তন হেতু উহার মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন হয় না; কারণ নিবর্ত্তন প্রতিযোগিত্বহেতু সত্ত্বের প্রমাণক হইতেছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্ব সত্ত্বের অবিরোধী হইয়া অর্থান্তরতা প্রকাশ করিতেছে অর্থাৎ "জ্ঞান-নিবর্ত্ত্যত্ব" শব্দের দ্বারা যাহা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা কেবলাদ্বৈতবাদিগণের হৃদয়ে প্রকাশিত ছিল, তাহা প্রকাশিত না হইয়া বিপরীত ভাব প্রকাশিত হওয়ায় অর্থান্তর হইয়া সৎ-সম্প্রদায়ের পরিপোষক হইতেছে।

নির্ধর্ম্মকত্বে বাক্য-ব্যাঘাত

"ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা" বলিতে গেলে ব্রহ্ম সৎ এবং তাঁহার অভাব জগৎ মিথ্যা এইরূপ বুঝায়। কিন্তু সত্তার অভাবকেই মিথ্যা বলা যায় না; কারণ, নির্ধর্ম্মক

ব্রহ্মে সত্তারূপ ধর্ম্মের অভাব দেখা যায়। তাহাতে ব্রহ্মও মিথ্যা হইয়া পড়ে। যদি বলা যায় ব্রহ্ম নির্ধর্ম্মক বিধায় তাহাতে সত্তার প্রতিযোগিতা নাই, তাহাও অসঙ্গত; কারণ, পক্ষ ব্রহ্মে যদি নির্ধর্ম্মকত্ব-রূপ হেতু থাকে, তাহা হইলে নির্ধর্ম্মকত্ব-রূপ ধর্ম্মের প্রাপ্তি ঘটায় উক্ত শব্দের ব্যাঘাত ঘটিল। আর যদি নির্ধর্ম্মকত্ব-রূপ হেতুটী যদি পক্ষ ব্রহ্মেতে না থাকে, তবে ব্রহ্মে স্বধর্ম্মের প্রাপ্তি হইল। সুতরাং নির্ধর্ম্মকরূপ-হেতু পক্ষে থাকুক আর নাই থাকুক, উভয়ক্ষেত্রেই কেবলাদ্বৈতবাদীর বিপদাপত্তি দেখিয়া ব্রহ্মও ধার্ম্মিক হইয়া পড়িলেন।

নির্ধর্ম্মকহেতু ব্রহ্মের সদ্রূপতার হানি

পুনশ্চ ব্রহ্ম নির্ধর্ম্মকহেতু সদ্রূপত্বও ব্রহ্মে নাই, যদি এরূপ বলা যায়, তাহা হইলে সত্বধর্ম্মেও সত্ত্ব নাই বলিয়া তাহাও সদ্রূপ হইতে পারিবে না। সুতরাং যাহাতে সত্বধর্ম্ম নাই তাহা সদ্রূপ নহে, এরূপ কথাও সঙ্গত নহে। এরূপ নিয়মে সত্বধর্ম্মের ব্যভিচার হয়। তাহা ছাড়া সত্বধর্ম্মে সত্বধর্ম্ম স্বীকার করিলে অর্থাৎ সদ্রূপে সদ্ধর্ম্ম অস্বীকার করিলে আত্মাশ্রয় বা স্বাশ্রয়-দোষ ঘটে। এইরূপ যদি কেবলাদ্বৈতবাদিগণ বিচার তোলেন তাহাও বিচারে যুক্তিসঙ্গত হইবে না। কারণ—বস্তু গুণের দ্বারা ব্যক্ত, গুণ ও তাহার গুণত্বের দ্বারা প্রকাশিত, ইহা অপ্রামাণিক নহে। ধর্ম্মেরও ধর্ম্ম আছে। ধর্ম্মী যে-প্রকার ধর্ম্মের দ্বারা পরিচিত হয়, তদ্রূপ ধর্ম্মও তাহার ধর্ম্মের দ্বারা পরিচিত হয়। ধর্ম্মের ধর্ম্ম-স্বীকারে স্বাশ্রয় বা আত্মাশ্রয় দোষ হয় না। প্রমাণের অভাব হেতুই স্বাশ্রয় একটী দোষ। কিন্তু প্রামাণিক হইলে উহা দোষ নহে। দেখা যাইতেছে "সত্বং সৎ" বলিলে সত্বই সৎ বুঝায়। সুতরাং সতের ধর্ম্ম থাকিলে সত্বেরও ধর্ম্ম থাকিবে। উহাতে স্বাশ্রয় দোষ হইতে পারে না। বরং সত্বেও সত্বধর্ম্ম আছে—ইহাই প্রমাণিত হয়। সত্বধর্ম্মই সৎ। যদি সত্বধর্ম্ম না থাকে তাহা হইলে 'সৎ'ও নাই। আধার যেরূপ আধেয় লইয়াই হয় এবং আধেয়ও আধেয়তা-শূন্য নহে; আধেয়তা নাই বলিলে আধারেরও অস্তিত্ব হানি হইবে। ইহা ন্যায়সিদ্ধ ও স্বাশ্রয়-দোষ-রহিত। আধেয়তা না থাকিলে আধেয় এবং আধেয় না থাকিলে আধার থাকিবে—এরূপ বলা কেবল বাগাড়ম্বর বিতণ্ডা মাত্র। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ব্রহ্ম নির্ধর্ম্মকহেতু তাহাতে সত্বধর্ম্ম নাই ও সত্বধর্ম্ম না থাকায় ব্রহ্ম 'সদ্রূপ'ও হইলেন না।

প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব সত্য কি মিথ্যা?

কেবলাদ্বৈতবাদিগণ প্রপঞ্চকে মিথ্যা বলিয়া থাকেন, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে; কিন্তু ঐ মিথ্যাত্ব সত্য কি মিথ্যা? এরূপ প্রশ্ন করিলে তাহারা কোনও কূলেই দাঁড়াইতে পারেন না। কারণ দেখা যায়, উভয় ক্ষেত্রেই নিতান্ত অসঙ্গত বিধায় মিথ্যাত্ব বজায়

থাকে না। কারণ মিথ্যাত্বকে সত্য বলিলে ব্রহ্মের অদ্বয়ত্বের হানি হয়। মায়াবাদিগণ বলেন কেবলমাত্র ব্রহ্মই সত্য, আর সব মিথ্যা। সুতরাং মিথ্যাত্ব যদি সত্য হয়, তবে সত্য দুইটী হইয়া পড়ায় ব্রহ্মের কেবলতার হানি হয় এবং প্রপঞ্চ ব্রহ্মের তুল্য অর্থাৎ সমান হইয়া পড়ে। সুতরাং উক্ত মতে মিথ্যাত্বটী সত্য বলা যায় না। আর যদি মিথ্যাত্বকে মিথ্যা বলা যায়, তাহাও সঙ্গত হয় না। কারণ যাহার মিথ্যাত্বটী মিথ্যা তাহা সত্যই হইবে। সুতরাং মিথ্যাত্ব সত্যই হউক্ আর মিথ্যাই হউক্, প্রপঞ্চ সত্যই হইতেছে।

কেবলাদ্বৈতবাদের সহস্র গুহ্যত্ব

এই প্রকার কেবলাদ্বৈতবাদের ব্যবহারিকতা ও পারমার্থিকতা, মিথ্যাত্ব ও সত্ব লইয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিলে দেখা যায়—উহার যুক্তির যতই ইন্দ্রত্ব (বজ্রত্ব বা কাঠিন্য) থাকুক না কেন, সে গুরুত্বের বিজ্ঞতারূপ পত্নীহরণ করায় বৈষ্ণবগণের অভিশাপ-মুক্তিতে সহস্র ছিদ্রত্বরূপ সহস্র গুহ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়া নির্লজ্জের ন্যায় জীবনধারণ করিতেছে। এইপ্রকার উক্তিতে কটাক্ষ করিয়া যদি কেবলাদ্বৈতবাদী বলেন যে, ইন্দ্রত্বের সহস্র গুহ্যত্ব পরিবর্ত্তিত হইয়া সহস্র-লোচনত্ব হইয়াছিল। তাহাতেও বিষ্ণু-বৈষ্ণবের পদাবলেহনই মূল কারণ। পরম-দয়াল কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ অসুরগণকে বিনাশ করিয়াও তাহাদের প্রতি দয়া-পরবশ হইয়া মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। কংস কৃষ্ণবিরোধ করা সত্ত্বেও কৃষ্ণ কৃপা করিয়া তাহাকে সাযুজ্য-মুক্তি দিয়াছিলেন। এই প্রকার মুক্তিতে মায়াবাদি-মতে সহস্র লোচনত্ব থাকিলেও তাহার মূলে সহস্র গুহ্যত্ব থাকায় বৈষ্ণবগণ তাহা অত্যন্ত কুৎসিৎ ও হেয় জ্ঞান করিয়া থুৎকার করিয়া থাকেন।

ঘটাকাশত্ব জীবত্ব নহে

ব্রহ্মের অবিদ্যা-গ্রস্ততাহেতু জীব সাধ্য হইতেছে। ঘটাকাশই তাহার উদাহরণস্থল। উদাহরণটী বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, ঘটটী একস্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া গেলে প্রথম-ক্ষেত্রের ঘটাবৃত আকাশ দ্বিতীয় ক্ষেত্রের ঘটাবৃত আকাশের সহিত এক নহে। কারণ প্রথম ক্ষেত্রের ঘটাবচ্ছিন্ন আকাশ পরিত্যক্ত হইয়াই দ্বিতীয় ক্ষেত্রের ঘট দ্বিতীয় স্থানের আকাশকে পরিচ্ছন্ন করিয়াছে। কিন্তু ঘটাকাশ জীব হইলে অথবা ঘটত্বই জীবত্ব হইলে দোষ এরূপ জড়ায় যে, জীব একস্থান হইতে অন্যস্থানে গেলে দেহাভ্যন্তরস্থ আত্মাকে পূর্ব্বস্থান ত্যাগ করিয়াই দ্বিতীয় স্থানে গমন করিতে হয়, কিন্তু তাহা প্রমাণাসিদ্ধি হইতেছে; যথাপূর্ব্ব অর্থাৎ প্রথম স্থানেই অবস্থান করিয়া আমি যে চিন্তা করিয়াছিলাম বা যাহা করিয়াছিলাম, দ্বিতীয় স্থানে আসিয়াও তাহার পুনরালোচনা করিতে ও পূর্ব্বকৃত কার্য্যসমূহের স্মরণ করিতে পারিতেছি। তাহাতে এই প্রতিপন্ন হয় যে, যে-আত্মা পূর্ব্বস্থানে ছিল সেই আত্মাই পরস্থানে বিদ্যমান আছে; সুতরাং ঘটত্বই জীবত্ব নহে।

ব্রহ্ম সধর্ম্মক

আরও দেখা যায়, ঘট ভগ্ন হইলে ঘটাবশেষে ঘটাভাব-ধর্ম্ম আশ্রিতরূপে থাকে। ঘটাবশেষ ঘটাভাব হইতেছে। সেইরূপ সমস্ত বস্তুর অভাব-ধর্ম্মটীও ব্রহ্মে থাকার দরুণ ব্রহ্ম অভাব-ধর্ম্মবিশিষ্ট হইলেন। সুতরাং ব্রহ্ম নির্ধর্ম্মক না হইয়া সধর্ম্মক হইলেন। আরও দেখা যায় যে, যদি অভাব-ধর্ম্ম অদ্বৈতের ব্যাঘাত না হয়, তাহা হইলে বন্ধাভাব-ধর্ম্ম ব্রহ্মে থাকার দরুণ ব্রহ্ম মুক্ত হইলেন সন্দেহ নাই; কিন্তু তাঁহাতে মুক্তত্ব-ধর্ম্ম-বিশিষ্টতা আসিয়া পড়িল। কারণ, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রই মুক্তপুরুষে বন্ধাভাব স্বীকার করেন। আবার যদি ব্রহ্মে মুক্তত্ব ধর্ম্ম নাই বলা হয়, তাহা হইলেও তাঁহাতে বদ্ধতা আসিয়া পড়ায় মহা অনিষ্টের কথা হইয়া পড়ে।

"ভগবান্ ও ব্রহ্ম"

এখন বক্তব্য এই যে, ব্রহ্ম কখনই কোন যুক্তিদ্বারা নির্ধর্ম্মক প্রতিপন্ন হইতে পারেন না। সুতরাং ব্রহ্ম সধর্ম্মক, নির্ধর্ম্মক নহেন। ভগবান্ সধর্ম্মক, ব্রহ্মও সধর্ম্মক। সুতরাং ভগবান্ই ব্রহ্ম এবং উভয়ই এক। ব্রহ্ম বা ভগবান্ যদি সধর্ম্মক হন, তবে তাঁহাতে বদ্ধত্ব ও মুক্তত্ব উভয়ই থাকিবে। যদি মুক্তত্ব থাকে তবে বিশেষ দোষের কথা নয়। কিন্তু যদি বদ্ধত্ব থাকে তবে পূর্ব্ব যুক্তি-অনুসারে মহা অনিষ্টের কথা হইয়া পড়ে। তর্কস্থানে আমি বলিতে চাই, মায়াবাদীর উক্ত অলঙ্কারের কোনও কারণ নাই। ভগবানে বদ্ধতা থাকিলেও তাহা দোষ না হইয়া উপাদেয়ই হয়। ভগবান্ মুক্ত হইয়াও তাঁহার একান্ত ভক্ত-বৎসলতাহেতু নন্দ-যশোদার স্নেহাবদ্ধ। তাঁহার এবম্প্রকার বদ্ধতায় কিপ্রকার আনন্দের উৎস আছে, তাহা গুন ও ধর্ম্মভয়ে ভীত অধার্ম্মিক কেবলাদ্বৈতবাদী কিরূপে উপলব্ধি করিবে? তত্ত্ববস্তু ভাব ও অভাব উভয় ধর্ম্মবিশিষ্ট স্বীকার করিলে কোনও দোষ হয় না বরং যুক্তির উপাদেয়তাই হয়। বেদে যে নির্গুণ উক্তি—উহাও বিষ্ণুকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে এবং বিষ্ণুর সহস্র-নাম গ্রন্থে তাঁহার গুনমধ্যে নির্গুণও একটী গুন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। নির্গুণকে গুন বলিলে বাক্যব্যাঘাত বা অর্থান্তরতা হয় না; কারণ "সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ" এই ন্যায়ানুসারে গুণের প্রাকৃতত্ব পরিহার অর্থাৎ প্রাকৃতগুন-শূন্যতাকেই পণ্ডিতগণ গ্রহন করিয়া থাকেন। তাই তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ তত্ত্বকে ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্—এই ত্রিবিধ আখ্যা দিয়া থাকেন। কেবলাদ্বৈতবাদী ব্রহ্ম ও আত্মাকে এক বলিয়া থাকেন, তাহা পূর্ব্বেই প্রমান উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইয়াছে। কেবলমাত্র ভগবানের ভয়ে তাহারা ভীত হইয়া সর্ব্বদাই তাঁহার প্রতি শত্রুতাসাধনে যত্ন করে।

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণের বিরোধই কেবলাদ্বৈতবাদ

ব্যাস বলেন, "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" কৃষ্ণই একমাত্র ভগবান্ স্বয়ং। তাই কৃষ্ণ-বিরোধই মায়াবাদীর ধর্ম্ম। কৃষ্ণবিরোধ হইতেই তাহাদের নানাপ্রকার বিপদাপ্তি ঘটিয়াছে। কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যপ্রভাবে অর্থাৎ গুণধর্ম্ম-প্রভাবে তাহাদের বিনাশ হইয়া থাকে বলিয়া তাহারা সর্ব্বদাই শঙ্কিত, ভীত ও গ্রস্ত। যাহাতে কৃষ্ণের আবির্ভাব না হইতে পারে বা আবির্ভাব হওয়ামাত্রই যাহাতে তাঁহার বিনাশসাধন করা যায়, তাহার জন্য কেবলাদ্বৈতবাদী সর্ব্বদাই সচেষ্ট ও নানাপ্রকার কৌশল-জাল সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু ভগবানের এমনই ঐশ্বর্য্য যে, মায়াবাদের শৃঙ্খল তাঁহার আবির্ভাবের পূর্ব্বেই ছিন্ন হইয়া ভগবান্ ও তাঁহার ভক্তের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছে। তাই অদ্য জন্মাষ্টমী-বাসরে ভাবাভাব-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট মহৈশ্বর্য্যবান্ পরমব্রহ্ম পরমাত্মা স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ কেবলাদ্বৈতবাদ-রূপ কংসাসুরের হস্ত হইতে নির্ব্বিঘ্নে জন্ম লাভ করিয়া নন্দালয়ে নীত হইলেন। অতএব পাঠকবর্গ! কৃষ্ণদাসগণ! আপনারা সকলে কেবলাদ্বৈতবাদের বিনাশের হেতু ও কৃষ্ণের নির্ব্বিঘ্নে আবির্ভাব-হেতু জয়গান করুন—

"শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে ভারতমন্যে ভজন্তু ভবভীতাঃ।
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম॥"

—দৈনিক নদীয়া প্রকাশ ১০ম খণ্ড, ১৪৬-১৪৭ সংখ্যা।
(৪ ভাদ্র ১৩৪২, ইং- ২১।৮।১৯৩৫)
—শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা ২য় বর্ষ, ৯-১২ সংখ্যা।

মায়াবাদীর ব্রহ্মজ্ঞান

ব্রহ্ম অজ্ঞেয় (?)

মায়াবাদী বলেন, ব্রহ্ম একমাত্র সত্য। ভাল, এখন কথা হইতেছে এই যে, ব্রহ্ম সত্য বা মিথ্যা হউন, তাহা নির্ণয় করিবার পূর্ব্বে স্বভাবতঃই জানিতে ইচ্ছা হয়, ঐ ব্রহ্ম কি বস্তু। কারণ, যে বস্তু অজ্ঞাত তাহা সত্য কি মিথ্যা, ইহা লইয়া বিচার করা চলে না। কিন্তু অদ্বৈতবাদী সে-সম্বন্ধে আমাদিগকে প্রথমেই নিরাশ করিয়াছেন। তাঁহারা 'আকাশকুসুম'-রূপ ব্রহ্মের সত্যতা নির্ণয়ে ব্যস্ত, তাঁহাদেরই মতে তাঁহা অজ্ঞেয়, অগুণ, অরূপ এবং অক্রিয়। তাঁহার অনুভবশক্তি, ইচ্ছাশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তি নাই। এমন কোন প্রমাণ বা জ্ঞান নাই যাহাদ্বারা ব্রহ্মকে জানা যাইতে পারে। তিনি শব্দবেদ্য বা জ্ঞানবেদ্য নহেন, তিনি স্বতঃসিদ্ধ বস্তু। ব্রহ্মকে যে গুণী বা জ্ঞানী বলিয়া বিবর্ত্ত হয়, অর্থাৎ মায়া-

কর্ত্তৃক ব্রহ্মে যে উপাধি আরোপিত হয়, 'নেতি' 'নেতি' বিচারমুখে ব্রহ্মে সেই গুণ নিষেধেই শাস্ত্রের প্রবৃত্তি। নচেৎ শাস্ত্র কখনও অজ্ঞেয় বস্তুর জ্ঞান দান করিতে পারে না। যাহা কিছু জ্ঞেয়, তাহা জানা যায়, অনুভব করা যায়; এবং যাহা জানা যায় অর্থাৎ জানিলাম বলিয়া অনুভব করা যায়, তাহা অসত্য। জড় বস্তুকেই জ্ঞানের বিষয়ীভূত করা যায়, সেই জন্য তাহাকে জানা যায় এবং সেইকারণে তাহা অসত্য; কিন্তু ব্রহ্ম চেতন বস্তু, তাহাকে জ্ঞানের বিষয়ীভূত করা যায় না, সেই জন্য তাঁহাকে জানা যায় না; (অতএব) তিনি অজ্ঞেয় ও সত্য বস্তু। (এইপ্রকারে) অদ্বৈতবাদীর ব্রহ্ম সর্ব্বপ্রকার প্রমাণের বাহিরে এবং কেহই জানে না বা জানিতে পারে না ব্রহ্ম কি বস্তু; এমন কি তাহার আভাস পর্য্যন্ত পাইতে পারে না। ধন্য মায়া তোমার মহিমা! তুমি মায়াবাদীকে একেবারে পদ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত গ্রাস করিয়াছ!

প্রাকৃত বাক্য ও মনদ্বারা ব্রহ্ম অব্যক্ত

অবশ্য বেদ বা উপনিষদের কোথাও কোথাও কয়েকটী মন্ত্র আছে, যাহার অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তি অপরাধী পাষণ্ডী মায়াবাদীর বুদ্ধিকে মোহাবৃত করিয়াছে। **"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"** এবং এই জাতীয় আর দুই একটী শ্রুতিমাত্র মায়াবাদী ব্রহ্মাস্ত্ররূপে ধারণ করিয়াছেন। কিন্তু ব্রহ্মাস্ত্র-গ্রহণে উৎফুল্ল মায়াবাদী চিন্তা করিতে পারে নাই যে, (সেই) অস্ত্র প্রতিবাদীর প্রতিবাদ ছেদনের জন্যই ধারণ হইয়াছে। শ্রীমৎ আনন্দ-তীর্থপাদ তাহার বিদ্বদ্রূঢ়ি প্রকাশপূর্ব্বক সেই অস্ত্রদ্বারাই প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমতবাদ বা মায়াবাদ সমূলে ধ্বংস করিবেন।

ব্রহ্ম যদি প্রাকৃত বস্তু হইতেন, তাহা হইলে প্রাকৃত জ্ঞান দ্বারাই তাঁহাকে জানা যাইতে পারিত। সুতরাং তাহার জন্য স্বতন্ত্র বেদবাক্যের উপদেশের প্রয়োজন হইত না। আর যদি ব্রহ্ম অজ্ঞেয় হইতেন, তাহার জন্যও বেদ-উপদেশের প্রয়োজনীয়তা দৃষ্ট হইত না, কারণ, তাহা প্রত্যক্ষ এবং অনুভবসিদ্ধ ব্যাপার। কিন্তু ব্রহ্ম প্রাকৃত বস্তু নহেন এবং অজ্ঞেয় বস্তুও নহেন। তিনি অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দময় বস্তু এবং অপ্রাকৃত-জ্ঞানবেদ্য। এই অপ্রাকৃত জ্ঞানগম্য অপ্রাকৃত ব্রহ্মবস্তুর উপদেশেই শাস্ত্রের সার্থকতা দৃষ্ট হয়। প্রাকৃত বাক্য ও মন তাহার অক্ষজ চেষ্টায় ব্রহ্মবস্তুকে শব্দদ্বারা ব্যক্ত বা মনন করিতে পারে না এবং সেইজন্যই "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" শ্রুতির প্রবৃত্তি। "ব্রহ্ম সত্য অথচ কোন প্রকারেই জ্ঞানগম্য নহেন' একথা বলা আর 'ব্রহ্ম মিথ্যা' একথা বলা একই হইতেছে। মায়াবাদী যে ব্রহ্মকে সত্য বলিতেছেন, তাহা কোন্ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া? যদি কোন প্রমাণই ব্রহ্ম সম্বন্ধে প্রযুক্ত না হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে সত্যই বা বলা যায় কি প্রকারে? আর যদি ব্রহ্মের সত্যত্ব অনুভবসিদ্ধ ব্যাপার হয়, তাহা হইলে তাঁহার জ্ঞানগম্যত্ব সিদ্ধ হইতেছে।

'অব্যক্ত'-অর্থে সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তযোগ্য নহেন

মায়াবাদী শব্দের স্ফোট-শক্তি-বিজ্ঞানে দারিদ্রতা নিবন্ধন অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তি-দ্বারা প্রতারিত হইয়া উক্ত শ্রুতিমন্ত্রের যে অর্থ করেন, তাহাতে পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় না। সদ্‌-গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিলে তিনি জানিতে পারিতেন যে, উক্ত শ্রুতিমাত্রই ব্রহ্মকে সম্পূর্ণ-রূপে অজ্ঞেয় বলেন নাই, পরন্তু তিনি বিভুচিদ্বস্তু বলিয়া কেহই তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানের বিষয়ীভূত করিতে বা সম্পূর্ণরূপে বর্ণন করিতে পারে না। ব্রহ্ম অধোক্ষজ বস্তু ; একমাত্র বৈকুণ্ঠ শব্দ বা বেদই তাঁহার কথা কীর্ত্তন করিতে পারেন। ভেকের কোলাহল যে-প্রকার সর্পকে আকর্ষণ করিয়া আনে এবং সেই সর্প-কর্তৃক ভক্ষিত হইয়া আত্মবিনাশ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ মায়াবাদীর তর্ক-কোলাহল তাহার ত্রিপুটী-বিনাশরূপ আত্মবিনাশেরই কারণ হইয়া থাকে। মায়াবাদীর ব্রহ্ম অজ্ঞেয় বলিয়া উৎক্রান্ত-দশায় কৃপণ হইয়া দেহত্যাগ করে, বস্তুতঃ মুক্তি লাভ হয় না। কিন্তু ব্রহ্মবিদ্‌গণ উৎক্রান্ত দশায় এমন কি জীবদ্দশায়ও পরব্রহ্মকে জানিয়া পরম মুক্ত বা জীবন্মুক্ত হন। তখন তিনি অদ্বয়জ্ঞান-পরব্রহ্মের চিদ্বিলাসের বিলাসোপকরণ-রূপে আত্মসত্তার স্বরূপ উপলব্ধি করতঃ ধন্য হয়েন।

জীবস্বরূপের অণুত্ব-নিবন্ধন সে অনন্ত পরব্রহ্মকে সাকল্যে জানিতে পারে না এবং বাক্যও সেই নিখিল-কল্যাণ-গুণাকর পরব্রহ্মের অনন্তগুণ সম্যগ্‌রূপে কীর্ত্তন করিতে পারে না ; সেইজন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন—"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" প্রাকৃত উদাহরণ-দ্বারাও জানা যায় যে, কোন ব্যক্তি সমুদ্র দর্শন করিলেও যেমন সম্পূর্ণ-রূপে তাহাকে দেখিতে পায় না অর্থাৎ তাহার দৃষ্টিশক্তির সামর্থ্যানুরূপই সে দেখে আবার সামর্থ্যানুরূপই বর্ণন করিতে পারে। ব্রহ্ম-সম্বন্ধেও সেইপ্রকার অর্থাৎ মুক্তজীব পরব্রহ্মকে দর্শন করেন এবং বৈকুণ্ঠ-শব্দসাহায্যে তাঁহাকে বর্ণনও করেন। বেদব্রহ্মে ও বেদবাক্যে বাচ্য-বাচক-সম্বন্ধ ওতপ্রোতভাবে বর্ত্তমান।

ব্রহ্মের জ্ঞেয়ত্ব হেতু মনের প্রবৃত্তি

ব্রহ্ম যদি একান্তই অজ্ঞেয় বস্তুই হন, তাহা হইলে সেই ব্রহ্মানুসন্ধানে বাক্য ও মনের প্রবৃত্তিই জন্মিতে পারে না, কিন্তু "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" শ্রুতি-মন্ত্রে জানিতে পারি যে, সেই 'জ্ঞেয়' পরব্রহ্মকে জানিবার জন্যই বাক্য ও মন প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু তাঁহাকে সম্যক্ না জানিয়া ফিরিয়া আসে। সম্যক্ না জানিবার হেতু এই যে, ব্রহ্ম বিভুবস্তু।

ব্রহ্ম—'শব্দ'-বেদ্য

বেদ, ব্রহ্মসূত্র ও শ্রীগীতা— যাহাদিগকে প্রস্থানত্রয় বলা হয়, যাঁহার উপর সমগ্র হিন্দু দর্শন প্রতিষ্ঠিত, তাঁহারা সকলেই পরব্রহ্ম-বস্তুকে জ্ঞেয় বলিয়াছেন। "আত্মা বা অরে

শ্রোতব্যো দ্রষ্টব্যোঃ মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" বেদমন্ত্রই ইহার প্রমাণ। বেদান্ত দর্শনের প্রারম্ভিক সূত্রই হইতেছে "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"। যদি ব্রহ্ম স্বরূপতঃ অজ্ঞেয় হইতেন, তাহা হইলে তদ্রূপ ব্রহ্মের জিজ্ঞাসারাই বা কি প্রয়োজন এবং তৎসম্বন্ধে প্রায় ৫৫০ সংখ্যক্ সূত্রেরই বা আবশ্যকতা কি ছিল?

এখন কথা হইতেছে যে ব্রহ্মবস্তুকে জানিবার উপায় কি? এইরূপ সন্দেহ প্রাপ্তিতে সূত্রকার সূত্র বলিতেছেন "শাস্ত্র-যোনিত্বাৎ"। 'শাস্ত্র' অর্থে শব্দ; এ শব্দ কুণ্ঠ-জগতের বায়বীয় ঘাত-প্রতিঘাতোত্থ প্রাকৃত শব্দ নহে, ইহা চিদ্‌ব্যোমের অনাহত স্বয়ং প্রকাশ শব্দ। বৈকুণ্ঠশব্দ—এই শব্দ এবং ব্রহ্মে স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই—নাদব্রহ্মে (প্রণবে) এবং ব্রহ্মে কোন ব্যবধান নাই অর্থাৎ প্রণবই ব্রহ্মের স্বরূপ হওয়ায় ব্রহ্মের শব্দ-বেদ্যত্ব স্বতঃই সিদ্ধ হইতেছে।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন—**"বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্য"**। বেদান্ত-সূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতও তাহা কীর্ত্তন করিয়াছেন—**"বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদম্।"** চরমমঙ্গলপ্রদ নিরস্তকুহক বাস্তব সত্য পরব্রহ্ম বস্তুই বেদ্য; সুতরাং মায়াবাদী যে পরব্রহ্মকে অজ্ঞেয় এবং শব্দদ্বারা অবাচ্য বলেন, তাহা নিতান্তই ভেক্ কোলাহল মাত্র। নিখিলকল্যাণ-গুণাকর, শব্দাশ্রিত, জনবেদ্য, অচিন্ত্যশক্তি পরব্রহ্ম-বস্তুকে মায়াবাদী তর্কের দ্বারা নিয়মিত করিবার ধৃষ্টতা প্রকাশ করিয়া সজ্জনসমাজে উপহাস্যাস্পদ হইয়াছেন মাত্র।

প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমতবাদ

তাই শ্রীপদ্মপুরাণ মায়াবাদকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমতবাদ বলিয়াছেন। মায়াবাদী অপেক্ষা বরং বৌদ্ধ কিছু সরল। কারণ, তাহারা সোজাসুজি সর্ব্বপ্রকারের সত্ত্বাভাবকেই 'তত্ত্ব' বলিয়াছে অর্থাৎ শূন্যই তত্ত্ব। ইহা বেদবিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত। আর মায়াবাদী কপটতাপূর্ব্বক বেদ অঙ্গীকার করিবার ছলনা করিয়াও বেদবেদ্য ব্রহ্মকে 'অজ্ঞেয়' এবং শব্দাবেদ্য বলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বৌদ্ধ যেমন 'সর্ব্বশূন্য' বলিয়া আবার শূন্যকেই 'তত্ত্ব' বলিতেছে, তদ্রূপ। মায়াবাদী পরব্রহ্মকে 'অজ্ঞেয়' বলিয়া আবার কপটতাপূর্ব্বক 'সত্য বলিতেছে। কোন বস্তু সত্য কি মিথ্যা, তাহা প্রমান-সাপেক্ষ, কিন্তু মায়াবাদী ব্রহ্মের কোন প্রমাণ দিতে পারে না। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় ত' নাস্তিক।
বেদাশ্রয়ে নাস্তিক্যবাদ বৌদ্ধকে অধিক॥
জীবের নিস্তার লাগি' সূত্র কৈল ব্যাস।
মায়াবাদি-ভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ॥
'পরিণাম-বাদ'—ব্যাস-সূত্রের সম্মত।
অচিন্ত্যশক্তি ঈশ্বর জগদ্রূপে পরিণত॥

মণি যৈছে অবিকৃতে প্রসবে হেমভার।
জগদ্রূপ হয় ঈশ্বর, তবু অবিকার॥
ব্যাস—ভ্রান্ত বলি' সেই সূত্রে দোষ দিয়া।
বিবর্ত্তবাদ স্থাপিয়াছে কল্পনা করিয়া॥
জীবের দেহে আত্মবুদ্ধি, সেই মিথ্যা হয়।
জগৎ যে মিথ্যা নহে, নশ্বর মাত্র হয়॥
'প্রণব' যে মহাবাক্য—ঈশ্বরের মূর্ত্তি।
প্রণব হৈতে সর্ব্ববেদে, জগতে উৎপত্তি॥

(চঃ চঃ মধ্য ৬।১৬৮-১৭৪)

ব্রহ্মের সগুণত্ব ও নির্গুণত্ব এক তাৎপর্য্যপর

মায়াবাদী সম্প্রদায় অদ্বয়জ্ঞান পরব্রহ্মের দ্বিবিধ স্বরূপ কল্পনা করেন। সগুণ অর্থাৎ উপাধিযুক্ত এবং নির্গুণ অর্থাৎ উপাধিবিমুক্ত—ব্রহ্মের এই দুইপ্রকার রূপ। (তাঁহাদের মতে) জীব হইতে ঈশ্বর পর্য্যন্ত সমস্তই উপাধিযুক্ত ব্রহ্ম; জীব ও ঈশ্বর উপাধিমুক্ত হইলেই নিরূপাধিক ব্রহ্ম হইলেন। বেদশাস্ত্রে যে ব্রহ্মবস্তুর কথা কীর্ত্তিত হইয়াছে এবং যাহাকে জ্ঞানবেদ্য বলা হইয়াছে, তাহা এই সগুণ ব্রহ্ম সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে, নির্গুণ ব্রহ্ম সম্বন্ধে নহে।

কিন্তু সমস্ত বেদশাস্ত্রে এরূপ কথা কোথাও পাওয়া যায় না যে, উপাধিভেদে ব্রহ্ম দ্বিবিধ। অবশ্য বেদশাস্ত্রে একই অদ্বয়জ্ঞান পরব্রহ্মকে সগুণ ও নির্গুণ বলা হইয়াছে। অপ্রাকৃত অদ্বয়জ্ঞান পরব্রহ্ম-বস্তুতে পাছে মনুষ্য প্রাকৃত সাহজিক বিচারাবলম্বনে প্রাকৃত গুণ আরোপ করে, তাহাই নিবারণকল্পে শাস্ত্র তাঁহাকে প্রাকৃত গুণরহিত বা নির্গুণ পরব্রহ্ম বলিয়াছেন এবং তাঁহার অপ্রাকৃত কল্যাণ গুণরাশিকে লক্ষ্য করিয়াই বেদশাস্ত্র তাঁহাকে সগুণ পরব্রহ্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীঅর্জ্জুনকে উপদেশস্থলে ভগবান্ স্বয়ং শ্রীমুখে বলিয়াছেন,—

"জ্ঞেয়ং যত্তৎপ্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে।
অনাদি মৎপরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে॥" (গী ১৩।১৩)

এই বাক্যে স্পষ্টভাবেই ব্রহ্মবস্তুকে জ্ঞেয় বলা হইয়াছে। যে ব্রহ্মবস্তুকে জানিলে জীবের অমৃতত্ব লাভ হয়, সেই জ্ঞেয় ব্রহ্মবস্তু বর্ণনপ্রসঙ্গে কোথাও তাঁহার সগুণ ও নির্গুণ-ভেদে দ্বিবিধ স্বরূপের কথা বলা হয় নাই। গীতাশাস্ত্রে ব্রহ্মের একই স্বরূপের কথাই বলা হইয়াছে। সেই ব্রহ্ম অনাদি এবং নির্গুণ হইয়াও ত্রিগুণাতীত 'ভগ'-শব্দবাচ্য ষড়্গুণাস্বাদক। তিনি জ্ঞান, তিনি জ্ঞেয় এবং তিনি জ্ঞানগম্য। পরম তত্ত্ব কি, এই কথা বলিতে গিয়া অর্জ্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছেন,—

"পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্॥ (গী ১০।১২)

শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং নিগুর্ণ পরব্রহ্ম

মায়াবাদিগণ যে পরমেশ্বর বস্তুকে সগুণ ব্রহ্ম এবং পরমেশ্বর হইতে শ্রেষ্ঠ পরতত্ত্বই নিগুর্ণ বলিয়া কল্পনা করে, তাহা বেদবেদান্ত ও গীতাশাস্ত্র-বিরোধী স্বকপোল-কল্পিত মতবাদ মাত্র। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন **"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"** বলিয়াছেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ হইতে যদি শ্রেষ্ঠ নিগুর্ণ পরব্রহ্ম অপর কেহ থাকেন, তাহা হইলে আমরা কেনই বা কৃষ্ণপাদপদ্মে শরণাগত হইব ? শ্রীকৃষ্ণের কথা যদি বিশ্বাস করিতে হয়, তাহা হইলে বুঝা যাইবে যে, তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ পরতত্ত্ব আর কিছু নাই—**"মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়"** ।

সুতরাং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই সেই পরব্রহ্ম। মায়াবাদী নিজের দেহ সম্পর্কে নানাবিধ অসুবিধা ভোগ করায় মনে করে, তাহার মত শ্রীভগবানের দেহসম্পর্ক থাকিলে তিনিও বুঝি তাহারই ন্যায় অসুবিধায় পড়িবেন। কিন্তু মায়ার আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা শক্তিদ্বয় কর্ত্তৃক হরিপাদপদ্ম হইতে বিক্ষিপ্ত এবং মায়াগ্রস্ত মায়াবাদী জানে না যে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ তাহার ন্যায় কখনই উপাধি-সংশ্লিষ্ট হয়েন না, তিনি সচ্চিদানন্দঘন-বিগ্রহ পরতত্ত্ব। মায়াবাদী পরতত্ত্বকে মুখে এক এবং অদ্বিতীয় বলিয়া আবার পরব্রহ্ম ও শ্রীকৃষ্ণের ভেদ কল্পনা করিতেছে। পরব্রহ্মে এই দ্বৈতত্ব কল্পনার মূলে বৌদ্ধপ্রভাবই দৃষ্ট হয়। শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম—পরব্রহ্মই শ্রীকৃষ্ণ—একই অদ্বয় বস্তু। বেদান্ত-দর্শনেও সেই একই ব্রহ্মের জিজ্ঞাসার কথা বলিয়াছেন—যে-পরব্রহ্ম হইতে জগতের জন্ম স্থিতি-ভঙ্গ সাধিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণ মায়াবাদীর কথিত সগুণ-ব্রহ্ম নহেন

সগুণ ও নিগুর্ণ বলিয়া যে ব্রহ্মকে বলা হইয়া থাকে, তাহা সগুণ ব্রহ্মজ্ঞান ও নিগুর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান-ভেদে জ্ঞানের দ্বিবিধত্ব স্বীকার করিয়া নহে ; কারণ, "গতি-সামান্যাৎ" বেদান্ত-দর্শনের এই সূত্রেই তাহা খণ্ডিত হইয়াছে। তাহাতে বলা যায় যে' ব্রহ্ম-জ্ঞানোৎপত্তিতে বেদই মুক্তি প্রদান করে এবং সেই বেদই প্রমান। ঐ বেদসকল নিখিল হেয়গুণ অর্থাৎ প্রাকৃতগুন বিবর্জ্জিত, অতএব নিগুর্ণ এবং অখিল-কল্যাণগুন-বিশিষ্ট ; সুতরাং 'সগুণ' একমাত্র অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম-বিজ্ঞান প্রকাশ করিয়া থাকে। ছান্দোগ্য শ্রুতি পরব্রহ্মকে এক এবং অদ্বিতীয় বলিয়াছেন। ব্রহ্মের কোন অবস্থান্তর প্রাপ্তির কথা কোন শ্রুতিই কীর্ত্তন করেন না, অথচ মায়াবাদী কল্পনাপূর্ব্বক ব্রহ্মের উপাধি-যুক্তাবস্থার নাম ঈশ্বর তথা সগুণ-ব্রহ্ম এবং উপাধি-নির্ম্মুক্তাবস্থাই নিগুর্ণ-ব্রহ্ম বলেন। কিন্তু মায়াবাদীর

জানা উচিত যে ব্রহ্মের ঐপ্রকার দ্বিবিধ স্বরূপ থাকিলে ছান্দোগ্যের **'একমেবাদ্বিতীয়ং'** প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হয় না ; কারণ, ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব যখন নিত্য, তখন ঈশ্বরত্ব ভঙ্গক্রমে ঈশ্বরের নির্গুণত্ব লাভের কোন সম্ভাবনা হইতেছে না। সুতরাং সগুণ-ব্রহ্ম এবং নির্গুণ ব্রহ্ম এই দুই ব্রহ্মের নিত্য অস্তিত্ব রক্ষিত হইতেছে। কিন্তু তাহাতে শ্রুতি-প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘিত হয় না। অতএব সিদ্ধান্তিত হইতেছে—পরব্রহ্ম একই এবং তিনিই শ্রীকৃষ্ণ, অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। একই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রাকৃত গুণাভাব লক্ষ্য করিয়াই শ্রুতি তাঁহাকে নির্গুণ এবং নিখিল অপ্রাকৃত কল্যাণ গুনগণকে লক্ষ্য করিয়াই তাঁহাকে সগুণ বলিয়াছেন। কিন্তু মায়াবাদীর কল্পিত সগুণ নির্গুণ-ভেদে ঈশ্বর এবং ব্রহ্মের দ্বিবিধত্বের কথা শ্রুতি কখনই কীর্ত্তন করেন নাই। সর্ব্বকালে এবং সর্ব্বাবস্থায়ই পরব্রহ্মের একই স্বরূপের কথা বলিয়াছেন।

—দৈনিক নঃ প্রঃ ৮ম খণ্ড, ৩০ সংখ্যা।

ব্রহ্ম—খণ্ডবস্তু

জাগতিক বিচারে দেখা যায়, কার্য্যের তারতম্যহেতু কারণের বৈষম্য হয় এবং কারণের তারতম্যহেতু কার্য্যেরও ভেদ লক্ষিত হয়। এই বিচারের সূক্ষ্ম তাৎপর্য্য এই যে, বৃত্তির তারতম্যক্রমে বস্তুর তারতম্য হইয়া থাকে। সুতরাং উপাসকের উপাসনার বৈষম্য হেতু উপাস্য-তত্ত্বের বৈষম্য হইবে। জাগতিক দৃষ্টান্তস্থলে দেখিতে পাই, কেহ যদি চল্লিশ বৎসর অতিক্রম করে, তাহা হইলে তাহার চক্ষের দৃষ্টিশক্তি কমিয়া যায় এবং সে তাহার খর্ব্বদৃষ্টিতে নিকটস্থ পুঁথির অক্ষরগুলির স্বরূপ দেখিতে পায় না। একারণ তাহার কাছে অক্ষরগুলি নিরাকার, নির্ব্বিশেষ ও আবছায়া বলিয়া জ্যোতিঃস্বরূপ মনে হয়। কিন্তু পূর্ণ দৃষ্টিশক্তিযুক্ত চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি অক্ষরগুলিকে কখনই নিরাকার ও নির্ব্বিশেষ দর্শন করেন না।

আমার উল্লিখিত উদাহরণ হইতে আপনারা স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছেন যে, অক্ষর ব্রহ্মবস্তুর জ্ঞান লাভ করিতে গিয়া শাস্ত্রীয় বিচারযুক্তির রূপ দর্শনের স্বল্পতা হেতুই অক্ষর-বস্তু নিরাকার, নির্ব্বিশেষ ও জ্যোতিঃস্বরূপ বলিয়া কাহারও কাহারও নিকট প্রতিভাত হন। কিন্তু তাই বলিয়া চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির পক্ষে অর্থাৎ যাঁহারা শাস্ত্রযুক্তিতে সুনিপুণ ও সুদর্শন-সেবী তাঁহাদের পক্ষেও কি কুদর্শনকারীর ন্যায় অক্ষর-ব্রহ্মবস্তু নিরাকার, নির্ব্বিশেষ,

জ্যোতির্ম্ময় হইবে, না বাস্তবিক পক্ষে তদ্বস্তুর পূর্ণ বৈশিষ্ট্যযুক্ত স্বরূপ উপলব্ধ হইবে—ইহা সুধী পাঠকবর্গ বিচার করিয়া দেখিবেন। পর্ব্বতের উপরে উঠিয়া তাহার পাদদেশস্থ ক্ষুদ্র-বৃহৎ বৃক্ষলতাদি, উচ্চাবচ ভূখণ্ডসমূহ দৃষ্ট না হইলে কি উঁচু-নীচু ছোট-বড় বস্তু-সকলের সত্তাহীনতাই স্বীকার করিতে হইবে? বা তাহাকে সমতল নির্ব্বিশেষ বলিয়াই মানিয়া লইতে হইবে? উচ্চস্থান হইতে নিম্নস্থ দৃশ্যবস্তুর দূরে অবস্থিতি হেতু তাহা আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হইতেছে না। কিন্তু সুষ্ঠুদর্শক প্রতি বস্তুরই ভেদ-বৈশিষ্ট্যাদি সুষ্ঠুভাবে দর্শন করিয়া তৎসম্বন্ধে বাস্তবসত্য জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন। ইহারই নাম **সুদর্শন** বা **বেদান্ত**।

যে বস্তুর যাহা স্বরূপ, তাহাকে তদ্রূপ দেখাই সত্য-দর্শন এবং যে বস্তু যাহা, তাহাকে তদ্রূপ না দেখাই ভ্রম-দর্শন। দর্শনের ভ্রান্তিহেতু বস্তুবিচারেও আমাদের ভ্রান্তি উপস্থিত হয়। প্রবন্ধের প্রারম্ভেই উক্ত হইয়াছে যে, কার্য্যে বৈষম্য থাকিলে কারণেও বৈষম্য আছে প্রমাণিত হয়। এস্থলে স্মরন রাখিতে হইবে যে, কারণবৈষম্য বলিলে বস্তুবৈষম্য বা বস্তুর নানাত্ব প্রমাণিত হয় না, কিন্তু বস্তুর শক্তির নানাত্ব স্বীকৃত হয়। বস্তুতে অর্থাৎ কারণে যে শক্তি আছে সেই শক্তিরই বিবিধত্ব, নানাত্ব, বিষমত্ব প্রভৃতি স্বীকৃত হইয়া থাকে। তাহাতে বস্তুর কোনপ্রকার বিকার হয় না।

এখন বিচার্য্য এই যে, আমরা ইহজগতে এই যে ভেদ ও বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিতেছি তাহার কারণ কি? যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও প্রত্যক্ষীভূত বৈশিষ্ট্য, তাহাকে কার্য্য বলিয়া স্বীকার করিলে তাহার কারণেও বৈশিষ্টের অধিষ্ঠান যুক্তিবিরুদ্ধ নহে। কার্য্যরূপ জগতে ভেদ থাকিলে কারণেও তাহার ভেদ থাকা সম্ভব। সুতরাং বস্তু কোনপ্রকারেই নির্ভেদ, নির্ব্বিশেষ ও নিরাকার প্রতিপন্ন হইতে পারে না। যে বস্তুতে যাহার সত্তা (potency) নাই, তদ্বস্তু হইতে তাহার উদ্ভব হইতে পারে না। যেমন—জল হইতে ঘৃতের উৎপত্তি ও বালুকা হইতে তৈলের উৎপত্তি কখনই সম্ভব হয় না। তদ্রূপ কারণস্বরূপ ব্রহ্ম যদি নির্ব্বিশেষ হন, তাহা হইলে কার্য্যস্বরূপ জগৎ কোনপ্রকারেই সবিশেষ হইতে পারে না। জাগতিক বস্তুতে যদি শক্তি থাকে, তাহা হইলে ব্রহ্মবস্তুতেও শক্তি আছে, ইহা সর্ব্বতোভাবে মানিয়া লইতে হইবে। আচার্য্য শ্রীপাদ শঙ্করও 'অসৎকারণবাদ' নিরাকরণ-কল্পে উপনিষদের মন্ত্রাদি উদ্ধার করিয়া বেদান্তের (২।১।১৬) সূত্রের ভাষ্যে আমার উল্লিখিত যুক্তির সর্ব্বৈব অনুমোদন করিয়াছেন। পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে তাহা উদ্ধার করিলাম।—

"'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ', 'আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ', ইত্যাদাবিদং-শব্দগৃহীতস্য কার্য্যস্য কারণেন সামানাধিকরণ্যাৎ। যচ্চ যদাত্মনা যত্র ন বর্ত্ততে, ন তৎ তত উৎপদ্যতে, যথা সিকতাভ্যস্তৈলম্।" উক্ত ভাষ্যের (কালিবর বেদান্ত-বাগীশ মহাশয়ের)

অনুবাদ যথা,—"হে সৌম্য, এসকল অগ্রে সৎ-ই ছিল। অগ্রে অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে এসকল এক আত্মা ছিল। ইত্যাদি শ্রুতিতে কারণের সহিত ইদম্-শব্দ-বাচ্য জগতের সামানাধিকরণ্য কথিত হওয়াতেও কার্য্য-কারণ ভিন্ন নহে। যাহা যাহাতে তদ্রূপে থাকে না, তাহা হইতে তাহা জন্মেও না। যেমন বালুকা হইতে তৈল জন্মে না।"

সুতরাং শঙ্করের উক্ত যুক্তি অনুসারেও দৃঢ়ভাবে বলা যাইতে পারে, জগৎরূপ কার্য্যের ভেদ-বৈশিষ্ট্যাদি তাহাদের কারণ-স্বরূপ ব্রহ্মতে নিশ্চিতরূপে বর্ত্তমান। কেহ কেহ বলিতে পারেন, ইহ জগতেও আকাশের নিরাকার নির্ব্বিশেষত্ব অনুভূত হইয়া থাকে; সুতরাং কার্য্যস্বরূপ জগতে এবম্প্রকার নির্ব্বিশেষত্বাদি অনুভূত হইলে কারণস্বরূপ বস্তুর নিরাকারত্ব নির্ব্বিশেষত্ব স্বীকার করিয়া তাহার ব্রহ্মতা সিদ্ধ হইবে না কেন? এইরূপ স্থলে আমার বক্তব্য এই যে, আমার যুক্তিসমূহ পূর্ব্বপক্ষকারী স্বীকার করিয়া লইলে আমি তাহার সিদ্ধান্তকে মানিয়া লইতে পারি। কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিবার বিষয় এই যে, আকাশ নিরাকার হইলেও পাঞ্চভৌতিক জগতের উহা আংশিক উপাদান মাত্র। সুতরাং বস্তুর নির্ব্বিশেষাদি কল্পনা পূর্ব্বপক্ষীর পক্ষে আংশিক জ্ঞান বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। কাষ্ঠেতে অগ্নিসত্তা অপ্রকাশিত থাকে বলিয়া তাহাকে তদ্বস্তুহীন বলিয়া প্রকাশ করিলে কাষ্ঠের অপূর্ণতাই প্রকাশিত হইল। সুতরাং বস্তুকে নির্ব্বিশেষ মাত্র প্রতিপন্ন করিয়া তাহাকে ব্রহ্ম বলিলে বস্তুর অখণ্ডত্ব না হইয়া খণ্ডত্বই স্থাপিত হইতেছে।

—শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা ১৮শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা।

বস্তু আলোচনা

বস্তুতে বিভিন্নগুণের সমাবেশ থাকিলেও বস্তু এক, এই প্রবন্ধে আমরা তাহা আলোচনা করিব। গুণ, ধর্ম্ম, শক্তি, অংশ, কার্য্য প্রভৃতি দার্শনিক বিচারে এক-পর্য্যায়গত শব্দ। কেহ কেহ ভ্রান্তিবশে বস্তুকে নির্গুণ, নিঃশক্তিক, নির্ধর্ম্মক, নিরংশক, কার্য্যত্বশূন্য, কারণস্বরূপ প্রতিপন্ন করিতে গিয়া তাঁহাকে জড়-স্বরূপের ন্যায় প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বস্তু পূর্ণচেতন; তাঁহাকে জড়ের ন্যায় প্রতিপন্ন করিতে গিয়া অদ্বৈতবাদী বিবর্ত্তগর্ত্তে পতিত হইয়াছেন,

"অতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃতঃ॥"

(বেদান্তসার ৬০)

তত্ত্ববস্তুকে জড়পিণ্ড অতত্ত্ববৎ প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্য—পাছে তাহাতে নানাত্ব বা বহুত্ব আসিয়া পড়ে এই ভয়ে। কিন্তু বস্তুর নানাত্ব কোন পক্ষেরই স্বীকৃত তত্ত্ব নহে, তবে বস্তুতে নানাত্ব থাকিলে বস্তুত্বের কোন প্রকারেই হানি হয় না। তাহাতে যদি কেহ মনে করেন, বস্তুতে নানাত্ব স্বীকৃত হইলে বস্তু-বিপর্য্যয়ক্রমে বস্তুবিকারবাদ বা বস্তু-পরিমাণবাদ আসিয়া পড়ে, সেইজন্য বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ের আচার্য্য বল্লভ উপনিষদের "বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি" (তৈঃ উঃ ২।৬) মন্ত্রের দ্বারা বস্তুবিকারের শাব্দপ্রামাণিকতা অঙ্গীকার করিলেও আমরা তৎপ্রমাণ হইতে স্বতন্ত্রভাবে বস্তুগত শক্তির পরিণাম স্বীকার করিয়া বস্তুর হানি না করিয়া বস্তুবিকারবাদ হইতে পৃথক্ অবস্থান করিতেছি। বেদান্তের "আত্মকৃতে পরিণামাৎ" (১।৪।২৬) সূত্রানুসারে জানা যায়, বস্তু স্বয়ংই ইচ্ছা-শক্তিপ্রভাবে জগতের রচয়িতারূপে পরিণত হইয়াছেন। উক্ত সূত্রের 'কৃতে'-শব্দের দ্বারা 'রচনা' বুঝিতে হইবে। সুতরাং বস্তুর কর্ত্তৃত্ব ও "সোহকাময়ত", (তৈঃ উঃ ২।৬) এই মন্ত্রের দ্বারা বস্তুর ইচ্ছাশক্তিযুক্তত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। পরিণাম স্বীকার করিলে বস্তু বিকৃত হ'ন বলিয়া বিবর্ত্তবাদিগণ জগৎকে ব্রহ্মের বিবর্ত্ত বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত বেদান্ত-সূত্রানুসারে পরিণামবাদই বেদব্যাস কর্ত্তৃক স্পষ্টরূপে স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। 'সঃ অকাময়ত বহু স্যাং' ইত্যাদি মন্ত্র হইতে 'তদ্বস্তু ইচ্ছা করিলেন—আমি বহু হইব' ইত্যাদি দ্বারা পরিস্ফুটরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, জগৎ ভগবদ্বস্তুর ইচ্ছা-শক্তির পরিণাম। আচার্য্য শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এই সম্পর্কে বলিয়াছেন,—

"অবিচিন্ত্য-শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্।
ইচ্ছায় জগৎরূপে পায় পরিণাম॥"

তিনি আরও একটী জাগতিক দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, অচিন্ত্য ভগবচ্ছক্তি জগৎরূপে পরিণত হইলেও শক্তি চিন্তামণির ন্যায় বিবিধ রত্নরাশি প্রসব করিয়াও অবিকৃতভাবে অবস্থান করেন।

"তথাপি অচিন্ত্যশক্ত্যে হয় অধিকারী।
প্রাকৃত চিন্তামণি তাহে দৃষ্টান্ত ধরি॥
নানারত্নরাশি হয় চিন্তামনি হৈতে।
তথাপিহ মণি রহে স্বরূপে অবিকৃতে।
প্রাকৃত-বস্তুতে যদি অচিন্ত্যশক্তি হয়।
ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তি—ইথে কি বিস্ময়॥"

(চৈ চঃ আঃ ৭।১২৫-১২৭)

সুতরাং বস্তুতে নানাত্ব থাকিলে বস্তুর অখণ্ডত্বের হানি না হইয়া বরং পূর্ণতাই প্রতিপন্ন হয়। "বস্তুনোহংশো জীবঃ বস্তুনঃ শক্তিমায়া চ বস্তুনঃ কার্য্যং জগচ্চ তৎ সর্ব্বং বস্ত্বেব॥" (ভাবার্থদীপিকা ১।১।২)

উক্ত বাক্য হইতেও আমরা বস্তুতত্ত্বের বিষয় স্পষ্টরূপে অভিজ্ঞান লাভ করিতে পারি যে, সমস্ত তত্ত্বটী বস্তু হইলেও অংশরূপে জীব, শক্তিরূপে মায়া এবং কার্য্যরূপে জগৎ তাঁহাতেই অবস্থান করিতেছে। বস্তুকে নির্ব্বিশিষ্ট করিলে উল্লিখিত বিচার ও শাস্ত্রযুক্তিসমূহের অসঙ্গতি ও একদেশদর্শিতা হয়। জাগতিক হেয়তাযুক্ত ঘৃণিত বিশেষের অভাবই বস্তুতে পরিলক্ষিত হয়। জাগতিক আনন্দ, উপাদেয়তা প্রভৃতি ক্ষণস্থায়ী—নিরানন্দ ও অনুপাদেয়তা হইতে জাত বলিয়া তাহাদের নশ্বরতা কথিত হয় মাত্র। কিন্তু বস্তুর স্বরূপগত শক্তিতে বিলাস-বৈশিষ্ট্য নশ্বরতা, পরিবর্ত্তনশীলতা ও হেয়তাবর্জ্জিত। মায়ার বিলাস-বৈচিত্র্যের অবস্থান্তর দেখিয়া বস্তুর নির্ব্বিশেষ কল্পনাকেই 'মায়াবাদ' বলিয়া থাকে। মায়িকদৃষ্টি তাহাদের অত্যন্ত প্রবলা বিধায় মায়াতীত বৈচিত্র্যে তাহাদের অধিকার জন্মে নাই। তাহাদের পক্ষে ইহকালেও ক্লেশ-স্বীকার হেতু আনন্দলাভ হইতে বঞ্চিত হইতে এবং পরেও নির্ব্বিশেষ বস্তুতে পর্য্যবসান লাভ করায় চিদানন্দের অপ্রাপক হইয়া আত্মবিনাশ সাধন করিতে দেখা যায়। জগৎকে ও জাগতিক বস্তুকে থুৎকার করিতে গিয়া বস্তুনির্দ্দেশকল্পে যে 'নেতি নেতি' বিচার অবলম্বিত হইয়াছে তাহাও বস্তুর অন্তর্ভুক্ত বিশেষ তত্ত্বেরই একটী প্রকাশস্বরূপ হওয়ায় জ্যোতির্ম্ময় তত্ত্বকে পাওয়া যাইতেছে। তাহাকে আমরা বস্তুর খণ্ডপ্রতীতি বা তাঁহার আভাস জ্ঞান বলিয়া জানিতে পারি। বস্তুর আভাস বস্তু হইতে পৃথক্ না হইলেও কেবলমাত্র তাহাতেই আবদ্ধ থাকা অসম্পূর্ণ বিচার হেতু ভ্রম-বিচার বলা যাইতে পারে। জ্যামিতির প্রতিজ্ঞা প্রতিপাদন করিতে গিয়া আংশিক উত্তর প্রদত্ত হইলে তাহাতে উত্তরদাতার ভ্রান্তিই প্রকাশ পায়।

—শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা ১৯শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা।

বস্তু-বিচারে বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব

বস্তু বা তত্ত্ব-সম্বন্ধে পরিচয় দিতে গিয়া ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান্ প্রভৃতি শব্দসমূহ শাস্ত্রে পরিলক্ষিত হয়। কোথাও বা তাঁহাকে প্রাণস্বরূপ বা প্রাণময়, কোথাও কোথাও বা মনোময়, কোথাও বা রসস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ বা আনন্দমনোস্বরূপ, কোথাও বা সূর্য্য, বায়ু, ইন্দ্রস্বরূপ, কোথাও বা অন্নস্বরূপ বা অন্নময়স্বরূপ, শূন্য বা আকাশস্বরূপ প্রভৃতি বহু পরিভাষা পরিলক্ষিত হয়। কোথাও বা বিষ্ণু, কৃষ্ণ, চৈতন্য, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, নারায়ণ, বাসুদেব প্রভৃতি সংজ্ঞাও পরিলক্ষিত হয়। শাস্ত্রে বস্তুবিচারে বিবিধ আখ্যান লইয়া ভিন্ন ভিন্ন আচার্য্যগণের ভিতরে বিবিধ মতভেদ লক্ষিত হয়। উক্ত মতভেদসমূহের মধ্যে

সংক্ষেপতঃ দুইটি শ্রেণী-বিভাগ করা যাইতে পারে। একশ্রেণীর আচার্য্যগণ—তাঁহারা নিজ নিজ স্বরূপকে বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দেন, আর অন্য শ্রেণীর আচার্য্যগণ নিজ-দিগকে বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয়দিতে কুণ্ঠা বোধ করায় অবৈষ্ণব নামে অভিহিত হইয়া গর্ব্ব অনুভব করিতেছেন। উক্ত বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব শ্রেণীদ্বয়ের মধ্যে প্রত্যেকেরই বিভিন্ন শাখা বর্ত্তমান।

বৈষ্ণব-বিভাগে বিভিন্ন শাখা বর্ত্তমান থাকিলেও মূলতঃ সকল মতেই উপাস্য-উপাসকের নিত্যভেদ ও উপাসনার নিত্যত্ব ও জগতের সত্যতা অঙ্গীকৃত হইয়াছে। এই নিমিত্ত বিষ্ণুস্বামী, রামানুজ, মধ্ব, নিম্বার্ক ও গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীরূপ, সনাতন ও শ্রীজীব প্রভৃতি গোস্বামিবর্গ সকলেই উক্ত তত্ত্বত্রয়ের নিত্যত্ব স্বীকার করিয়া পরমবৈষ্ণব নামে অভিহিত হইয়াছেন। উক্ত আচার্য্যবর্গের বিচার-নৈপুণ্য ও শাস্ত্রজ্ঞানের মাধুর্য্য এই যে, তাঁহাদের মধ্যে সমস্ত বিরোধ ও অবিরোধ, ব্যক্ত ও অব্যক্ত তত্ত্বের সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর চমৎকারিতাপূর্ণ সঙ্গতি থাকায় এবং একমাত্র ভক্তিকেই উপায়স্বরূপ অঙ্গীকার করায় পরস্পরের মধ্যে কোন ভেদ লক্ষিত হয় না, পরন্তু বৈশিষ্ট্যই লক্ষিত হয়। তাঁহাদের মধ্যে বিচারবৈশিষ্ট্য থাকায় তারতম্য বিচারে বিবিধ উজ্জ্বলরসের উৎপত্তি হইয়াছে।

অবৈষ্ণব-বিভাগে প্রায় সকলেরই বিচারে উপাস্য-উপাসকের নিত্য অভেদ ও উপাসনার ব্যবহারিকতা হেতু অনিত্যত্ব ও জগৎ মিথ্যা বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। এইজন্য শাক্যসিংহ বুদ্ধ, মহাবীর স্বামী, কপিল, পতঞ্জলি, শঙ্কর ও তদনুগ সমন্বয়বাদী পঞ্চোপাসকগণ সকলেই অবৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত। উক্ত আচার্য্যবর্গের মধ্যে বিচারের ও শাস্ত্রজ্ঞানের বিশেষ নৈপুণ্য লক্ষিত না হওয়ায় পারমার্থিক হউক বা ব্যবহারিকই হউক কোন বস্তুবিচারেই সঙ্গতি পরিলক্ষিত হয় না। পরন্তু উহাদের প্রত্যেকেরই বিচারের মধ্যে বহু প্রকার ভেদ লক্ষিত হয়। প্রাকৃত বিচারের অনুগত সম্প্রদায়ের মধ্যে এই প্রকার ভেদ স্বতঃসিদ্ধ। উঁহাদের মধ্যে বস্তুপ্রাপ্তির আশায় কেহ বা বাহ্য-বিজ্ঞানকে, কেহ বা কেবল-জ্ঞানকে, কেহ বা যোগকে, কেহ বা কর্ম্মকে, কেহ বা নানা প্রকার দেবদেবীর পূজাকে উপায়-স্বরূপ অঙ্গীকার করিয়া পরস্পরের মধ্যে বিষম ভেদ ও বিবাদ স্থাপন করিয়া মহা অশান্তি ও জগজ্জঞ্জাল সৃষ্টি করিয়াছেন।

ভেদ-জগতে মতভেদ অবশ্যম্ভাবী জানিয়া পরস্পর মতবাদিগণের ভিতরে একটা সামঞ্জস্য স্থাপনকল্পে আচার্য্য শঙ্কর জগতের এক নূতন ধারায় মিথ্যাত্বের কল্পনা করিলেন। যে ভেদ হইতে নানা প্রকার মতভেদ ও জগজ্জঞ্জাল সৃষ্টি হইতেছে সেই ভেদের (তন্মতে) মূলীভূত কারণ, জগৎকে মিথ্যারূপে প্রতিপন্ন করিতে পারিলে ভেদের হস্ত হইতে উদ্ধার লাভ করা যায়। এইরূপ চিন্তা করিয়া আচার্য্য শঙ্কর সমস্ত ভেদের সঙ্গতি করিতে বৃথা চেষ্টা করিয়াছেন।

আচার্য্য শঙ্কর শুধু ভেদমিথ্যাত্ব-স্থাপনের চেষ্টা করিয়াই নিরস্ত হন নাই, পরন্তু তাঁহার ব্যবহারিকতা প্রদর্শনের জন্যও বিশেষ যত্ন করিয়াছেন। ব্যবহারিকতা নিরাকৃত হইলে পারমার্থিকতা প্রকাশ পায়। এই পারমার্থিকতার স্বরূপবর্ণনে তিনি সেই বস্তুতত্ত্বের নির্দ্দেশ করিতে গিয়া তাহা নিরাকার, নির্ব্বিশেষ ও স্ত্রী-পুরুষ হইতে ভিন্ন ক্লীবব্রহ্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বস্তুকে রূপবান্ বিশেষযুক্ত পুরুষ বলিয়া স্বীকার করিলে, বস্তুতে ভেদধর্ম্মের ত্যাগ আশঙ্কা করিয়া শঙ্কর তাহা হইতে দূরে অবস্থান করিতে অভিলাষ করিতেছেন। শাঙ্করগণের এবম্প্রকার সিদ্ধান্ত স্থাপনের কারণ অনুসন্ধান করিলে জানা যায়, শাস্ত্র-বিচারে সঙ্গতিজ্ঞানের অভাবই তাঁহাদের মধ্যে পরিস্ফুট। বিরুদ্ধ বস্তুর সামঞ্জস্য স্থাপন করা কেবলমাত্র বস্তু-গতপ্রাণ ব্যক্তিদিগের মধ্যেই সম্ভবপর এবং বস্তুতে বিরুদ্ধ ধর্ম্মের যুগপৎ সমাবেশই বস্তুর ঐশ্বর্য্য। তাই আচার্য্য শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

"বিরুদ্ধধর্ম্মং তস্মিন্ ন চিত্রম্।" (তত্ত্বসূত্র)

—শ্রীগৌঃ পত্রিকা ১৯শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা।

বেদ-বর্ষ

আমরা (শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার) ক্রমে ক্রমে চন্দ্র-পক্ষ বর্ষদ্বয় মহানন্দে অতিবাহিত করিয়াছি। গত নেত্র-হায়নে নারসিংহ-হুঙ্কারে দক্ষিণদেশীয় চিন্তাস্রোত-প্রসূত শাঙ্কর-'বৃহন্নৃসিংহের' পক্ষদ্বয় বিদীর্ণ করিয়া সেবকতত্ত্বের অতিবাড়ী চিন্তাস্রোত প্রশমিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে হিরণ্যকশিপুর কনক-কামিনী-লোলুপতা বিধ্বংস হওয়ায় শ্রীপত্রিকার সেবকগণ প্রহ্লাদ-লাভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বেদ-বর্ষে ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সেবক শ্রীনারসিংহ-প্রহ্লাদ মহারাজ শ্রীনারদ-ব্যাসাদি-ভাগবত ধারায় নিষ্ণাত শ্রীপত্রিকার অপ্রাকৃত আলোচনা-দীপ্তিতে বেদবিরোধী শূন্যবাদী বা বেনামবাদী প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ শ্রমণগণের বিচার-অন্ধকার বিদূরিত করিয়া বিশ্ববাসীর নিকট বেদের নিগূঢ় তাৎপর্য্য উপস্থিত করিবেন।

যেরূপ গণিত-শাস্ত্রের ১, ২, ৩ সংখ্যাকে যথাক্রমে 'চন্দ্র', 'পক্ষ' ও 'নেত্র'-সংজ্ঞা দেওয়া হইয়া থাকে, সেইপ্রকার চতুর্থ-সংখ্যা বিজ্ঞাপনের জন্য 'বেদ'-শব্দ ব্যবহৃত হয়। বেদ-শব্দে চার (৪) সংখ্যা বিজ্ঞাপনের গূঢ় তাৎপর্য্য আমরা লক্ষ্য করিয়া থাকি। বেদের নাম 'ত্রয়ী' হইলেও ইহা চারি-সংখ্যাবাচক ; ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ব—এই চারিবেদের নাম 'ত্রয়ী'। ইহা বেদেরই একটী তাৎপর্য্য। এক (১) চন্দ্রের উল্লেখ থাকিলে তাহাতে

দ্বাদশমাসে দ্বাদশ আদিত্যের তেজ-প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং 'এক'-এর মধ্যে বহুত্বের অবস্থিতিই অদ্বিতীয়ত্ব। যাঁহারা একের মধ্যে বহুর অবস্থিতি অস্বীকার করেন, তাঁহারা স্বভাবতঃই ত্রয়ী-বিরোধী হইতে বাধ্য হন। ত্রিত্বের অন্তর্গত চতুঃসংখ্যা তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। এতদ্ব্যতীত 'বেদ'—এই শব্দের ধাতুনিষ্পন্ন অর্থ গ্রহণ করিতে গেলেও বেদ-শব্দে নিত্যসত্তাসহ সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-রূপ চারিটী প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। বেদ-শব্দে—বিদ্ ধাতু কর্ত্তৃবাচ্যে অথবা কর্ম্মবাচ্যে অল্ বা অন্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। কর্ত্তৃবাচ্যে 'বেদ'-শব্দের আভিধানিক অর্থ—'বিষ্ণু'; 'ব্রহ্ম' তাহার আপেক্ষিক অর্থ মাত্র। বিদ্-ধাতু চারিপ্রকার অর্থে-ই ব্যবহৃত হয়। পাণিনি প্রভৃতি বৈয়াকরণগণ বলেন,—

বেত্তি বেদ বিদো **জ্ঞানে** বিন্তে বিদো **বিচারণে**।
বিদ্যতে বিদ **সত্তায়াং লাভে** বিন্দতি বিন্দতে ॥

অর্থাৎ বিদ্ ধাতুর অর্থ—(১) জ্ঞান, (২) বিচারণ, (৩) সত্তা ও (৪) লাভ। সুতরাং বেদ-শব্দে জ্ঞান, বিচার, সত্তা ও লাভ—এই চারিটী তত্ত্বকেই লক্ষ্য করিয়া থাকে। এই চারিটী তত্ত্বের মধ্যে 'সত্তা' বস্তুটী নিত্যসত্তা-জ্ঞাপক অর্থাৎ বিদ্-ধাতুর অন্য তিনটী অর্থের নিত্য ও সনাতন অর্থ প্রকাশ করিতেছে। যাঁহারা ঐ ত্রয়ীর অথবা বেদের উক্ত 'জ্ঞান', 'বিচার' ও 'লাভ'-রূপ তত্ত্বত্রয়ের নিত্যসত্তা স্বীকার করেন না, তাঁহারাই প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ বা প্রকাশ্য-বৌদ্ধ। বেদ সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের নিত্যসত্তা প্রচার করেন। জ্ঞান-অর্থে—সম্বন্ধজ্ঞান বা অদ্বয়জ্ঞান, বিচারণ-অর্থে—অভিধেয়-তত্ত্ব, লাভ-অর্থে—প্রয়োজন বুঝায়। এবং এই সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজনমূলক তত্ত্বের নিত্যত্ব ও সনাতনত্ব বিদ্ ধাতু হইতে যে বেদ-শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা হইতেই প্রকাশ পায় এইজন্যই নিত্যসত্তা-সমন্বিত বেদের অপর নাম—ত্রয়ী। সত্তা সর্ব্বক্ষেত্রেই অবশ্য স্বীকৃত বলিয়া কোন কোন ক্ষেত্রে চতুর্থ সংখ্যায় তাহার গণনা করা হয় নাই। যাহা সর্ব্ববাদিসম্মত, তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। মূর্ত্তিমন্ত বেদ-হৃদয় শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার অপ্রাকৃত লেখনী-ধারায় সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন সম্বন্ধে জানাইয়াছেন—"অদ্বয়**জ্ঞান**-তত্ত্ব, ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন।" "অদ্বয়**জ্ঞান**-তত্ত্ব কৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান্।" ইহাই বেদ-শব্দের জ্ঞান-অর্থজ্ঞাপক। 'অভিধেয়' ও 'প্রয়োজন' সম্বন্ধে আমরা জানিতে পারি—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দয়া করহ **বিচার**।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৮।১৫)

ইহাই বেদ-শব্দে 'বিচারণ' অর্থে অভিধেয়-তত্ত্ব—কৃষ্ণভক্তি এবং 'লাভ'-অর্থে প্রয়োজনমূলা—কৃষ্ণপ্রীতিরূপা চমৎকারিতা। সম্বন্ধ-তত্ত্বে অদ্বয়জ্ঞান কৃষ্ণ, অভিধেয়-তত্ত্বে ভগবদনুগ্রহের বিচার ও প্রয়োজন-তত্ত্বে কৃষ্ণপ্রীতির চমৎকারিতা—এই তত্ত্বত্রয় নিত্য-

সত্তাবিশিষ্ট। ইহার কোনপ্রকার ধ্বংস বা বিলোপ সাধিত হয় না। ইহাই বেদের সত্তাজ্ঞাপক। যাঁহারা প্রয়োজন লাভ করিয়া অভিধেয় পরিত্যাগ করেন, তাঁহারা অবৈদিক। অথবা যাঁহারা কেবল-জ্ঞানের বিচার করিয়া 'জ্ঞেয়' এবং 'জ্ঞাতার' অস্তিত্ব স্বীকার করেন না বা উহা প্রাতিভাসিক ও ক্ষণিক বলিয়া মনে করেন, তাঁহারাও অবৈদিক।

—শ্রীগৌঃ পত্রিকা ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা।
২৭ ফাল্গুন, ১৩৫৮ (বঃ), ১১।৩।১৯৫২ ইং।

দশমে দশম লক্ষণ

দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয়-বিগ্রহম্।
শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তৎ ॥
(ভাঃ ১০।১।১-স্বামি-টীকা)

আমরা (শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার) ৯ম বর্ষ অতিক্রম করিয়া ১০ম পরিক্রমের আয়োজন করিয়াছি। দশমের অন্তর্গতই নয়টী লক্ষণ বা নব লক্ষণ। শাস্ত্রকারগণ দশমের বিশেষ আদর করিয়াছেন। তত্ত্ব-নিরূপণ করিতে গিয়া আচার্য্যবর্গের মধ্যে অনেকেই দশমের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন। আচার্য্য-সমাজের মূল পুরুষ শ্রীল কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস স্বয়ংই দশমের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, যাবতীয় প্রথম হইতে নবম তত্ত্ব পর্য্যন্ত সমস্তই দশমের অন্তর্গত—বিচার করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধ ইহার উপরই প্রতিষ্ঠিত। ভাগবতের ২য় স্কন্ধ ১০ম অধ্যায়ে ইহার নির্দ্দেশ দিয়াছেন—

অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ স্থানং পোষণমূতয়ঃ।
মন্বন্তরেশানুকথা নিরোধো মুক্তিরাশ্রয়ঃ ॥ ১ ॥
দশমস্য বিশুদ্ধ্যর্থং নবানামিহ লক্ষণম্।
বর্ণয়ন্তি মহাত্মানঃ শ্রুতেনার্থেন চাঞ্জসা ॥ ২ ॥

এই শ্লোকদ্বয় অবলম্বন করিয়া জগদ্গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যে লিখিয়াছেন—এই ভাগবত-শাস্ত্রে সর্গ, বিসর্গ, স্থান, ঊতি, পোষণ, মন্বন্তর, ঈশকথা, নিরোধ, মুক্তি ও আশ্রয়—এই দশটী বিষয় বিবৃত হইয়াছে। দশমতত্ত্ব যে আশ্রয় তাহার বিশুদ্ধ আলোচনার জন্য পূর্ব্ব নয়টী লক্ষণ মহাত্মগণ কোন স্থলে স্তুতি ও আখ্যানছলে ও কোন স্থানে সাক্ষাদ্ বিচারের দ্বারা বর্ণন করিয়াছেন। দশম স্কন্ধে আশ্রিতগণের

"আশ্রয়"—বিগ্রহস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ লক্ষিত হইয়াছেন। সেই শ্রীকৃষ্ণাখ্য পরমধাম ও জগদ্ধামকে আমি নমস্কার করি। তাৎপর্য্য এই যে,—জগতে দুইটী তত্ত্ব আছে। অর্থাৎ, আশ্রয় ও আশ্রিত। যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া সমস্ত আশ্রিত তত্ত্ব বর্ত্তমান, সেই মূলতত্ত্বই আশ্রয়। সেই তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া যে সকল তত্ত্ব আছেন, তাঁহারা সকলেই আশ্রিত তত্ত্ব। 'সর্গ' হইতে 'মুক্তি' পর্য্যন্ত সমস্ত আশ্রিত তত্ত্ব। সুতরাং পুরুষাবতার ও তদন্তগত সমস্ত অবতার, সমস্ত শক্তি, তদন্তগত জৈব ও জড় জগৎ সকলেই সেই কৃষ্ণরূপ আশ্রয়ের আশ্রিত। ভাগবতে স্তব ও আখ্যান ছলে কিঞ্চিৎ গৌণরূপে এবং সাক্ষাদ্ উপদেশ ছলে সাক্ষাদ্ আশ্রয় তত্ত্বেরই বিচার করিয়াছেন। অতএব কৃষ্ণের স্বরূপ ও শক্তিত্রয় জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা আছে।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

কৃষ্ণের স্বরূপ আর শক্তিত্রয় জ্ঞান।
যার হয় তার নাহি কৃষ্ণেতে অজ্ঞান॥ (চৈঃ চঃ আঃ ২।৯৬)

সুতরাং 'দশমস্য বিশুদ্ধ্যর্থং' অর্থাৎ দশমতত্ত্বের বিশুদ্ধ আলোচনার জন্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব 'নবানামিহলক্ষণম্'।

পরতত্ত্বই অচিন্ত্য ভেদাভেদতত্ত্ব। উক্ত অচিন্ত্যভেদ ও অভেদ-তত্ত্ব বলায় বস্তু বা তত্ত্বটী অদ্বয় বা অভেদ নহে। যাহারা অচিন্ত্য-ভেদাভেদকে 'অভেদবাদে' পরিণত করিতে চেষ্টা করেন, তাহারা নিতান্তই ভ্রান্ত। আমরা শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদের গ্রন্থে দেখিয়াছি—'বৈষ্ণবমাত্রেই অদ্বৈতবাদী বা অভেদবাদী'। বৈষ্ণবগণের সম্বন্ধে এইরূপ উক্তি অত্যন্ত হাস্যাস্পদ এবং দার্শনিক জ্ঞানের সম্পূর্ণ অভাবমূলা। তিনি শ্রীল জীব গোস্বামীকেও স্পষ্ট-ভাবে 'অভেদবাদী' রূপে অঙ্কিত করিতে কোন দ্বিধা বোধ করেন নাই, ভীতও হন নাই। আমরা 'অচিন্ত্যভেদাভেদ' প্রবন্ধে তাহা বিস্তৃত আলোচনা করিতেছি ও করিব। শ্রীল সনাতন গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'বৈষ্ণব তোষণীর' প্রারম্ভেই লিখিয়াছেন—

"**নাভেদবাদ** ইত্যেষ নালেখি ক্ষম্যতামিদম্।"

এক আশ্রয়-তত্ত্বের অন্তরালে নয়টী তত্ত্ব ক্রোড়ীভূত হইয়া অবস্থিতি করিতেছে। সুতরাং দশম এক বচনাত্মক শব্দ হইলেও তাহাতে আরও নয়টী তত্ত্ব আশ্রিতরূপে নিত্য বর্ত্তমান। এই বিচার পরিত্যাগ করিলে মায়াবাদীর ন্যায় অভেদবাদী হইতে হয়। বেদের পূরণকারী পুরাণসমূহ দশলক্ষণে পরিপূর্ণ। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যের পূর্ব্বাচার্য্য মধ্বমুনির বিচারধারাও দশলক্ষণে লক্ষিত। 'মধ্ব প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং'—ইত্যাদি শ্লোকেই তাহার প্রমাণ। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনমূলক তত্ত্ব-সমূহ 'আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়ঃ' শ্লোকে নবতত্ত্বান্বিত দশমের কথাই বিচারিত হইয়াছে। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ দশমূল রচনা করিয়া সমগ্র বিশ্ববাসীকে দশমের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞাপন করিয়াছেন।

আমরা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ধারায় স্নাত হইয়া সারস্বত ধারায় অবস্থিত থাকিব। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর দশমূল, আম্নায়-দশমূল, ভগবদ্গীতা-দশমূল, ভাগবত-দশমূল, চরিতামৃত-দশমূল প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া বর্ত্তমান বিশ্বের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। সমগ্র দশমূল গ্রন্থ সমূহের নির্য্যাস-স্বরূপ পৃথক্ আরও একটী 'দশমূল-নির্য্যাস' শীর্ষক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। তিনি এই 'নির্য্যাস'-গ্রন্থে লিখিয়াছেন —দশমূলকে 'যিনি হেলা করিবেন তাঁহার কৃষ্ণ-ভক্তি সৃষ্ঠু হইবে না'। সুতরাং নবধা ভক্তিলাভের একমাত্র উপায়-স্বরূপ—দশমূলনির্য্যাস আলোচনা করা।

যাহারা অদ্বয় বা অদ্বৈতবাদী অথবা অভেদবাদী, তাঁহারা সর্ব্বত্রই ভেদ বা বৈশিষ্ট্যের স্বীকার করিতে নারাজ। একত্বই তাহাদের মূল স্বরূপ। এক বই দুই এর কোন কথা তাহাদের চিন্তার ভিতরে গ্রহণ করিতে অক্ষম। আমরা তাহাদের অক্ষমতায় বিশেষ লজ্জিত হইতেছি। 'এক'-শব্দ বহুত্বের পরিপোষক অথবা বহুত্বের সেবক, গোলাম বা দাস। বহুত্ব স্বীকৃত না হইলে একত্বের কোন মূল্য নাই। বিশেষতঃ এক বলিয়া কোন বস্তুরই অধিষ্ঠান দশ-প্রমাণের দ্বারা লক্ষিত হয় না। প্রমাণ-দশকের বহির্ভূ'ত কোন তত্ত্ব যাহারা স্বীকার করিতে চেষ্টা করেন তাহারা ভ্রান্ত, নাস্তিক ও অসুর শ্রেণীভুক্ত তাহারা এক বলিতে কি ধারণা করিয়া থাকেন? আমরা বলিতে চাই—এক 'আশ্রয়'-তত্ত্বই যাবতীয় আশ্রিত তত্ত্বের মূল আশ্রয়-বিগ্রহ। এই শ্রেণীর একের অন্তর্গত দ্বিত্ব, ত্রিত্ব, বহুত্ব প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। সুতরাং দশম শুধু দশম নহে—ইহার অন্তর্গত বহু লক্ষিত হইতেছে ও হইবে।

—শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা ১০ম বর্ষ।১ম সংখ্যা।
২১ ফাল্গুন ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ, ৫।৩।১৯৫৮ ইং

গৌড়ীয়ের ত্রয়োদশ বর্ষ

আমরা (শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার) ত্রয়োদশ-বর্ষারম্ভে ত্রয়োদশ-আম্নায়-পরম্পরার কীর্ত্তন করিয়া মঙ্গলাচরণ করিয়াছি। গৌড়ীয়গণের গুরু-পরম্পরা,—"শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্ম-দেবর্ষি-বাদরায়ণ-সংজ্ঞকান্, শ্রীমধ্বঃ" প্রভৃতি হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভু, বলদেব ও মদীয় গুরুপাদপদ্ম জগদ্গুরু শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের বন্দনা করিয়াছি। সামান্য লক্ষণের দ্বারা শ্রৌত পারম্পর্য্য কীর্ত্তন করিয়া বিশেষ লক্ষণে 'সত্যং পরং ধীমহি'-মন্ত্রে পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণই "তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদিকবয়ে"-মন্ত্রে ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদ প্রকাশ করেন। ব্রহ্মা নারদের নিকট, নারদ বাদরায়ণ ব্যাসের নিকট, ব্যাস শুকদেবের

নিকট, এবং শুকদেব তাঁহার নিজ শিষ্য পরীক্ষিতের নিকট পর পর শ্রৌত বাণী কীর্ত্তন করেন।—ইহাই প্রাগৈতিহাসিক যুগের গুরুপরম্পরা। ঐতিহাসিক যুগে শ্রীমধ্বমুনি পরীক্ষিতের অধস্তন-স্বরূপ ব্যাসদেবের শিষ্যরূপে পরিচয় দিয়াছেন। আমরা সকলেই ব্যাসানুগত। মধ্বমুনি বা যে-কোন ধর্ম্ম-প্রচারক ব্যাসানুগত্য পরিত্যাগ করিলে তাঁহাদের আম্নায়-ধারা রক্ষিত হয় না, বা শাস্ত্রীয় বৈদিক বিচার-ধারা শুদ্ধ ও সুষ্ঠু হয় না। বেদব্যাস ইহা তাঁহার বেদান্তদর্শনে বেশ ভাল করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তজ্জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রকৃত বৈয়াসকি-সম্প্রদায়ের ঐতিহাসিক আচার্য্য শ্রীমধ্বমুনিকেই সাম্প্রদায়িক গুরুরূপে অঙ্গীকার করেন। মধ্ব-সম্প্রদায়ের বিচার ন্যূনাধিক বিপর্য্যস্ত হইতে থাকিলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুই তাঁহার শ্রী বা সৌন্দর্য্য বিধান করেন। মধ্ব-সম্প্রদায়ে সেই সৌন্দর্য্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর কুলেই বিকশিত হয়। সেই গৌর-কুলের একমাত্র রক্ষক বেদান্তাচার্য্যকুল-মুকুটমণি শ্রীবলদেব এবং শ্রীচৈতন্য-সম্প্রদায় নানারূপে আক্রান্ত, বিপর্য্যস্ত ও অধঃপতিত হইতে থাকিলে শ্রীবলদেবাভিন্ন জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরই শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পালক, রক্ষক ও পরিপোষক-রূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এইজন্য তিনি **ওঁ বিষ্ণুপাদ** শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী।

ত্রয়োদশ-সংখ্যা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য-ধারণায় সাধারণতঃ অনুপাদেয় সংখ্যা বলিয়া জনসাধারণের নিকট পরিচিত। আমরা ত্রয়োদশ-অপসম্প্রদায়ের দ্বারা অশুভ গণনা করিয়া থাকি। কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক যুগে, এমন কি, শ্রীব্যাসদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বেও সংখ্যাগত বিবিধ তত্ত্বের উল্লেখ দেখিতে পাই। চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্ব বা পঞ্চবিংশতি-তত্ত্ব প্রকৃতির অন্তর্গত বলিয়া প্রাকৃত-তত্ত্ব-সংখ্যা আমাদের দেশে আজও প্রচুর প্রচলিত আছে। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক প্রকার তত্ত্ব-সংখ্যার উল্লেখ শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে পরিদৃষ্ট হয়। এক সময়ে শ্রীউদ্ধব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—

কতি তত্ত্বানি বিশ্বেশ সংখ্যাতানৃষিভিঃ প্রভো।

* * * *

কেচিৎ সপ্তদশ প্রাহুঃ ষোড়শৈকে **ত্রয়োদশ** ॥ (ভাঃ ১১।২২।১-২)

হে বিশ্বেশ, হে প্রভো ! ঋষিগণ-কর্ত্তৃক বর্ণিত তত্ত্বসমূহ কতপ্রকার সঙ্গত বলিয়া মনে করেন ? কেহ সপ্তদশ, কেহ বা ষোড়শ, আবার **কেহ বা ত্রয়োদশ-তত্ত্বের** বর্ণনা করিয়া থাকেন। উক্ত প্রশ্নের উত্তরে ভগবান বলিলেন,—"যুক্তঞ্চ সন্তি সর্ব্বত্র ভাষন্তে ব্রাহ্মণা যথা।" (ভাঃ ১১।২২।৪)

অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহা সমস্তই যুক্তিসঙ্গত। যদিও যাবতীয় সংখ্যা-তত্ত্ব ভগবন্মায়াদ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াই উদ্ভূত হইয়াছে, তথাপি সকলেই

কিছু না কিছু যুক্তি অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের স্ব-স্ব-মত স্থাপন করিয়াছেন। যুক্তিসঙ্গত হইলেই তাহা গ্রহণযোগ্য—এরূপ বিচার নহে। প্রকৃত সিদ্ধান্ত-সম্মত হওয়া আবশ্যক। আমাদের বর্ত্তমান বর্ষের আলোচ্য বিষয়—ত্রয়োদশ-সংখ্যা। অর্থাৎ ত্রয়োদশ-তত্ত্ব বলিলে কি বুঝাইবে? এই ত্রয়োদশ-তত্ত্ববাদিগণ বলেন,—"ভূতেন্দ্রিয়ানি পঞ্চৈব মন **আত্মা** ত্রয়োদশ॥" (ভাঃ ১১।২২।২৩)

অর্থাৎ—পাঁচ প্রকার ভূত, পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয়, মন ও আত্মা লইয়া ১২টী হইতেছে। মূল শ্লোকে উহাকেই ত্রয়োদশ-সংখ্যা বলা হইয়াছে অর্থাৎ 'আত্মা' এই শব্দটীকে জীবাত্মা ও পরমাত্মা-স্বরূপ দুইটী পৃথক্ তত্ত্বরূপে গৃহীত হওয়ায় সংখ্যা ত্রয়োদশ হইয়াছে। মূল শ্লোকে 'আত্মা'-শব্দ এক হইলেও উহাকে দুইটী তত্ত্বরূপেই গ্রহণীয়। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য বলেন,—"আত্ম-শব্দেন চ ব্রহ্মা পরমাত্মা চোভাবুচ্যতে।" আরও বলিয়াছেন,—"আত্মেতি পরামাত্মা চ বিরিঞ্চিশ্চাপি কথ্যতে।" অর্থাৎ 'আত্মা'-শব্দের দ্বারা ব্রহ্মা বা বিরিঞ্চি এবং পরমাত্মা উভয়কেই বলা হয়। সুতরাং 'আত্মা'-শব্দের দ্বারা জীবাত্মা এবং পরমাত্মাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। ব্রহ্মা জীবকোটীর অন্তর্গত। ত্রয়োদশ-তত্ত্ববাদী যে ত্রয়োদশটী তত্ত্বের সংখ্যা করিয়াছেন, তাহার মধ্যেই সকলের সমস্ত তত্ত্ব অন্তর্নিহিত আছে। সুতরাং ত্রয়োদশ সংখ্যা কোন কোন ক্ষেত্রে অশুভ নির্দ্দেশক হইলেও সকল তত্ত্বসমূহকে ক্রোড়ীভূত করিয়া ত্রয়োদশ-তত্ত্ব-সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। অতএব আমাদের এই ত্রয়োদশ-তত্ত্বে সর্ব্বোচ্চ অষ্টাবিংশতি তত্ত্বের আলোচনাও অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

বেদান্ত-ভাষ্যকার-মুকুটমণি শ্রীবলদেব তত্ত্ব-সংখ্যার কথা বলিতে গিয়া জানাইয়াছেন,—ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম্ম—এই পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে সমস্তই অনুস্যূত আছে। সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া দেখিলে এই ত্রয়োদশ-তত্ত্বও শ্রীবলদেব-ভাবিত পঞ্চ-তত্ত্বের অন্তর্গত। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের উপাস্য পঞ্চতত্ত্বেরও অন্তর্ভুক্ত এই ত্রয়োদশ-তত্ত্ব।

যাঁহারা তত্ত্বের একত্ব স্বীকার করেন তাঁহারা ভাগবত-বিরোধী; সুতরাং গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণেরও বিরোধী। আমরা সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের কতিপয় গ্রন্থে তাহার এই তত্ত্ব বিরোধ লক্ষ্য করিয়াছি। তিনি বলিতে চাহেন,—তত্ত্ব এক, দুই বা বহু নহে। তিনি তত্ত্বের অদ্বয়ত্ব স্বীকার করিতে গিয়া গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণকেও অদ্বৈতবাদী বলিয়াছেন। তাহার মতে, শ্রীমজ্জীব গোস্বামী প্রভুপাদও অদ্বৈতবাদী—অর্থাৎ অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তাঁহার মত নহে; বাহ্যতঃ অচিন্ত্য-ভেদাভেদ বলিলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে তিনি অদ্বৈতবাদী। আমরা বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের এইরূপ বিচারকে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক, যুক্তিবিরুদ্ধ ও অসঙ্গত স্থির করিয়াছি।

বস্তুর অদ্বয়ত্বের মধ্যে সেব্য-সেবক-ভাব বহুত্বরূপে অবস্থিত না থাকিলে নির্ব্বিশেষবাদ হইয়া পড়ে। এমন কি, ভক্তিদেবীর অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ধ্বংস করা হয়। অনেকে ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞানের প্রাধান্য দিতে গিয়া আসুরিক চিন্তার আবাহন করেন। এইরূপ শ্রেণীর লোকের মধ্যে আমরা বিচার করিতে দেখিয়াছি,—ভক্তির সরলতা বা তরলতা তাহাদের রুচি-বিরুদ্ধ। তাহাদের মতে,—ভক্তির 'তরলতা' অপেক্ষা জ্ঞানের গরলতা অনেক উপকারী। তাহাদের বিচারে ভক্তির সরলতা অপেক্ষা জ্ঞানের কুটিলতাই দার্শনিকতা। আমরা জ্ঞানের গরলতার পক্ষপাতী জীবগণকে আত্মহত্যাকারী বলিয়া মনে করি। ভক্তি-রসের তরলতায় মুগ্ধ হইয়া যাঁহারা "রসো বৈ সঃ" তত্ত্ববস্তুর সেবানন্দে নিমগ্ন, তাঁহারা অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু যাহারা জ্ঞানের গরল বিষ পান করিয়া আত্মহত্যা করিয়া থাকেন, অর্থাৎ নিজেকে ব্রহ্মে লয় করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন, তাহারা আত্মঘাতী। আত্মহত্যা পাপ তাহাদিগকে 'অন্তরীণ' দণ্ডে দণ্ডিত করিয়া নরকস্থ করে।

ভক্তি ব্যতীত মনুষ্য-জগতের আর কোন করণীয় থাকিতে পারে না। প্রাণীমাত্রেরই ভগবদ্ভক্তিই স্বাভাবিক বৃত্তি। অন্যান্য ক্রিয়াসকল ভগবদ্ভক্তির অনুকূল হইলেই তাহার সার্থকতা সাধিত হয়। তাহা না হইলে সমস্তই নিরর্থক। সার্থক ক্রিয়াই ভক্তি, নিরর্থক ক্রিয়াই কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ-তপস্যা ইত্যাদি। ভক্তিই প্রাণীমাত্রকে ক্রিয়াশীল করে, অন্য উপায়গুলি নিষ্ক্রিয় করিয়া জীবকে প্রস্তরের ন্যায় স্থবীর ও অধঃপাতিত করে। ভক্তিই সমগ্র শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। সাধারণতঃ দেখা যায়, বিরুদ্ধ বস্তু বিরুদ্ধ বস্তুর সহিত বিরোধ করে বা গৌরব করে; সেইরূপ মূর্খ লোকগুলিই জ্ঞানের প্রাধান্য দেয়। অজ্ঞানের নিকট জ্ঞানের প্রতিপত্তি স্বাভাবিক; কিন্তু যাহাদের বাস্তব জ্ঞান স্বভাবসিদ্ধ, তাঁহাদের ভক্তিই একমাত্র বৃত্তি।

কেহ বলেন,—ভক্তির সংজ্ঞাতে কর্ম্ম-জ্ঞানের স্থান না থাকায় ভক্তি নিষ্ক্রিয় বা অজ্ঞান। ইহা মূর্খ লোকেরই উক্তি। যে কর্ম্ম ধ্বংস হইয়া যায় বা যে জ্ঞান নিজ অস্তিত্ব হারায়, সেই জ্ঞান ও কর্ম্ম ভক্তির দাসত্ব করিতে অক্ষম। কারণ ভক্তিই নিত্যা বৃত্তি। নিত্য-জ্ঞান ও নিত্য-কর্ম্ম—ভক্তির দুইটি চরণ। সুতরাং যাহারা নির্গুণ ভক্তির সম্মান রাখিবার সৌভাগ্য লাভ করেন নাই, তাহারাই দুর্ভাগ্যবশতঃ অনিত্য কর্ম্ম-জ্ঞানে আসক্ত। ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ প্রাপ্ত হইলে কর্ম্ম-জ্ঞান হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ভাগ্যবান জীব ভক্তির দাস-দাসী হইবার যোগ্যতা লাভ করিবেন। * * *

—শ্রীগৌঃ পত্রিকা ১৩শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা।

গৌড়ীয়ের বিংশ বর্ষ

আমাদের গৌড়ীয়ের বিংশ বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু চলিত কথায় বিংশ শতাব্দীর সুনাম ও বদনাম উভয়ই রহিয়াছে। বিংশ শতাব্দীর যুগকে কেহ কেহ জ্ঞানবিকাশের যুগ বলিয়া দাবী করেন। এই জ্ঞান যে অজ্ঞান, তৎসম্বন্ধে আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। প্রকৃত প্রস্তাবে যাহা জ্ঞান নহে, পরন্তু অজ্ঞান, তাহাই আজকাল জ্ঞান-নামে চলিতেছে। তজ্জন্য নানাশাস্ত্রের প্রমাণ উদ্ধৃত হইতেছে; এমন কি, বেদান্ত-দর্শনেও 'জ্ঞান'-শব্দের প্রয়োগ না থাকিলেও বেদান্তের জ্ঞানপর ব্যাখ্যাই আজকাল তথাকথিত শিক্ষিত সমাজে আদর লাভ করিতেছে। তাহারা গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখেন নাই যে, বেদান্তদর্শনে 'জ্ঞান'-শব্দের উল্লেখ কুত্রাপি নাই। অথচ জ্ঞানপর ব্যাখ্যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চলিতেছে। শাণ্ডিল্যঋষি ইহা প্রমাণ করিয়াছেন; শ্রীবেদব্যাস শাণ্ডিল্যঋষির নাম স্কন্দপুরাণের একাধিক ক্ষেত্রে তারস্বরে জানাইয়াছেন। "বেদান্ত-দর্শন" গ্রন্থখানি ভক্তিশাস্ত্র। উহাকে জ্ঞানশাস্ত্র বলা নিতান্ত অন্যায়। শাণ্ডিল্য বহু প্রাচীন কালের ঋষি। সুতরাং তিনি বেদব্যাসের সমসাময়িক। স্কন্দপুরাণের বিষ্ণুখণ্ডে শ্রীভাগবত-মাহাত্ম্যের ১ম অধ্যায়ে বেদব্যাস লিখিয়াছেন—

ইত্যুক্তো বিষ্ণুরাতস্তু নন্দাদীনাং পুরোহিতম্।
শাণ্ডিল্যমাজুহাবাশু বজ্র-সন্দেহনুত্তয়ে ॥ ১৬ ॥
অথোটজং বিহায়াশু শাণ্ডিল্যঃ সমুপাগতঃ।
পূজিতো বজ্রনাভেন নিষসাদাসনোত্তমে ॥ ১৭ ॥

উক্ত শ্লোকের মর্ম্মানুবাদ এই যে, রাজা বিষ্ণুরাত বজ্রনাভ-কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহার সন্দেহ দূরীকরণ জন্য নন্দগোপাদির পুরোহিত "ঋষি শাণ্ডিল্যকে" আহ্বান করিলেন। রাজার আহ্বানে "ঋষি শাণ্ডিল্য" পর্ণকুটীর পরিত্যাগপূর্ব্বক সত্বর তথায় আসিয়া উপনীত হইলেন। অনন্তর বজ্রনাভ তাঁহাকে পূজা করিয়া উপবেশনার্থ উত্তম আসন দান করিলে ঋষি তাহাতে উপবেশন করিলেন।

শাণ্ডিল্য ঋষিও বেদব্যাস রচিত ব্রহ্মসূত্র বেদান্তদর্শন বা উত্তরমীমাংসা সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন—"ব্রহ্মকাণ্ডং তু ভক্তৌ তস্যানুজ্ঞানায় সামান্যাৎ"। (শাঃ সূঃ ১।২।২৬) অর্থাৎ "ব্রহ্মকাণ্ড ভক্তির জন্যই শ্রুত আছে, জ্ঞানের জন্য নহে। কখনও অনুরাগ ভিন্ন জ্ঞান সম্ভব হয় না। যদি অনুরাগ ভিন্ন জ্ঞান জন্মিত, তাহা হইলে জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতাহেতু জ্ঞানকাণ্ডকেই উত্তরকাণ্ড বলা হইত। সুতরাং জ্ঞানকাণ্ডই যে উত্তরকাণ্ড বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে, তাহা ভ্রান্তিপূর্ণ; কিন্তু ব্রহ্মকাণ্ডই উত্তরকাণ্ড। উক্ত সূত্রের আচার্য্য স্বপ্নেশ্বর-কৃত ভাষ্যেও এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—"ভক্ত্যর্থং ব্রহ্মকাণ্ডং শ্রূয়তে, ন জ্ঞানার্থম্। * * *

তস্মাজ্ জ্ঞানকাণ্ডমিতি ভ্রমঃ। কিন্তু ব্রহ্মকাণ্ডমেব। অতএব (ব্রহ্মসূত্রে পাঃ ১ সূত্র ১) "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" ইতি সূত্রিতম্। তত্তু ভক্ত্যর্থত্বাদ্ভক্তিকাণ্ডমপীতি ॥ ২৬ ॥"

শাণ্ডিল্যসূত্রে বেদান্তদর্শনকে 'ভক্তিশাস্ত্র' বলিয়াছেন। 'শাস্ত্র' বলিতে ভক্তিশাস্ত্রকেই বুঝায়। কোন কোন জ্ঞানপন্থী জোরপূর্ব্বক বেদান্তদর্শনের জ্ঞানপর ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। অথচ বেদান্তদর্শনের মধ্যে 'জ্ঞান'-শব্দই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আচার্য্য শঙ্কর জগতে আসুরিক বৃত্তি অন্যায়ভাবে চালাইবার জন্য কয়েকটী শব্দ আহ্বান করিয়াছেন। ইহা ব্রহ্মসূত্রের কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হয় না। বেদান্তদর্শনে 'জ্ঞান'-শব্দ এবং জ্ঞানের মূল উপাদান 'নির্ব্বিশেষ'-শব্দ কুত্রাপি নাই। এতদ্ব্যতীত 'নিরাকার', 'নির্ব্বিশেষ', 'নির্গুণ', 'নিঃশক্তিক' শব্দগুলিও বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্রের কোনস্থলে উল্লেখ করেন নাই। তথাপি শঙ্করাচার্য্য বেদান্ত-ভাষ্যে উক্তরূপ শব্দের দ্বারা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানের কথা স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। উহাকে জবরদস্তি বা গায়ের জোর বলা যাইতে পারে। উক্ত শব্দ কয়টীই আচার্য্য শঙ্করের সিদ্ধান্তের সার। তাই তিনি বুঝিয়াছিলেন, তত্ত্ববস্তুকে নিরাকার, নির্ব্বিশেষ, নিঃশক্তিক প্রতিপন্ন করিতে না পারিলে তাঁহার নাস্তিক্য-দর্শনের কোন কথাই স্থাপিত হইবে না। ইহাকেই বিংশ শতাব্দীর বিক্রিয়া বলিতে হইবে। বহু পূর্ব্বে শঙ্করাচার্য্যের সৃষ্ট এই নাস্তিক্য মতবাদ বিংশ-শতাব্দীর অন্তিমকালে ষোলকলায় পূর্ণ হইয়াছে। তাঁহার আবির্ভাব-কালে বেদান্তের এই বিচার বহুল পরিমাণে নিরস্ত হইয়া শুদ্ধবৈষ্ণবসিদ্ধান্ত ভারতে প্রবলভাবে প্রচারিত হইয়াছে। 'ব্রহ্ম' যদি নির্গুণ হয়, তবে তাহাতে দয়ার কোনরূপ লেশমাত্রও নাই, ইহাই প্রতিপন্ন হয়। যাহার মধ্যে দয়া-গুন নাই, তাহার উপাসনা দ্বারা কি লাভ হইবে? এরূপ উপাসনাদ্বারা নির্দ্দয়তাই—অপরাধই মনুষ্য-স্বভাবকে আক্রমণ করিতে বাধ্য করে।

আমরা তজ্জন্য নিরীশ্বর-চিন্তার বিন্দুমাত্রও প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত নহি। নাস্তিক্য-চিন্তা ভারতের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে হেয় ও ঘৃণিত। ভারতবর্ষে এইরূপ নাস্তিক্য চিন্তার বহু ঋষি, আচার্য্য জন্মগ্রহণ করিয়া এই ভূখণ্ডকে তাঁহাদের সম্প্রদায়ভুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু কোনদিনই তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। প্রত্যক্ষ জীবনই তাহাদের আদ্যন্ত জীবন, ভবিষ্যৎ জীবন কাল্পনিক বলিয়া তাঁহারা তাহা উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। যাহা সত্য, তাহা ধ্বংস হইবার নহে। আজকাল রাষ্ট্রের যে-প্রকার বিধি-বিধান চলিতেছে, তাহাতে শীঘ্রই দেশ হইতে ধর্ম্মের আলোচনা একপ্রকার উঠিয়া যাইবে। ধর্ম্মনিরপেক্ষতার নামে বিপক্ষতার আশ্রয় দিব কেন? "নিরপেক্ষ না হইলে ধর্ম্ম না যায় রক্ষণে।"—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এই নিছক সত্যকথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। নিরপেক্ষতা বজায় রাখিতে গিয়া সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর বিপদের সম্মুখীন হইতে হয়, তাহাও আলিঙ্গন করিয়া সমগ্র বিশ্বকে আদর্শ শিক্ষা দিতে হইবে।

—শ্রীগৌঃ পত্রিকা ২০শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা।

সমালোচনা-মূলক প্রবন্ধ—

জীব-সেবা ও জীবে দয়া

"জীব-সেবা" ও "জীবে দয়া" এই বিষয় দুইটীর পার্থক্য বোধ হয় অনেকেই তলাইয়া দেখেন না। অধিকাংশ স্থলেই "জীব-সেবা" ও "জীবে দয়া"—এই বিষয়-দ্বয়ের বৈশিষ্ট্য-বিচারের অভাবে আমরা এক করিতে আর এক করিয়া বসি—'শিব' গড়িতে 'বানর' গড়িয়া থাকি। জগতে অনেকে "মনীষী", "উদারচেতা", "পরোপকারী", "সমাজবন্ধু", "বিশ্ববন্ধু" নামে পরিচিত হইবার বাসনা করেন, কিন্তু বস্তুবিচারের অভাবে তাঁহাদের যাবতীয় কার্য্য পণ্ডশ্রমমাত্রে পর্য্যবসিত হয়। জগতের লোক যেরূপ দেহারামী ও স্ব-সুখ বাঞ্ছায় মগ্ন, তাহাতে যদি কোন ব্যক্তিতে বিন্দুমাত্রও অপরের সেবা-প্রবৃত্তির চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়, তাহা হইলে উহাই পরম-প্রশংসার বিষয় হইয়া থাকে। 'পর-সেবা' জিনিষটী উত্তম, কিন্তু পরসেবা না হইয়া যদি "পর-ছলনা" হইয়া পড়ে, তাহা কখনও প্রশংসনীয় হইতে পারে না। "ছলনা"র উপর "সেবা"র 'লেবেল' ও 'ট্রেডমার্ক' লাগাইয়া বাজারে কোনপ্রকারে চালাইতে পারিলেই যে তাহা প্রকৃত-প্রস্তাবে "সেবা" শব্দ-বাচ্য হইবে, তাহা বিংশ-শতাব্দীর বিচারপরায়ন সভ্য মানব-সমাজ কি একবার বিচার করিয়া দেখিবেন না?

"পরসেবা", "পর-উপকার" প্রভৃতি কথার "পর"-শব্দে "শ্রেষ্ঠ" বা "পরমাত্মা বিষ্ণু" লক্ষিত হইলে পরাত্মার সেবা বা শ্রেষ্ঠের সেবাই স্থিরীকৃত হয়। জীব "পর" অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ হইলেও অনর্থযুক্তাবস্থায় ত্রিগুণে আবদ্ধ—

"যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে॥" (ভাঃ ১।৭।৫)

ত্রিগুণাত্মক মায়ার দ্বারা আবৃত ও বিক্ষিপ্ত চিত্ত অনাদি-বদ্ধ জীবের সেবা—অনর্থাবৃত-অবস্থারই সেবা অর্থাৎ ভোগ-মাত্র। "সেবা"-শব্দের সহিত কএকটী বিষয় অবিচ্ছিন্নরূপে সংশ্লিষ্ট। প্রথমতঃ "সেবা" বলিতেই আদৌ ইহা বিবেচ্য যে, যে-বস্তুর প্রতি সেবা প্রযুক্ত হইবে, সেই বস্তুবিশেষ "সেব্য" বা "প্রভু"-তত্ত্ব কি না; দ্বিতীয়তঃ "সেবা" বলিতে সেব্যের অনুকূল সুখসাধন; তৃতীয়তঃ সেবকের অধিষ্ঠান।

ত্রিগুণাত্মক, অনাদি-বহির্ম্মুখ জীব কি প্রভুতত্ত্ব? অনর্থযুক্তের সুখ-সাধন কি মঙ্গল-প্রদায়ক? আর সুখসাধনকারী সেবকেরই বা ঐরূপ কার্য্যে কি লাভ?—এ তিনটী প্রশ্নের নিরপেক্ষ উত্তর দিতে হইলে আমরা দেখিতে পাই যে, **"জীব-সেবা" বলিয়া কোন**

কথাই যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। জীব কখনও প্রভুতত্ত্ব নহেন—"মায়াধীশ মায়াবশ, ঈশ্বরে জীবে ভেদ।" মায়াবশের সেবায় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-তর্পণে সেব্যাভিমান, সেবকাভিমান ও সেবাভিমান, কোনটীরই সার্থকতা নাই। লম্পট, দস্যু, জুয়াচোর, গাধা, ঘোড়া, বৃক্ষলতা প্রভৃতির সেবা-কল্পনা মায়াবশ-জীবের ভোগমাত্র। সেইসকল বস্তু সেব্য বা প্রভুতত্ত্ব নহেন; মায়াবশ লম্পটকে পরস্ত্রী, দস্যুকে পরের অর্থাদি যোগাইতে পারিলে তাহাদের সুখসাধনরূপ সেবা বা 'ভোগ' হয় বটে, অর্থাৎ সেরূপ ভোগে দস্যু-লম্পটাদির প্রীতি হইলেও তাহাদের চিরকালের অকল্যাণ এবং তৎসঙ্গে অন্যান্য জীবের পীড়ন অনিবার্য্য। সুতরাং মায়াবশ জীবের সেবা বা ভোগ যতই মনোরম পোষাকে সুসজ্জিত থাকুক না কেন, তাহাতে জীবপীড়নই হইয়া থাকে। একটী মায়াবশ জীবের ইন্দ্রিয়-তর্পণ করিতে গিয়া সেই জীববিশেষের অকল্যাণ এবং তৎসঙ্গে-সঙ্গে বহুজীবের পীড়ন হয়।

'জীব-সেবা' কথাটী সম্পূর্ণ অযৌক্তিক, জীবের বদ্ধত্ববিচারে "জীবে দয়া" সম্ভব, এবং তাঁহার মুক্তত্ব-বিচারে "বৈষ্ণব-সেবা" সম্ভব। **অনর্থযুক্ত বদ্ধাবস্থার প্রীতিসাধন প্রকৃত-পক্ষে 'সেবা' শব্দবাচ্য হইতে পারে না;** তাহার প্রতি 'দয়া' করাই কর্ত্তব্য। **আবার মুক্তপুরুষের প্রতিও 'দয়া' শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে না,** তাঁহার 'সেবা' করাই কর্ত্তব্য। "জীব-সেবা" কথাটী যুক্তিযুক্ত হয় না, পরন্তু "শিব-সেবা", "গুরু-সেবা" বা "বৈষ্ণব-সেবা" কথাটীই যুক্তিযুক্ত। গুরুবৈষ্ণবের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বা সেবাই কর্ত্তব্য,—মুক্তকুলের সেবা ও বদ্ধকুলের প্রতি দয়াই জীবের শুদ্ধ সনাতন ধর্ম্ম।

মায়াবদ্ধ জীব 'প্রভু' বা 'সেব্যতত্ত্ব' নহেন,—বিচার শ্রবণ করিয়া অনেকে কপটতাক্রমে জীবকে সেব্যতত্ত্বরূপে সজ্জিত করিবার জন্য বাউল-মতের সহিত ন্যূনাধিক মিত্রতা স্থাপনপূর্ব্বক **বদ্ধজীবকে 'নারায়ণ' বলিবার প্রয়াস করেন।** জীব-নারায়ণ, দরিদ্র-নারায়ণ, অশ্ব-নারায়ণ, মৃগ-নারায়ণ, মনুষ্য-নারায়ণ প্রভৃতি নাম প্রদান করিয়া ঐসকল বাউল-মতাবলম্বী ব্যক্তিগণ জীবের মায়াবদ্ধতাকেই মায়াধীশ-নারায়ণত্ব মনে করেন; এবং দেহ ও মন—এই জড়বস্তুদ্বয়ের তোষণকেই 'নারায়ণ-সেবা' বলিয়া প্রচার করেন। **দরিদ্র-নারায়ণ, মনুষ্য-নারায়ণ-শব্দগুলি—সোনার পাথরবাটীর ন্যায় অযৌক্তিক ও অবৈধ।** জীবে 'নারায়ণ' বা 'ঈশ্বর' নাম সংযোগ করিলেই তিনি প্রভুতত্ত্ব হইতে পারেন না, বরং তাহাতে পাষণ্ডতাই হয়—

"যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্॥"

মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"যেই মূঢ় কহে 'জীব' 'ঈশ্বর' হয় সম।
সেই ত' পাষণ্ডী হয়, দণ্ডে তারে যম॥"

দরিদ্রত্ব নারায়ণত্ব নহে, তাহা নারায়ণত্বের অভাব। মৃগত্ব বা মনুষ্যত্ব মায়াধীশত্ব নহে, তাহা মায়াবশ্যতা। দরিদ্রের অন্তর্যামী, পশুর অন্তর্যামী, মানবের অন্তর্যামিস্বত্রে নারায়ণের নিত্য অধিষ্ঠান আছে। কিন্তু দরিদ্রত্ব, পশুত্ব বা মানবত্বের প্রতীতিতে নারায়ণত্ব নাই। দরিদ্রত্ব, পশুত্ব ও মানবত্বরূপ মায়ার আবরণ ও বিক্ষেপ-শক্তির বিক্রম দূরীভূত হইলেই অন্তর্যামী নারায়ণের বাস্তবসত্তা ও তদংশভূত শুদ্ধজীবাত্ম-স্বরূপ পরিদৃষ্ট হয়। 'গুরু' বা 'বৈষ্ণব' নারায়ণের বহিরঙ্গা-শক্তির বিক্রমে অভিভূত নহেন বলিয়া তিনি মুক্ত, শুদ্ধ ও নিত্য; তাঁহার নিত্য-সেবাই নিত্য কর্ত্তব্য। তিনি সাধারণজীব-শব্দবাচ্য নহেন। **যতক্ষণ বদ্ধজীব-দর্শন, ততক্ষণ তাঁহার প্রতি দয়াই কর্ত্তব্য, আর মুক্ত-দর্শনে সেবাই কর্ত্তব্য।** মহাভাগবতের গো-অশ্ব-খর-চণ্ডালে সর্ব্বত্র সম বা বৈষ্ণব-দর্শন, তিনি সকলকেই 'বৈষ্ণব' জানিয়া সেবা করিতে ব্যস্ত। তাঁহার দর্শন মায়াবাদী বা বাউলের 'দরিদ্র-নারায়ণ', 'মনুষ্য-নারায়ণ', 'মৃগ-নারায়ণ'-প্রভৃতির ন্যায় জড়ে চিদারোপ বা কল্পনামাত্র নহে। তিনি জীবাত্মাকে নারায়ণ কল্পনা করিয়া মায়ার আবরণ ও বিক্ষেপাত্মক-বৃত্তি-পরিণত ব্যাপারের অনিত্য সেবা করেন না। তাঁহার সেব্য—নিত্য, সেবা—নিত্য, এবং সেবকাভিমানও—নিত্য।

যাঁহারা "জীব সেবা" "জীব-সেবা বলিয়া চীৎকার করেন, যাঁহারা দরিদ্র-নারায়ণ, মনুষ্য নারায়ণ, মৃগ-নারায়ণের সেবা কল্পনা করিয়া দুনিয়ার অনভিজ্ঞ-সম্প্রদায়ের নিকট মহাপরোপকারী ধর্ম্মবীর বা কর্ম্মবীর বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইতে চাহেন, তাঁহাদের বিদ্যা-বুদ্ধির দৌড় কতদূর, তাহা এইটুকু তলাইয়া দেখিলেই বিচারক-সম্প্রদায় ধরিয়া ফেলিতে পারেন। কিন্তু বিচারপরায়ন মানব-সমষ্টির মনীষাকেও গতানুগতিক-ন্যায় এরূপ নিস্তেজ করিয়া দেয় যে, তাঁহারাও ঐসকল সাধারণ বিচারে ভ্রান্ত হইয়া পড়েন।

শ্রীভাগবতধর্ম্ম জীব-সেবার কোন কথা বলেন নাই; শ্রীভাগবতের বাণী—**"শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের 'সেবা' কর এবং বদ্ধজীবে 'দয়া' কর।"** ভাগবত ভরতরাজার আদর্শের দ্বারা জানাইয়াছেন যে, মহর্ষি ভরত মৃগ-জীবের বদ্ধতার সেবা করিতে গিয়া আত্মমঙ্গল ও পরমঙ্গলের পথে অন্তরায় আনয়ন করিবার শিক্ষা প্রচার করিয়াছিলেন। ভাগবত ঐরূপ জীব-সেবা নিরাস করিয়া মধ্যম ও উত্তম-ভাগবতের বিচার জানাইয়াছেন,—

"ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥"

"সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥"

"স্থাবর জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র স্ফুরয়ে তাঁর ইষ্টদেব-মূর্ত্তি॥"

মধ্যমাধিকারী উত্তমাধিকারী বৈষ্ণবের 'সেবা' করিবেন, তাঁহার সুখসাধনার্থ 'শুশ্রূষা' করিবেন, বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়-তর্পণ করিতে যাইবেন না, তাহাতে নিজের বা পরের কাহারও নিত্য উপকার বা মঙ্গল হইবে না। অতএব আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, **সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত আত্মার নিত্য বৃত্তি যে সেবা, উহার একমাত্র পাত্র—শ্রীহরি, গুরু ও বৈষ্ণব অর্থাৎ মুক্ত, শুদ্ধ, বৈকুণ্ঠ ভগবৎস্বরূপ ও তদ্রূপ-বৈভব**; 'জীব' বা 'প্রধান' নহে। আর স্বরূপবিস্মৃতি-জন্য বা দেবাত্মবুদ্ধি-নিবন্ধন দেহ ও মনের দ্বারা যে 'সেবা', উহা জড়েন্দ্রিয়-তর্পণমূলক ভোগেরই নামান্তর; উহার পাত্র —ভগবানে বা তদ্রূপবৈভবে বিমুখ বদ্ধজীব এবং 'প্রধান'; শুদ্ধচেতন বৈকুণ্ঠ-বস্তু নহেন। তাদৃশ **কৃষ্ণবিমুখ জীবগণকে কৃষ্ণোন্মুখীকরণই তাহাদের প্রতি পরম 'দয়া'।**

'জীব-সেবা' কথাটী হইতে পারে না অর্থাৎ জীবের চিদিন্দ্রিয়-বৃত্তিগুলি অচিদাবৃত-চেতনের সুখ বা ভোগ সাধনে কখনই নিয়োজ্য নহে, পরন্তু নিখিল চিদচিদ্‌বস্তুর ঈশ্বর ও ঈশ্বরীর সেবা-সুখ সাধনেই উহাদের সর্ব্বক্ষণ নিয়োগ করিতে হইবে—ইহাই একমাত্র সত্য কথা। "জীবে দয়া" আর "বৈষ্ণব-সেবা" কথাই যুক্তিযুক্ত ও পরমমঙ্গলদায়ক। শ্রীমন্মহাপ্রভু এই "জীবে দয়া" ও "বৈষ্ণব-সেবার" আদর্শ দেখাইয়াছেন। ভগবৎকথা-কীর্ত্তনেই অনন্ত-বদ্ধজীবের প্রতি অমন্দোদয়-দয়া হয় এবং কীর্ত্তনকারী বৈষ্ণবগণের সর্ব্বতোভাবে আনুকূল্য বা সেবা-বিধান করিলেই আমাদের আত্মার বৃত্তি পরিস্ফুট হইয়া থাকে। মহাপ্রভু স্বয়ং গ্রামে গ্রামে ভগবৎকথা প্রচার ও তাঁহার ভক্তগণকে প্রচারক-রূপে সংস্থান করিয়া জীবের প্রতি অমন্দোদয়-দয়ার আদর্শ দেখাইয়াছেন; আবার অনুক্ষণ কীর্ত্তনপরায়ণ বৈষ্ণবগণের সেবার আদর্শও শিক্ষা দিয়াছেন। আমরা শ্রীমদ্ভাগবত ও মহাপ্রভুর শিক্ষা উল্লঙ্ঘন করিয়া আধুনিক মনোধর্ম্ম-জাত মতবাদে প্রমত্ত হইয়া যেন ভগবৎসেবা হইতে বঞ্চিত না হই,—ইহাই সর্ব্বক্ষণ স্মরণ রাখিতে হইবে। জীব-সেবার লম্বা-চওড়া বক্তৃতা শুনিয়া যেন মায়াবাদী, বাউল, প্রাকৃত-সহজিয়া, চিজ্জড়-সমন্বয়বাদী হইয়া উৎপথগামী না হইয়া পড়ি। "জীবে দয়া" ও "বৈষ্ণব-সেবাই" আমাদের আদর্শ হউক,—**'জীবে দয়া', 'নামে-রুচি', 'বৈষ্ণব-সেবন'—ইহাই আমাদের মূলমন্ত্র হউক।**

—শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা ১৫শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা।

কালের গতি

শ্রীগৌরসুন্দর ৪৭৮ বৎসর পূর্ব্বে গৌড়দেশে আবির্ভূত হইয়া প্রপঞ্চের জীবগণকে নিজ ভজন উপদেশ করিয়াছিলেন। এই প্রপঞ্চস্থিত দুর্ভাগা জীব কিরূপভাবে বৈষ্ণব-জীবন লাভ করিয়া কৃষ্ণের ভজন করিবেন এবং ভজনবিরোধী কুসঙ্গ কি প্রকারে পরিত্যাগ করিবেন, তাহাও উপদেশ করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরহরির অন্তরঙ্গ নিজজনগণ তাঁহার প্রকটকালের পরও প্রেমময়বিগ্রহ শ্রীমহাপ্রভুর অনুসরণে ভজনের পথ কন্টকহীন করিয়া তাহাতে বিচরণ করেন। যাঁহারা নিষ্কপটচিত্তে চৈতন্যচন্দ্রের চরণানুসরণ করিলেন, তাঁহারা জগতে অতুলনীয় কৃপা বিতরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু কালপ্রভাবে নিষ্কপটতার প্রতি লক্ষ্য হ্রাস হইলে ভোগী জীবগণ হরিবিমুখ ভাবকেই ভজন বলিয়া অনভিজ্ঞ সমাজে চালাইতে আরম্ভ করেন।

তাহাদের অযোগ্যতাই ক্রমে ক্রমে বিপরীত ফল প্রসব করিল। যেমন পাটীগণিতে বহুসংখ্যা যোগ করিতে আরম্ভ করিয়া প্রথমেই ভুল করিলে সমস্ত গণনা অশুদ্ধ হইয়া পড়ে এবং অশুদ্ধ হইলে সেই অশুদ্ধ ফলদ্বারা কার্য্যকালে বিপত্তি উপস্থিত হয়, তদ্রূপ পূর্ব্ব হইতে ভজনের বাধাগুলি ভজনের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে পরিশেষে জীবকে বিপথ-গামী করে। বিপথগামী জীবকে আদর্শ জানিয়া তদনুগমন করিলে পরিণামে সুফল উৎপন্ন হয় না। প্রভুর সময়ে যেরূপভাবে তাঁহার অন্তরঙ্গ দাসগণ হরিভজনে নিযুক্ত ছিলেন, পরবর্ত্তিকালে ক্রমে ক্রমে সেই জীবন্ত আদর্শের অভাবে হীন আদর্শকে প্রভুর ভক্তজ্ঞানে ক্রমশঃই আমরা সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়ি। এইরূপে ভ্রষ্টাচারকে আদর্শ জানিয়া বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত যে বিষময় ফল সমাজে প্রচলিত হইয়াছে, তাহাকে অনর্থক আদর করিতে গিয়া আমরা সত্য হইতে ভ্রষ্ট হই। আবার ভগবৎবৈমুখ্যকে পূর্ব্ব মহাজনের আচরণ জানিয়া অঘ, বক, পূতনার অনুগমনপূর্ব্বক কৃষ্ণভজনের নামে আর কিছু করিয়া বসি; ভজন-নিপুণ হরিভজন দেখিলেও তাঁহাতে শ্রদ্ধা করি না। কাল আমাদিগকে শোধন করার পরিবর্ত্তে বিভ্রান্তির পথে লইয়া যায়। মহাজন দেখিতে গিয়া দুর্জ্জনকেই মহাজন বলিয়া নির্দ্দেশ করি। সেইজন্য প্রভুর সমকালীয় মহাজনগণের আচরণ ও ব্যবহার আমাদের ভজনের নির্দ্দেশ হউক।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে বিভিন্ন ভক্তবৃন্দ ভিন্ন-ভিন্নভাবে ভজনের আদর্শ দেখাইয়াছেন; তাহা হইলেও সকলেই ভজন করিয়াছেন। আর যিনি ভজন করেন নাই, তিনি শ্রীগৌরসুন্দর ও তাঁহার ভক্তগণ-কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইয়াছেন। আজকালকার দিনে কোনও ভজননিপুণ ব্যক্তি ভজনের অন্তরায় জানিয়া যদি কোনও ভোগিব্যক্তিকে পরিত্যাগ করেন,

তাহা হইলে সেই ভজনবিরোধী ব্যক্তিকে পতিত জানিবার পরিবর্ত্তে সাহায্য দান করিয়া ভগবদ্ভক্তের বিরুদ্ধে সাধারণ মানব না বুঝিয়া আক্রমণ করিবার জন্য প্রবৃত্ত হন। সুতরাং সেকাল ও একাল আলোচনা করিতে গিয়া আমরা অনেকগুলি বিচিত্রতা সন্দর্শন করি।

ভজন বিষয়ে শ্রীগৌরহরি যেরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন এবং যে উপদেশ লাভ করিয়া নির্ব্ব্যলীক শ্রীরূপানুগ-সম্প্রদায় শ্রীভগবানের ভজন করিতেন, তাহা বর্ত্তমানকালে ন্যূনাধিক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে কিনা তাহাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। আলোচনা করিবার পূর্ব্বে আমরা পাঠকদিগকে একটী কথা জানাইতে চাই যে, প্রপঞ্চস্থিত জীবের ভোগময় কর্ম্মের সহিত তাঁহারা ভক্তির অনুষ্ঠান সমান-শ্রেণীভুক্ত না করেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, মহাপ্রভুর সময়ে বাষ্পীয় যান ছিল না, সম্প্রতি বাষ্পীয় যানের সাহায্য গ্রহণ করা প্রভুর পথ পরিহার করার সহিত তুল্য—ইহা কর্ম্মীর ধারণা। বলাবাহুল্য, ভগবানকে উদ্দেশ করিয়া জীবের সেবাপ্রবৃত্তিমূলা ভক্তি অবস্থিত, তাহাতে ভগবানে প্রেমা উৎপন্ন হয়; কিন্তু কর্ম্মিগণ ভক্তিকে নিজ ভোগপর অনুষ্ঠানতুল্য মনে করিয়া কৃষ্ণপ্রীতির ক্রিয়াকলাপকে ভোগীর কর্ম্মমাত্রে পর্য্যবসিত করেন। ভক্তির ক্রিয়াকলাপগুলি কর্ম্মফলভোগীর কার্য্যের সহিত কখনই তুল্য নহে। যাঁহারা তাহা বুঝিতে পারেন না, তাঁহারাই বলেন —বাহ্য অনুষ্ঠানগুলি বহির্ম্মুখ স্মার্ত্তের অধীনে সর্ব্বতোভাবে করণীয়; কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে কৃষ্ণভক্তির বাধক শুভাশুভ কর্ম্মফল পরিহার করাই ভক্তির অনুষ্ঠান। কেহ এইরূপ মনে না করেন যে, মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে বিশুদ্ধভাবে মুদ্রিত ভক্তিগ্রন্থ অপেক্ষা প্রাচীন হস্তলিখিত ভ্রমপূর্ণ গ্রন্থই সমধিক আদরণীয়। 'আমাদিগের বংশে চিরদিন তুলসীমালিকা ধারণ ও মৎস্য-ভোজন, উভয় কার্য্যই চলিয়া আসিতেছে, আজ সেই সনাতন প্রথা পরিবর্ত্তন করিয়া শাস্ত্রের প্রকৃত সিদ্ধান্ত আমরা শুনিতে ইচ্ছা করি না'—এইরূপ কার্য্যে ভক্তি বৃদ্ধি পাওয়া দূরে থাকুক, নিরীশ্বর অভক্তের শুদ্ধাশুদ্ধের বিচারটী আসিয়া ভক্তির বিলোপ সাধন করিতেছে।

প্রভুর সময়ে গুরুর লক্ষন বা গুরুর আদর্শ যেরূপভাবে প্রচলিত ছিল, এখন তাহার পরিবর্ত্তন করিয়া মনঃকল্পিত গুরু-নির্ব্বাচন প্রথা যাহা কিছুদিন হইতে চলিতেছে, তাহার আদর করিতে পারিলেই আমাদের সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হয়, মনে করি। এই কথাটী আলোচনা করিতে গিয়া আমরা দেখি, প্রভুর সময়ে বংশ-পরম্পরা যোগ্যাযোগ্য-বিচাররহিত হইয়া গুরুগ্রহণের প্রথা ছিল না, আর বর্ত্তমানকালে কুলগুরু-প্রথা অন্যায়ভাবে প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রভুর শ্রীমুখবাণী অনাদর করিয়া আজকাল কৃষ্ণতত্ত্ববিৎকে গুরুপদে বরণ করিবার পরিবর্ত্তে কুলপ্রথা অন্যায়ভাবে অবলম্বিত হইতেছে। গুরু-নির্ব্বাচনে বৃত্ত-পন্থাকে শাস্ত্রীয় জানিবার পরিবর্ত্তে সাধারণ সামাজিক অনুষ্ঠানের ন্যায় শৌক্রপন্থাকে অবলম্বন করিয়া যোগ্যপাত্রের অনাদরে অযোগ্যতার আদর বাড়িয়া যাইতেছে। যাঁহারা

নিজে ভজন করেন না, যাঁহাদের যে সম্পত্তি নিজের নাই, তাহাদিগের নিকট হইতে সেইগুলি আশা করা আমাদের স্বভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা বর্ত্তমানকালে বণিকের নিকট হইতে যে প্রকার জড়দ্রব্য খরিদ করি, তাদৃশ ভোগপর দ্রব্যজ্ঞানে মন্ত্র খরিদ করিতে আরম্ভ করিয়াছি। প্রভুর সময়ে শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী, শ্রীরঘুনাথ ভাগবতাচার্য্য ও শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী **প্রাকৃত অর্থ বিনিময়ে ভাগবত পাঠ করিতেন না। বর্ত্তমান সময়ে কথক-ব্যবসার অনুকরণে গৌর-বাণী সেবকাভিমানী, শ্রীগুরু-পাদপদ্মের জীবন্ত বৈভববিদ্বেষী, বর্ত্তমানকালের কোন কোন আচার্য্য (ব্রুব) পণ্ডিত ও ভবিষ্যৎ কালের আচার্য্যত্ব-লোলুপ, আত্মোপলব্ধি-জন্য নির্জ্জন-ভজনস্পৃহ দুঃসাহসিক ভক্তব্রুবের দল ভাগবত পাঠ বিক্রয়ে অর্থোপার্জ্জন করিয়া 'বড় গুরুসেবক' সাজিতে চাহেন।** শ্রোতৃবর্গ ভৃতজ্ঞানে মাসিক দৈনিক বা এককালীন ঠিকা ফুরণ করিয়া ভাগবত পড়াইতেছেন। বর্ত্তমানকালে এইপ্রকার ভাগবত শ্রবণ করিয়া তাঁহারা ভাগবতগণকে অসম্মান করিতে শিখিতেছেন, সুতরাং ভাগবতপাঠ-ফলের বৈপরীত্য ব্যতীত অন্য কিছু ফলরূপে দৃষ্ট হইতেছে না।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্ গুরু কোনও একটী নির্দ্দিষ্টবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া মন্ত্রের ব্যবসা করিতে গিয়া শিষ্য করিতেন না, কিন্তু আজকাল নিজ উদর ভরণের জন্য কিছু জানুন্ আর না জানুন্, আপনাকে কুলগুরু বলিয়া অভিমানপূর্ব্বক শিষ্যের নিকট স্বীয় অর্ব্বাচীনতার মূল্যস্বরূপ অর্থ-দ্রবিণ প্রভৃতি আদায় করিয়া লইতেছেন। ভক্তের শৌক্রবংশে জন্ম, ঈশ্বরের শৌক্রবংশে জন্ম প্রভৃতি সামাজিক পরিচয় গুরুপদ লাভ করিবার একমাত্র উপকরণ হইয়াছে। পরমার্থধর্ম্মকে সমাজাধীন করিবার জন্য তাঁহারা ব্যস্ত। পরমার্থ-ধর্ম্মের অধীনে সমাজকে প্রতিষ্ঠিত করিতে তাঁহাদের সামর্থ্য নাই। তাঁহারা সকল পরমার্থ সমাজের অনুরোধে জলাঞ্জলি দিতে পারেন, কিন্তু পরমার্থের অধীনরূপে সমাজকে চালনা করিতে নারাজ।

শ্রীরূপ-সনাতনপ্রমুখ গোস্বামিগণ নিজ শিষ্যের দ্বারা ভগবৎসেবার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন এবং সেই সকল সেবাকে নিজের জীবিকার বৃত্তি করেন নাই, কিন্তু আজকালের শ্রীবিগ্রহগণ ভোক্তা-সেবকের পণ্যরূপে অর্থ-উপার্জ্জনের জন্য দণ্ডায়মান থাকিতে নিযুক্ত আছেন। দেবতার উদ্দেশে ভক্তের প্রদত্ত অর্থ গ্রাস করিয়া উদরভরণ, ইন্দ্রিয়তর্পণ, ভোগময় সংসারপোষণ প্রভৃতি অনুষ্ঠানকে অর্চ্চন বলিয়া অপসিদ্ধান্ত করিয়াছেন। প্রভুর সময়ে গৃহস্থসকল গৃহে অভিনিবিষ্ট হইবার প্রতিকূলে শ্রীবিগ্রহের সেবা স্থাপন করিতেন এবং আত্মীয়স্বজনকে শ্রীবিগ্রহের সেবকরূপে পরিণত করিতেন, কিন্তু আজ সেবকবংশ শ্রীবিগ্রহগণকে বাস্তবিক তাঁহাদিগের জীবিকোপায় বিলাসসহচর জ্ঞানে, সেবা না করিয়া কলঙ্কিত করিতেছেন। শ্রীমহাপ্রভুর সময়ে ভট্টগোস্বামী, পণ্ডিত গোস্বামিপ্রমুখ ভাগবত-উপদেশকগণ তপোবেশজীবীর কদর্য্য আচার গ্রহণ করেন নাই।

শ্রীমহাপ্রভুর সময়ে তাম্রকূটসেবা, নস্যগ্রহণ, চুরট ও বিড়ির প্রচলন ছিল না। বর্ত্তমান-কালের পাঠক, কুলগুরুবংশ, বিগ্রহসেবী অধস্তনগণ এইগুলি ন্যূনাধিক গ্রহণ করিতেছেন। তাঁহারা প্রকৃত বৈষ্ণবগুরুর নিকট হইতে ভাগবত-অধ্যয়ন, দীক্ষা-গ্রহণ, সদাচার-শিক্ষা প্রভৃতি কোনও অনুষ্ঠানই আদর করেন না। কেবল সামাজিক বংশগৌরব লইয়াই ধার্ম্মিক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে ইচ্ছা করেন। ভক্তিশাস্ত্রের আলোচনা, ভক্তির স্বরূপজ্ঞান প্রভৃতি সমৃদ্ধিগুলিকে চিরদিনের জন্য বিদায় দিয়া অভক্ত কর্ম্মীর ন্যায় কতকগুলি বাজে শুদ্ধাশুদ্ধি বিচারে পণ্ডিত হইয়া উঠেন এবং বৈষ্ণব-অপরাধ করাকেই তাঁহাদের মূলমন্ত্র বলিয়া জানেন। প্রভুর সময়ে এইরূপ বিশৃঙ্খলতা প্রবর্ত্তিত হয় নাই।

বিষয়-ভোগস্পৃহার বোঝা মাথায় চাপাইয়া ওতঃপ্রোত-ভাবে সংসার-সুখভোগ-বাসনায় প্রবল আকাঙ্ক্ষার দাস হইয়া ভজনানন্দীর অনুকরণ করেন। শ্রীরাসলীলা-পঠন পাঠন, রসগান-কীর্ত্তন-শ্রবণ, অষ্টকালীয় লীলা স্মরণমূলে অপাত্রে কীর্ত্তন-প্রভৃতি ভজন-বিরোধী আচরণগুলিকে জড়ভোগপর বিষয়বিশেষ মনে করিয়া তাহাতেই প্রমত্ত। উহাই মহাজনের সদাচার বলিয়া আস্ফালনে ত্রুটি করেন না। কিন্তু মহাপ্রভুর প্রকটকালে বা পরবর্ত্তী প্রকৃত শুদ্ধভক্তগণ এরূপ অপরিপক্ক সিদ্ধান্তের কোনদিনই আদর করেন নাই।

মহাপ্রভুর সময়ে শ্রাদ্ধপাত্র শ্রীহরিদাস ঠাকুর মহাশয়কে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু প্রদান করেন, আর সম্প্রতি শ্রাদ্ধপাত্র শৌক্রবিচার অবলম্বন করিয়া অপাত্রকে পাংক্তেয় জ্ঞানে অবাধে বিতরণ হইতেছে।

মহাপ্রভুর সময়ে শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর, নবমী ও কৃষ্ণদাস হোড় প্রভৃতি নিত্যানন্দ-শাখাগণ শৌক্র-ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ না করায় দীক্ষাকালে সংস্কার গ্রহণ করিয়া দ্বিজ হইতেন, আর একালে বামুন-ঠাকুর শিষ্য রুইদাসকে রুইদাস রাখিয়া নিজেকে অধঃপাতিত করিতেছেন। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু শ্রীরসিকানন্দ দেবকে যথা শাস্ত্র মহাজনপথে উপনয়নসংস্কার প্রদান করিয়া শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের ভার দিলেন, আর বর্ত্তমানকালে গৃহস্থ গোসাঞী নিজে বামুন থাকিয়া বেশ্যাকে মন্ত্র দিয়া তাঁহার অশুক্রবিত্তে নিজের অন্ন-বস্ত্রের যোগাড় করিয়া লইতেছেন। শুধু তাই নয়, যাঁহারা প্রাচীন সদাচার দীক্ষার অঙ্গ বলিয়া শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত প্রচার করিতেছেন, তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে ত্রুটি করেন না। গোসাঞিজীরা কেবল গৃহস্থলীতেই মনোযোগ দেওয়ায় 'জল-অচল জাতিকে' প্রসাদ, এমন কি চরণামৃত স্পর্শ করিতে দিতেও নারাজ। এখন ঐরূপ করিলে তাঁহাদের জাতিপাত হয়। পূর্ব্বে নিত্যানন্দ প্রভুর জাতি কেহ নষ্ট করিতে পারে নাই। এখনই বা তাঁহার প্রাকৃত সন্তানাভিমানিগণের মধ্যে সেরূপ জাতিনাশের আশঙ্কা হইয়া উঠিল কেন?

—শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা ১৭শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা।

শপথ ও সত্যপাঠ

ধর্ম্মাধিকরণে কোন অভিযোগ অথবা আবেদন-নিবেদন করিলে তাহা সত্যপাঠযুক্ত না হইলে বিচারকের গ্রহণীয় হয় না। শুধু তাহাই নহে, বাচনিক ও লিখিত প্রমাণের দ্বারা তাহার সত্যতা নিরূপন করিতে হয়। বাচনিক সাক্ষ্যদ্বারা প্রমাণ করিতে গেলে শপথ গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক। বর্ত্তমান ধর্ম্মাধিকরণ লিখিত কিছু অভিযোগ বা আবেদন বিচারক্ষেত্রে উপস্থিত করিলেই তাহা মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহেন। যে-কোন আবেদনের বিরুদ্ধে অপর পক্ষের কি বক্তব্য, তাহাও শ্রবণীয়। এবং অপর পক্ষেরও তাহার যাহা বক্তব্য তাহা 'শপথ' ও 'সত্যপাঠ'যুক্ত হওয়া প্রয়োজন, নচেৎ তাহাও গ্রহণীয় হইবে না। অপরপক্ষ নীরব থাকিলে কেবল আবেদনকারীর শপথযুক্ত উক্তির উপরেই বিচার ও সিদ্ধান্ত নির্ভর করে।

'শপথ' ও 'সত্যপাঠে'র বিধান প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং যিনি শপথ করিবেন ও সত্যপাঠ লিখিবেন, তাহাকেও উক্ত সংবিধান মানিয়া চলিতে হইবে। নচেৎ তাহা ধর্ম্মাধিকরণে গৃহীত হইবে না। শপথ গ্রহণের সময় বলিতে হয়—"আমি যাহা বলিব, তাহা সত্য হইবে; আমি মিথ্যা বলিব না; আমার বক্তব্য বিষয়ের কোন অংশ মিথ্যা হইবে না; আমি কিছুই গোপন করিব না।" সত্যপাঠে লিখিতে হয়—"আমি আবেদনে যাহা বলিয়াছি তাহার সমস্ত অংশই সত্য!" যদি উহার সমস্ত অংশ জ্ঞানমতে সত্য না হয়, তবে বিস্তৃত করিয়া পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে লিখিতে হইবে যে, "আমার আবেদনের 'অমুক' অংশ জ্ঞাতমতে সত্য, 'অমুক অমুক' অংশ বিশ্বাসমতে সত্য এবং 'অমুক অমুক' অংশ অবগতিমতে সত্য।" ইহাই বর্ত্তমান ধর্ম্মাধিকরণের এবং বিচার-জগতের রীতি।

এই রীতি অবলম্বন করিয়া আবেদন-নিবেদন করিতে হইলে উক্ত বিধি-ব্যবস্থামূলক ন্যায়কোবিদগণের পরামর্শ আবশ্যক। এইরূপ বিধানের উদ্দেশ্য—সাধারণ প্রমাণ-জ্ঞানহীন অজ্ঞ ব্যক্তিসকল যখন-তখন যে-কোন কথা বলিয়া বিচার উত্থাপন করিয়া ধর্ম্মাধিকরণের অযথা সময়ক্ষেপ না করিতে পারেন। আজকাল সময়ের মূল্য অধিক। মুদ্রামান হ্রাস প্রাপ্ত হওয়ায় প্রকৃত-প্রস্তাবে বস্তুর মূল্য অধিক অনুমিত হয়। বর্ত্তমানে সময়ই আমাদের অধিক মূল্যবান্ বস্তু। সুতরাং শ্রীপত্রিকার বিচারধারা ও সংবিধান যাহা শাস্ত্রকারগণ ও পরম অভিজ্ঞ সিদ্ধগণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহার অনুগত হওয়াই একমাত্র কর্ত্তব্য। অনেক পত্রিকা-পরিচালক কোন পদ্ধতির প্রতি লক্ষ্য না করিয়া যাহা খুসী তাহাই লিপিবদ্ধ করিতে দ্বিধাবোধ করেন না। সেজন্য আমরা তাঁহাদিগকে ন্যায়-কোবিদগণের আশ্রয় গ্রহণ করিতে অনুরোধ করি। প্রকৃত শাস্ত্রজ্ঞ আচার্য্যবর্গই এস্থলে ন্যায়-কোবিদ।

গুরু বা আচার্য্য পদাশ্রয় না করিলে কাহারও ধর্ম্ম-সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন বা আবেদন-নিবেদন উঠিতে পারে না। প্রশ্ন করিতে হইলে কিছু জানা আবশ্যক হয়। যে কিছু জানে না, সে কি প্রশ্ন করিবে ?

সুতরাং বেদব্যাস প্রথমেই 'ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা'র ক্ষেত্র রচনা করিতে গিয়া 'অথ' এই শব্দের দ্বারা পূর্ব্ব-অভিজ্ঞানের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্র বস্তু-নির্দ্দেশক সম্বন্ধ-জ্ঞানের গ্রন্থ। অভিধেয়-ক্ষেত্রে শাণ্ডিল্য-ঋষিরও একই পদ্ধতি লক্ষ্য করা যায়। "অথাতো ভক্তি-জিজ্ঞাসা" সূত্রটীর প্রারম্ভিক শব্দ 'অথ'। ইহাও সাধন-মার্গের পূর্ব্ব-অভিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিতেছে। সুতরাং জিজ্ঞাসাধিকরণেও পূর্ব্ব-অভিজ্ঞতার লক্ষন আবেদনকারী সাধকের হৃদয়ে না থাকিলে আবেদনের বা অভিযোগের কোন প্রশ্ন বা ক্ষেত্রই উপস্থিত হয় না। তজ্জন্য ন্যায়-কোবিদ গুরুবর্গের আশ্রয় একান্ত আবশ্যক।

ন্যায়-কোবিদগণই নয়-কোবিদ, তজ্জন্যই আচার্য্যবর্গ কীর্ত্তন করিয়াছেন—"বিধিমার্গ-রত জনে, স্বাধীনতা-রত্নদানে, রাগমার্গে করান প্রবেশ।" ন্যায়-কোবিদ বা নয়-কোবিদ আচার্য্যবর্গের শ্রীচরণাশ্রয়ই একমাত্র বস্তু-তত্ত্বজ্ঞানের বা বস্তুসিদ্ধিলাভের একমাত্র উপায়। বর্ত্তমান ধর্ম্মাধিকরণে ইহার বাহ্য 'ঠাঁট' পরিদৃষ্ট হইলেও ইহা অন্তঃসার-শূন্য বলিয়া মনে হয়।

আশ্চর্য্যের বিষয়, আজকাল যাঁহারা সংবিধান রচনা করেন, তাঁহাদিগকে শপথ গ্রহণ করিতে হয় ; কিন্তু সেই সংবিধান অবলম্বন করিয়া যাঁহারা কোন অভিযোগের সিদ্ধান্ত স্থাপন করিবেন, তাঁহাদের কোন শপথ গ্রহণ করিতে হয় না। তাঁহারা যাহা ইচ্ছা, তাহাই লিপিবদ্ধ করিলে অভিযোগকারীকে অবনত-মস্তকে তাহা মানিয়া লইতে হইবে। ইহা শরণাগত সেবকের লক্ষণ হইতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মাধিকরণে ইহাকে বিধির ছাচে গড়া একটা অবিধি বলা যাইতে পারে। আমরা বলি—ইহা একপ্রকার রাগমার্গ। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যাঁহারা ন্যায়-কোবিদ, তাঁহারা তাহাদের অনুগত জনের প্রতিনিধি হইলেও সত্যপাঠের প্রতিনিধিত্ব করেন না। অথবা তাঁহাদিগকে কোন শপথও গ্রহণ করিতে হয় না। উচ্চতর ধর্ম্মাধিকরণে কোন আপত্তি নিবেদন করিলেও নয়কোবিদ-গণকে 'জ্ঞানমতে সত্য'—এইরূপ কোন উক্তি প্রত্যক্ষভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হয় না। বর্ত্তমান ধর্ম্মাধিকরণের এইরূপ রীতিনীতি সাংবাদিকগণকে মানিয়া লইতে বাধ্য করা হইতেছে। নিরপেক্ষ সত্য শপথ করিয়া লিখিবার অধিকারও সাংবাদিকগণকে দেওয়া হয় না। সত্যপাঠের অধিকার অপেক্ষা শপথ গ্রহণের দায়িত্ব সাক্ষাদ্ভাবে গুরুতর বলিয়া মনে করি। আমরা এই গুরুত্ব বর্ত্তমান অবস্থায় শিরে ধারণ করিয়া তদনুসারে বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তা বহন করিয়া লোক-সমাজে নিবেদন জানাইতে প্রস্তুত হইয়াছি।

আজকাল অপ্রিয়-সত্যের আদর নাই। শপথ গ্রহণ করিলেও অপ্রিয়-সত্য গোপন রাখিতে হইবে—ইহাই বর্ত্তমান ধর্ম্মাধিকরণের রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নয়কোবিদগণ

পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাদের শরণাগত জনগণকে হুসিয়ার করিয়া দিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহা ধর্ম্মাধিকরণে সত্য নিরূপণের প্রধান পরিপন্থী। অপ্রিয়-সত্য কখনও গোপন করা হইবে না। ইহা শপথ গ্রহণ বিধানের অনুকূলই হইবে। অর্থাৎ শপথ গ্রহণ করিয়া বলিতে হয়—"আমি কিছু গোপন করিব না। আমি 'সত্যপাঠ'-স্বরূপে জ্ঞান, বিশ্বাস ও অবগতিমতে যাহা জানি, তাহা কখনও গোপন করা হইবে না।" "মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্"—ইহা আপাত সত্যবাদী দুর্নৈতিক-গণের জন্য উপদেশ। চক্ষের সম্মুখে যাহা সত্য বলিয়া দেখিব, তাহা গোপন করিব কেন? জনসাধারণের সমক্ষে তাহার মুখোস খুলিয়া পারমার্থিক সাংবাদিকগণের তাহা প্রকাশ করা উচিত। আমরা নির্ভীকভাবে প্রকৃত শপথ গ্রহণ করিয়া পারমার্থিক সংবাদ পরিবেশন করিব; কোন কথা গোপন করিব না। ইহাতে যদি নিজের ঘরের লোকের এমন কি, আপন ভাই-বন্ধুবর্গের কোন গোপনীয় কথা জানা থাকে, তাহাও গোপন না করিয়া প্রকাশ্যভাবে জানাইব—অন্যান্য সম্প্রদায়, অপসম্প্রদায়, নবীন সম্প্রদায়ের তো কা কথা। তবে ইহা ধ্রুবসত্য যে, আমরা শাস্ত্রীয় বিধান বিন্দুমাত্রও উল্লঙ্ঘন করিব না।

—শ্রীগৌঃ পত্রিকা ৯ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা।

সাউড়ী-শালার ভিতে গলদ

সাউড়ী-শালা বলিলে সাউড়ী-গৃহকেই প্রধানতঃ বুঝাইয়া থাকে। আমাদের পূর্ব্ববঙ্গীয় পাঠকগণ শাউড়ী বলিতে শাশুড়ীকে বুঝিয়া থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে জামাতার প্রতি শাউড়ী-শালার মধুময় ব্যবহার সম্বন্ধেই উক্ত প্রবন্ধে আলোচিত হইবে। ইহাও কিন্তু সর্ব্বাঙ্গ সত্য নহে। যে-সাউড়ীগৃহে রাসলীলার ছড়াছড়ি ও প্রমোদ-কাননে হুড়াহুড়ি, সেখানে মধুময় ব্যবহারের অভাব হইবে না।

'শালা'-অর্থে 'অমরকোষ' গৃহকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। 'মেদিনীকোষ' বৃক্ষশাখা-অথবা গৃহের কোন অংশ বা কক্ষকে লক্ষ্য করিয়াছেন। আমি অমরকোষ ও মেদিনীকোষের প্রদর্শিত অর্থ লইয়াই উক্ত প্রবন্ধের সূচনা করিয়াছি। কেহ কেহ শ্যালক-শব্দের অপভ্রংশ 'শালা'শব্দ বলিয়া থাকেন। আমরা সেরূপ অর্থ বর্ত্তমানে গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। তবে এ প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য আমরা পরে নিবেদন করিব।

'ভিতে গলদ' বলিলে ভিত্তিতে গলদ অর্থাৎ পাতিত্ব বা দোষ বুঝায়। সুতরাং কোন গৃহের ভিত পত্তনে (Foundation-এ) দোষ থাকলে সে-গৃহ কখনও অধিক দিন স্থায়ী হইতে পারে না। এমন কি, সেই গৃহস্থিত গৃহি-ব্যক্তিগণের কোন মঙ্গল হইতে

পারে না। আমরা এস্থলে সাউড়ী-গৃহাশ্রিত ব্যক্তিগণের কোন প্রকার মঙ্গল হয় নাই, হইবেও না তাহা শাস্ত্র-যুক্তিদ্বারা প্রদর্শন করিব। যেহেতু এই গৃহ নির্ম্মাণকারী ব্যক্তির ভিতরেই সহজিয়া মত প্রবেশ করায়, তাঁহার আশ্রিত জনগণেরও সহজিয়া ধর্ম্মে লিপ্ত হওয়াই নিতান্ত স্বাভাবিক। আমরা এই সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিব।

মাননীয় শ্রীযুত * * দাস মহাপাত্র জমিদার মহোদয়ের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা প্রভৃতি পরিবারবর্গের সহিত বসবাস করিবার গৃহটীকেই সাউড়ীর সহজিয়াগণ 'প্রপন্নাশ্রম' নাম দিয়া তাহার ছবিখানি সজ্জন-সঙ্গিনী পত্রিকার প্রচ্ছদপটে বিজ্ঞাপন দিয়া থাকেন। আমরা ইহাকে * * বাবুর বসতবাটী বলিয়াই জানি এবং তাঁহার দেহান্তের পর তাঁহারই পুত্র পৌত্রাদি এই গৃহের সত্ত্বাধিকারী হইয়াছে ও হইবে। সুতরাং সাউড়ীর এই গৃহটীকে শালা বলিয়া পরিচয় দিলে কোন অন্যায় হইবে না।

আশ্রম বলিতে সাধারণতঃ সাধু-সন্ন্যাসীর আবাসস্থলী অথবা ত্যাগী ভগবদ্ভজনেচ্ছু ব্যক্তিগণের আবাস-স্থলীকেই বুঝায়। যদিও একথা সর্ব্বতোভাবে স্বীকৃত—প্রকৃত গৃহস্থগণের গৃহকেও আশ্রম সংজ্ঞা দিলে অশাস্ত্রীয় সংজ্ঞা হইবে না। তথাপি সেটীকে গৃহস্থাশ্রমই বলা হইয়া থাকে, প্রপন্নাশ্রম বলা হয় না। প্রপন্নাশ্রম বলিলে—হরি-গুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্মে যাঁহারা সর্ব্বতোভাবে প্রপত্তি স্বীকার করিয়াছেন তাঁহারাই প্রকৃত প্রপন্ন। এইরূপ প্রপন্নগণের আশ্রম সর্ব্বত্রই স্থাপিত হউক ইহা সকলেরই কাম্য। গৃহস্থগণের স্ত্রী-পুত্র লইয়া বসবাসের গৃহকে প্রপন্নাশ্রম সংজ্ঞা দেওয়ার পদ্ধতি শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আচরিত প্রথার অনুমোদিত নহে। আমরা তজ্জন্যই উহাকে সাউড়ী-শালা বা সাউড়ী-গৃহ বলিয়াছি।

তবে কেহ হয়ত বলিবেন— * * বাবুর গৃহে যদি কোন কোন মুক্ত মহাপুরুষগণ পদার্পণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও কি উহা আশ্রম বলিয়া স্বীকৃত হইবে না? ইহার বিচার এই যে—

'মহান্তের স্বভাব হয় তারিতে পামর। নিজকার্য্য নাই তবু যান তার ঘর॥' এই বিচারে মহাজনগণ সর্ব্বত্রই জীবের মঙ্গলের জন্য বিচরণ করিয়া থাকেন। তজ্জন্য পৃথিবীর সমস্ত স্থানগুলিকেই আশ্রম সংজ্ঞা দেওয়া হয় না। মহাজনগণের পদার্পণ-মাত্রেই স্থানের বিশুদ্ধতা সম্পাদিত হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু ঐ বিশুদ্ধতা সংরক্ষিত না হইলে তাহা পুনরায় অশুদ্ধ হইয়া পড়ে। তজ্জন্যই শাস্ত্রে 'তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি' শ্লোকের অবতারণা দেখা যায়। পানা-পুকুরে ঢিল ছুড়িলেই ঢিলের শক্তিতে পানা বিদূরিত হইয়া নির্ম্মল জল প্রকাশিত হয়; কিন্তু পরক্ষণেই পানা আসিয়া স্বস্থান অধিকার করিয়া নির্ম্মল জলকে আবৃত করিয়া ফেলে। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এবং জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর সাউড়ীগৃহে পদার্পণ করিয়া * * বাবুর চিত্তের সাময়িক শোধন করিয়া থাকিলেও পরিশেষে তিনি উক্ত মহাজনদ্বয়ের

আনুগত্য পরিত্যাগ করায় প্রপন্নাশ্রম গৃহমেধী-গৃহে পরিণত হইয়াছে। আমরা তজ্জন্যই ইহাকে সাউড়ী-শালা আখ্যা দিয়াছি। 'ভিতে গলদ' বলিতে আমরা মাননীয় শ্রীযুত * * বাবুর আচার-ব্যবহার, ক্রিয়া-কলাপ এবং তাঁহার রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে যে গলদ বা ভ্রান্তি ঢুকিয়াছে তাহাকেই লক্ষ্য করিয়াছি। আমরা তাহার প্রত্যেকটী গ্রন্থের বিচার-যুক্তিহীন অশাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তগুলি একটী একটী করিয়া জন-সমাজে প্রকাশ করিব। সাউড়ী-শালার ভিত্তি বলিতে * * বাবুকেও বুঝিতে হইবে। তিনি যে তাঁহার গুরুপাদপদ্ম শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আচার-বিচার-ধারা পরিত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র-মত বা সহজিয়া-মত গ্রহণ করিয়া গলদ করিয়াছেন তাহা আমরা প্রদর্শন করিব।

আমরা মাননীয় * * বাবুকে যথেষ্ট সম্মান করি ও শ্রদ্ধা করি। সুতরাং কোন গৌরবান্বিত ব্যক্তির সম্বন্ধে কিছু লিখিতে হইলে আমরা নিজস্ব-লেখনী সম্প্রতি স্তব্ধ রাখিয়া পূর্ব্ব মহাজনগণের লিখিত প্রবন্ধগুলির উপরই অধিক নির্ভর করিতেছি। এস্থলে * * বাবুর আচার-ব্যবহার ও ধর্ম্মমতের প্রতি কটাক্ষ করিয়া অর্থাৎ তাঁহার সহজিয়া মতের প্রতিবাদ করিয়া শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং যে-সমস্ত প্রবন্ধ তাঁহাকে ও জগদ্বাসীকে শিক্ষা দিবার জন্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, আমাদের তাহাই একমাত্র অবলম্বন। যথা—

১। প্রাকৃত রস-শতদূষণী ২। প্রাকৃত শূদ্র বৈষ্ণব নহে ৩। (সাউড়ীর ভাক্ত সম্প্রদায়) ৪। ভাই সহজিয়া প্রভৃতি। উক্ত প্রবন্ধসমূহ জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের লিখিত।

ইঁচড়ে পাকা, সহজিয়া ও গুরুদ্রোহী

আমরা সিদ্ধমহাপুরুষের শিষ্য; সুতরাং সিদ্ধমহাপুরুষগণের আদেশ-পালনে ও তাঁহাদের সেবা-সংরক্ষণে সিদ্ধ-হস্ত না হইলে শিষ্যগণের গুরুসেবা ভঙ্গ হইবে। গুরু-সেবাই ভক্তিরাজ্যের সর্ব্বোত্তমতা এবং সর্ব্বোত্তম সোপান। সাউড়ীর দল যদি তাঁহাদের গুরুসেবা পরিত্যাগ করিয়া স্বকপোল-কল্পনায় পরিচালিত হন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে গুরুদ্রোহী বলিলে আদৌ অন্যায় হইবে না। আপনারা প্রশ্ন করিতে পারেন—সাউড়ীর দলের ভিত্তি-স্বরূপ প্রধান পাণ্ডা মাননীয় * * বাবু যে তাঁহার গুরুপাদপদ্মের আচার-বিচার পরিত্যাগ করিয়াছেন তাহার প্রমাণ কি? আমরা পূর্ব্বেই অকপট-ভাবে জানাইয়াছি—গৌরবান্বিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন কথা লিখিতে হইলে পূর্ব্ব-মহাজনগণের লেখনীর উপরেই নির্ভর করা কর্ত্তব্য। তজ্জন্যই আমরা আমাদের মন্তব্য প্রকাশের পূর্ব্বে পূর্ব্ব-মহাজনের উক্তি নিম্নে উদ্ধার করিব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—গুরুদাস্যই একমাত্র ভক্তি। সুতরাং আমাদের গুরুপাদপদ্ম জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের লিখিত 'ভাই সহজিয়া' প্রবন্ধই আমাদের প্রধানতঃ অবলম্বনীয়। সুতরাং আমাদের গুরুপাদপদ্ম যদি কাহাকেও **'এঁচড়ে পাকা'** বলেন, আমরাও সেই গুরুপাদপদ্মের বাক্য সংরক্ষণ-কল্পে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে 'ইঁচড়ে পাকা' বলিব। আমাদের গুরুপাদপদ্ম যদি কাহাকেও **'সহজিয়া'** বলিয়া থাকেন, আমরা তাঁহাকে 'সহজিয়া' বলিবই। আমাদের গুরুপাদপদ্ম যদি কাহাকেও গুরুদ্রোহী বলিয়া বুঝাইয়া থাকেন, আমরাও তাহা বুঝিয়া লইয়া তাহাকে 'গুরুদ্রোহী' বলিতে দ্বিধা বোধ করিব না। আমরা যদি তাহা না বলি, তাহা হইলে আমাদের গুরুদাস্য হইবে না।

এইরূপ স্থলে একটী তর্ক উপস্থিত হইতে পারে—তাহা হইলে সাউড়ীর দলেরই বা দোষ কি? * * বাবু যদি সহজিয়া-গুরু হন, তাহা হইলে তাঁহার শিষ্যবর্গও সহজিয়া হইবেন—তাহাতে আর দোষ কি? এস্থলে আমার বক্তব্য এই যে, বর্ত্তমানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ভুক্ত নাম করিয়া ১৩টী অপসম্প্রদায় চলিতেছে। তাহারা স্ব-স্ব সম্প্রদায় অনুযায়ী আপন আপন পরিচয় দিলে কোন গোল থাকে না। সহজিয়া যদি শুদ্ধভক্ত বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহা হইলেই শুদ্ধভক্ত তাহা আপত্তি করিবেন। সাউড়ীর দল নিজেকে সহজিয়া বলিয়া পরিচয় দিলে আমাদের কোন আপত্তি নাই। কিন্তু তাঁহারা যদি শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অনুগত শুদ্ধ-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় বলিয়া পরিচয় দিতে চাহেন, তাহা হইলেই আমরা তাহাদের জিহ্বা স্তম্ভন করিব। দুনিয়ার অসদ্ গুরু-সম্প্রদায় নিজেদের অসৎ আদর্শে গঠিত শিষ্য-পরম্পরার দ্বারা যে গুরু-পরম্পরার আদর্শ সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা, সর্ব্বতোভাবে অযৌক্তিক, অশাস্ত্রীয়, অবৈধ ও অসঙ্গত। এই প্রকার গুরু-পরম্পরা স্বীকৃত হওয়ার ফলে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে ধর্ম্মের নামে উচ্ছৃঙ্খলতা প্রসার লাভ করিয়াছে। আমরা এই গুরু-প্রণালীর ভিতরে **'সখা-ভেকী'** **ও 'সখী-ভেকী'** নামক অপসম্প্রদায়দ্বয়ের পরস্পর সম্মিলন দেখিতে পাই। যদিও তাহারা তাহাদের স্ব-স্ব গুরু-পরম্পরা বিভিন্ন দেখাইয়া থাকেন। শুদ্ধ ভক্ত-পরম্পরায় অবস্থিত থাকার অভিমান করিয়া যদি কেহ উক্ত অপসম্প্রদায়ের প্রশ্রয় দিতে থাকেন, আমরা তাহা হইলে তাহাদিগকেও অপসম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া সংজ্ঞা দিতে বাধ্য হইব এবং গুরুদ্রোহী বলিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করিব না।

আমাদের গুরুপাদপদ্ম শ্রীল প্রভুপাদ মাননীয় * * বাবুর সম্বন্ধে যে উক্তি করিয়াছেন, তাহা আমি আপনাদের স্মরণপথে আনিয়া দিতেছি—

"শ্রদ্ধা না হইতে হইতেই প্রথম মুখে সাধনকালে **এঁচড়ে পাকাইবার উদ্দেশ্যে** প্রাকৃত রস হইতে অন্তঃকরণ শুদ্ধ না হইলে রাসলীলা আরম্ভ করিয়া দিলে সাধুসঙ্গ হইবে না। **সজ্জনকে অসাধু বুদ্ধি** ও অনর্থময় **সহজিয়াকে সাধু-জ্ঞান** হইবে।"

শ্রীল গুরুপাদপদ্মের এই বাক্য হইতেই আমরা * * বাবুর দলকে 'ইঁচড়ে পাকা' সম্প্রদায় বলিয়াছি। উক্ত বাক্য হইতে কেবল মাত্র 'ইঁচড়ে পাকা' এই সংজ্ঞাই প্রকাশ পায়—তাহা নহে, 'সহজিয়া ও গুরুদ্রোহী' ইহাও এই বাক্য হইতে প্রকাশ পায়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই প্রবন্ধটি শ্রীল প্রভুপাদ মাননীয় * * বাবুকে লক্ষ্য করিয়াই লিখিয়াছেন। উক্ত বাক্যে 'সজ্জনকে অসাধু বুদ্ধি' ও 'সহজিয়াকে সাধুজ্ঞান' বাক্যদ্বয় বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। এস্থলে সজ্জন বলিতে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। এবং 'সহজিয়াকে সাধুজ্ঞান' এইবাক্যের দ্বারা শ্রীল প্রভুপাদ কোন প্রসিদ্ধ সহজিয়াকে লক্ষ্য করিয়াছেন। উক্ত বাক্য হইতে জানা যায় * * বাবু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আচার-বিচারে সন্দিহান হইয়া কোন প্রসিদ্ধ সহজিয়াকেই শিক্ষাগুরুরূপে বরণ করিয়াছেন। অবশ্য এ ঘটনা শ্রীল ঠাকুরের দেহরক্ষার পরেই ঘটিয়াছিল। এই সম্পর্কে আমাদের এই প্রকার সিদ্ধান্তের যথেষ্ট প্রমাণও আমরা শ্রীল গুরুপাদপদ্মের লেখনী হইতে প্রদান করিতেছি।—

"ভাই সহজিয়া! তুমি ইন্দ্রিয়-দমনে অপারক হইয়া সিদ্ধির ভাণে রাধা-গোবিন্দের লীলা-রহস্য ইন্দ্রিয়-পরায়ণ বিশৃঙ্খল লোক-সমাজে গান গাইয়া **'সেবা-কল্পনার'** নামে কবিতা লিখিয়া **'কাঞ্চা-রসের'** দোকান খুলিতেছ। কেহ তোমাকে বাধা দিতে আসিলে, তোমার গুরু প্রাকৃত-সহজিয়া ছিলেন এবং সেই **চক্রবর্ত্তী-জীবী বৃন্দাবনস্থ সহজিয়া-গুরু** তোমাকে উহাই শিখাইয়াছেন, বল।"

উক্ত বাক্যসমূহ-মধ্যে 'সেবা-কল্পনা' ও 'কাঞ্চা-রস' বাক্যদ্বয়ের সম্বন্ধেও পাঠক-গণকে বিশেষ করিয়া আলোচনা করিতে অনুরোধ করি। উহাও অকাল-পক্কতা ও সহজিয়া-চিন্তাস্রোতের প্রতিবাদ-স্বরূপ। 'কেহ তোমাকে বাধা দিতে আসিলে'—এই বাক্যদ্বারা প্রবন্ধলেখক শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ংই * * বাবুকে সহজিয়া পথ হইতে নিরস্ত করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াছিলেন, বুঝায়। এস্থলে শ্রীল প্রভুপাদের সহিত * * বাবুর কিরূপ সম্বন্ধ ছিল—তাহা বলা আবশ্যক। * * বাবুর গুরুপাদপদ্ম শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ; তাঁহারই যোগ্যতম অন্বয় শ্রীল প্রভুপাদ। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ দেহরক্ষা করিবার পূর্ব্বে তাঁহার শিষ্য ও অনুগত সকলকেই মুক্ত কণ্ঠে জানাইয়া গিয়াছিলেন যে—'আমার অবর্ত্তমানে সিদ্ধান্ত সরস্বতীর (শ্রীল প্রভুপাদের) নির্দ্দেশ ও শিক্ষা অনুসারে তোমরা সকলে ধর্ম্মজীবন অতিবাহিত করিবে'। সুতরাং শ্রীল প্রভুপাদ * * বাবুর শিক্ষাগুরু। ঠাকুরের উক্ত নির্দ্দেশ ছাড়াও শ্রীহরিভক্তিবিলাসের গুরুতত্ত্বের বিচার-অনুসারে শ্রীল প্রভুপাদ * * বাবুর অভিন্ন গুরুপাদপদ্ম। ইহা কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সুতরাং প্রভুপাদ তাঁহার নিজ কর্ত্তব্যের অনুরোধে * * বাবুকে তাঁহার গুরুপাদপদ্মের বিরুদ্ধাচরণ-কার্য্যে বাধা দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সে বাধা অগ্রাহ্য করিয়া "চক্রবর্ত্তী-জীবী বৃন্দাবনস্থ সহজিয়া গুরু"কেই গুরুরূপে বরণ করায় গুরুদ্রোহিতা

হইয়াছে। "চক্রবর্ত্তী-জীবী বৃন্দাবনস্থ সহজিয়া গুরু" বাক্যটী হেঁয়ালী-স্বরূপে * * বাবুকে লক্ষ্য করিয়াই আচার্য্য-কুল-মুকুটমনি শ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন। আমরা ইহার প্রত্যক্ষদর্শী এবং আমরা এই হেঁয়ালীর মূল উদ্ঘাটন করিতে সক্ষম। এই বাক্যদ্বারা প্রমাণিত হয় যে তিনি ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে পরিত্যাগ করিয়া সহজিয়া গুরু করেন, তজ্জন্যই আমরা তাঁহাকে 'গুরুদ্রোহী' বলিয়া আখ্যা দিয়াছি।

—শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৮-৯ম সংখ্যা।

কলির ভগবান্

আমরা কলির ভগবান্ বলিতে শাস্ত্রে লিখিত বুদ্ধ-কল্কির কথা বলিতে বসি নাই। বুদ্ধ ও কল্কিদেব শক্ত্যাবেশ অবতার; তবে অবতারী পুরুষ সব সময়েই স্বেচ্ছাক্রমে অবতীর্ণ হইতে পারেন, শাস্ত্রীয় লক্ষণের দ্বারা তাঁহার পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবতে ১।৩।২৬ শ্লোকে দেখা যায়—

অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ।
যথাবিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ॥

অর্থাৎ হে সৌনকাদি ঋষিগণ, যেরূপ অক্ষয় সরোবর হইতে সহস্র ক্ষুদ্র প্রবাহ-সমূহ নির্গত হয়, তদ্রূপ সত্ত্বসাগর শ্রীহরি হইতে অসংখ্য অবতার-সমূহ প্রকটিত হন। ভাগবতের এই প্রমাণের সুযোগ লইয়া আজকাল বহু ভগবানের উৎপত্তি হইয়াছে। ইংরাজীতে একটী কথা আছে,—**Devils can quote scriptures,** অর্থাৎ শয়তানও শাস্ত্র-প্রমাণ উল্লেখ করে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে,—শয়তানগণ তাহাদের শয়তানি জগতের লোকের নিকট আদৃত করিবার জন্য শাস্ত্র-প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া সরল-হৃদয় ব্যক্তিগণের বিশ্বাস আকর্ষণ করে। বর্ত্তমান কলিযুগে আমরা ইহার প্রত্যক্ষ উদাহরণ সর্ব্বত্রই বিশেষতঃ বাঙ্গালা দেশে লক্ষ্য করিতেছি। যাঁহারা ধর্ম্মজীবন যাপন করিতে চাহেন, তাঁহারা এই শ্রেণীর ভগবত্তায় কথনই আকৃষ্ট হইবেন না।

কিঞ্চিদধিক শতবৎসর পূর্ব্বে এক জেলের ব্রাহ্মণের বংশে একব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়া ধর্ম্মজীবন যাপন করিতে আরম্ভ করেন। কিছুদিন পরে তিনি কোন ধর্ম্মেই কোন প্রকার সিদ্ধি নাই ইহা উপলব্ধি করিয়া নানাপ্রকার ধর্ম্ম যাজন করিতে থাকেন। হিন্দু-ধর্ম্মে আস্থাহীন হইয়া মুসলমানগণের মস্‌জিদে গিয়া মুক্তকচ্ছে "আল্লা হুঁ আকবর"—এই কলমা পড়িতে লাগিলেন। তাহাতেও কোন সিদ্ধিলাভ করিতে না পারিয়া পুনরায়

খৃষ্টানধর্ম্মের গির্জ্জায় গিয়া "Oh God, save me from my sin" বলিয়া তপস্যা আরম্ভ করেন। ইহাতেও তিনি কোনপ্রকার সিদ্ধিলাভ করিতে না পারিয়া ব্রাহ্মদের দলে কিছুদিন ঘোরাফেরা করেন। তৎপরে তিনি কোন ধর্ম্মেরই কোন ফল নাই মনে করিয়া সব ধর্ম্মই সমান বলিয়া বিচার করেন। ইহার পরে "সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়" বলিয়া প্রচারিত হয়। কেহ কেহ ইহাকে "যত মত তত পথ" বলিয়া থাকেন। তাঁহার লোক-সংগ্রহের স্পৃহা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় তিনি "পুনর্ম্মূষিকো ভব" এই ন্যায়ানুসারে পুনরায় হিন্দুধর্ম্মে প্রবেশ করেন। হিন্দুধর্ম্মেও তাঁহার বিশেষ আস্থা না থাকায় কোন-সময়ে শিবের উপাসনা, কোনসময়ে কালীর উপাসনা, কোনসময়ে পঞ্চোপাসকগণের কৃষ্ণোপাসনায় আত্মনিয়োগ করেন। ইহাতে কোনপ্রকার স্বফল লাভ করিতে না পারিয়া তণ্ডুল-প্রদাতা ঢেঁকীর উপাসনা করেন। চিত্তের এইপ্রকার অপ্রসন্নতা-হেতু তিনি পৃথক্ কোন ঈশ্বরের উপাসনা হইতে বিরত হইয়া নিজকেই নিজে পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন হইতেই তিনিই 'ভগবান্' এইরূপ প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহার সঙ্গীগণ সকলে একত্রিত হইয়া তাঁহাকে ঐরূপ ভাবে প্রচার করিতে থাকেন। পরিশেষে তিনি একজন প্রসিদ্ধ 'ভগবান্' হইয়া পড়েন।

ইংরাজীতে আমরা একটী কথা শুনিতে পাই—Everbody's property is no body's property, অর্থাৎ যে সম্পত্তি সকলেরই তাহা কাহারও নহে। অর্থাৎ কেহই তাহাতে যত্ন-আগ্রহ করে না। সুতরাং যে সকল ধর্ম্ম যাজন করে, সে কোন ধর্ম্মেরই যাজক নহে। ইহাই ন্যায় ও যুক্তি-সঙ্গত বিচার। এই শ্রেণীর ভগবানের যাহারা সেবক বা স্তাবক, তাহারা কলির ভগবানের সেবক মধ্যে পরিগণিত। তাহাদের কোন ধর্ম্মেই বিশ্বাস নাই, সুতরাং সব ধর্ম্মই এক। যদি কোন একটী ধর্ম্ম যাজন করিয়া তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিতে পারা যায়, তবে অন্য ধর্ম্ম যাজন করিবার আবশ্যকতা কি? ভারতে বিশেষতঃ বাঙ্গালার পঞ্চোপাসনা প্রভৃতি পাঁচ-সাত-দশ-বিশ রকমের ধর্ম্ম বহুদিন হইতেই প্রচলিত আছে। যুক্তির খাতিরে বলিতে হয়, ইহার কোনটীতেই সিদ্ধি নাই। যদি প্রত্যেকটিতেই সিদ্ধি থাকে, আর সেই সিদ্ধি যদি একই হয়, তাহা হইলে প্রত্যেকটি সাধন করিবার প্রয়োজন কি? তবে যদি কেহ বলেন—প্রত্যেক সাধনেরই সিদ্ধি পৃথক্; সুতরাং সিদ্ধির তারতম্য জন্যই প্রত্যেক ধর্ম্মের তারতম্য আছে এবং এই তারতম্যমূলক সিদ্ধি যদি কাহারও প্রয়োজন হয়, তবে তিনি মুসলমান, খৃষ্টান, ব্রাহ্ম, হিন্দু প্রভৃতি যে কোন ধর্ম্মের যাজন করিতে পারেন। তবে ইহা কিন্তু "সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়" হইল না। এ-সম্বন্ধে আমাদের আরও বক্তব্য ক্রমশঃ প্রকাশ করিব। আমরা একটী মাসিক পত্রিকা পড়িয়া এরূপ প্রবন্ধ লিখিতে উদ্দীপনা পাইয়াছি।

—শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা ৯ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা।

অষ্টম বর্ষের সূচনা

দেখিতে দেখিতে আমাদের সাতটী বৎসর অতীত হইয়া গেল। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা ৮ম বর্ষে পদার্পণ করিয়া বজ্রস্বরে ধ্বনিত করিতেছেন,—

তেতো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥ (ভাঃ ১১।২৬।২৬)

অর্থাৎ বিচার-পরায়ণ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সর্ব্বাগ্রে দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সাধুসঙ্গ করিবেন। যেহেতু সাধুগণ কঠোর উক্তির দ্বারা জীব-সাধারণের চিত্তগত বা বিচারগত মালিন্য দূর করিয়া থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের উক্ত শ্লোক ভক্তিপথে প্রবেশ করিবার প্রথম দ্বার-স্বরূপ। ভক্তিপথে প্রবেশ করিতে হইলে অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞানাদি পরিত্যাগ করিয়া অনুকূলভাবে কৃষ্ণানুশীলন করিতে হইবে। শ্রীল রূপগোস্বামী ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু-গ্রন্থে—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥ (ভঃ রঃ সিঃ ১।১।৯)

—শ্লোকের দ্বারা অনুকূল অনুশীলনকেই উত্তমাভক্তি বলিয়া জানাইয়াছেন। জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদও শিক্ষা দিয়াছেন,—

"শ্রীহরিসেবায় যাহা অনুকূল। বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥"

"আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্য-বিবর্জ্জনম্"—শ্রীল রূপপাদ উপদেশামৃতে এইরূপ শিক্ষাও দিয়াছেন। সুতরাং সর্ব্বত্রই সাধন-মার্গে প্রতিকূল-বর্জ্জন ও অনুকূল-গ্রহণ দুইটী ক্রিয়া সাধক-হৃদয়ে যুগপৎ জাগরূক থাকা আবশ্যক। এই উভয় বৃত্তি যুগপৎ গ্রহণ করিতে হইলে **প্রতিকূল-বর্জ্জন করাই অনুকূল-অনুশীলনের অন্যতম** বলিয়া স্বীকৃত হইবে। কোন কোন প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় বলিয়া থাকেন,—অনুকূল-অনুশীলন প্রতিকূল-বর্জ্জন হইতে পৃথক্ ক্রিয়া। প্রকৃতপ্রস্তাবে এইরূপ বিচারকে সুসঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায় না। দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ না হইলে সাধুসঙ্গের সম্ভাবনা কোথায়? অসদাচার পরিত্যক্ত না হইলে সদাচারের স্থান কিরূপে হইবে? শাস্ত্রের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে না পারিয়া প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় স্মার্ত্ত ও অপসম্প্রদায়গুলির অনুগত হইয়া পড়িয়াছে।

আমরা বজ্র-গম্ভীর-নিনাদে বর্ত্তমান যুগের অসৎ-চিন্তাস্রোতকে স্তব্ধীভূত করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছি। আজকাল ধর্ম্মের নামে যে অসদাচার, কদাচার, অসিদ্ধান্ত, কুসিদ্ধান্ত প্রভৃতি ভারতকে আক্রমণ করিয়াছে, আমরা সেই নব্যযুগীয় অসৎ চিন্তাগুলির

সৎ-সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইব। বর্ত্তমান ভারতের বক্ষে বহু অপসম্প্রদায় ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের তাণ্ডব নৃত্য চালাইতেছে। সেই সকল ধর্ম্মধ্বজিগণের বিরুদ্ধে লেখনী সঞ্চালন করিয়া আমরা তাহাদিগকে নিস্তব্ধ করিতে চেষ্টা পাইব। "যত মত তত পথ" এবং "মানুষের পূজাই ভগবানের পূজা" প্রভৃতি অপসম্প্রদায়ের অশাস্ত্রীয় কুশিক্ষার দ্বারা ভারতীয় ধর্ম্ম-চিন্তাস্রোত সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। পাশ্চাত্য খৃষ্টানী চিন্তাস্রোত ও মক্কা-মদিনার মুসলমানী ধারা ভারতের ধর্ম্মক্ষেত্রের যতটুকু ক্ষতি করিয়াছে, তদপেক্ষা ভারত ধর্ম্ম-সম্বন্ধে উক্ত অপসম্প্রদায়ের দ্বারা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

ভারতে, বিশেষতঃ বঙ্গভূমিতে শস্যের চাষ-আবাদ কমিয়া গিয়া আজকাল ভগবানের চাষ (?) অধিক পরিমাণে চলিতেছে! যেখানে-সেখানে ভগবান্ ও যুগাবতারের আমদানী হইতেছে! প্রোপাগ্যাণ্ডার (Propaganda) যুগে তোসামোদকারী দালালের সাহায্যে এবং গ্রাম্য ও নাগরিক বার্ত্তাবহের প্রচারে ভগবানের উৎপত্তি সহজ হইয়া পড়িয়াছে। ইহারই নাম দুঃসঙ্গ, ইহা সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জনীয়। ধর্ম্মের নামে এই-প্রকার পাষণ্ডতা ও ভণ্ডামি পরিত্যক্ত না হইলে সৎসঙ্গের সম্ভাবনা কোথায়?

—শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা ৮ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা।

নবম বর্ষের বিদায়

'নবম' অবম নহে, নবীন। যদিও 'নব'-শব্দের উত্তর 'মট্'-প্রত্যয় করিলে সংখ্যা-সমাপ্তি বুঝায়; কিন্তু এস্থলে অর্থাৎ নবম বর্ষে আমাদের ক্রিয়া-সমাপ্তি বা সংখ্যা-সমাপ্তি লক্ষিত হইতেছে না। তথাপি বৈয়াকরণিকগন 'মট্'-প্রত্যয়ের দ্বারা সংখ্যার সমাপ্তিকে লক্ষ্য করায় আমরা 'বিদায়'-শব্দ আহ্বান করিতেছি। যখন আমরা নবম বর্ষের ১ম সংখ্যা মুদ্রিত ও প্রকাশিত করি, তখন বৈয়াকরণিকগণের 'মট্'-প্রত্যয়ের দ্বারা সমাপিকা ক্রিয়া হৃদয়ে জাগরূক হয় নাই। প্রথম সংখ্যা-দ্বারাই আমাদের দ্বিতীয় সংখ্যা হইতে দ্বাদশ সংখ্যা পর্য্যন্ত সমুদায় সংখ্যাই আবাহন হইয়াছে। তজ্জন্য নবম বর্ষের সমাপ্তির অবমতা আমাদিগকে স্পর্শ করে নাই। বর্ত্তমান বর্ষ-সমাপ্তিতেও আমরা আমাদের পারমার্থিক বার্ত্তাবহনের সমাপ্তি লক্ষ্য করিতেছি না। আগামী দশম বর্ষের আগমনী-গীতি আমাদের হৃদয়-বীণাযন্ত্রে ঝঙ্কার দিতেছে। সুতরাং নব-শব্দের উপর 'মট্'-প্রত্যয় থাকিলেও নবম অবম নহে। নবীনতাই ইহার আভ্যন্তরীণ স্বরূপ। নবীনের উৎসাহ, উদ্যম ও অফুরন্ত চেষ্টা নবমের মধ্যে পূর্ণ বিদ্যমান। নবধা ভক্তিই ইহার স্বরূপ।

তবে শিরোনামায় বিদায়-শব্দের সংযোগ কেন? বিদায় আমাদিগকে সর্ব্বদাই ব্যথিত করে। যে-বস্তু সনাতন এবং যাহার ক্রম বা সমাপ্তি খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন, সে-স্থলে বিদায় কোথায়? তথাপি গৌড়ীয় রস-সাহিত্যে বিদায়ের এত গৌরব যে, মিলন তাহার নিকট সমপর্য্যায়ে দাঁড়াইতে পারে না। অন্য পক্ষে পরস্পর পরস্পরের সহিত এমনই বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ যে, একটী অপরটীর অদর্শনে অত্যন্ত ব্যথিত। বিদায় ও মিলনে এই প্রকার বন্ধুত্ব। এই উভয় রস-তত্ত্বের মধ্যে যে কোনও প্রকার মিত্রতা, সখ্যভাব ও সৌহৃদ্য নাই, এইরূপ নহে। পরন্তু বিদায় ও মিলনের মধ্যে অচ্ছেদ্য প্রিয়ত্ব নিত্যবর্ত্তমান। আমাদের নবম বর্ষ দশম বর্ষের সূচনা করে। সুতরাং নবম দশমেরই বন্ধু, সুহৃদ্, মিত্র ও সখা। প্রিয়ত্ব লক্ষণে বন্ধুত্ব ভাব অথবা স্বজন বলিলে নবম ও দশম একই তত্ত্ব বলিয়া গৃহীত হইবে। স্বজন বা প্রিয়ত্বের এই চারিটী লক্ষণ আমাদের পত্রিকার আদ্যন্ত-মধ্যে সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান। বন্ধু, সখা, মিত্র ও সুহৃৎ-শব্দকে একার্থবোধক স্বজন বলিয়া লক্ষ্য করিলেও শব্দ মাত্রেরই কিছু না কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। শাস্ত্র বলেন—

অত্যাগসহনো **বন্ধুঃ**, সদৈবানুমতঃ **সুহৃৎ**।
একক্রিয়ং ভবে**ন্মিত্রং**, সমপ্রাণঃ **সখা** মতঃ॥

অর্থাৎ প্রণয়াস্পদদ্বয়ের মধ্যে যিনি অপরের ত্যাগ বা বিদায় সহ্য করিতে পারেন না, তিনি **বন্ধু**। যিনি অন্যতরে অনুমত ও অনুগত থাকেন তিনি **সুহৃৎ**। যে দুইজনের একবিধ ক্রিয়া তাহারা পরস্পর **মিত্র**, এবং যিনি অন্যতরকে নিজের প্রাণতুল্য জ্ঞান করেন তিনি **সখা**। * * *

বিদায় ও মিলন পরস্পর স্বজন। পূর্ব্বোক্ত চারি প্রকার আত্মীয়তাই উভয়ের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ পৃথক্ বস্তু নহে। প্রাকৃত কাব্য-মোদিগণ ইহাকে পৃথক্ভাবে বিচার করিয়া অপ্রাকৃত রসতত্ত্বে একটা বিপ্লব ও বিরোধ সৃষ্টি করিয়াছে। তাই প্রাকৃত কাব্যরসের রসিকগণের পরম-মোক্ষের বা বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তির সৌভাগ্য হয় না। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং বিপ্রলম্ভ বিগ্রহ। তিনি রাধাকৃষ্ণ মিলিত-তনু; ভোক্তা ও ভোগ্যার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধযুক্ত মিথুনতত্ত্বের একই বিগ্রহ। শাস্ত্র তজ্জন্যই 'শক্তি-শক্তিমতো-রভেদঃ' বিচার করিয়া থাকেন। বিদায় ও মিলনের আপাতঃ বিরোধ (মাত্র)—বাস্তব বিরোধ নহে। 'রস'-শব্দের দ্বারা আনন্দকেই লক্ষ্য করা হয়। 'রস'-শব্দের যদি এই তাৎপর্য্যই স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে বিদায়, বিরহ ও বিপ্রলম্ভকে কখনও 'রস'-পর্য্যায়ে গণনা করা যায় না। কিন্তু সর্ব্বশাস্ত্রেই ইহাকে এক উন্নত উজ্জ্বল-রস বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। প্রাকৃত কাব্যমোদিগণও ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। অত্যন্ত দুঃখাত্মক বিরহ-রসের কাব্যই রসিকগণের নিকট শ্রেষ্ঠ কাব্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। এবং ইহার অভাব যে কাব্যগ্রন্থে দেখা যাইবে, তাহা আংশিক কাব্যরূপে গৃহীত হয়।

আংশিক কাব্য কোন কাব্যই নহে; যে-হেতু যুক্তিবাদিগণ বলেন 'আংশিক সত্য কখনও সত্য নহে'। গৌড়ীয় সাহিত্যে সর্ব্বত্রই এই রসতত্ত্বকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। এবং এই রসতত্ত্ব জানিতে হইলে তত্ত্বত্রয়ের আলোচনা সর্ব্বাগ্রে এবং সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজন। তজ্জন্য সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন—এই তত্ত্বত্রয় শ্রীপত্রিকার প্রতি বর্ষ, প্রতি সংখ্যা, প্রতি পত্র, প্রতি ছত্র, প্রতি শব্দ ও প্রতি অক্ষরে লক্ষিত হইবে। বিষয়, সংশয়, পূর্ব্বপক্ষ, সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতি—এই পঞ্চাঙ্গ ন্যায়কে ক্রোড়ীভূত করিয়া সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের চরম-বিকাশ ব্যক্ত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে।

শ্রীল প্রভুপাদ বলেন—"প্রাণ আছে তার সে-হেতু প্রচার।" শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পরিচালিত শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা সমগ্র-বিশ্বের একমাত্র সমালোচনী পারমার্থিক-পত্রিকা। এই পত্রিকা দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন সর্ব্বতোভাবে করিয়া থাকেন। প্রাণ-হীন অপারমার্থিক পত্রিকার প্রচার থাকিলেও মৃত-শরীরে অলঙ্কার যে-প্রকার শোভাবর্দ্ধন করে না, সেই প্রকার অপসম্প্রদায়-সমূহের দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ষাণ্মাসিক ও বার্ষিক পত্রিকাসমূহের বহুল প্রচার থাকিলেও তাহার দ্বারা ধর্ম্মজগতের কোনও শোভা হয় না বা কোনও প্রকার কল্যাণ সাধিত হয় না। আহার-নিদ্রা-ভয়-ইন্দ্রিয়তর্পণাদিতেই যদি মনুষ্য-জগৎ ব্যস্ত থাকেন, তাহা হইলে মনুষ্যেতর প্রাণী-জগতের সহিত তাহাদের পার্থক্য কোথায়? শাস্ত্র বলেন—

আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।
ধর্ম্মঃ হি তেষামধিকোবিশেষঃ ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥

তাৎপর্য্য এই যে—আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুনাদি মনুষ্য ও পশু সকলের মধ্যে সমভাবে বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু সেই মনুষ্য ও পশুগণের মধ্যে ধর্ম্মই পার্থক্য ও বিশেষত্ব স্থাপন করিয়া থাকে। ধর্ম্ম না থাকিলে মানুষ পশুগণের সমতুল্য। সুতরাং সুবুদ্ধি-মানবগণ এই শ্রেণীর কেবলমাত্র খাওয়া-দাওয়া-থাকা লইয়াই জীবন ধারণ করার প্রশ্রয় দেন না। আবার "ধর্ম্মই পশুর সহিত মানুষের পার্থক্য স্থাপন করে"—শাস্ত্রের এই উপদেশের সুযোগ লইয়া পৃথিবীতে অনেক প্রকার ধর্ম্মের প্রচলন হইয়াছে। কারণ তাহারা ধার্ম্মিক হইলেই পশু-সমাজ হইতে পৃথক হইয়া উন্নত সমাজে উন্নীত হইলেন,—মনে করিয়া থাকেন। দুঃখের বিষয় কলির প্রাবল্য-হেতু ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম, কুধর্ম্ম, বিধর্ম্ম, অপধর্ম্মাদিই সমগ্র জগৎকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। বাহ্য স্থূল দৃষ্টিতে যে-গুলিকে ধর্ম্ম-বলিয়া প্রচার করা হইতেছে প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা ধর্ম্ম-শব্দবাচ্য নহে। যদি এই অপধর্ম্মগুলিকেই ধর্ম্ম বলিয়া সংজ্ঞা দেওয়া হয়, তাহা হইলে অধর্ম্ম আর কাহাকে বলা হইবে।

যাহার যাহা ইচ্ছা তাহাই যদি করা হয় তাহা হইলে স্বেচ্ছাচারিতা কাহাকে বলা হইবে? ধর্ম্ম-শব্দ অধর্ম্মের বিনাশক ও পশুধর্ম্মের সন্ত্রাশক। পশু, পক্ষী প্রভৃতি মনুষ্যেতর প্রাণীসকল মৎস-মাংস ও কদর্য্যাদি ভক্ষণ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। সেই শ্রেণীর

আহার মনুষ্য-জগৎ গ্রহণ করিলে তাহাদের ধর্ম্ম হইল কোথায়? আজকাল কতকগুলি যথেচ্ছধর্ম্মী, যথেচ্ছাচারী, যথেচ্ছাহারী, যথেচ্ছাভাষী ও যথেচ্ছকর্ম্মী ধার্ম্মিক-সজ্জায় সজ্জিত হইয়া সমগ্র বিশ্বে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে। তাহারা কলির চর ও ভণ্ড তপস্বী। সাংসারিক জীবনেও মনুষ্যমাত্রেরই পবিত্রতা রক্ষা করিয়া ধর্ম্ম-জীবন অতিবাহিত করা আবশ্যক। তাহা না করিলে তাঁহারাও মনুষ্যেতর অবর কুলোদ্ভূত বলিয়া দৈত্য-দানব-শ্রেণীভুক্ত হইবেন। আহার নিদ্রাই মূল বা কিছুকাল বাঁচিয়া থাকাই মনুষ্য-জন্মের একমাত্র কর্ত্তব্য নহে।

আজকাল দেশীয় কর্ত্তৃপক্ষগণের মধ্যে অনেকেই 'বিদায়' অপেক্ষা 'মিলনে'র অনুসন্ধিৎসু বা অভিলিপ্সু হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা ভ্রমবশতঃ বলিয়া থাকেন—মতভেদই বিচ্ছেদ ও বিবাদের কারণ। আমরা শাস্ত্রযুক্তির দ্বারা অবগত হইতে পারি যে, বিদায় ও মিলন পরস্পর বন্ধু। আধুনিক মনীষীসকল বলেন—যে-হেতু ধর্ম্মের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ পরিলক্ষিত হয়, সেই হেতু 'ধর্ম্ম' কাহারও যাজন করা কর্ত্তব্য নহে। এক্ষেত্রে আমাদের জিজ্ঞাস্য—তাহা হইলে কি অধর্ম্মই যাজন করিতে হইবে? যাহারা ধর্ম্মের মধ্যে বিবাদ বা মতভেদ লক্ষ্য করিয়া থাকেন, তাঁহারাই বিবাদী এবং অধার্ম্মিক। যেগুলি ধর্ম্ম নয়—'যত মত তত পথে'র পথিক—তাহারাই অধার্ম্মিক। ধর্ম্মের ভিতরে অথবা কতকগুলি মতবাদের ভিতরে নানাপ্রকার ভেদ লক্ষ্য করিয়াই তাহাদের মধ্যে সদসতের একটা সামঞ্জস্য স্থাপন করিবার চেষ্টা হইতেই 'যত মত তত পথ'-রূপ একটী উচ্ছৃঙ্খল চিন্তার উৎপত্তি হইয়াছে। 'যত মত তত পথে'র দ্বারা কি সৎ ও অসৎ সকলকেই অযথা এক করিয়া ফেলিতে হইবে? এই শ্রেণীর মতবাদই ধর্ম্মজগতে তথা-কথিত বিবাদের সৃষ্টি করিয়াছে। ধর্ম্মকর্ত্তা একমাত্র ব্যাস। তিনি বিবাদের সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন। পক্ষান্তরে পরস্পর মতভেদই যদি ধর্ম্মত্যাগের হেতু হয়, তাহা হইলে সংসারে পিতা-পুত্রে, স্বামী-স্ত্রীতে, বন্ধু-বান্ধবে, চাকর-মনিবে সর্ব্বত্র সর্ব্বথা সর্ব্বদাই মতভেদ ও বিবাদ লক্ষিত হয়। সুতরাং তাঁহাদের মতে ঐ প্রকার সম্বন্ধ স্থাপন করিতে যাওয়া কখনই যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ত' সর্ব্বত্রই মতভেদ প্রতি মুহূর্ত্তে লক্ষিত হইতেছে—তাহা হইলে, রাজনীতি সর্ব্বাগ্রে পরিত্যক্ত হউক। 'মতভেদ-হেতু ধর্ম্ম পরিত্যজ্য'—এইরূপ যাহাদের মত তাহাদের সহিত 'ধর্ম্মই একমাত্র মতভেদ নিরাশের হেতু'—এইরূপ মতবাদিগণের একটা ভীষণ মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। এই শ্রেণীর মতভেদ-ক্ষেত্রে কাহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে? মতভেদই কোনও বিশুদ্ধ বিষয় পরিত্যাগের কারণ হইতে পারে না; পরন্তু উভয়ের মতভেদের মধ্যে কোন্‌টী সত্য এবং কোন্‌টী অসত্য তাহা নিরূপণ করিয়া সত্যগ্রাহী ব্যক্তিসকল সত্যেরই সমাদর করিয়া থাকেন। অসত্যের সহিত সত্যের বিবাদ চিরদিনই আছে এবং থাকিবে। দেবাসুরের সংগ্রাম ঐতিহাসিক যুগের পূর্ব্ব হইতেই আছে। সুতরাং পরস্পরের মতভেদ-হেতু

শান্তির পথ ও সত্য পরিত্যাগ করিয়া অশান্তির পথ ও অসত্যই গ্রহণ করিতে হইবে—এরূপ যুক্তি যুক্তিবাদী বা তার্কিকগণও স্বীকার করেন না। সৎ ও অসৎ, ভাল ও মন্দ, আলো ও অন্ধকার লইয়াই জগৎ। ইহাদের মধ্যে তুলনামূলক বিচার করিয়া অসৎ, মন্দ ও অন্ধকার পরিত্যাগ করিয়া সৎ, ভাল ও আলো গ্রহণ করিতে হয়। সুবুদ্ধিগণ অসৎ-প্রভৃতি অবর চিন্তাস্রোতের প্রশ্রয় না দিয়া 'সংস্থ সজ্জেত বুদ্ধিমান্'—এই ন্যায় অবলম্বন করিয়া থাকেন।

—শ্রীগৌঃ পত্রিকা ৯ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা।

গৌড়ীয়ের রুদ্র-বর্ষ

"কাজীর কাছে হিন্দুর পরব"

গৌড়ীয়ের একাদশ বর্ষের নাম রুদ্র-বর্ষ। সংখ্যা-বিচারে একাদশ সংখ্যার নাম 'রুদ্র'-সংখ্যা। রুদ্র-দিবসেই গত আত্মার শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য। শ্লেষোক্তিতেও শ্রাদ্ধ-ক্রিয়াকে অন্তিম ক্রিয়া বলা হয়। কোন ব্যক্তি মৃত হইলেই তাহার শেষ হয় না। শ্রাদ্ধের দ্বারাই তাহার শেষকার্য্য সাধিত হয়। সুতরাং কাহারও শ্রাদ্ধ সপিণ্ডীকরণ বলিলে তাহাকে নিঃশেষ করা বুঝাইয়া থাকে। গৌড়ীয়ের এই রুদ্র-বর্ষে কতকগুলি মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধানুষ্ঠান আবশ্যক। কেন না, যাহারা বায়ুভূত নিরাশ্রয় অর্থাৎ প্রত্যক্ষ-দর্শনে যাহাদের অস্তিত্ব উপলব্ধ হয় না, অথচ তাহাদের ক্ষীণ সত্তা প্রেতযোনি লাভ করিয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় অনুভূত হয়, তাহাদের পারলৌকিক শ্রাদ্ধাদি না হইলে কিরূপে উদ্ধার লাভ করিবে?

গুরু নানকজী এই বৈদিক শ্রাদ্ধ-ক্রিয়ার বিশেষ বিরোধী ছিলেন। তাঁহার পর-জগতের দেবতাগণের প্রতি কোন আস্থা ছিল না। বৈদিক শাস্ত্র, উপনিষৎ, পুরাণ, মহাভারত প্রভৃতি সনাতন শাস্ত্রের প্রতি তাঁহার কোন শ্রদ্ধা ছিল না। তাঁহার নিকট বৈদিক ব্রাহ্মণগণের একাদশাহে শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া একটা উপহাসের বিষয় ছিল। সুতরাং শ্রাদ্ধ-বিরোধী নানক-পন্থী, কবীর-পন্থী, নিম্নরেতা, গৃহমন্থী প্রভৃতি প্রেতযোনি প্রাপ্ত ও প্রত্যক্ষ-দৃষ্টির অন্তরালে অবস্থিত বহু সাম্প্রদায়িকগণের একাদশ বর্ষে সপিণ্ডীকরণ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। কেহ কেহ হয়ত বলিবেন,—যাহাদের শ্রাদ্ধে বিশ্বাস নাই, তাহাদের জন্য শ্রাদ্ধ করিবার আবশ্যক কি? উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, বস্তুশক্তি নষ্ট হইবার নহে। ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক্, জ্ঞাতসারে হউক বা অজ্ঞাতসারেই হউক, বস্তুর ক্রিয়া রুদ্ধ হইবে না—দ্রব্যগুণ প্রকাশিত হইবেই। সাধারণ কথায় বলে—

জানিয়াই হউক, আর না জানিয়াই হউক, বিষ খাইলেই মৃত্যু ঘটিবে। কবির-সম্প্রদায়ে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান বিষবৎ। তাহা হইলেও 'বিষে বিষক্ষয়', ইহা স্বতঃসিদ্ধ বাক্য। সুতরাং অবিশ্বাসের **'শৈলেন্দ্র'** শাস্ত্রীয় আণবিক বিস্ফোরণের দ্বারা ধ্বংস হইবেই।

দেব-দানবের লড়াই চিরদিনই আছে ও থাকিবে। হিরণ্যকশিপু সত্যযুগে সর্ব্বাপেক্ষা ধীশক্তি-সম্পন্ন সম্রাট্ হইয়াও ক্ষুদ্র শিশু প্রহ্লাদের ইচ্ছামাত্রই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। ত্রেতাযুগে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক বিজ্ঞানে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পারদর্শী ও দশদিক্ চিন্তা করিয়া কার্য্যক্ষম দশমৌলি রাবণ কপিকুল-পতি হনূমৎ-চেষ্টায় শ্রীরামচন্দ্রের হস্তে সর্ব্বতোভাবে নিহত হইয়াছে। দ্বাপরযুগে কংস-নামধারী ক্লীবপুরুষ ভারত-সাম্রাজ্যের অধিপতি হইয়াও শিশু কৃষ্ণের হস্তে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। 'মেদিনী-গর্ভোত্থিত শ্রী-হীন শৈলেন্দ্রও' যুক্তি-তর্কের উন্নত শিখরে যতই উত্থিত হউন কেন, তাহা যবন-জোলার উপজীব্য পর্য্যুষিত অমেধ্য ব্যতীত অন্য কিছু নহে। অতিমর্ত্ত্য অপ্রাকৃত জীব-বৈশিষ্ট্যের গভীরতম শাস্ত্রালোচনার বজ্রাঘাতে শৈলেন্দ্রের উচ্চতম শিখর চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া প্রেম-বন্যা পর্য্যুষিত অমেধ্যের পূতিগন্ধ বিধৌত করিয়া অপ্রাকৃত বিশুদ্ধসত্ত্ব-ধর্ম্মের অমৃতধারা প্রবাহিত করিবে।

মেদিনীপুর-সহরের শৈলেন্দ্রনারায়ন ঘোষাল নামক এক ব্যক্তি কর্ণেলগোলা হইতে সনাতন-ধর্ম্ম-জগতে "আলোকতীর্থ"-নামক এক দুর্গন্ধময় ও বিষাক্ত গোলা বিস্ফোরণ করিয়াছেন। এই কর্ণেলগোলায় নিরপেক্ষ শান্ত নিরীহ ধর্ম্ম-রাষ্ট্রের ধ্বংস বিধানের জন্য জঙ্গী-প্রণালীতে বা মিলিটারী-বিধানে অসৎযুক্তির বারুদে নানাবিধ বিস্ফোরক দ্রব্য প্রস্তুত হইয়াছে। মেদিনীপুর-সহরস্থ উক্ত কর্ণেল-গোলার কেল্লার নাম—"সন্ত ধাম"। আসামী ভাষায় 'স'এর উচ্চারণ 'হ' হইয়া থাকে। বাংলাদেশেও এইরূপ উচ্চারণ বর্ত্তমান 'ঘোষাল' হইলে বিশেষ দোষের হইবে না। যেহেতু ইহা 'সন্ত ধাম' না হইয়া 'হন্ত ধাম' বা Slaughter house (কসাইখানা) বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিশেষতঃ উহা কবির সাহেবের বর্ত্তমানে আবিষ্কৃত হিন্দু-লাঞ্ছনার একটী প্রধান দুর্গ।

কবির সাহেবের ইতিহাস ভারতের ধর্ম্ম-জগতের ঐতিহাসিকগণের নিকট অপরিচিত নহে। কবির সাহেব নিম্নশ্রেণীর মুসলমান-কুলে অর্থাৎ জোলার গৃহে জন্মগ্রহন করিয়াছিলেন। মৃত্যুর পর কতক হিন্দু-সমাজ মুসলমানের আচার ব্যবহারের সহিত তাঁহার কিছু পার্থক্য আছে মনে করিয়া তাঁহাকে হিন্দু বলিয়া দাবী করেন এবং উক্ত সাহেবের হিন্দুধর্ম্মের সহিত কোনই সম্বন্ধ নাই দেখিয়া ও মুসলমান-কুলে আবির্ভূত জানিয়া ইসলামীগণ তাঁহাকে দাবী করেন। ফলে তাঁহার মৃতদেহ দুইভাগে বিভক্ত করিয়া অর্দ্ধাংশ মুসলমানগণ ভূ-প্রোথিত করিয়া কবর দেন, বাকী অর্দ্ধাংশ হিন্দুগন কাশীরাজের রাজধানীতে আনয়নপূর্ব্বক দাহ করেন। কবির-পন্থীর ইতিহাস ভারতবাসীর নিকট নূতন নহে। শৈলন্দ্রেবাবু বোধহয় বেলুড়মঠের রামকৃষ্ণদেবের শিক্ষা ও আদর্শ লইয়াই

'না হিন্দু, না মুসলমান' এইরূপ এক মাঝামাঝি সম্প্রদায়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ফেলিয়াছেন! কারণ তিনি (শৈলেন্দ্রবাবু) রামকৃষ্ণ মিশন হইতে জানিতে পারিয়াছেন—রামকৃষ্ণদেব হিন্দু হইয়াও মুক্তকচ্ছে মুসলমানদের মসজিদে গিয়া 'আল্লা হুঁ আকবর' মন্ত্র জপ করত সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। সুতরাং মুসলমান ধর্ম্মও মন্দ নহে, কেন আর আমরা মুসলমানের হস্তের লগুড়াঘাতে প্রাণত্যাগ করি, ইসলাম-ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে আর ক্ষতি কি? সব ধর্ম্মই সমান! আবার হয়ত মনে করিয়াছেন,—হিন্দু ভ্রাতৃ-সম্প্রদায় ও আত্মীয়-স্বজন মুসলমান হইলে ত' আমার হাতের জল গ্রহণ করিবে না, আমাকে স্পর্শ করিবে না, আমাকে 'অহিন্দু' বলিয়া সমাজচ্যুত করিবে, বর্ত্তমান সমাজ-তন্ত্রের যুগে আবার হয়ত বিপদে পড়িব।—এই প্রকার নানাবিধ চিন্তা করিয়া বোধহয় স্থির করিয়াছেন—Via-media অর্থাৎ মাঝামাঝি উভয় কুল রক্ষা করিয়া এক নবীন পন্থা আবিষ্কার করা যাক্। তাঁহার এই চিন্তার পরিপোষকরূপে কবির সাহেবই আদিগুরুরূপে কল্পিত হইয়াছেন।

এক্ষণে আমরা শৈলেনবাবুকে প্রশ্ন করিতেছি—তিনি কি হিন্দু, না—মুসলমান? কবির সাহেবের 'দুই নৌকায় পা' দেওয়া আছে, তিনিও কি তাহাই করিয়াছেন! যাহা হউক, তিনি আমার এই প্রশ্নের উত্তরে 'হাঁ' বলিলেও দোষী সাব্যস্ত হইবেন, 'না' বলিলেও অপরাধের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন না। আমরা শৈলেনবাবুকে হিন্দু-ধর্ম্মের বহির্ভূত কবির-পন্থী বলিয়া ধরিতে পারিয়াছি। ইহা তিনি তাঁহার রচিত "আলোক-তীর্থ" গ্রন্থের কতিপয় ক্ষেত্রে গোপন করিবার চেষ্টা করিলেও অনেকস্থলেই তিনি স্পষ্টতঃ ধরা দিয়াছেন যে, তিনি কবির-পন্থী, সুতরাং হিন্দু নহেন। তিনি অনধিকার-চর্চ্চা করিয়া বৈদিক সনাতন বৈষ্ণব-ধর্ম্মের যে অযথা সমালোচনা করিয়াছেন, তাহা দেখিয়াই আমার মনে হইয়াছে—**"কাজীর কাছে হিন্দুর পরব।"** আমরা উক্ত গ্রন্থের নিরপেক্ষ তীব্র প্রতিবাদ করিয়া রুদ্রের অসুর-বিনাশের লীলা স্মরণ করিব। পূর্ণপুরুষ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই রুদ্রের দ্বারা বহু অসুরকে মোহিত করিয়াছিলেন, 'সুদর্শনের' দ্বারা অনেক দৈত্যের জিহ্বা স্তম্ভন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অপ্রাকৃত বিশুদ্ধসত্ত্বময় লীলাদ্বারা দানব-দলনের শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন।

—শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা ১১ বর্ষ, ১ম সংখ্যা

(৩০ ফাল্গুন ১৩৬৫, ইং ১৪।৩।১৯৫৯)

শ্রীপত্রিকার উদ্দেশ্য

হরিসেবা ও জনসেবা

শ্রীগৌড়ীয়-পত্র হরিসেবক—জনসেবক নহেন। হরিসেবা ও জনসেবা দুইটী পৃথক্ বৃত্তি; শুধু তাহাই নহে, ইহাদের পরস্পরকে অনুকূল বৃত্তিও বলা যায় না। জন-সেবকগণের ভোগ-প্রবণতা অত্যন্ত প্রবল হওয়ায় হরিসেবার বিরোধী হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং জনসেবকগণই জনগণের ভোগের ইন্ধন যোগাইতে গিয়া নাস্তিক হইতে বাধ্য হইয়াছে। এক কথায়, জন-সেবকগণ ধর্ম্মধ্বজী ও নাস্তিক এবং হরি-সেবকগণই একমাত্র আস্তিক।

ধর্ম্ম-জগতে আস্তিকগণই বিষ্ণু-সেবক এবং নাস্তিকগণই জন-সেবক। জন-সেবকগণ সাধারণ জনগণের ইন্দ্রিয়-তর্পণ করাকেই 'ধর্ম্ম' জ্ঞান করিয়া তাহাই অনুশীলন করিতে ব্যস্ত হইয়াছেন—ইহা প্রত্যক্ষ সত্য। এমন কি ইহাও সর্ব্ববাদি-সম্মত যে, পার্থিব জনগণের চিত্তবৃত্তি, মনোবৃত্তি, ইন্দ্রিয়বৃত্তি, শারীর-বৃত্তি পরস্পর পৃথক্। শুধু পৃথক্ বলিলে চলিবে না, বিষম ও বিরোধী বলিয়াও অনুভূত হয়। অসম ও বিষম বৃত্তির সাম্যস্থাপন করাই ইন্দ্রিয়-পিপাসুগণের বর্ত্তমান ধর্ম্ম বা কলির ধর্ম্ম। ইন্দ্রিয়জনিত ভোগ-পিপাসা চরিতার্থের জন্য যে প্রাণীমাত্রেরই পরস্পরের মধ্যে আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনাদির চেষ্টা লক্ষিত হয়, তাহারই ইন্ধন সংগ্রহকে ধর্ম্মমতরূপে অঙ্গীকার করাই জনমত বা জনসেবা। সুতরাং নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে ইহাই চরম নাস্তিকতা অর্থাৎ ঈশ্বর ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবেশ।

কলিকালে নাস্তিকগণই জন-সেবার ঢক্কা বাজাইয়া নাস্তিকতাকেই 'ধর্ম্ম' বলিয়া প্রচার করিতেছে। হরিসেবা কখনও জনসেবা নহে। যুক্তির খাতিরে যদি জনগণকেই হরি বলিয়া গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে হরিসেবা ও জনসেবা একই হইতে পারে। কিন্তু স্বয়ং হরি যদি জনগণের সৃষ্টিকর্ত্তা ও নিয়ামক হন, তাহা হইলে 'জনগন' 'শ্রীহরির' বিচারে পৃথক্ হইয়া পড়েন—এক কখনও হন না। যথা—পিতা ও পুত্র কখনও এক নহে। কেহ যদি "আত্মবৎ জায়তে পুত্রঃ" এই ন্যায় অবলম্বনে পুত্রকেও পিতা-স্বরূপ বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন, তাহা হইলেও কার্য্যক্ষেত্রে বা ব্যবহার ক্ষেত্রে, এমন কি প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহারাও পিতা-পুত্রের ভেদই স্বীকার করিয়া থাকেন, একত্ব স্বীকার করেন না। তাহার প্রধান লক্ষণ—পুত্রকে তাহার মাতার সহিত পিতার সর্ব্বপ্রকার ব্যবহার করিতে দেওয়া হয় না; সুতরাং পিতা পুত্র কখনই এক হইতে পারে না। এইপ্রকার ব্যবহারিক যুক্তি-অনুসারে সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর এবং তাঁহার সৃষ্ট পদার্থ জনগণকে এক বলা যাইবে না। সুতরাং জনসেবা ও হরিসেবা কখনই এক নহে।

আধুনিক নাস্তিকসমাজের মস্তিষ্কে হরিসেবা ও জনসেবার পার্থক্য অনুভব করার জ্ঞানের নিতান্ত অভাব। অশিক্ষিত ব্যক্তি চালক সাজিলে হেঁয়ালী-খেয়ালীর দ্বারাই মোড়ল সাজিয়া বসে। বিবেক-শূন্য ব্যক্তি জ্ঞানী সাজিবার চেষ্টা করিলে ভারতীয় হিন্দুধর্ম্মের সর্ব্বনাশকারী হইয়া পড়ে এবং হিন্দুকে মুসলমান, মুসলমানকে হিন্দু বা খৃষ্টান এবং নানকপন্থী, বৌদ্ধ প্রভৃতিকে একাকার বলিয়া মনে করে। ইহাই হিন্দুধর্ম্মের ধ্বংসের মন্ত্র। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা এই প্রকার হিন্দুধর্ম্ম-বিনাশকারী নাস্তিক অপসম্প্রদায়ের ধ্বংসসাধনের জন্য শাস্ত্রীয় অস্ত্রের দ্বারা যুদ্ধ ঘোষণা করিবে।

আমরা ক্রমাগত শ্রীপত্রিকার হরিসেবাময় উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছি এবং ভবিষ্যতেও তাহা পরিস্ফুট হইবে। জীব-সেবকগণের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া আমরা তাহাদিগকে নাস্তিকতা-জাল হইতে মুক্ত করিয়া 'জীবে দয়া'র আদর্শ প্রদর্শন করিব। প্রকৃতই যদি 'জীবে দয়া' করিতে হয়, তাহা হইলে এইরূপ জীবসেবিগণের প্রতি দয়া করাই বিশেষ আবশ্যক। (শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি শ্রীধাম নবদ্বীপে এই বৎসর একটী অভ্রভেদী সর্ব্বোচ্চতম শ্রীমন্দির স্থাপন করত তাহাতে শ্রীশ্রী'গুরু'-'গৌরাঙ্গ'-'রাধা'-'বিনোদবিহারীজীউর' বিগ্রহ-চতুষ্টয়ের সহিত নবদ্বীপের অন্তর্গত কোলদ্বীপ-ধামেশ্বর শ্রীশ্রীকোলদেব (বরাহদেব) বিগ্রহ প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক অধর্ম্ম, বিধর্ম্ম, কুধর্ম্ম, অপধর্ম্ম, ছলধর্ম্মাদি বিধ্বংস করিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন।) * * *

—শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা ১৫ বর্ষ, ১ সংখ্যা।
২৯ ফাল্গুন, ১৩৬৯, ইং ১৪।৩।১৯৬৩

সপ্তদশ বর্ষে বিজ্ঞান

দেখিতে দেখিতে আমাদের শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার ষোড়শ বর্ষ অতিক্রান্ত হইয়াছে। ষোলকলা ষোড়শ বর্ষে পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারি। আমাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব-আচার্য্যবর্গের লীলায় আমরা দেখিতে পাই, স্বয়ং ভগবান্ তাঁহাদের দ্বারা সচ্চিদানন্দ-ভক্তিসিদ্ধান্তের ষোলকলা পূর্ণ করিয়াই তাঁহাদিগকে স্বধামে আহ্বান করিয়াছেন। কৃপাময় আচার্য্যবর্গ ষোলকলা পূর্ণের পরিণতি পর্যবেক্ষণের জন্য আরও এক বৎসর প্রকট থাকিয়া বিশ্বের মঙ্গল-পরিস্থিতি লক্ষ্য করিয়াছেন অর্থাৎ সপ্তদশ (১৭শ) বর্ষ পত্রিকা পরিচালনের পর তাঁহারা ভগবদাহ্বানে গোলোক-ভবনে গমন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ "সজ্জনতোষণী"-পত্রিকা স্থাপন করিয়া সপ্তদশ বর্ষ পর্য্যন্ত তাঁহার সেবকসূত্রে সম্পাদনা করিয়াছেন। পরে তিনি তাঁহার সমস্ত প্রচারকার্য্যের ভার তাঁহার সর্ব্বোত্তম অন্বয়াচার্য্য পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের

উপর নির্ভর করিয়া গোলোকস্থ শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মের পার্শ্বে প্রয়াণ করেন। তৎপরে তাঁহার যোগ্যতম অধস্তন গৌড়ীয়-গগনে উজ্জ্বলতম অপ্রাকৃত ভাস্কর শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ ভক্তিধর্ম্মের নবপ্রচেষ্টা প্রদর্শন করিয়া পরম-মঙ্গল আনয়নোদ্দেশ্যে অন্যান্য বহু পারমার্থিক পত্রিকার সমভিব্যাহারে সাপ্তাহিক 'গৌড়ীয়'-পত্রিকা প্রকাশপূর্ব্বক সমগ্র বিশ্বে শ্রীচৈতন্য-বাণীর সর্ব্বোত্তম প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের ন্যায় কোন উন্নত অত্যুজ্জ্বল মহাপুরুষ পৃথিবীর ইতিহাসে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। তিনিও সাপ্তাহিক 'গৌড়ীয়'-পত্রিকার পঞ্চদশ বর্ষেই ষোলকলা পূর্ণ করত তাহাতে গৌর-বাণী সেবা-সৌন্দর্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া গোলোকে শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মের গুহ্যতম প্রকোষ্ঠে আত্মগোপন করিয়াছেন।

আমরাও "শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা"র ষোড়শ বর্ষ অতিক্রম করত সপ্তদশ বর্ষে প্রবেশাধিকার লাভ করিলাম। ভগবদিচ্ছা হইলে শ্রীপত্রিকা বিশ্বের বৈজ্ঞানিক অজ্ঞতা বিদূরিত করিয়া ধর্ম্মজগতে প্রকৃত স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান প্রকাশ করিতে সমর্থ হইবেন। কু-জ্ঞান, অ-জ্ঞান, অ-বিজ্ঞান, হত-জ্ঞান, মূঢ়-জ্ঞান প্রভৃতি বিজ্ঞান-নামে চালিত হওয়া কলির প্রভাব ব্যতীত অন্য কিছু নহে। কলি যতই প্রবল হইতে থাকে অজ্ঞান-কুজ্ঞান, মিছা-জ্ঞানও ততই প্রবল হইতে চেষ্টা করে। বর্ত্তমান বিজ্ঞান পৃথিবীর উপর শাসন পরিচালন করিতে উদ্যত হইলে "স্বকর্ম্ম-ফলভুক্ পুমান্"—ন্যায়ানুসারে বিশ্ব নিশ্চয়**ই** ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। আজকাল বৈজ্ঞানিক যুগ বলিয়া একটা অবৈধ ধ্বংসমূলক ধূয়া উঠিয়াছে। এই বিজ্ঞানই তাহাদিগকে শিক্ষা দিবে—বিশ্ব-বিনাশই তাহাদের পরিণতি। বিজ্ঞানের ধূয়াকে ধ্বংসের ধূয়া বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে।

বর্ত্তমানে অজ্ঞ বৈজ্ঞানিকগণ এখনও অনুসন্ধান (Research) করিতে শিক্ষা করেন নাই যে, বিজ্ঞানের অণু-পরমাণু সমস্তই ধ্বংসশীল। আমরা ক্রমশঃ মহাপ্রলয়ের দিকে অগ্রসর হইতেছি, ইহা তাহারা স্বপ্নেও কল্পনা করিতে অক্ষম। কেবলমাত্র পার্থিব বস্তুর পরিবর্ত্তনশীলতা স্বীকার করিলেই বস্তুর অনিত্যত্ব স্বীকৃত হইল না। যে বস্তুর মূল উপাদান ধ্বংসশীল অর্থাৎ পরিবর্ত্তনশীলতা অতিক্রম করিয়া সত্তাশূন্যতাযুক্ত, তাহার দ্বারা যাহাই গঠিত হউক না কেন, তাহার পরিণতি অভাব-ধর্ম্মযুক্ত। প্রাগভাব বা ধ্বংসাভাব লইয়া বিশ্বের চিন্তায় অবৈদান্তিক বা অবৈদিক চিন্তাস্রোত প্রভাবান্বিত হইলেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। পার্থক্যে সাদৃশ্য বা সাম্য দর্শন পরিলক্ষিত হইলেও, অধোক্ষজ বা অপ্রাকৃত জ্ঞানময় গোলক তাহা হইতে বিপরীত বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। সাম্য ও সাদৃশ্যের সহিত বৈপরীত্যের পার্থক্য অনুধাবন করা বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক মস্তিষ্কের পক্ষে অসম্ভব। মূর্খ বৈজ্ঞানিকগণ বা নাস্তিক ঐতিহাসিকগণ এইরূপ চিন্তায় প্রবেশাধিকার লাভে অক্ষম।

যে বস্তু সুকৃতিসাপেক্ষ, তাহা চেষ্টাসাপেক্ষ নহে। সুকৃতি বলিলে ভগবদনুগ্রহ-প্রাপ্তিরূপ বৃত্তিকে লক্ষ্য করে। বেদ বলেন,—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্ ॥

এই বৈদিক মন্ত্রের শিক্ষা বৈজ্ঞানিকগণ অনন্তকোটী জন্ম অনুশীলন করিলেও তাহা অনুধাবন করিতে পারিবেন না। বৈজ্ঞানিক মস্তিষ্ক পরম মঙ্গল-চিন্তার বিরুদ্ধ। অমঙ্গলের খনি মঙ্গলের আকরের পাদস্পর্শেরও অধিকার পায় না। বিজ্ঞান আমাদিগকে ধ্বংসের পথে অবশ্যই লইয়া যাইবে, ইহা ধ্রুবসত্য। সুতরাং সাধু সাবধান! ফের বলি,—কর অবধান!!

পূর্ব্বোক্ত বৈদিক মন্ত্রের আলোচনা করিলে আমরা জানিতে পারি যে, আত্মবস্তু কোন পার্থিব অণু পরমাণু (Matter) নহে। পার্থিব Matter প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের অন্তর্গত। শিক্ষা অনুশীলন বা Culture এর দ্বারা যাহা অনুভব করিতে পারা যায়, তাহা অনিবার্য্য ধ্বংসশীল। যে রাজ্যে ধ্বংসশীলতার অধিকার নাই সেই রাজ্যে না গিয়া ধ্বংসের স্তূপের মধ্যে নির্ব্বোধের ন্যায় আত্মোৎসর্গ করিব কেন? আত্মহত্যাই বিজ্ঞান-অনুশীলনের নামান্তর। ইহা একাধারে পাপ ও দুর্নীতি অর্থাৎ sin and crime. বহুকাল হইতেই ইহা দণ্ডবিধি আইনের একটী অপরাধ বলিয়া স্বীকৃত আছে। জীবমাত্রেরই জীবিত থাকা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। এই স্বভাবকে রূপান্তরিত করিয়া মৃত্যুই বর্ত্তমানযুগে জীবিত থাকার নামান্তর বলিয়া বিচারিত হইয়াছে। পরিণাম-দর্শিগণ এইপ্রকার চিন্তাধারার ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। প্রাণীকে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করাই উন্নততম চিন্তা বলিয়া স্বীকৃত হইলেই হইল না। শাক্যসিংহ বুদ্ধ এই মৃত্যুর হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য যে গৌতমীয় শিক্ষা জগতে বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা ভারতীয় ঋষিবর্গের চিন্তার প্রতিকূল-অনুশীলন। ফলে মৃত্যুই তাহাদের সঙ্গের সাথী হইয়াছে। ভারতীয় ঋষিবর্গের উপজীব্য সনাতন বৈদিক বিচার-বহির্ভূত চিন্তাধারা মনুষ্য-জগৎ বা প্রাণিজগৎকে রক্ষা করিতে অসমর্থ। যমরাজের শাসনদণ্ড হইতে নিষ্কৃতিলাভ করার পদ্ধতি শ্রীযমরাজ স্বয়ংই বিধি-বিধান প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। দুর্ভাগা জীব তাহা অনুশীলন করিতে নারাজ।

আত্মবস্তু কখনও অণু-পরমাণু বা Matter নহে—ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অথচ প্রত্যেক জীব হৃদয়ে "বালাগ্র-শতভাগস্থ" এই ন্যায়ানুসারে আত্মা অবস্থিতি করিতেছেন। এই আত্মার অস্বীকৃতি বৈজ্ঞানিক বিশ্বে অসম্ভব। এই প্রকার অসৎ চিন্তাও আত্মাবস্থিতির প্রধান প্রমাণ। সেই আত্মবস্তুকে লাভ করিতে হইলে বাক্য-বিন্যাস বা প্রবচন, বক্তৃতার ছড়াছড়ি অথবা পার্থিব বিজ্ঞান-চর্চ্চার ছড়াছড়ি, হাটে-ঘাটে পথে-মাঠে যতই আলোচিত

হউক না কেন, আত্মা তাহাদের আয়ত্তের সম্পূর্ণ বাহিরে ; বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক মাধ্যাকর্ষণ (Gravitation)-এর আয়ত্তের সম্পূর্ণ বাহিরে অর্থাৎ Law of Gravitation যেখানে fail করিয়াছে, সেইস্থানেই আত্মার অবস্থিতি। রাষ্ট্রীয় influence (অধিকার) বা তাহাদের আইন-আদালত, চিন্তা-বিচার-ধারা আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবতে ১১শ স্কন্ধে ইহার অনুরূপ প্রমাণ শ্রীল বেদব্যাসের লেখনী হইতে জানিতে পারি, যথা—

"গোবিন্দভুজগুপ্তায়াং দ্বারাবত্যাং কুরুদ্বহ।
অবাসীন্নারদোঽভীক্ষ্ণং কৃষ্ণোপাসনলালসঃ॥ ইত্যাদি।

এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ গোবিন্দ পরমাত্ম-স্বরূপে তাঁহার ভুজ অর্থাৎ তেজ বা শক্তির দ্বারা তাঁহার নিজক্ষেত্র দ্বারকাপুরী সর্ব্বদা সংরক্ষণ করিতেছেন অর্থাৎ ভৌতিক বিশ্বের সম্রাট্ দক্ষের আইন-আদালত, শাসন-পদ্ধতি কিছুই দ্বারকায় প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারে না। বিশ্ব-সম্রাটের ক্রিয়াকলাপ ও শাসন পদ্ধতির Scope (অধিকার) Law of Gravitationএর sphere (মাধ্যাকর্ষণের অধিকার) পর্য্যন্ত। ক্ষিতি, অপ্, তেজাদি পাঞ্চভৌতিক ক্ষেত্রের বাহিরে মাধ্যাকর্ষণের কোন অধিকার নাই। এই জন্যই প্রাণীমাত্রের স্থূল শরীরের উপর পার্থিব শক্তি বা মায়াশক্তি স্বভাবতঃ প্রতিষ্ঠিত। বৃক্ষলতা-কীটপতঙ্গ, পশু-পক্ষী, দেব-দানবাদির স্থূল-শরীরে হ্রাস-বৃদ্ধি ও জন্ম-মৃত্যুর কারণ হিসাবে বৈজ্ঞানিকগণ মাধ্যাকর্ষণকেই স্বীকার করিতে চাহেন। তর্কের খাতিরে ইহা মানিয়া লইলেও জীবাত্ম-তত্ত্ব, পরমাত্ম-তত্ত্ব, পরমাত্ম-জগৎ, পরমাত্ম-ক্রিয়াকলাপ, পরমাত্ম-পরিস্থিতি, পরমাত্ম-রীতি-নীতি—ভৌতিক জগৎ বা মাধ্যাকর্ষণিক শক্তির অনন্তকোটি যোজন দূরে অবস্থিত। আত্মাবস্থিতি লাভ করিতে পারিলে যুধিষ্ঠিরের ন্যায় সশরীরেই উন্নত লোকে গতি হইতে পারে। সুতরাং বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা আমাদিগকে বিন্দুমাত্রও পরমমঙ্গলের দিকে আকর্ষণ করিতে পারিবে না। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর বৈদিকী বাণীই আমাদের একমাত্র অনুশীলনীয়, আলোচনীয় ও গ্রহণীয়। ইহা ব্যতীত অন্য সমস্ত পথই অপথ, কুপথ, বিপথ বলিয়া গণ্য। আমরা শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের মৌলিক-শিক্ষা শ্লোকটী নিম্নে উদ্ধার করিয়া শ্রীপত্রিকার সপ্তদশবর্ষের প্রারম্ভিকভাষণ সমাপন করিতেছি—

"আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥"

—শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা ১৭ বর্ষ, ১ম সংখ্যা।
৩০ ফাল্গুন ১৩৭১, ইং ১৪।৩।১৯৬৫

শ্রীশ্রীঝুলনযাত্রা ও শ্রীশ্রীবলদেব-পূর্ণিমা

দেব-গন্ধর্ব্বাদি সেবকসকল-কর্ত্তৃক ঝুলনের নিত্যক্রিয়া সমাপন-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের আনন্দ-বিধানই ঝুলন-উৎসবের নিগূঢ় উদ্দেশ্য। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ এই উৎসব অতি আগ্রহের সহিত সম্পন্ন করিয়া থাকেন। দেব-বিহিত ঝুলন ও গন্ধর্ব্ব-বিহিত ঝুলন শুদ্ধ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের পরমোৎসাহ বিধান করিয়া থাকে। দেব-বিহিত ঝুলনে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের উৎসাহ নাই—এইরূপ বিচার শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত সেবক-গণের নহে, গন্ধর্ব্বাদি অন্যান্য জীবাত্মগণের কা কথা। শুদ্ধ জীবমাত্রই কৃষ্ণ-প্রীতি-বিধানে তৎপর।

মাধ্ব-গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের আদিগুরু শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য দেবগণকেই প্রধান বৈষ্ণব বলিয়া বিচার করেন। কিঞ্চিৎ ঐশ্বর্য্যপর বিচার যাঁহাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়াছে, তাঁহারা দেবগণের প্রতি শ্রদ্ধাবিশিষ্ট। সুতরাং জীবমাত্রই বৈষ্ণব, তন্মধ্যে দেবগণের অধিকার বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া যদি কেহ তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা-বিশিষ্ট হন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব হইতে বহির্ভূত করিয়া দেওয়া চলে না। 'গৌর-গণোদ্দেশ-দীপিকা' যাঁহারা সুষ্ঠুভাবে অনুশীলন করিয়াছেন এবং অন্যান্য গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-গ্রন্থ যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে, দেবগণ মহাপ্রভুর ইচ্ছাক্রমেই গৌরলীলায় আবির্ভূত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর ঔদার্য্য-রসের সেবক হইয়াছেন। সেই দেবগণই পরম-মাধুর্য্যরসে শ্রীকৃষ্ণলীলাতেও প্রকট ছিলেন। সুতরাং তাঁহারা গৌড়ীয়-বৈষ্ণব নহেন, অথবা শ্রীমহাপ্রভুর অনুগত সম্প্রদায়ভুক্ত নহেন, এরূপ বিচার আমরা কোনক্রমেই গ্রহণ করিতে পারি না। "অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ"-লেখক গুরুত্যাগী সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ নামক জনৈক ব্যক্তি এইরূপ ভ্রান্তিময় বিচারে পতিত হইয়া বৈষ্ণবাপরাধে অধোগতি বরণ করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীঝুলন-পূর্ণিমার সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে শ্রীশ্রীবলদেবের আবির্ভাব-তিথি আমাদের হৃদয়ে বল সঞ্চার করে। শ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর মিলন-প্রয়াসী সেবকগণের ঝুলনযাত্রা সমাপ্তি অনুভব করিতে গেলে একপ্রকার অপ্রাকৃত সেবা-সঙ্গোপনের স্মৃতি তাঁহাদের হৃদয়ে জাগরূক হয়। এই স্মৃতির নির্ব্বেদহেতু শ্রীশ্রীবলদেব আবির্ভূত হইয়া সমুদয় ভক্ত-হৃদয়ে বল সঞ্চার করিয়া থাকেন। বলদেবের আবির্ভাবে ভক্তগণ "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" উপনিষদের এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বলদেবাবির্ভাবের সাদর আহ্বান করিয়া থাকেন। এই আনন্দউৎসবে একনিষ্ঠ সেবকগণ আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শ্রীশ্রীবলদেবের বিজয়-উৎসব সম্পন্ন করিয়া থাকেন। এই বলদেব-আবির্ভাব-পূর্ণিমা-তিথি গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের পরম আদরের এবং সর্ব্বোত্তমা উপাস্যা তিথি।

শ্রীবলদেব কৃষ্ণের ন্যায় বাসুদেব ও দেবকী-নন্দন। 'বাসুদেব' বলিলে বসুদেবের অপত্য শ্রীকৃষ্ণকে যেরূপ লক্ষ্য করিয়া থাকে, তদ্রূপ বসুদেবের অপত্য-অর্থে শ্রীবলদেবকেও লক্ষ্য করিয়া থাকে। সুতরাং 'বাসুদেব' বলিলে কৃষ্ণ এবং বলদেব উভয়কেই লক্ষ্য করা হয়। 'দেবকীনন্দন' বলিলেও তাহাই বুঝাইবে। শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ অবতারী, শ্রীবলদেবও সেইপ্রকার অবতারী। যদিও শ্রীল জয়দেব গোস্বামী "দশাবতার-স্তোত্রে" শ্রীবলদেবকে অষ্টম অবতাররূপে বর্ণন করিয়াছেন, তথাপি অন্য সমস্ত অবতারই শ্রীবলদেব হইতে আবির্ভূত হইয়াছেন। এইজন্য শ্রীবলদেব মূল-সঙ্কর্ষণ বা মহাসঙ্কর্ষণ। সুতরাং বলদেবও কৃষ্ণের ন্যায় অবতারী। শ্রীকৃষ্ণকে আচার্য্যবর্গ যেপ্রকার পরমেশ্বর বিচার করিয়া তাঁহাকে সর্ব্বসদ্‌গুণ-সমষ্টি-স্বরূপে লক্ষ্য করিয়াছেন, সেইপ্রকার বলদেবও সর্ব্বসদ্‌গুণ-সমষ্টি-স্বরূপ। কৃষ্ণ যেরূপ দুষ্ট নিগ্রহ ও শিষ্টপালনকারী, বলদেবও সেইরূপ দুষ্ট-বিনাশকারী ও শিষ্ট-রক্ষক। কৃষ্ণ ও বলদেবকে সূক্ষ্মবিচারের দ্বারা দর্শন করিতে গিয়া এবং তাঁহাদের উভয়ের ক্রিয়া-কলাপ লক্ষ্য করিয়া একই বলিয়া মনে হইলেও "তটস্থ হঞা বিচারিলে আছে তর-তম।"—ইহাই ঈশ্বরের তারতম্যমূলক ঈশ্বরত্বের লীলা-বৈশিষ্ট্য বা লীলা-পার্থক্য। তজ্জন্যই ঈশ্বরতত্ত্বে আয়ুধ-বৈষম্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

শ্রীবলদেবের আবির্ভাব-তিথিতে আমরা গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের আনুগত্য স্বীকার করিয়া শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর কথা সর্ব্বতোভাবে স্মরণ করিতেছি। শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভু বলদেবাভিন্ন-বিগ্রহ। 'বলদেবাভিন্ন' বলিলে হৃদয়ের মধ্যে একপ্রকার পার্থক্যের ময়লা আসিয়া আক্রমণ করিতে পারে। তজ্জন্য তাঁহাকে 'সাক্ষাৎ বলদেব' বলিয়া আচার্য্যবর্গ বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু সাক্ষাৎ বলদেব হইলেও হলায়ুধ নহেন। ইহাই ঈশ্বরত্বের ঐক্যের মধ্যে বৈশিষ্ট্যমূলক লীলাগত ভেদ। এই ভেদাভেদ-তত্ত্ব বিশুদ্ধ হৃদয়ে পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। সুন্দরানন্দের ন্যায় অশুদ্ধ-হৃদয়ে ইহা **অচিন্ত্য-**অদ্বৈতবাদে পরিণত হইয়াছে। আমরা এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর একটী শ্লোক স্মৃতিপটে জাগরূক হওয়ায় নিম্নে উদ্ধার করিলাম।—

বন্দেঽনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্য্যং শ্রীনিত্যানন্দমীশ্বরম্।
যস্যেচ্ছয়া তৎস্বরূপমজ্ঞেনাপি নিরূপ্যতে॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৫।১)

শ্রীশ্রীবলদেব-জয়ন্তীর উপবাস

কেহ কেহ শ্রীবলদেবের আবির্ভাব-তিথিকে 'জয়ন্তী' বলিয়া গ্রহণ করিতে চাহেন না। এইরূপ বিচার আমরা ভ্রান্তিমূলক বলিয়া মনে করি। শ্রীবলদেব মূল-সঙ্কর্ষণ-স্বরূপে সমস্ত অবতার সকলের আশ্রয়-স্বরূপ হইলে অর্থাৎ তাঁহাকে বিষয়-বিগ্রহ-স্বরূপ গ্রহণ করিলে তাঁহার আবির্ভাব-তিথিকে 'জয়ন্তী' বলিতে আপত্তি করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ

থাকিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ-জয়ন্তী, শ্রীগৌর-জয়ন্তী, শ্রীনৃসিংহ-জয়ন্তী, শ্রীনিত্যানন্দ-জয়ন্তী তিথিতে যে-প্রকার নিরম্বু উপবাস করিয়া আবির্ভাব-মুহূর্ত্তের পরে শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণ অনুকল্প গ্রহণই (অশক্তপক্ষে) স্বীকার করিয়া থাকেন, সেইপ্রকার বিচার শ্রীবলদেব-আবির্ভাবেও স্বীকৃত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। নতুবা জয়ন্তী-ব্রতের তারতম্য বিচার করিতে গিয়া "এই ভাল, এই মন্দ, এইসব ভ্রম"—এই ন্যায় বিচারের অন্তর্ভূক্ত হইয়া পড়িতে হইবে।

—শ্রীগৌঃ পত্রিকা ৯ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

শ্রীনিম্বাদিত্য ও নিম্বার্ক এক নহেন

শাস্ত্রে নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের কোন উল্লেখ নাই। চারি আচার্য্যের অন্তর্গত নিম্বাদিত্যের কথা কোন কোন পুরাণে পাওয়া যায়। সেই নিম্বাদিত্যকেই চতুঃসন তাঁহার সম্প্রদায়ের আচার্য্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। নিম্বার্ককে তিনি আচার্য্য বলিয়া স্বীকার করেন নাই। ভবিষ্যপুরাণের কয়েকটী প্রক্ষিপ্ত শ্লোক অবলম্বন করিয়া নিম্বাদিত্য-স্বামীকেই নিম্বার্ক-স্বামী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে কেহ কেহ চেষ্টা করিয়া থাকেন। আমরা তাঁহাদের সহিত একমত নহি। যদিও ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর আচার্য্যগণের মধ্যে কেহ কেহ নিম্বাদিত্যস্বামীকেই নিম্বার্ক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, ঐ প্রকার উল্লেখ জনশ্রুতিগত ব্যবহারিক উল্লেখমাত্র। প্রকৃতপ্রস্তাবে নিম্বাদিত্য ও নিম্বার্ক কখনই একব্যক্তি নহেন। নিম্বাদিত্যকে যাঁহারা প্রাচীনতম বৈষ্ণব-আচার্য্য বলিয়া থাকেন, তাঁহারা বলেন—তিনি নারদের সাক্ষাৎ শিষ্য। এরূপক্ষেত্রে শ্রীল ব্যাসদেব নিম্বাদিত্যের গুরুভ্রাতা হইতেছেন। সাক্ষাৎ ব্যাসের সমকক্ষরূপে নিম্বার্কস্বামীকে স্বীকার করিয়া লওয়া কতদূর যুক্তিসঙ্গত বা ঐতিহাসিক প্রমাণসঙ্গত, তাহা সাধারণ বিচারকগণই বুঝিতে পারিবেন। যুক্তির খাতিরে ইহা মানিয়া লইলেও নিম্বাদিত্যস্বামীকেই নারদের শিষ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে পারা যায়। কিন্তু নিম্বার্কস্বামীকে তাহা কখনই স্বীকার করা যায় না।

'আদিত্য'-শব্দের অর্থ অর্ক। তজ্জন্য কেহ কেহ 'নিম্ব+আদিত্য' স্থলে 'নিম্ব+অর্ক' ব্যবহার করিয়া নিম্বাদিত্যকেই নিম্বার্ক বলিয়া থাকেন। তজ্জন্য প্রাচীন নিম্বাদিত্য ও আধুনিক নিম্বার্ক এক নহেন। রামচন্দ্র রঘুনাথ ছিলেন। যদি তাঁহাকে কেহ রঘুপতি বলেন, তাহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। এইরূপ ক্ষেত্রে যদি কোন-স্থলে নিম্বাদিত্যকে নিম্বার্ক বলিয়া কোন বৈষ্ণবাচার্য্য আখ্যা দিয়া থাকেন, তাহা হইলে বিশেষ কোন আপত্তির কথা না থাকিলেও শাস্ত্রীয় নিম্বাদিত্যকেই নিম্বাদিত্য বলিয়া জানিতে হইবে। বর্ত্তমান নব্য সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষমূলে কেহ কেহ আধুনিক নিম্বার্ককেই

প্রাচীন নিম্বাদিত্য বলিতে চাহেন। ইহা কিন্তু কোন প্রকারে যুক্তিসিদ্ধ বা ঐতিহাসিক প্রমাণসিদ্ধ নহে। প্রাচীন আচার্য্য নিম্বাদিত্য-স্বামীর কোন গ্রন্থ আজ পর্য্যন্ত কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হয় না এবং তাঁহার কোন সম্প্রদায়ও অদ্যাপি কোথাও দেখা যায় না। বিগত পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ভারতবর্ষে লক্ষিত হয় না। কেবলমাত্র ২।১টী স্থানে বৈষয়িক কারণে কোন মঠাধীশ নিজকে নিম্বাদিত্য-সম্প্রদায়ের মঠাধীশ বলিয়া পরিচয় দিতে বাধ্য হইতেছেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে তাঁহারাও নিম্বাদিত্য বা নিম্বার্ক-স্বামীর সম্প্রদায়ভুক্ত মহান্ত কিনা, তৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে।

বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব সাহিত্যিককুল-মুকুটমণি পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত মহোদয় ভারতীয় দার্শনিক ও ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ইতিহাস আলোচনা করিতে গিয়া সমস্ত ভারত পর্য্যটন করেন এবং তিনি নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের কোন অস্তিত্ব ১৫০-২০০ বৎসর পূর্ব্বেও অনুভব করেন নাই। কেবলমাত্র এইরূপ একটী সম্প্রদায় প্রাচীনকালে অবস্থিত ছিল, তাহার সন্ধান মাত্র তিনি পাইয়াছিলেন। আমরা পণ্ডিত অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে সত্য বলিয়া না মানিলেও, ইহা সর্ব্বতোভাবে স্বীকার করি যে, প্রাচীন নিম্বাদিত্য-সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব পঞ্চদশ বা ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে ফল্গু নদীর ন্যায় অন্তঃ-সলিলারূপে অবস্থিত ছিল মাত্র।

নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের যে পারিজাতভাষ্য, তাহা নিম্বাদিত্য-স্বামীর রচিত নহে। উহা শ্রীনিবাস আচার্য্য ও কেশব কাশ্মিরীকৃত ভাষ্য নিম্বার্কস্বামী বলিয়া পরিচিত। বরিশাল জিলার প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া 'বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস' নামক একখানি বিরাট গ্রন্থ রচনা করেন। যদিও তাহার সর্ব্বত্র বিশুদ্ধ বিচার লিপিবদ্ধ হয় নাই, তথাপি তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অত্যন্ত বিরোধীতা ও বিদ্বেষ পোষণ করিয়াও কেশব-কাশ্মিরীকে নিম্বার্কস্বামীর শিষ্য বলিয়া একটী মত উত্থাপন করিয়াছেন। সুতরাং কেশব কাশ্মিরী ও শ্রীনিবাস আচার্য্য উভয়েই নিম্বার্কের শিষ্য। কেশব কাশ্মিরী দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া যোগী, জ্ঞানী, তপস্বী ও শাঙ্করমতবাদী প্রভৃতি বহু পণ্ডিতব্যক্তিকে বিচারে পরাস্ত করিয়া নবদ্বীপে উপস্থিত হইলে ষোড়শ (?) বর্ষীয় যুবক নিমাইপণ্ডিতের (যিনি স্বয়ং ভগবান্) নিকট বিচারে পরাস্ত হইয়া লজ্জিত অন্তঃকরণে সরস্বতী দেবীর নিকট তাঁহার নিবেদন জ্ঞাপন করেন। সরস্বতীদেবীর নির্দ্দেশ-অনুসারে তিনি পুনরায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট ধর্ম্মশাস্ত্রের বিশেষতঃ অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্বের বিচার শ্রবণ করেন। সেই বিচারে মুগ্ধ হইয়া তিনি তাঁহার নিজ সম্প্রদায়ে তাহা প্রবর্ত্তন করেন। বৃদ্ধ-বয়সে কেশবকাশ্মিরী বিচারে পরাস্ত হইয়া সরস্বতীদেবীর নির্দ্দেশে মহাপ্রভুর পাদপদ্মে শরণাগত হইলেও তাঁহার হৃদয়ের বিদ্বেষ-বহ্নি কিছুমাত্র নির্ব্বাপিত হয় নাই। নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের এই শ্রেণীর বিদ্বেষ-বহ্নি অদ্যাপি প্রচলিত দেখা যায়। সেই বিদ্বেষ-প্রভাবে তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ও শিক্ষাগুরুস্বরূপ শ্রীনিবাস আচার্য্যের সহিত মিলিত হইয়া পারিজাতভাষ্য-রূপে

একখানি সংক্ষেপ বেদান্তভাষ্য রচনা করেন এবং ঐ ভাষ্যের প্রামাণিকতা স্থাপনের জন্য নিম্বার্কের ভাষ্য বলিয়া বৈষ্ণবসমাজে প্রচার করিতে চেষ্টিত হন। এই ভাষ্য রচনা করিয়া তাহার উপর আচার্য্য শ্রীনিবাস ও কেশবকাশ্মিরী স্বয়ং স্ব স্ব নামে পৃথক্ পৃথক্ সংজ্ঞাদ্বারা টীকা রচনা করেন। এই টীকাদ্বয়ের উদ্দেশ্য এই যে, পারিজাত ভাষ্যখানি তাঁহাদের গুরুদেবের রচিত, কিন্তু তাঁহাদের রচিত নহে। কেশব কাশ্মিরীর আবির্ভাব-কাল ও,শ্রীনিবাস আচার্য্যের আবির্ভাব কাল বিচার করিলে জানা যাইবে যে, তাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর গার্হস্থ্য-লীলা সময়ে বৃদ্ধাবস্থায় প্রকট ছিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত কেশব কাশ্মিরীর সাক্ষাৎকালে তিনি নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের একজন আচার্য্য বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করায় আত্মগোপন করিয়াছিলেন। যে-হেতু সে সময়ও নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের কোন গ্রন্থ রচিত হয় নাই বা নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব তখনও ভারতের ইতিহাসে প্রভাব বিস্তার করে নাই। তজ্জন্যই কোন গোস্বামী-গ্রন্থে নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের কোন উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয় না। গোস্বামীবর্গের আবির্ভাব-সময়ে যদি নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের কোন অস্তিত্ব থাকিত, তাহা হইলে জীবগোস্বামী কিম্বা রূপ, সনাতন প্রভৃতি অন্যান্য গোস্বামীবর্গ নিশ্চয়ই তাহার উল্লেখ করিতেন। শ্রীরামানুজ, মধ্ব, বিষ্ণুস্বামী প্রভৃতি আচার্য্যবর্গের উল্লেখ গোস্বামীগণের গ্রন্থমধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু নিম্বার্ক-সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয় না। কেবলমাত্র কেশব কাশ্মিরীর প্ররোচনায় একটী নবীন গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-বিদ্বেষী সম্প্রদায় উদ্ভূত হইয়াছে। প্রকৃত-প্রস্তাবে এই সম্প্রদায়ের কোন গ্রন্থের অস্তিত্ব শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে কখনও দৃষ্ট হয় না।

—শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা ৮ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা।

উপদেশ-মূলক প্রবন্ধ—

সেশ্বর-ছাত্র

জগতে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর লোক দৃষ্ট হয়। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করেন এবং নিজেকে ভগবানের সেবায় নিযুক্তও করেন। এই শ্রেণীর লোক 'আস্তিক'-নামে অভিহিত হন। অপর শ্রেণীর লোক ভগবানের সেবা করা ত' দূরের কথা, তাঁহার অস্তিত্বও স্বীকার করে না, স্বেচ্ছাচারী হইয়া জীবন যাপন করে। ইহারা 'নাস্তিক'-নামে কথিত হয়।

ভগবদ্বিশ্বাসী ছাত্রকেই সাধারণতঃ 'সেশ্বর-ছাত্র' বলা হয়, তবে যে-ছাত্রের ভগবানে বিশ্বাস আছে, ভগবানের সেবা করাই যাহার জীবনের একমাত্র ব্রত, ভগবৎ-সেবার জন্যই যাহার বিদ্যা-শিক্ষা, গুরু-গৃহে অবস্থান করিয়া শ্রীগুরুদেবের আদেশানুসারে সেবাময়

জীবন-যাপনই যাহার একমাত্র লক্ষ্য ও সংকল্প সেই ছাত্রই প্রকৃত সেশ্বর-ছাত্র নামের যোগ্য। 'সেশ্বর' অর্থে—আস্তিক—ভগবদস্তিত্বে বিশ্বাস, ঈশ্বরের সহিত বর্ত্তমান, যুক্ত, কিংবা যিনি শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে ঈশ্বরের চিন্তা করেন, সেই ব্যক্তিই সেশ্বর। বর্ত্তমান যুগে এইরূপ সেশ্বর ছাত্রের সংখ্যা অতীব বিরল। শতকরা কেন, সহস্র সহস্র ছাত্রের মধ্যেও এইরূপ একটি সং-ছাত্র পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। এই বিবদমান অধর্ম্ম-প্রবল কলিযুগে বিনয়ী, নম্র, অনুগত, সত্যবাদী ও সচ্চরিত্র সেশ্বর ছাত্র পাওয়া অত্যন্ত দুষ্কর, কারণ জগতের অধিকাংশ লোকই আপন আপন ভোগ-সুখে বা ইন্দ্রিয়-তর্পণে মত্ত। ভগবানের সেবা করা জীব মাত্রেরই বিশেষতঃ মনুষ্য-জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য, সে-চিন্তাস্রোতকে তাহারা জগতের কোন অজ্ঞাত স্থানে জলাঞ্জলি দিয়া আজ নিজেরাই ভোক্তা সাজিয়া জগতের যাবতীয় বস্তুকে ভোগ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা মানুষের অবনতি আর কি হইতে পারে? এই সম্বন্ধে শাস্ত্রে একটি শ্লোক দৃষ্ট হয়, যথা—

"আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।
ধর্ম্মোহি তেষামধিকো বিশেষো ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥"

অন্যান্য ইতর পশুও মনুষ্যের ন্যায়ই আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুনাদি-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে। কিন্তু ভগবদনুসন্ধান বা ভগবৎসেবারূপ ধর্ম্মই কেবলমাত্র মানুষকে ইতর প্রাণী হইতে পৃথক রাখিয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, মানুষের মধ্যে যাহারা হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা ব্যতীত অন্যায় কার্য্যে সময় ব্যয় করিতেছে, তাহারা মানুষ হইয়াও পশুতুল্য। সেই জন্য শাস্ত্র তাহাদিগকে মনুষ্য-চর্ম্মাবৃত দ্বিপদ পশু বা নরপশু আখ্যা দিয়াছেন।

শাস্ত্রের আদেশ অনুসারে আমাদের চলিতে হইবে, নচেৎ অন্যায় হইবে। আজকাল বিজ্ঞানের কাল; তাই অধিকাংশ ছাত্র শিক্ষিত হইয়া জাগতিক পাণ্ডিত্যাদি দ্বারা মনুষ্য-সমাজে গৌরবান্বিত হইতেছে। কিন্তু সেশ্বর-ছাত্র আদৌ দৃষ্ট হইতেছে না। পূর্ব্বকালে ছাত্রগণ বাল্যাবস্থায় গুরুগৃহে থাকিয়া বেদাদি অধ্যয়ন, গুরুসেবা ব্রহ্মচর্য্যা-শ্রমের যাবতীয় ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালন করিতেন। পরে যাঁহাদের ইচ্ছা হইত, তাঁহারা পুনরায় গৃহে গিয়া সংসারাদি করিতেন। এই আশ্রমের নাম গার্হস্থ্যাশ্রম। পরে বানপ্রস্থ ও ক্রমে ক্রমে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ-পূর্ব্বক শেষ জীবন ঈশ্বর চিন্তায় কাটাইতেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, পূর্ব্বকালের লোক শাস্ত্রানুসারে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালন করিয়া জীবন-নির্ব্বাহ করিতেন। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে সে-সমস্ত বিধি-নিয়ম উঠিয়া গিয়াছে; এখন অধিকাংশ লোকই আশ্রমের ধার ধারে না, যথেচ্ছাচারী হইয়া জীবন-যাপন করে। ইহা যে আমাদের অবনতির একটি প্রধান কারণ এ' কথাটী সুধী-সমাজ তাহাদের মস্তিষ্কে আদৌ স্থান দিতেছেন না; তাই আজকাল ছাত্রগণ পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া জন্ম-ঐশ্বর্য্য-পাণ্ডিত্যাদির গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া 'ধরাকে সরার' ন্যায় জ্ঞান

করিতেছে। তজ্জন্য ভগবানের কথা আলোচনা করিবার আবশ্যকতা তাহাদের বোধ হইতেছে না।

সেশ্বরের পরিবর্ত্তে নিরীশ্বর বা নাস্তিক ছাত্রের সংখ্যাই বর্ত্তমানে বেশী। তাহারা পুণ্য বা নৈতিক জীবনের 'ধার ধারে' না, বরং নৈতিক হওয়ার পরিবর্ত্তে নানা পাপ-চিন্তা বা পাপ-কার্য্য দ্বারা জীবনটাকে কলুষিত করিয়া ভীষণ যন্ত্রণাপ্রদ নরকের দ্বার প্রশস্ত করিতেছে। কর্ত্তব্য পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া যে কি প্রকার অন্যায় কার্য্যে ব্রতী হইতেছে, এ বিষয়ে চিন্তা তাহাদের নাই। বাল্যকাল হইতে যদি নৈতিক ও সেশ্বর না হওয়া যায়, তবে কি প্রৌঢ়ে বা বৃদ্ধকালে সেশ্বর হইতে পারিবে ?

জগতে নিরীশ্বর ও অনৈতিকের সংখ্যাই অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে কেহ কেহ নৈতিক হইলেও নিরীশ্বর-নৈতিকেরই সংখ্যাধিক্য দেখা যায়। সুতরাং সেশ্বর ছাত্রের সংখ্যা যে অত্যল্প তাহা সহজেই অনুমেয়। প্রকৃত সেশ্বর ছাত্রের মধ্যে অনৈতিকতা থাকা অসম্ভব।

সাধারণতঃ দেখা যায় যে, কাঁচা মাটির হাঁড়িতে দাগ দিলে তাহা সহজে বসিয়া যায়, কিন্তু পোড়া হাঁড়িতে দাগ দিতে গেলে দাগ ত' বসেই না, উপরন্তু উহা ভাঙ্গিয়াও যাইতে পারে। আমাদের বাল্যজীবনের অবস্থাও কতকটা তদ্রূপই। বাল্যকালে মানুষের অন্তঃ-করণ কোমল থাকে, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই তাহার পরিবর্ত্তন ঘটে। সুতরাং বাল্যকালে একটী বিষয় যত সহজে আয়ত্ত করা যায়, প্রৌঢ়ে বা বৃদ্ধবয়সে তাহা সহসা হইয়া উঠে না। এমন কি অনেক সময় অনেক কার্য্য করা অসম্ভব হইয়া উঠে। কারণ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জাগতিক-চিন্তাস্রোত মানুষের উপর আধিপত্য করে। সুতরাং বাল্যকাল হইতে চিত্তবৃত্তিকে জগতের কোন চিন্তাস্রোতের মধ্যে আটক না রাখিয়া, যিনি যথার্থ মনুষ্য-নামের সার্থকতা করেন, তিনিই সেশ্বর বা সৌভাগ্যবান্। প্রত্যেকরই সেশ্বর হওয়া কর্ত্তব্য, নচেৎ মঙ্গলের আশা খুবই কম ; প্রত্যেক ছাত্রেরই সচ্চরিত্র, বিনয়ী এবং নম্র হইয়া পবিত্র-মনে গুরুগৃহে অবস্থানপূর্ব্বক সাধু-গুরুসেবা করাই কর্ত্তব্য। তবেই সেশ্বর নামের যোগ্য হওয়া যাইবে।

শাস্ত্রে জানা যায়,—প্রহ্লাদ মহারাজ একজন সেশ্বর ছাত্র ছিলেন। তাঁহার পিতা হিরণ্যকশিপু একজন নিরীশ্বরবাদী ছিলেন। হিরণ্যকশিপু আপন পুত্র প্রহ্লাদকে নিজগুরু শুক্রাচার্য্যের আলয়ে বিদ্যাশিক্ষার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। অসুর-গুরু শুক্রাচার্য্য নানাকার্য্যে ব্যস্ত থাকায় তাঁহার 'ষণ্ডামর্ক'-নামক পুত্রদ্বয়ের উপর প্রহ্লাদের শিক্ষার ভার ন্যস্ত করিয়াছিলেন। প্রহ্লাদ অন্যান্য ছাত্রগণের সহিত একসঙ্গে পড়িতেন। একই স্থানে একই গুরুর নিকট অধ্যয়ন করিয়া প্রহ্লাদ সেশ্বর ছাত্র হইলেন, আর অপর ছাত্রগণ আসুরিক ভাবাপন্ন হইল। তিনি 'ক' এই অক্ষরটী পড়িয়াই বিদ্যাশিক্ষা শেষ হইয়াছে মনে করিলেন। কারণ, 'ক' উচ্চারণে যখন কৃষ্ণচিন্তা উদিত হয়, তখন আর কিছুরই

দরকার হয় না। পিতার প্রতি পুত্রের যে কর্ত্তব্য তাহা তিনি মানিয়া চলিতেন। কিন্তু তিনি বাল্যকাল হইতে সেশ্বর ছিলেন বলিয়া নিরীশ্বরবাদী পিতা হিরণ্যকশিপু তাঁহার প্রতি পিতার ন্যায় উপযুক্ত ব্যবহারের পরিবর্ত্তে কঠোর শাস্তিই প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু যিনি একমাত্র কৃষ্ণকেই নিজের মনে করিতে পারিয়াছেন, শত বাধা-বিঘ্ন তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াও কিছু করিতে পারে না। হিরণ্যকশিপু পুত্রের প্রতি, পিতার ন্যায় ব্যবহার না করিয়া, অনেক প্রকারেই তাঁহার প্রাণনাশের চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রহ্লাদ কিন্তু সর্ব্বদাই পিতার প্রতি পুত্রের কর্ত্তব্য প্রদর্শন করিয়াছেন। কারণ, তিনি বালক হইলেও ভগবানের পরমভক্ত ছিলেন। গুরুগৃহে পাঠের সময় অন্যান্য ছাত্রের সহিত একসঙ্গে পাঠাভ্যাস করিলেও তিনি সর্ব্বদাই কৃষ্ণকথা স্মরণ করিয়াছেন এবং সেই অসুর-বালকগণকে বাল্যকাল হইতেই একমাত্র ভগবানের আরাধনা করাই কর্ত্তব্য, ইহাই শিক্ষা দিয়াছিলেন। সুতরাং কৃষ্ণভক্ত যেখানে যে অবস্থায় থাকুন না কেন, কৃষ্ণকথা কখনও বিস্মৃত হন না।

"কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্ ভাগবতানিহ।
দুর্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্॥"

—এই শিক্ষা প্রহ্লাদ মহারাজ অসুর-বালকগণকে দিয়াছেন।

বুদ্ধিমান ব্যক্তি বৃথা কাল হরণ না করিয়া সুদুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া কৌমার বয়স হইতেই ধর্ম্ম আচরণ করিবেন। মনুষ্যজন্ম ব্যতীত অন্য কোন জন্মে ভগবদারাধনা সম্ভবপর নহে। সুতরাং এ হেন মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হইয়া জীবনটাকে অপব্যয় করা কোন-ক্রমেই উচিত নয়। অন্যান্য অসুরবালকগণের মধ্যে যাহারা ভাগ্যবান্, তাহারা প্রহ্লাদ মহারাজের এইরূপ চেতনবাণী শ্রবণ করিয়া তাঁহার সহিত ধর্ম্মাচরণ করিতে লাগিলেন। প্রহ্লাদের পিতা হিরণ্যকশিপু বিষ্ণু-বিদ্বেষী ছিলেন। কারণ তাঁহার ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষ বিষ্ণুকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। সুতরাং বিষ্ণুর প্রতি তাঁহার জাতক্রোধ ছিল। তাঁহার পুত্র প্রহ্লাদও সেই বিষ্ণুরই একজন পরম ভক্ত হওয়ায় তিনি তাঁহাকে নিহত করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ-মনোরথ হন। অবশেষে নিজেও বিষ্ণুকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন।

এইরূপ সেশ্বর ছাত্র অতীব বিরল। তিনি হিরণ্যকশিপুর ন্যায় হরি-বিদ্বেষীর গৃহে আবির্ভূত হইয়া জগজ্জীবকে ভক্তি-সদাচার শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে,—

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥

ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নব-লক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥"

তিনি আমাদিগকে প্রতি বাক্যে সর্ব্বদাই বিষ্ণুর কথা শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ ইত্যাদি নবধা ভক্তির বিষয় জানাইয়াছেন। প্রতি অক্ষর পাঠেই তাঁহার কৃষ্ণের স্মৃতি হইত। কৃষ্ণকথা ব্যতীত অন্য কথা তিনি বলিতেন না। তিনি ভগবৎ-কৃপায় জগতের সকল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া নিত্যকাল ভগবানের সেবা করিয়াছেন ও করিতেছেন।

এইরূপ একটী প্রশ্ন উদিত হইতে পারে যে, আমাদের সেশ্বর হইবার দরকার কি? এই প্রসঙ্গে বৈষ্ণব-কবি শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

"কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসারাদি-দুঃখ॥
কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥"

আমরা যতদিন নিজেকে ভগবানের দাস বলিয়া না জানিব, ততদিন পুণ্যফলে কখনও স্বর্গে এবং পুনরায় পুণ্যক্ষয় হইলে মর্ত্ত্যে আসিব এবং পাপফলে কখনও নরকেও যাইতে বাধ্য হইব। সুতরাং জীবনে কখনও ভগবানের দাসত্ব পরিত্যাগ করিয়া নিরীশ্বর হওয়া উচিৎ নহে। নিরীশ্বর হইলে জাগতিক, আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক তাপ-ত্রয়ের নির্ম্মম কষাঘাতে জর্জ্জরিত হইতে হইবে। জন্ম-মরণের সময় দুঃখকষ্ট সহ্য করিতে হইবে এবং মৃত্যুর পরেও নরকের লোমহর্ষণ ব্যাপার হইতেও নিষ্কৃতি পাইব না।

সেশ্বর-ছাত্রের জীবনে কোন ভয় থাকে না। কারণ, ভয়ও যাঁহাকে ভয় করেন সেই ভগবানকে আশ্রয় করিলে আবার ভয় কিসের? তিনিই নির্ভয়, যিনি বাল্য হইতে সেশ্বর নামের যোগ্য হইয়াছেন। স্বয়ং যমও তাঁহার কেশাগ্র স্পর্শ করিতে সাহসী হন না; বরং ভগবদ্ভক্তকে তিনি নানাভাবে সম্মান করিয়া থাকেন। অন্যান্য দেবতারাও ভক্তের নিকট কৃপাকাঙ্ক্ষা করেন। সেশ্বর হওয়া সামান্য কথা নয়। প্রহ্লাদের মত ধ্রুবও একজন সেশ্বর ছিলেন। তাঁহারা নিত্যকাল ভগবানের পার্ষদ হইয়া আছেন। আমাদের প্রত্যেকেরই এরূপ সেশ্বরের জীবনবৃত্তান্ত অবগত হইয়া সেইরূপভাবে জীবন অতিবাহিত করা কর্ত্তব্য। তাঁহাদের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া ভক্তিপথে অগ্রসর হইলে ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের কৃপায় ভবসাগর উত্তীর্ণ হইয়া আমরাও ভগবানের দাসত্ব করিবার সৌভাগ্য পাইব—ভবসাগর পার হইতে সমর্থ হইব।

ভগবদ্দাস্য জীবমাত্রেরই একমাত্র কৃত্য। ভগবদ্দাস্যে সর্ব্বতোভাবে নিযুক্ত হইতে পারিলেই জীবের জীবন কৃতকৃতার্থ হইয়া যায়, তাহাতেই সর্ব্বশুভোদয় ও পরাশান্তি লাভ হয়।

—শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা ১০ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা।

ভগবদনুশীলন

শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা অকুণ্ঠভাবে ও যথাযথরূপে এই সমগ্র পৃথিবীতে যতপ্রকার নাস্তিকতা আছে, তাহার স্বরূপ নিরপেক্ষ পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থাপিত করিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন। 'অস্তি' এমন বস্তুর অস্বীকার-কারীই 'নাস্তিক' বলিয়া বর্ত্তমান ধর্ম্ম-প্রগল্‌ভতার যুগে অত্যন্ত আদর লাভ করায় গৌড়ীয়ের চেতনময়ী লেখনী সচলা হইয়া উঠিয়াছে। পাশ্চাত্য দেশে একটী প্রবাদ আছে, "Pen is mighter than the sword." অর্থাৎ তরবারী অপেক্ষা লেখনী শক্তিশালিনী। পাশ্চাত্য দেশ যাহারা অত্যন্ত জড়বাদী তাহারা শব্দের এবম্বিধ প্রাধান্য কেমন করিয়া দিতে শিক্ষা করিল জানি না, তবে ভারত-বর্ষের উন্নততম চিন্তায় শব্দের মাহাত্ম্য এবং স্বতঃপ্রামাণ্যের বহুল সংবাদ আমরা বেদাদি অপৌরুষেয় সাহিত্য হইতে জানিতে পারি। ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের চূড়ান্ত বিচারের জন্য ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে নিকটাগত কলির মূর্ত্ত প্রতীক দুর্যোধন কার্ষ্ণ অর্জ্জুনাদির নিকট নিদারুণভাবে পরাজিত হইয়াছিল। সেইখানে আমরা দেখিতে পাই, প্রত্যহ দশ সহস্র সৈন্য বধ করিতে প্রতিজ্ঞাকারী দ্রোণাচার্য্য "অশ্বত্থামা হতঃ" সামান্য এই শব্দদ্বয় শ্রবণ করিয়া অস্ত্র সঞ্চালনে সম্পূর্ণ অক্ষম হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, "অশ্বত্থামা হতঃ" শব্দদ্বয়ের উচ্চারণকর্ত্তা কোনও জন-সামান্য ছিলেন না, দ্বাপরের ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির যিনি ন্যায়-নীতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন তিনিই এই শব্দদ্বয়ের বাহক।

সুতরাং "Pen is mightier than the sword" এই প্রবাদটীর আলোচনা করিতে বসিয়া আমরা কোন প্রকার নাস্তিক লোকের লেখনীর প্রশংসা করিব না, বা করিতে পারি না। নাস্তিক লোক প্রতিষ্ঠাকামী। 'অস্তি'-বস্তুর উপর মিথ্যা নঞর্থক ধারণা করা কোন সভ্যলোকের সমীচীন নহে। জড়ের সমীক্ষকই বলেন, জড় বস্তু ধ্বংসশীল। "অস্তি" এমন বস্তু ধ্বংসশীল নহে বলিয়াই জড় হইতে পারে না, উহা নিত্য। হরি ও জীবাত্মাই সেই বস্তু। অতএব ভগবানের অনুশীলন করিতে যাইয়া আমরা নাস্তিকের নিকট ঋণ করিবার আশা পোষণ করি না। তবে স্বভাবগত দোষে আস্তিক লোকের নিকটও নাস্তিক ব্যক্তি পসার জমাইতে চায়—ইহাই হাস্যাস্পদ।

নাস্তিক লোক হরি-অন্বেষণের ভাণ করে কেন? ইহার উত্তর অতীব সহজ। 'অস্তি' কি তাহা জানিতে না পারিলে 'নাস্তি' বলা যাইবে না। সুতরাং হরি ও হরি-সম্বন্ধীয় বস্তুর দুয়ারে হানা দেওয়া নাস্তিক লোকের স্বভাব। সে সর্ব্বপ্রকারে হরি-বিরোধী কার্য্য করিতে থাকে। লেখনীকেও সে তাহার সহায়করূপে গ্রহণ করিয়া থাকে। এইজন্য

নাস্তিক লোকের লেখনী পাঠ করিয়া মানুষ ভগবদ্বিশ্বাস হারাইয়া ফেলে। যাহারা নাস্তিক হইতে চায়, অথচ জগতের নিকট নাস্তিক বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করে, তাহারা নাস্তিকের লেখায় যেখানে ঈশ্বরের বিষয়ে আলোচনা আছে তাহা পাঠ করে, ভোটের জোরে নাস্তিক লোককে ভক্ত দাঁড় করাইয়া আস্তিককেই নাস্তিক বলিতে চায়। নাস্তিকের শাস্ত্র-আলোচনা কপটতা মাত্র। ভ্রমর ও লুতাকীট উভয়েই ফুলে ফুলে ঘুরিয়া বেড়ায়। ভ্রমর ফুলের মধু অন্বেষণ করে, আর লুতাকীট ফুলকে নষ্ট করিবার জন্য মাৎসর্য্যপূর্ণ হৃদয়ে ফুলের উপর বসে। পাষণ্ডের শাস্ত্রালোচনাও তদ্রূপ। সম্প্রতিকালে কোন এক বিশিষ্ট রাজনীতিবিদের মৃত্যুর পর সংবাদপত্রে দেখা গেল যে, তাঁহার শয্যার পার্শ্বে গীতা ধর্ম্ম-গ্রন্থখানি ছিল। অথচ তাঁহার সমস্ত জীবন ধরিয়া বলিয়াছেন, ধর্ম্ম কাপুরুষের জন্য। সুতরাং তিনি কিরূপে গীতা স্পর্শ করিতে পারেন? যদি ঘটনাটি সত্যও হয়, তবে উহা লুতাকীটের পুষ্পের উপর উপবেশন বুঝিতে হইবে।

একদেশে এক বিরাট ধনী লোক বাস করিত। লোকটী অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিল এবং ধনী হইলেও খুব কৃপণ ছিল। উহার দুইজন প্রধান কর্ম্মচারী ছিল। তাহারাও অত্যন্ত কৃপণ ছিল। একবার উক্ত ধনী লোকটী একটী উৎসব করিয়া স্বীয় কার্পণ্যদোষ অপনোদন করিতে মনস্থ করিল। কিন্তু অর্থ ব্যয় না করিয়াই যাহাতে উৎসব হইতে পারে, সেই ইচ্ছা তাহার একেবারে নষ্ট হইল না। তথাপি তাহার কৃপণ কর্ম্মচারী দুইটীকে বাজারে পাঠাইল এবং বলিয়া দিল—খুব ভাল দ্রব্য বাজার হইতে ক্রয় করিয়া আনিবে। ব্যয়কুণ্ঠ কর্ম্মচারী দুইটী পয়সা ব্যয় করিতে নারাজ। যাহা হউক, দুইজনে বাজার হইতে ফিরিয়া আসিয়া দুইটী কৈফিয়ৎ দিল। একজন বলিল, বাজারে ভাল দ্রব্য নাই। আর একজন বলিল, বাজারে ভাল দ্রব্য বলিয়া কিছু দেখিলাম না, যাহা যাহা পাওয়া যাইতেছে সবই সমান বলিয়া বোধ হইল, একটী হইতে আর একটীর তফাৎ নাই। বুদ্ধিমান মালিক স্বীয় উদ্দেশ্য সাধন হইল জানিয়া মনে মনে সন্তুষ্ট হইলেন। তথাপি মৌখিক জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের উক্তি দুই প্রকার হইলেও মূলতঃ একই; কারণ কেহই আমাকে আমার আদিষ্ট দ্রব্যগুলি সংগ্রহ করিয়া আনিলে না।

ভগবদনুশীলনে রত হইয়া জগতের নাস্তিকগন ঐ কৃপণ কর্ম্মচারিদ্বয়ের ন্যায় মন্তব্য করিয়া থাকে। যাহাতে যাহারা প্রকৃত ভগবদনুশীলন করিতে চাহে না, তাহারা আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকে এবং ঐপ্রকার মন্তব্যকেই ভগবৎসিদ্ধান্ত বলিয়া প্রচার করে। আমরা ঐপ্রকার দুইটী মতের সমানতা প্রদর্শন করিব। পূর্ব্ব মত দুইটীর একটীতে সরাসরি দ্রব্য নাই এবং অপরটিতে 'সব দ্রব্যই ভাল, ইহার সহিত অন্যের কোন পার্থক্য নাই' উক্ত হইয়াছে। প্রথমজন বোকা, সেইজন্য ভালো দ্রব্য নাই বলিয়া ধ্বনি তুলিয়াছে। বুদ্ধিমান এবং চাপা দ্বিতীয় কর্ম্মচারী চিন্তাসহকারে পরে উত্তর দিল যে সমস্ত দ্রব্যই ভাল, অর্থাৎ যাহা খুসী তাহাই ক্রয় করিতে পারা যায়। মূল

ভাবটী এই যে, অধিক মূল্যের দ্রব্য ক্রয় করিবার আবশ্যকতা নাই। 'সব ধর্ম্মই সমান'-উক্তিকারীও ঐরূপ।

কোন কোন নাস্তিক বলিয়া থাকে—ঈশ্বর নাই, পরলোক নাই। লোকায়ত (চার্ব্বাক) দর্শন এই শ্রেণীর। "যাবজ্জীবং সুখং জীবেৎ"—এই তাঁহার নীতি। চার্ব্বাক অত্যন্ত প্রত্যক্ষবাদী। কালক্রমে ঐ মত বিভিন্ন আচার্য্য-কর্ত্তৃক ভীষণভাবে নিন্দিত হইলে বর্ত্তমানের নাস্তিকগণ লুতাকীটের পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। উক্ত দ্বিতীয় কর্ম্মচারিণীর ন্যায় তাহারা বলে, প্রত্যেকেই ভগবান্—Everybody is God. শিক্ষিত সমাজ কি একটু বিচারও করিবেন না? **ভগবান্ নাই** এবং **প্রত্যেকেই ভগবান্**—উক্তিদ্বয় একই—ইহা নহে কি? প্রত্যেক জীবমাত্রই যদি ভগবান্ হইয়া থাকে তাহা হইলে ভগবানের সেবা আর কে না করে? চেতন বস্তু-মাত্র জীব, প্রত্যেকে নিজ নিজ সুখ উৎপাদনে সচেষ্ট। সুতরাং ঈশ্বর-সেবা ত' প্রত্যেকেরই হইল? এই সকল চিন্তা কি কপটতার আকর নহে? পরস্পরের মধ্যে ভেদ-বৈশিষ্ট্য না থাকিলে 'প্রত্যেক'-শব্দটীর সৃষ্টি কি করিয়া সম্ভব? যাহারা নাস্তিক হইতে চাহে, নাস্তিকতার বৃদ্ধিসাধনে যাহারা তৎপর, তাহারা ভিন্ন আর কে বলিবে যে জীবমাত্রই শিব, ভগবান্? বিশেষতঃ গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীর পক্ষে "জীবই ভগবান্" বলা স্ববিরোধ। যদি তাহাই হইত, সেই বিশ্বাস যদি তাহার প্রকৃতই থাকিত, তবে তিনি গৃহ-ত্যাগ করিলেন কেন? গৃহের মাতা, পিতা, স্ত্রী, বন্ধুবর্গ সকলেই ত' ভগবান্—তাহাদের সেবা করিলেই ত' ভগবানের সেবা হইয়া যাইত? তবে আবার লাল কাপড় পরিবার কপটতা কেন? ইহা উদ্দেশ্য-সাধনে ব্যর্থ জীবের উক্তি নহে কি? প্রত্যেকেই ভগবান্ আর প্রত্যেকের মধ্যেই ভগবান্ আছেন—এই দুইটী পৃথক কথা। প্রত্যেকের মধ্যে ভগবান্ আছেন বলিয়া প্রত্যেকের সেবাবিধান কি-প্রকারে ভগবানের সেবা হইতে পারে?

কুক্কুরগুলি বিষ্ঠা গ্রহণ করে এবং উহাদের জীবনও তাহাতে রক্ষিত হয়। সুতরাং বিষ্ঠাতেও মনুষ্যাদি জঙ্গম প্রাণীর জীবনধারণের উপাদানগুলি আছে বুঝা যায়, কিন্তু তজ্জন্য বিষ্ঠা মানুষ বা মানবেতর কোন উচ্চ প্রাণীর আহার্য্য হইতে পারে না এবং মানুষ যে-খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করিয়া থাকে তাহার সহিত কুকুরের ভক্ষ্য বিষ্ঠা সমতুল্য হইতে পারে না। যদি কেহ সব খাদ্যদ্রব্যই সমান বলিয়া থাকে, সে পাগল বা তজ্জাতীয় কোন বিকৃতমস্তিষ্ক হইবে। তাহাকে মানুষ বলা কোনও ক্রমে যাইবে না, যাইতে পারে না। সেই প্রকার একের বাঞ্ছাপূরক ধর্ম্মকে অন্যের ধর্ম্মের সহিত সমান জ্ঞান করা যায় না। যদি কেহ সেইরূপ উক্তি করিয়া থাকেন, তিনি পূর্ব্বের উদাহরণের শিকার হইবেন না কেন—সুধী পাঠকবর্গ তাহার কৈফিয়ৎ তলব করিবেন। সুতরাং সব ধর্ম্ম সমান—ইহা কোন শাস্ত্র ও যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে না। প্রত্যেক জীবও ভগবান্ হইতে পারে না। এইরূপ উক্তি মিথ্যাবাদীরাই করিতে পারে। কোন পাত্রের মধ্যে তৈল আছে বলিয়া পাত্রটীই তৈল

বা তৈলই পাত্র—এরূপ বলা যেমন মূর্খতা, তদ্রূপ জীবের মধ্যে ভগবান্ আছেন বলিয়া জীবই ভগবান্ বা ভগবান্ই জীব একথা বলা মূর্খতা। আধার ও আধেয় কখনই এক নহে। ইহাতে ভগবানের একত্বে বহুত্বের দোষও আপতিত হয়। স্বতরাং ভগবান্ নাই এবং প্রত্যেকেই ভগবান্—ইহা একই কথা, উক্তিদ্বয়ে বিন্দুমাত্র পার্থক্য নাই। ইহাই নাস্তিকতার প্রতীক।

—শ্রীগৌঃ পত্রিকা ১৯শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা।

বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীর ত্রুটী ও তৎসংশোধন-চেষ্টা

দেশের শিক্ষা-প্রণালী বিলাতী ধরনে গড়িতে যাইয়া আমাদের প্রাচীন বৈশিষ্ট্য যাহা কিছু ছিল, সব গিয়াছে। আমাদের দেশে নিম্নতম শিক্ষা-সোপান হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বোচ্চতম সোপান পর্য্যন্ত দেখা যায়—ভগবৎকথার নামগন্ধও নাই! নিরীশ্বর নৈতিক জীবনযাপনের কতকগুলি মামুলী কথা আছে। স্বধর্ম্মনিষ্ঠ মাতাপিতার সাক্ষাৎ শাসনাধীনে থাকা অবস্থায় বরং বালকগণের চিত্তে একটু ধর্ম্মভাব দেখা যায়, কিন্তু মাতাপিতার দৃষ্টির অন্তরালে থাকিয়া বালকগণ যতই উচ্চতর শিক্ষালাভ করিতে থাকে, ততই তাহারা ভগবদ্‌বিশ্বাসটী পর্য্যন্তও হারাইতে থাকে। ক্রমে একেবারে নাস্তিক হইয়া বিলাতী ধরণের চাল-চলন আরম্ভ করিয়া দেয়। তাহাতে তাহাদের বিলাসিতা এত বেশী বৃদ্ধি পায় যে, বাপ-মা আর ছেলের খরচ দিয়া কুলাইয়া উঠিতে পারেন না। বিলাতী-শিক্ষা-লব্ধ গুণধর ছেলে তখন তাহার পিতামাতার নিত্য অর্চ্চনীয় শালগ্রাম-শিলা-পূজাকে পুতুল-পূজা বলিতেও কুণ্ঠা বোধ করেন না, বিষ্ণুদাসের চিহ্নস্বরূপ তুলসী-মাল্য উর্দ্ধপুণ্ড্রাদি ধারণ প্রভৃতি তাঁহার মতে কুসংস্কার বলিয়া সিদ্ধান্তিত হয়; শুদ্ধভক্তগণ-সঙ্গে হরি-কীর্ত্তনাদিতে যোগদান করা অপেক্ষা গার্ডেন-পার্টি, ইভিনিং ক্লাব প্রভৃতি করিয়া চা-চুরুট, পান-তামাক প্রভৃতি কলির সেবাই তাঁহার পক্ষে শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে হয় ইত্যাদি।

ছেলেদের মধ্যে এই যে নিরীশ্বর নাস্তিক্য ভাব, ইহার মূল কারণ একমাত্র সৎশিক্ষার অভাব। শুদ্ধ সাত্বত শাস্ত্রকারগণ-প্রবর্ত্তিত শিক্ষার প্রচলন ব্যতীত ছেলেদের এই নাস্তিক্য ভাব কিছুতেই দূর হইবার নহে। শিশুকাল হইতে ছাত্রগণ যে প্রকৃতির লোকের সঙ্গে যেরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া আসিতে থাকে, সেই শিক্ষা তাহাদের হৃদয়ে এমন একটা সংস্কার বদ্ধমূল করিয়া দেয় যে, সে-সংস্কার পরে শত চেষ্টাতেও যাইতে চাহে না।

ভাগবত-গীতা-পুরাণাদি-কথিত ছাত্রজীবন অর্থাৎ পরমার্থ-তত্ত্ববিৎ গুরুগৃহে বাস করিয়া গুরুপাদপদ্মে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাসহকারে শাস্ত্রসিদ্ধান্ত শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি দ্বারা আদর্শ ছাত্রজীবনের কথা এখনকার ছাত্রগণের নিকট যেন একটা উপকথা বলিয়া মনে হয়। কারণ বহুদিন ধরিয়া একটী পদ্ধতি উঠিয়া গেলে তাহার কথা পরে সম্পূর্ণ নূতন বলিয়া মনে হয়।

তখন ছাত্রগণকে অষ্টম বর্ষ-বয়ঃক্রম-কালে গুরুগৃহে যাইতে হইবে এবং গুরুসেবা করিতে হইবে, গুরুদেবের আদেশ মত ব্রহ্মচর্য্যাদি চারি আশ্রম অবলম্বন করিতে হইবে—কথাটীর মধ্যে কিছু নূতনত্ব ছিল না; কেননা তাহাই তাৎকালিক রীতি ছিল। তখনকার ছাত্রগণের স্মৃতিশক্তি প্রখর ছিল, গুরুদেবের উপদেশ শুনিয়া শুনিয়াই ছাত্রগণ বেদবেদান্ত কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিত। সকলেরই স্বধর্ম্মে নিষ্ঠা ছিল। স্বধর্ম্মনিষ্ঠগণের মধ্যে কেহ কেহ উন্নতাধিকার লাভ করিয়া শুদ্ধভক্তও হইতেন। এখন প্রাথমিক শিক্ষা কাল হইতে আরম্ভ করিয়া ছাত্রগণ নাস্তিক হইতে আরম্ভ করে, আর বিদ্যাশিক্ষা শেষ করা পর্য্যন্ত সেই নাস্তিকতা। অবশ্য কোন সৌভাগ্যবান্ যুবক বর্ত্তমান শিক্ষার কবল হইতে ছুটি লাভ করিয়া একটু ভক্তি-জীবন লাভ করিতে চান বটে, কিন্তু তাঁহার সংস্কারগুলি তাঁহাকে শুদ্ধভক্তি কিছুতেই লাভ করিতে দেয় না; হয় তাঁহাকে ভোগী কর্ম্মী, না হয় মায়াবাদী জ্ঞানী অথবা যোগী করিয়া তাঁহাকে ভক্তিপথ হইতে ছিনাইয়া লইয়া যাইবে।

শুদ্ধ সাত্বত-শাস্ত্র-প্রচারকগণের আনুগত্যে আধুনিক শিক্ষাপ্রণালী আমূল সংশোধিত হইলেই বালকগণের উন্নত-জীবনের আশা করা যায়। বর্ত্তমানে যে শিক্ষাস্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, তাহার গতির পরিবর্ত্তন দু'এক বৎসরের চেষ্টায় যে সাধিত হইবে, তাহা নহে; তবে এখন হইতে চেষ্টা করিলেও পরিণামে অনেক সুফল আশা করা যাইতে পারে। আমাদের মনে হয়, অভিভাবকবর্গ যদি শিশুকাল হইতেই সন্তানগণকে সাত্বত-শাস্ত্রতত্ত্ববিৎ সদ্গুরু-চরণাশ্রয়ে সাত্বত-শাস্ত্র আলোচনার সুবিধা করিয়া দেন, তাহা হইলে সুকুমারমতি বালকগণ সচ্চরিত্রবান্ হইয়া ক্রমশঃ ভক্তিময় জীবন যাপন করিতে পারেন। তাদৃশ ছাত্রগণ দ্বারাই ভারতের ধর্ম্মাকাশ অধর্ম্মমেঘ-মুক্ত হইতে পারে। ধর্ম্মজীবন যাপন করিতে হইলেই ছাত্রগণ সংসার ছাড়িয়া বিরাগী হইয়া যাইবে, এই ভয়ে অভিভাবকবর্গ যদি তাহাদিগকে সংশিক্ষালাভ হইতে বঞ্চিত করেন, তাহা হইলে বড়ই দুঃখের বিষয় হয়। সাত্বত-শাস্ত্রসিদ্ধান্তের বহুল প্রচারক্রমে জগৎ হইতে ধর্ম্মের ভাণ উঠিয়া যাইতে পারে, জগৎ একটী শান্তিময় ক্ষেত্র হইতে পারে।

তবে একটী কথা হইতেছে যে, কেবল বই মুখস্থ করা পণ্ডিত-নামধারী শাস্ত্রোদ্দিষ্ট আচরণ-হীন অসদাচারী অভক্ত শিক্ষকের নিকট শাস্ত্র পড়িয়া ছাত্রগণ কিছুই লাভবান্ হইবে না। বরং হিতে বিপরীত ফল হইবে। শুদ্ধ-ভক্তি যিনি নিজে আচার করিয়া প্রচার করেন, এমন আচার্য্যের চরণাশ্রয়েই জীবের মঙ্গল হইতে পারে।

বর্ত্তমানে ভারতে লোকের মধ্যে যেরূপ একটু ধর্ম্মভাব দেখা যাইতেছে, তাহাতে আমাদের খুবই বিশ্বাস হয় যে, ছাত্রগণ যদি সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয়ে সংশিক্ষা লাভ করিয়া ধর্ম্মজীবন যাপন করিতে থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের দ্বারাই দেশের মঙ্গল হইবে। সংশিক্ষার উন্নতিবিধানই দেশের উন্নতির একমাত্র উপায়। শিক্ষাবিভাগীয় কর্তৃপক্ষগণ যদি পূর্ব্বতম মহর্ষিগণ-প্রদর্শিত শিক্ষা-প্রণালী অগ্রাহ্য না করিয়া তাহার প্রচলনে যত্নবান্ হয়েন, তাহা হইলে ভারতের বাস্তবিকই নবজাগরণ সম্পাদিত হয়। বিদ্যাকে কেবল অর্থকরী করিয়া না তুলিয়া তাহা যদি পরমার্থকরী করা যায়, তাহা হইলেই মঙ্গল। যদি বলেন, ছাত্রগণ তাঁহাদের স্বাধীন ইচ্ছামত ধর্ম্মজীবন যাপন করিতে পারেন, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা হয় না। আদর্শ ভিন্ন কখনও শিক্ষার প্রসার হয় না। বালকগণ তাহাদের সম্মুখে যেমন যেমন আদর্শ দেখিতে পাইবে, সেইরূপেই তাহাদের জীবন গঠন করিতে শিখিবে। অতএব আমাদের বিশেষ প্রার্থনা, শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষগণ-কর্তৃক আমাদের কথিত বিষয় যেন একটু স্থিরচিত্তে আলোচিত হয়।

কোন বিদেশীয় শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কোন আপত্তির কারণ নাই, তবে বিদেশীয় ভাষা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রগণ বিদেশীয় চাল-চলনের অনুকরণ করিতে যাইয়া নিজেদের বৈশিষ্ট্য হারাইয়া না ফেলেন, ইহাই দেখিতে হইবে। আমাদের পূর্ব্বতন মহাজনগণের আদর্শে যদি ছাত্রগণ শিক্ষা লাভ করেন, তাহা হইলে আর স্বধর্ম্ম নাশের কোন আশঙ্কা থাকে না।

—শ্রীগৌঃ পত্রিকা ১১শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা।

অশিষ্টাচার

যাঁহারা সাত্বত-স্মৃতির শাসন মানিয়া চলে না তাঁহারা অশিষ্ট। অশিষ্টগণ প্রেয়ঃ-পথের পথিক ; তাঁহারা মানসিক-বৃত্তি চরিতার্থতার জন্য স্বেচ্ছাচারী হইয়া পড়েন। সুতরাং তাঁহাদের আচারে স্বেচ্ছাচারিতার প্রবল তরঙ্গ দৃষ্ট হয়। শাস্ত্রের শাসনবাণীর সহিত নিজেদের অশান্ত মনের চিন্তাস্রোতের মিল হয় না বলিয়া অনেক সময় তাঁহারা সাত্বত-শাস্ত্রকারগণকে 'একদেশদর্শী', 'সাম্প্রদায়িক' প্রভৃতি সংজ্ঞা প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে অজ্ঞ এবং নিজদিগকে বিজ্ঞ জ্ঞান করেন। কোনও পাশ্চাত্য মনীষী বলিয়াছেন—We think our fathers fool. Our wiser sons will no doubt think us so. বস্তুতঃ অশিষ্টাচারের গতি এই প্রকারই। প্রতিষ্ঠা লাভের আশায় নিজেদের প্রতিভা দেখাইতে যাইয়া যদি আমরা আমাদের পরম হিতৈষী পূর্ব্বাচার্য্যগণকে অজ্ঞ বলিতে দ্বিধা-

বোধ না করি, তাহা হইলে আমাদের সন্তান-সন্ততিগণ যে আমাদের উচ্ছৃঙ্খলবৃত্তি লক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে অজ্ঞ, মূর্খ, অসভ্য প্রভৃতি বলিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি?

একটী সত্য ঘটনা লিখিতেছি। কোনও স্ত্রীলোক তাহার বৃদ্ধা শ্বশ্রূমাতাকে সর্ব্বদা বাক্যবাণে জর্জ্জরিত করিত। বৃদ্ধা একটী ভগ্ন পাথরের থালায় আহার করিত। আহারান্তে থালাটী তাহাকেই পুষ্করিণীতে লইয়া যাইয়া ধৌত করিতে হইত। একদিন পুষ্করিণী হইতে আসিবার সময় থালাটী হস্ত হইতে পড়িয়া একেবারে চূর্ণ হইয়া গেল। ইহাতে বৃদ্ধার পুত্রবধূর ক্রোধের আর পরিসীমা রহিল না। সে অনর্গল ধারায় বচনামৃত বর্ষণ করিতে লাগিল। এই গালি শ্রবণ করিয়া তাহার পুত্র—বৃদ্ধার পৌত্রও বৃদ্ধাকে গালি দিয়া বলিতে লাগিল—"বুড়ি, তুই আমার যে ক্ষতি করলি, এইরূপ ক্ষতি আর কেহ করে নাই। ভাঙ্গা পাথরখানা যে একেবারে চুরমার করলি, আমার মা যখন বৃদ্ধা হইবে তখন আমি তাহাকে ভাত দিবার জন্য এইপ্রকার মূল্যবান্ ভাঙ্গা পাথর আর কোথায় পাইব?" এইবার বৃদ্ধার পুত্রবধূর একটু চৈতন্যোদয় হইল। সে দেখিল—বৃদ্ধাকে সে যেভাবে উৎপীড়িত করিতেছে, তাহার পুত্রও তাহাকে সেইপ্রকার উৎপীড়নের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। ঐ দিন হইতে সে শিষ্ট হইল—শ্বশ্রূমাতাকে যথাসাধ্য যত্ন করিতে লাগিল। এই উদাহরণ দেখিয়া—নিজেরা অশিষ্ট হইলে সন্তান-সন্ততিগণ-কর্ত্তৃক তাহার উপযুক্ত পুরস্কার পাওয়া যাইবে, এই চিন্তা করিয়াও যদি জনগণ অশিষ্টাচার পরিত্যাগ করে তাহা হইলেও অন্ততঃ মন্দের ভাল নহে কি? উপদেশে শিক্ষা না হইলে অনেকে অপরের অবস্থা দেখিয়া শিক্ষা করে। সর্ব্বশেষে ঠেকিয়া শিক্ষা হইয়া থাকে। তাহাতেও যাহার চৈতন্যোদয় না হয়, সে ত' পশুরও অধম।

সাত্বত-শাস্ত্রবাণীর প্রতি অনাদরের ফলে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের পর্য্যন্ত আজ কি ভীষণ দুর্গতি হইয়াছে। অনেকে বলিবেন—ভারতে রেলগাড়ীর বন্দোবস্ত হইয়াছে, ডাক-বিভাগের উন্নতি হইয়াছে, মুদ্রণ-যন্ত্রাদি হইয়াছে, নূতন নূতন শিল্পাগার প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, সুতরাং ভারতের দুর্গতি কোথায়? কিন্তু ঐগুলি কি সুগতির চরম লক্ষণ? বৈজ্ঞানিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অশান্তির মাত্রা বৃদ্ধি পাইতেছে কেন? অধিকাংশ স্থলেই ত' কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠকে সম্মানের চক্ষে দেখিতেছে না; ইহার কারণ কি? অপস্বার্থ আসিয়া বন্ধুতার মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইতেছে কেন? দেশে দেশে, প্রদেশে প্রদেশে, বিভাগে বিভাগে, জেলায় জেলায়, মহকুমায় মহকুমায়, থানায় থানায়, বোর্ডে বোর্ডে, গ্রামে গ্রামে বিবাদ-বিসম্বাদ প্রজ্জলিত অবস্থায় কেন? জাতিতে জাতিতে অহি-নকুল সম্বন্ধ হইতেছে কেন? এইসকল কি অশিষ্টতা নহে? শিক্ষার আগার যে-সকল স্থান, সে-সকল স্থান হইতেও ছাত্রবৃন্দের ক্রমশঃই অধিকতর দুর্ব্বিনীত হইবার অভিযোগ শিক্ষক ও অধ্যাপক-মণ্ডলী হইতেও পাওয়া যাইতেছে কেন? স্থিরচিত্তে নিরপেক্ষভাবে কারণ অনুসন্ধান করুন, দেখিতে পাইবেন—সাত্বত-স্মৃতির প্রতি ঔদাসীন্য, পরমার্থশিক্ষার প্রতি দৃষ্টিহীনতাই ইহার

মূলীভূত কারণ। কেহ কেহ বলেন—পরাধীনতাই এই অশিষ্টতা বৃদ্ধির কারণ; কিন্তু পাশ্চাত্য স্বাধীন দেশগুলির মধ্যে কি অশিষ্টতার উদাহরণ কিছু কম পাওয়া যায়?

শিষ্টতার আগার হৃদয়ে ধারণ করিয়া যাঁহারা আমাদের জন্য অহৈতুক-করুণাবশতঃ উপদেশবাণী সাত্বত-শাস্ত্ররূপে সংরক্ষণ করিয়াছেন, তৎপ্রতি যদি উপেক্ষা প্রদর্শন করি—প্রকৃত শিক্ষককে যদি অবহেলা করি—যাহা আমাকে শিষ্টাচার শিক্ষা দিবে, তাহাকে যদি উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করি, তাহা হইলে অশিষ্টাচার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিকৃত-মস্তিষ্কতার ফলস্বরূপ অশান্তির অনল সমগ্র দেশ গ্রাস করিবে বৈ কি? তাই আমাদের শিক্ষিত ভ্রাতৃ-বৃন্দের নিকট নিবেদন—তাঁহারা কি ঠেকিয়াও শিখিবেন না? পরমার্থ-জ্ঞানের অভাবে যে ভীষণ অবস্থা শিক্ষামন্দিরে পর্য্যন্ত আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহা প্রতিক্ষণ অনুভব করিয়াও কি "Back to God and back to Home"-এর জন্য যত্নবিশিষ্ট হইবেন না? তাঁহারা কি প্রকৃত শিষ্টাচার—ভগবৎসেবায় আত্মনিয়োগ-পূর্ব্বক "আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়" এই শিক্ষাসার বরণ করিবেন না? তাহা হইলে তাঁহাদের শিক্ষার মূল্য কি? পাশ্চাত্য ভূখণ্ড হইতে আমদানী কপট-শিষ্টাচার ভারতের সম্পত্তি নহে। মনঃপ্রাণে সরল হইয়া ভগবদ্ভজন—জীবমাত্রকেই স্বরূপতঃ ভগবদ্দাস জানিয়া সকলকেই প্রীতির চক্ষে অবলোকন—সকলকেই ভগবদ্ভজনের মাধুর্য্যে আকর্ষণই ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিষ্টাচার। সে-স্থানের আচার-ব্যবহার যে আবরণেই আবৃত থাকুক এই শিষ্টাচারের অভাব যে-স্থানে, ভারত—পরমার্থ-ভারতের দৃষ্টিতে তাহা অশিষ্টাচার ব্যতীত আর কিছুই নহে। পরমার্থ-ভারত সর্ব্বদাই স্বাধীন আছে, ভবিষ্যতেও স্বাধীন থাকিবে। পরমার্থ-ভারত জগতের গুরু; তিনি স্বীয় শিষ্টাচারের আলোকে জগতের যাবতীয় অশিষ্টাচার দূরীভূত করিবেন। তাঁহার অধীনতায় থাকাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব।

—শ্রীগৌঃ পত্রিকা ৮ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা।

বিশেষ উপদেশ-মূলক প্রবন্ধ—

বৈষ্ণব চিনিতে হইবে

জীবের মুখ্য প্রয়োজনলাভের একমাত্র উপায় শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপা, শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপাফলেই জীবের পক্ষে সদনুগ্রহ শ্রীভগবানের কৃপাকটাক্ষ লাভ করা সম্ভব, ইহা আমরা পূর্ব্বাপর শুনিয়া আসিতেছি। ইহাও শুনিয়াছি, গুরুবৈষ্ণবের কৃপা অহৈতুকী, জগতের কোন বস্তু বা জাগতিক কোন বস্তুর নির্ব্বিশেষ ভাব ঐ কৃপার উৎপত্তির কারণ নহে। এই হৈতুকতার বিপরীত বস্তুটী যে কি ব্যাপার, তাহা না বুঝিয়া অনেক সময় শ্রীগুরুবৈষ্ণবের করুণাকে আমরা একটা কাল্পনিক রূপ দিয়া বসি। আমরা মনে করি, আমাদের পক্ষে সেবানিষ্ঠা বা তজ্জন্য যত্নাগ্রহের কোন প্রয়োজন নাই। আমরা আমাদের মত চলিতে থাকি, একদিন আকস্মিকভাবে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপায় সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইয়া যাইবে। ভজনাগ্রহটী যেন মিছা ভোক্তাভিমান, মনোধর্ম্মী, বদ্ধজীব আমরা সাধু-গুরু-কৃপা ব্যতীত স্বতন্ত্রভাবেই করিতে পারি।

যাঁহারা ঐরূপ বলেন, তাঁহারা সাধুর কৃপা ও জীবের পক্ষে সেবার আগ্রহ যে স্বতন্ত্র বস্তু নহে, ইহা বুঝিতে পারেন না। সাধুর কৃপালাভ করিবার জন্য তাঁহারা যে সত্য সত্য অন্তরের সহিত আর্ত্তিবিশিষ্ট নহেন, ইহাও তাঁহাদের ঐরূপ কপটতাপূর্ণ উক্তি হইতেই বুঝা যায়। বৈষ্ণবের কৃপালাভ করিবার উপায় সম্বন্ধে মহাজনগণ এরূপ বলেন,—

যে যেন বৈষ্ণব, চিনিয়া লইয়া আদর করিব যবে।
বৈষ্ণবের কৃপা যাহে সর্ব্বসিদ্ধি, অবশ্য পাইব তবে॥

যিনি যেমন বৈষ্ণব অর্থাৎ ভক্তিমার্গ যাঁহারা অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহাদের অধিকার বিচার করিয়া কনিষ্ঠ, মধ্যম অথবা উত্তম যেরূপ যোগ্যতা যিনি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাকে সেইরূপ আদর করিতে হইবে। কনিষ্ঠাধিকারীকে উত্তম অধিকারীর প্রাপ্য সম্মান দিলে বা মধ্যম অধিকারীর সহিত কনিষ্ঠের ন্যায় ব্যবহার করিলে আদর সুষ্ঠুরূপে হয় না। বৈষ্ণবের প্রতি ব্যবহার যথাযথরূপে সম্পন্ন হইলেই জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত বৈষ্ণবাপরাধ হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয়। তখনই বৈষ্ণবের সর্ব্বসিদ্ধিদাত্রী, অমায়ায় কৃপার স্বরূপ উপলব্ধির বিষয় হয়।

সুতরাং বৈষ্ণব চিনিবার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য্য। চিনিতে পারিলেই আদর বা মমতা স্বতঃই উদিত হয়। নিজের ভ্রাতাকে ভ্রাতা বলিয়া চিনিবার সঙ্গে সঙ্গেই অনাস্বাদিতপূর্ব্ব ভ্রাতৃস্নেহের মাধুর্য্য অনুভূত হইতে থাকে, উহা সময়ের অপেক্ষা করে না। এই চেনা বা আপনজ্ঞানে, স্বজনজ্ঞানে, বান্ধবজ্ঞানে প্রণয়বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া একান্ত

প্রয়োজন। বৈষ্ণব আমাকে কতটা স্নেহ করেন বা আপন জ্ঞান করেন, এই বিচারই পর্য্যাপ্ত নহে। কারণ, 'আমি বৈষ্ণবের স্নেহভাজন', এই চিন্তায় যে আত্মপ্রসাদ লাভ হয়—উহা অন্তরের অন্তরালে অবস্থিত ভোগপিপাসারই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। আমি বৈষ্ণবের প্রতি কতটা মমত্ববুদ্ধিবিশিষ্ট হইতে পারিয়াছি, এই বিচারই সর্ব্বসিদ্ধি-অভ্যুদয়ের সূচনা করে। বৈষ্ণব চিনিয়া তাঁহার প্রতি আত্মীয়বুদ্ধি না আসা পর্য্যন্ত আমার প্রতি বৈষ্ণবের মমতার প্রকৃত স্বরূপ আমার পক্ষে উপলব্ধি করা কখনই সম্ভব হয় না।

কিন্তু এই বৈষ্ণব চেনা বা তাঁহার প্রতি মমত্ববুদ্ধিসম্পন্ন হওয়ার মধ্যে কয়েকটী বিষয় আমাদের লক্ষ্য করিবার আছে। প্রাকৃত দৃষ্টিতে বৈষ্ণব দেখিতে গিয়া আমরা তাঁহাদের মধ্যে যেমন দোষ দেখিতে পাই, সেইরূপ নানাপ্রকার গুণও দেখিয়া থাকি। বৈষ্ণবের স্নেহ-বিনীত ব্যবহার, স্বভাবসুলভ ক্ষমা ও উদারতা অনেক সময় আমাদের আকৃষ্ট করে। ঐ গুণগুলি বিচার করিয়াই আমরা বৈষ্ণবের বৈষ্ণবতার পরিমাপ করিতে উদ্যত হই। ঐ গুণগুলিই আমাদিগকে আকর্ষণ করিয়া বৈষ্ণবের প্রতি একটা মমত্বাভাসের জন্মদান করে। এই প্রকার বাহ্যগুণ-দর্শনে স্বরূপবিচার ও সেই সকল অনুকূল-গুণের প্রতি আকর্ষণজনিত মমত্ববোধের দ্বারা বাস্তবিক বৈষ্ণবদর্শন এবং বৈষ্ণবে আদর হয় কিনা আমাদের বিচার করিয়া দেখা উচিত। বৈষ্ণবকে চিনিতে হইবে, আদর করিতে হইবে তাঁহার বৈষ্ণবতার দিক্ দিয়া। 'বৈষ্ণবতা'-অর্থে বিষ্ণুর ঐকান্তিকী সেবাপরতা। উহাই বৈষ্ণবের স্বরূপ। যদি বৈষ্ণব চেনাই আমাদের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে তাঁহার মধ্যে বিষ্ণুসেবা-তাৎপর্য্যময়তা কি পরিমাণে আছে তাহাই দেখিতে হইবে।

বৈষ্ণবের ছাব্বিশটী গুণের বিষয় শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন। তাহার মধ্যে **কৃষ্ণৈকশরণতা বৈষ্ণবের স্বরূপ-লক্ষণ**—বৈষ্ণবের বৈষ্ণবত্ব। অন্য পঁচিশটী গুণ ঐ স্বরূপ-লক্ষণের আশ্রয়ে প্রকাশিত হইয়া উহাকে মাধুর্য্যমণ্ডিত করে। যিনি বৈষ্ণব, তাঁহার মধ্যে বৈষ্ণবতার সঙ্গে সঙ্গে ঐ গুণগুলি থাকিবেই। বৈষ্ণব, অথচ তিনি মৃদু বা সুশীল নহেন এরূপ হইতে পারে না। তবে বৈষ্ণবতার তারতম্যানুসারে ঐ গুণগুলির বিকাশের তারতম্য হইতে পারে। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ঐ সকল গুণ সম্বন্ধে আমাদের যেরূপ সাধারণ ধারণা, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু সেরূপ বলেন নাই। সাধারণভাবে বিচার করিতে গেলে আমাদের এরূপ ধারণা হয় যে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ বৈষ্ণবের যে সকল গুণের কথা বলিয়াছেন, ঐ-সকল গুণ বৈষ্ণব ব্যতীত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মপরায়ণ ইতর ব্যক্তিতেও থাকিতে পারে। বাস্তবিক পক্ষে বৈষ্ণবের গুণ কিছু অবৈষ্ণব ব্যক্তিতে থাকিবার সম্ভাবনা নাই। বৈকুণ্ঠশব্দের বাচ্যবস্তু এজগতের বস্তুর ন্যায় সঙ্কীর্ণ, অনিত্য বা স্থুল নহে। এ জগতে শব্দ যে-সকল বস্তু উদ্দেশ করে, সেই সকল বস্তু নিতান্ত তুচ্ছ। সুতরাং একই গুণ বৈষ্ণব এবং বৈষ্ণবেতর ব্যক্তিতে দৃষ্ট হওয়া সম্ভব

এরূপ বিচার নিতান্ত স্থূলদর্শীগণের নিকটেই আদর পাইয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে "বদান্যতা" বৈষ্ণবের একটী গুণ, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী এরূপ বলিয়াছেন। "বদান্যতা" এই শব্দটী এজগতে অজ্ঞরূঢ়ি-বৃত্তিতে যে-অর্থ নির্দ্দেশ করে, তাহা সাধারণ মানবে দেখা যাইতে পারে কিন্তু বিদ্বদ্রূঢ়ি-বৃত্তিতে ঐ শব্দ যে-অর্থ প্রকাশ করে, তাহা একমাত্র বৈষ্ণব ব্যতীত আর কাহারও প্রতি প্রযোজ্য হয় না।

কিন্তু বৈষ্ণবের এই গুণবৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিবেন কে? বৈষ্ণবের বৈষ্ণবতাকে আদর করিবার প্রয়োজনীয়তা তিনিই উপলব্ধি করেন যিনি বৈষ্ণবতার শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন, অর্থাৎ যিনি সেবোন্মুখ হইয়াছেন। **নিষ্কপট শরণাগত ব্যক্তির নিকটই বৈষ্ণবের গুণসকল যথার্থ-স্বরূপে প্রকাশিত হয়।** বৈষ্ণবের অপ্রাকৃত এবং অনন্য-সাধারণ গুণ তিনিই দর্শন করেন, তিনি উঁহাকে প্রাকৃত গুণসাম্যে দর্শন করিয়া অপরাধের আবাহন করেন না। সেবাবিমুখ আমরা কিন্তু এই বৈষ্ণবতার দিক্ হইতে বৈষ্ণব দেখিবার রহস্য বুঝিতে পারি না। আমরা অনেক সময় বৈষ্ণবের স্নেহময়তা প্রভৃতি গুণে আকৃষ্ট হইয়া থাকি। বৈষ্ণবের ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি গুণের প্রশংসাও করি। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, **বৈষ্ণবের গুণ কাহারও ইন্দ্রিয়তর্পণের বস্তু নহে।** বৈষ্ণবের স্নেহ বা তাঁহাদের ধৈর্য্য প্রভৃতি গুণ, যাহা আমরা বর্ত্তমানে লক্ষ্য করিতেছি, তাহা যদি আমাদিগকে বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবায় প্রবুদ্ধ না করে, ঐ সকল গুণ যদি বৈষ্ণবের বৈষ্ণবতার প্রতি আকৃষ্ট না করে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে বাস্তবিক পক্ষে বৈষ্ণবের প্রকৃত গুণ আমাদের দর্শন হয় নাই; অথবা উহাদ্বারা আমাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি মাত্র।

বৈষ্ণবোচিতগুণ সকল বৈষ্ণবেই থাকিবে। প্রাকৃতচক্ষে দেখিতে গিয়া যদি বলি কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু 'কবি' ছিলেন কিন্তু শিবানন্দ সেন অথবা শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবক শ্রীগোবিন্দের সেরূপ কবিত্ব শক্তি ছিল না, তাহা হইলে বৈষ্ণবের কবিত-গুণটী দর্শন হইল না। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীকে সাধারণ সাহিত্যিক মনে করিয়া তাঁহাতে প্রাকৃত কবিত্বরূপ একটী প্রাকৃত, আকস্মিকগুণের সমাবেশ লক্ষ্য করা হইল মাত্র।

প্রাকৃতবুদ্ধিবিশিষ্ট মানব কৃষ্ণৈকশরণতার দিক্ হইতে বৈষ্ণব দেখিতে পারেন না, বৈষ্ণবকে সাধারণ মানবসাম্যে দেখিতে গিয়া তাঁহাতে দোষ, গুণাভাস ইত্যাদি দেখিয়া ফেলেন। তাঁহারা বৈষ্ণবের গুণাভাস-দর্শনেই বৈষ্ণবতার বিচার করিয়া থাকেন। কোন বৈষ্ণবে সাধারণ মানবের ন্যায় গাম্ভীর্য্য প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া তাঁহার প্রশংসা করেন, ঐ দিক্ দিয়াই তাঁহার বৈষ্ণবতা বিচার করেন। যদি কোন বৈষ্ণব তাঁহার ঐ গুণটী অপ্রকাশিত রাখেন, তাঁহাকে আর বৈষ্ণব বলেন না, আর যদিই বা বলেন তাহা হইলে বলিবেন, ইনি বৈষ্ণব সত্য কিন্তু ইঁহার অমুক বৈষ্ণবের ন্যায় গাম্ভীর্য্য নাই। উহা সোণার পাথরবাটীর ন্যায় নিরর্থক বাক্য। বৈষ্ণবের দোষাভাস আমাদের ইন্দ্রিয়ের

অরুচিকর বলিয়া তাহা দেখিয়া বৈষ্ণবের প্রতি অসূয়া পরবশ হওয়া যেমন নিরয়-প্রাপক, বৈষ্ণবের গুণাভাস আমাদের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিকর বলিয়া ঐ গুণদর্শনে বৈষ্ণবের প্রতি মমতাযুক্ত হওয়াও তদ্রূপ অসুবিধাজনক। উভয় ক্ষেত্রেই দর্শকের দৃষ্টি প্রাকৃততত্ত্বেই বদ্ধ, অপ্রাকৃত বৈষ্ণব চিনিয়া লওয়া তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। সুতরাং বৈষ্ণব চিনিতে গিয়া আমরা যেন প্রাকৃত গুণবিশিষ্ট অথবা প্রাকৃত গুণহীন কোন ব্যক্তিবিশেষ না চিনিয়া বসি।

মহাজনগণ বলিয়া থাকেন—"বৈষ্ণব চিনিতে নারে দেবের শকতি।" অসহায়, দুর্ব্বল মানব, অজ্ঞ ও মূর্খ আমরা বৈষ্ণব কি প্রকারে চিনিব? বৈষ্ণবের বৈষ্ণবতা কি প্রকারে বুঝিব? সম্বন্ধতত্ত্বে অনভিজ্ঞতা এবং বৈষ্ণবের কৃপায় অবিশ্বাস যতদিন প্রবল থাকে, ততদিন অনুরূপ নানাপ্রকার বিতর্ক আসিয়া বৈষ্ণবের কৃপালাভে আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়া রাখে। কোন বৈষ্ণব এই প্রশ্নের অতি সুন্দর এবং সুযুক্তিপূর্ণ উত্তর দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন—দেবগণও বৈষ্ণব চিনিতে পারেন না—একথা সত্য। কিন্তু সেজন্য আমি কেন ভীত হইব? দেশের সম্রাট্ আমার জননীকে না চিনিতে পারেন, কিন্তু সেজন্য ক্ষুদ্র শিশু আমার পক্ষে আমার জননীকে চিনিতে বাধা নাই। আমি যখন অতি শিশু ছিলাম, তখন জননীকে জননী বলিয়া জানিতাম না, তাঁহার স্নেহের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিবার যোগ্যতাও আমার ছিল না। কিন্তু আমি জানিতাম না বলিয়াই যে আমার জননী তখন জননী ছিলেন না বা আমি মাতার স্নেহ হইতে তখন বঞ্চিত ছিলাম, তাহা নহে। মাতাকে মাতৃরূপে আমি না চিনিলেও তখনও মাতার সহিত আমার সম্বন্ধ ছিল, তাঁহার স্নেহ হইতে তখনও আমি বঞ্চিত হই নাই। মাতার স্নেহে পুষ্ট হইয়াই আমি প্রাপ্ত বয়স্ক হইয়া মাতার সহিত আমার কি সম্বন্ধ এবং মাতৃস্নেহ কি বস্তু তাহা জানিতে পারিয়াছি। শিশুকালে মাতাকে চিনিতাম না, তজ্জন্য মাতার স্নেহ আমার প্রতি বর্ষিত হইলেও উহার মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে পারি নাই। কিন্তু মাতার স্নেহ-যত্নে যখন পরিণত-বয়স্ক হইলাম, তখন মাতার স্নেহ ও কৃপাতেই তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া তাঁহার প্রতি মমতাযুক্ত হইলাম। সাধক-ভক্ত মধ্যম অধিকারে উপনীত হইলে "যে যেন বৈষ্ণব চিনিয়া লইয়া" তাঁহার প্রতি মমত্বস্থাপন করেন। তখনই তিনি বৈষ্ণবের কৃপা লাভ করিয়া থাকেন। মধ্যম অধিকার লাভ করাও বৈষ্ণবেরই কৃপা-সাপেক্ষ। বৈষ্ণবের কৃপা সর্ব্বকালেই ক্রিয়াবতী। অনর্থযুক্ত বহির্ম্মুখ-জীব কনিষ্ঠাধিকারে 'নাম' সেবা করিবার প্রবৃত্তিও বৈষ্ণবের কৃপা হইতেই লাভ করেন। কিন্তু কনিষ্ঠাধিকারী উহা উপলব্ধি করিতে পারেন না, ইহাই তাঁহার কনিষ্ঠত্ব। কনিষ্ঠ-অধিকারী বৈষ্ণবের কৃপা অজ্ঞাতসারে লাভ করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবের কৃপা তৎকালে অজ্ঞাতভাবে তাঁহার উপর বর্ষিত হইয়া তাঁহাকে মধ্যম অধিকারে উন্নীত করায়। বৈষ্ণবের কৃপাতেই তিনি বৈষ্ণব চিনিয়া তাঁহার প্রতি আদরযুক্ত হন। বৈষ্ণবের সহিত আমাদের

সম্বন্ধ নিত্য, তাঁহার সহিত নূতন করিয়া সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হয় না। সেই সম্বন্ধটী উপলব্ধি করাই আমাদের প্রয়োজন, তাহা তাঁহাদের কৃপাবলেই হইয়া থাকে, তজ্জন্য সঙ্কুচিত হইব কেন ?

বৈষ্ণবকে আত্মীয়জ্ঞানে কতটা আদর করিতে পারিয়াছি, ইহা জানিবার একমাত্র কষ্টিপাথর হইতেছে—অবৈষ্ণবের প্রতি অনাত্মীয়জ্ঞানে কতটা ঔদাসীন্য বা অনাদর আসিয়াছে, এই জ্ঞান। অবৈষ্ণবে সম্পূর্ণরূপে অনাদর বা অনাত্মীয়বুদ্ধি না আসা পর্য্যন্ত বৈষ্ণবে আত্মীয়জ্ঞান হইবার আশা নাই। যে পরিমাণে অবৈষ্ণবকে পরবুদ্ধি হইবে, সেই পরিমাণে বৈষ্ণবে আপনবুদ্ধি আসিবে। এ কেবল মুখের কথা নহে, সত্যই যদি বৈষ্ণবের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইতে আমাদের ইচ্ছা হয় তাহা হইলে অবৈষ্ণবের প্রতি মমতা সর্ব্বাগ্রে পরিহার করিতে হইবে। আমাদের মাতা, পিতা, ভাই, বন্ধু এবং তথাকথিত আত্মীয়-স্বজন এমন কি আমাদের দেহ বা মনও যদি বৈষ্ণব-সেবার বিরোধী হন, তাহা হইলে সেই চৈতন্যবিমুখ নিজজনগণকে প্রকৃতপক্ষে পর জানিয়া তাহাদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হইবার মত দৃঢ়তা অর্জ্জন না করা পর্য্যন্ত বৈষ্ণবকে আত্মীয়জ্ঞান করা কেবল ছলনা মাত্র। অবৈষ্ণবকে অনাত্মীয়জ্ঞান নাই অথচ বৈষ্ণবে মমতা বা আত্মীয়বুদ্ধি আছে, ইহা সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ।

—শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা ৭ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা।

শাস্ত্রীয় সাধুসঙ্গ

সাধুসঙ্গ ব্যতীত আমাদের উপায় নাই বলিয়াই শ্রীমদ্ভাগবত **"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্। সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ ॥"**—শ্লোকে অসৎসঙ্গ পরিহারপূর্ব্বক সৎসঙ্গ-গ্রহণের উপদেশ দিয়াছেন। জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কারপুষ্ট গোপ্য মনোধর্ম্মরূপ ভোগ-পিপাসা বা প্রচ্ছন্ন ভোগরূপ ত্যাগ-পিপাসা এই সাধুর সঙ্গ-প্রভাবে বা তাঁহার শ্রীমুখ-বিগলিত তীক্ষ্ণ-বাক্যাস্ত্রের দ্বারা হৃদয় হইতে চিরতরে দূরীভূত হয়। এই সাধুসঙ্গের প্রতি বা সাধুসেবার প্রতি উদাসীন হইলে মঙ্গল-লাভের —চেতনের বিকাশ হইবার—ভগবৎপ্রীতি অর্জ্জন করিবার আর অন্য কোন রাস্তা নাই। এই সাধুসঙ্গ অত্যন্ত সুদুর্ল্লভ হইলেও নিষ্কপট সাধুসঙ্গ-প্রার্থীর পক্ষে একেবারে অপ্রাপ্য নহে। এই অসাধু-জগতে সাধু পাওয়া কষ্ট জানিয়া ভগবান্ সঙ্গদানের জন্য কৃপাপূর্ব্বক এ জগতে অবতীর্ণ হন, আবার কখনও বা তাঁহার প্রেষ্ঠজনকে এ জগতে প্রেরণ করেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখিতে পাই—

"সাধু পাওয়া কষ্ট বড় জীবের জানিয়া।
সাধু-গুরুরূপে কৃষ্ণ আইল নদীয়া॥

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আর প্রভু নিত্যানন্দ।
যাঁহার প্রকাশে সর্ব্ব জগৎ আনন্দ॥
দুই ভাই হৃদয়ের খালি অন্ধকার।
দুই ভাগবত সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার॥

"এক ভাগবত বড় ভাগবত-শাস্ত্র।
আর ভাগবত ভক্ত—ভক্তিরস-পাত্র॥
দুই ভাগবত দ্বারা দিয়া ভক্তিরস।
তাঁহার হৃদয়ে তাঁ'র প্রেমে হয় বশ॥"

সাধু দ্বিবিধ—শাস্ত্ররূপী সাধু ও ভক্তরূপী সাধু। ইহারা উভয়েই ভগবান্ ও ভগবদ্-ভক্তের কথা কীর্ত্তন করেন। এই শাস্ত্র ও ভক্ত—জীবের একমাত্র বন্ধু ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বলিয়া ইঁহারা উভয়েই জীবের জীবনস্বরূপ। সেইজন্য যাঁহারা বুদ্ধিমান্, সত্যানুসন্ধিৎসু ও শ্রেয়ঃপন্থী, তাঁহারা এই সাধু ও শাস্ত্রের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া থাকিতে পারেন না। তাঁহারা অসৎসঙ্গ-ত্যাগে দৃঢ়তা ও সৎসঙ্গ-গ্রহণে উৎসুক হইয়া সদাচার-পালনে দৃঢ়ব্রত বলিয়া কখনও ভক্ত-ভাগবতের সঙ্গ এবং তদভাবে শাস্ত্রীয় সাধুসঙ্গে যত্নবান্ হন। চেতন জীব চব্বিশ ঘণ্টা সঙ্গ না করিয়া থাকিতে পারে না। হয় সে সতত সাধুসঙ্গ করিবে, না হয় তৎপরিবর্ত্তে অন্তরে বা বাহিরে অসৎসঙ্গ করিবেই করিবে। সকল সময় যখন আমাদের ভক্তরূপী সাধুসঙ্গ মিলে না, তখন এমতাবস্থায় শাস্ত্রীয় সাধুসঙ্গ ব্যতীত আমাদের মঙ্গলের আর কি উপায় থাকিতে পারে? সাধুসঙ্গ না করিলে কৃষ্ণে মতি হয় না। সুতরাং সাধু-শাস্ত্রানুগত্যহীন সেবার ছলনায় ইন্দ্রিয়তর্পণ করিয়া সাধুসঙ্গে বা সৎসিদ্ধান্তালোচনায় উদাসীন থাকিলে আমাদের কি লাভ হইবে? সাধুর সঙ্গ বা আনুগত্যই সেবা। সাধুর শ্রীমুখবিগলিত হরিকথা ও শাস্ত্রের কথাই আমাদিগকে হরি-গুরু-বৈষ্ণব-চরণে আকৃষ্ট করায়। সেইজন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ সাধু-শাস্ত্রকথায়, তদালোচনায় ও তৎসেবায় মনঃপ্রাণ নিয়োগ করিয়া থাকেন। শাস্ত্রালোচনায় আলস্য থাকিলে আমাদের অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। সেইজন্য আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলিয়াছেন,—

"সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হইতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥
"নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়॥"

হরি, গুরু ও বৈষ্ণব—ইঁহারা অধোক্ষজ ও নিত্য সেব্যবস্তু, ইঁহাদের চেতনময়ী বাণী বা কথাই শাস্ত্র। সুতরাং শাস্ত্রও অধোক্ষজ এবং নিত্য। ইহা না জানিয়া যদি আমরা শাস্ত্র, শ্রীমূর্ত্তি, শ্রীনাম ও শ্রীবৈষ্ণবকে প্রাপঞ্চিক জ্ঞান করি—তাঁহাদিগকে এ-জগতের কোন বস্তু মনে করিয়া অবহেলা করি, তাহা হইলে আমরা অপরাধ-পঙ্কে নিমগ্ন হইয়া তাঁহাদের সেবা হইতে বঞ্চিতই থাকিব। সাধুর কথা বা শাস্ত্রালোচনা যদি না করি তাহা হইলে বাক্যবেগের বশীভূত হইয়া আমরা এ-জগতের আলোচনায়—অসদালোচনায় অল্পবিস্তর প্রকাশ্য বা গুপ্তভাবে ব্যস্ত না হইয়া পারিব না। সুতরাং শাস্ত্রাদি আলোচনা করিবার ইচ্ছা না থাকিলেও শাস্ত্রের মহিমা শাস্ত্রজ্ঞ সাধুর নিকট শ্রবণ করিয়া তদালোচনার জন্য প্রযত্ন করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। আদরের সহিত শ্রীনাম করিতে করিতে যেমন শ্রীনামে রুচি হয়, সাধু-গুরুর আনুগত্যে শাস্ত্রালোচনা করিতে করিতেও সেইরূপ শাস্ত্রবাক্যে দৃঢ় শ্রদ্ধা ও রুচির উদয়ে জীব শাস্ত্রকেই জীবন-স্বরূপ ও আশ্রয়স্থল বলিয়া জানিবার সৌভাগ্য পায়। তখন সে আর গ্রন্থ-ভাগবতের সঙ্গ ও ভক্ত-ভাগবতের সঙ্গ না করিয়া পারে না। এই উভয় সঙ্গই তখন তাহার প্রার্থনীয় ও আলোচ্য বিষয় হয়। আমরা সকল সময় জীবন্ত সাধুর সঙ্গ-সুযোগ পাই না বলিয়া পরম করুণাময় প্রভুপাদ মদীয়াচার্য্যদেব তাঁহার অনুকম্পিত ব্যক্তিগণকে কৃপা করিয়া লিখিয়াছেন,—'হরিভজন না করিলে জীব জ্ঞানী, কর্ম্মী বা অন্যাভিলাষী হইয়া যায়, সেইজন্য সর্ব্বদা ভগবান্‌কে মহামন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ডাকিবেন। সংখ্যা নির্ব্বন্ধ করিয়া কৃষ্ণনাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিলে অনর্থ-নিবৃত্তি হয়, জাড্য প্রভৃতি পলায়ন করে। **শাস্ত্রীয় সাধুসঙ্গই ভাল।** পরে ভজন-শিক্ষার জন্য সাধুসঙ্গ স্বতন্ত্র। * * * পারমার্থিক পত্রিকাদি ভাল করিয়া পাঠ করিবেন। কল্যাণকল্পতরু, প্রার্থনা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থ অবকাশমতে আলোচনা করিবেন। নিরপরাধে হরিনাম গৃহীত হইলে সকল সিদ্ধিই করতলগত হয়। শাস্ত্র-শ্রবণ, পঠন ও তদ্বিষয়ক অনুশীলন দ্বারা শ্রীনাম উদিত হন। বর্ত্তমান অনর্থ—শ্রবণ-কীর্ত্তন প্রবল করিলে—তাহারা প্রবল হইবে না।"

কৃষ্ণ-কীর্ত্তনই জীবের ধর্ম্ম। এই কৃষ্ণ-কীর্ত্তন চারি প্রকার—নাম-সংকীর্ত্তন, রূপ-সংকীর্ত্তন, গুণ সংকীর্ত্তন এবং পরিকর-বৈশিষ্ট্যময় লীলা-সংকীর্ত্তন। আমরা কৃষ্ণ-বিষয়ে অনভিজ্ঞ। সুতরাং জীবের একমাত্র ধর্ম্ম কৃষ্ণকীর্ত্তন করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। সেইজন্য শ্রীবেদব্যাস আমাদের ন্যায় মূর্খ জীবের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া আমাদের মঙ্গলের জন্য শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করিয়াছেন। এই পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনার সঙ্গে সঙ্গেই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শোক-মোহ-ভয়নাশিনী ভক্তির উদয় হয়। মুক্তকুল-শিরোমণি শ্রীল শুকদেব গোস্বামী এই শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীল ব্যাসদেবের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

আমাদের কৃষ্ণস্মৃতি-জ্ঞান নাই বলিয়াই ভগবান্ স্বয়ং সাধু-গুরুরূপে শাস্ত্রাদি প্রণয়ন করেন। আমাদের মঙ্গলের জন্যই যাহা প্রণীত হইল সেই মঙ্গলময় শাস্ত্রের প্রতি যদি আমরা আদর না করি বা তদালোচনায় আগ্রহ না করি, তাহা হইলে আমাদের মঙ্গলের পথ রুদ্ধ হইবে না কি? এবং এইসকল বিষয় সম্যক্ অবগত না হইয়া শাস্ত্র-জীবন, সাধু-জীবন, গুরুদেবতাত্ম ভক্তিসিদ্ধান্তবিদ্‌গণকে কটাক্ষ করা আমাদের উচিত কি? ভক্তগণ এত কষ্ট করিয়া জীব-মঙ্গলের জন্য শাস্ত্র প্রণয়ন করিলেন, কিন্তু আমরা যদি তাহা আলোচনা না করি তাহা হইলে প্রত্যবায় হইবে না কি? যাঁহার হরি-গুরু-বৈষ্ণবে প্রীতি আছে তাঁহার শাস্ত্রে প্রীতি না থাকিয়া পারে না। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতেও শাস্ত্রালোচনা করিবার জন্য আমাদিগকে বিশেষভাবে উপদেশ করিয়াছেন। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ এ সকল অবশ্যই আলোচনা করিবেন।

"মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতি-জ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় কৈলা কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ॥

"শাস্ত্র-গুরু-আত্মরূপে আপনারে জানান।
'কৃষ্ণ মোর প্রভু ত্রাতা',—জীবের হয় জ্ঞান॥

সাধু-শাস্ত্রকৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তারে মায়া তাহারে ছাড়য়॥"

এজগতে ঔপাধিক বাক্যসমূহ শ্রবণ করিবার সুবিধা আছে, কিন্তু হরি-কথার ভীষণ দুর্ভিক্ষ। সুতরাং সকলেই হরিকথা—শাস্ত্রকথা আলোচনার আগ্রহবিশিষ্ট হউন, ইহাই সকলের নিকট আমাদের প্রার্থনা।

—শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা ১০ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা।

দ্রষ্টা নহে, দৃশ্য হওয়াই সেবকের কার্য্য

শ্রীহরিভক্তি-সুধোদয় বলিতেছেন,—

অক্ষ্ণোঃ ফলং ত্বাদৃশ দর্শনং হি
তনোঃ ফলং ত্বাদৃশ-গাত্রসঙ্গঃ।
জিহ্বা ফলং ত্বাদৃশ-কীর্ত্তনং হি
সুদুর্ল্লভা ভাগবতা হি লোকে॥

প্রবন্ধের শিরোনামটী দেখিয়া এই শ্লোকটীর উল্লেখ করায় অনেকে হয়ত' প্রবন্ধটী পাঠ করিবার পূর্ব্বেই প্রতিবাদ করিতে আরম্ভ করিবেন। আমরা আমাদের বান্ধববর্গের নিকট দন্তে তৃণ ধারণপূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইয়া কাকুবাক্যে নিবেদন করিতেছি যে, শাস্ত্রের মর্ম্ম আমরা বাহ্যতঃ যাহা বলিয়া মনে করি, শাস্ত্রের প্রকাশ-বিগ্রহ—মূর্ত্তিমৎ-শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত আচার্য্য-পাদপদ্মে উপস্থিত হইলে দেখিতে পাইব, আমাদেয় মনন-ধর্ম্ম—শাস্ত্র-যাহাকে নিরাস করিয়াছে, তাহাকেই হয়ত' শাস্ত্রের উদ্দিষ্ট-বিষয় বলিয়া ধারণা করিয়া লইয়াছি। উক্ত শ্লোকটীতে কোন ভাগ্যবান্ ব্যক্তি কোন ভাগবতের দর্শনের সৌভাগ্য পাইয়া আনন্দ-ভরে বলিতেছেন যে, বৈষ্ণবকে দর্শন করাই চক্ষুর ফল, তাঁহার গাত্রস্পর্শলাভই শরীরের ফল, তাঁহার গুন-কীর্ত্তন করাই জিহ্বার ফল। কারন, জগতে ভাগবতগণ সুদুর্ল্লভ।

বৈষ্ণবের কৃপা লাভ করিয়া সেবক তাঁহার চরণে কৃতজ্ঞতাভরে ঐ উক্তিটী প্রকাশ করিয়াছেন। বৈষ্ণব কৃপা করিয়া তাঁহার স্বরূপ না জানাইলে তাঁহাকে জানিবার সম্ভাবনা নাই। বৈষ্ণব যখন কৃপা করিয়া তাঁহার স্বরূপ জানান, তখন জীব স্বভাবতঃই তাঁহার পূর্ব্ব প্রাকৃত ভোগপর দর্শনের কথা স্মরণ করিয়া মর্ম্মাহত হন এবং বৈষ্ণবের ভগবৎ-সেবাপর রূপটী তাঁহাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। এমনভাবে আকৃষ্ট করে যে, প্রাকৃত দর্শনের স্মরণপথে উদিত হইলেই ঘৃণার উদ্রেক হয়। ঐ যে বলা হইয়াছে,—"অক্ষ্ণোঃ ফলং ত্বাদৃশ-দর্শনং হি," এই দর্শনে বৈষ্ণবের আনুগত্যে সেবা করিবার ভাবই প্রস্ফুটিত হইয়াছে। বৈষ্ণব ভগবান্ ব্যতীত আর কিছুই জানেন না। আবার বৈষ্ণব-সেবকও বৈষ্ণবের আদেশানুসারে সেবা করা ব্যতীত আর কিছুই জানেন না।

এই সেবন-ধর্ম্মে দর্শন-স্পর্শনাদি দ্বারা আত্মসুখ-তৎপরতা নাই। ভগবান্ ও ভাগবতগণ আমার সেবাপর স্বরূপকে অঙ্গীকার করিয়া থাকেন,—সেবাবিহীন প্রাকৃত স্বরূপ কখনই তাঁহারা গ্রহণ করেন না। ভগবান্ প্রাকৃত বস্তু নহেন, শুদ্ধ জীবাত্মাও প্রাকৃত বস্তু নহে। শুদ্ধ অবস্থায় জীবাত্মা স্বভাবতঃই ভগবানের আনন্দবিধানে যত্নপর হন। সেই সময় ভগবানের দর্শনের জন্য যে প্রবলা উৎকণ্ঠা, তাহা সেবার জন্যই। সেবক যে

ভগবদ্ধামে গমন করিয়া তাঁহার পাদ-পদ্মদ্বয়ের সার্থকতা করেন, তাহা ভগবানের সেবা-লাভের জন্য। হস্তদ্বারা বিষ্ণু-মন্দির মার্জ্জনা করিয়া বিষ্ণুর আনন্দই বর্দ্ধন করেন। চক্ষুর্দ্বয় যাবতীয় সুদৃশ্যবস্তু ভগবানের সেবন-উদ্দেশ্যেই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হয়। নাসার সাহায্যে যাবতীয় সুগন্ধি দ্রব্য আহরণ করিয়া সেবক সেব্যের প্রীতিবিধান করেন। জিহ্বা ভগবানের গুন-কীর্ত্তন করিয়া তাঁহার আনন্দ বিধান করেন। এতদ্ব্যতীত সেবক জিহ্বার সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া সুস্বাদু দ্রব্য ভগবৎ-সেবায় লাগাইয়া থাকেন। সেব্য যাহাতে স্পর্শ-সুখ অনুভব করিতে পারেন, তজ্জন্যই সেবকের অপ্রাকৃত কলেবর। বিধি-মার্গের বিচারপর 'শ্রী'-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ এই সকল কথার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গমে সমর্থ না হইলেও, রাগ-মার্গীয় গৌড়ীয়গণের উন্নতাধিকারে যে সেবা-বিচার রহিয়াছে, তাহাতে যাবতীয় ইন্দ্রিয়ের সম্পূর্ণ সার্থকতা ঐ ভাবেই হইয়া থাকে।

আমরা প্রবন্ধের শিরোনামায় বলিয়াছি—**'দ্রষ্টা নহে, দৃশ্য হওয়াই সেবকের কার্য্য'** এই কথার তাৎপর্য্য এই যে, নিজেকে ভগবানের দ্রষ্টা জ্ঞান করিতে হইবে না অর্থাৎ ভোগ-তৎপর হইয়া ভগবদ্দর্শনে প্রধাবিত হইতে হইবে না। যে-স্থানে কাম বা আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা, সেইস্থানে ভগবানের অপ্রাকৃত ধামের দ্বার রুদ্ধ। যে-স্থানে ভোগ ও ত্যাগ উভয়প্রকার প্রাকৃত চেষ্টা বিদূরিত হইয়া কৃষ্ণৈক-শরণতা সেবকের হৃদয়কে আলোকিত করে, তথায় নিজের সেবাপরতার দ্বারা ভগবানের আনন্দবিধানই সেবকের কার্য্য। ব্রজের অপ্রাকৃত গোপীগণের যে বেশভূষা ধারণ, তাহা কৃষ্ণের আনন্দ-বিধানের জন্যই। কৃষ্ণ যাহাতে আনন্দিত হইবেন তাহা পরিত্যাগ করিবার ফল্গুত্ব কখনই তাঁহাদের হৃদয়ে স্থান পাইতে পারে না। তাঁহারা যে কৃষ্ণের জন্য পাগলিনী, তাহা কৃষ্ণের সেবা করিবার জন্যই। তাঁহারা যে নির্ণিমেষ-নেত্রে কৃষ্ণের মুখারবিন্দের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকেন, তাহাও কৃষ্ণের আনন্দ-বিধানের জন্যই। গোপীগণ কৃষ্ণকে দর্শন করিতেছেন—ইহা দেখিয়া কৃষ্ণ আনন্দিত হন, ইহা জানিয়াই গোপীগণ কৃষ্ণ-দর্শনের জন্য একান্ত তৎপরা। এখানেও বস্তুতঃপক্ষে তাঁহাদের কার্য্যটী দ্রষ্টার ভোগপর কার্য্য নহে। পক্ষান্তরে কৃষ্ণের 'দৃশ্য' হওয়া বা কৃষ্ণের আনন্দ-বিধানের জন্য নিজের সেবাপর স্বরূপটী দেখান। এইস্থানে 'দেখান' কথাটী অহঙ্কার-ব্যঞ্জক নহে, পক্ষান্তরে সেবার ঔজ্জ্বল্যেরই নিদর্শন-স্বরূপ।

তীর্থস্থানে লক্ষ-লক্ষ যাত্রী ভগবদ্দর্শনে যান, তন্মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি 'ভগবদ্দর্শন করিয়াছে' মনে করিয়াও ভগবদ্দর্শন হইতে অনন্ত-যোজন দূরে অবস্থিত। ভগবদ্দর্শন হইলে 'কাঠের ঠাকুর', 'মাটির ঠাকুর', 'পাথরের ঠাকুর', 'হস্ত-পদ-হীন জগন্নাথ',—এই প্রকার উক্তি প্রকাশিত হইত না। এইস্থানে ভোগ-তৎপরতা-ক্রমে 'দেখা'-কার্য্যটী —ভগবৎসেবকের নহে। ভগবদ্দর্শনের অন্তরায়-রূপে উক্ত 'দেখা' কার্য্য। অমানিশায় আচ্ছন্ন পথভ্রান্ত পথিককে উদ্ধার করিবার জন্য শ্রীগুরুপাদপদ্মের সতর্ক-বাণী—"জগতের

বহির্ম্মুখ বৃত্তি-জাত ভোগ-তৎপরতা লইয়া জগন্নাথকে দেখিতে যাইও না, জগন্নাথ যাহাতে আনন্দিত হন, সেইপ্রকার উপকরণ অর্থাৎ সেবা-বৃত্তি লইয়া শ্রীজগদীশের মন্দিরে যাইও। মনে রাখিও প্রাকৃত নয়ন-দ্বারা জগন্নাথকে দেখা-কার্য্যটি সেবকের নহে। সেবা-বৃত্তির স্বরূপ দেখানই—সেব্যের আনন্দ-বিধায়ক দৃশ্য হওয়াই সেবকের কার্য্য। ভগবান্‌কে দেখিয়া নিজের আনন্দ লাভ করা—সেবকের কার্য্য নহে। ভগবান্ আমাকে দেখিয়া আনন্দিত হইবেন, এই বিচারই সেবকের হৃদয়ে শোভা পাইয়া থাকে।"

—শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা ৭ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা।

গৌড়ীয়ের ষোড়শ বর্ষ

'শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা' বিশুদ্ধ গৌড়ীয়। 'গৌড়ীয়'-শব্দের দ্বারা পঞ্চগৌড় বুঝাইলেও বাংলাদেশই তাহার রূঢ়ি। তথাপি বাংলাদেশ বলিতেও যাহা আমরা সাধারণতঃ বুঝিয়া থাকি, গৌড়ীয় বলিতে তাহার শীর্ষদেশকে লক্ষ্য করে। 'গৌড়ীয়' বলিতে গৌড়-দেশীয় কোন বস্তু বা ব্যাপারকে বুঝায়। কিন্তু 'গৌড়ীয়'-শব্দটী কোন দেশ, কাল বা পাত্রকে না বুঝাইয়া তাহার অতীত কোন এক বিশুদ্ধসত্ত্বময় তত্ত্বকে লক্ষ্য করে। ভ্রান্তগণকে বিশুদ্ধসত্ত্বময়-তত্ত্ব বুঝাইতে হইলেও নির্গুণ-শব্দ-ব্যতীত অন্যকোন শব্দ বেদ বা বেদানুগ শব্দশাস্ত্রে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সাধারণ অপ্রাকৃত বিশেষত্বপূর্ণ নির্ব্বিশেষ বিচারকে নৈর্গুণ্য বা ব্যতিরেক ধারণায় বস্তুজ্ঞান করা যাইতে পারে। নির্গুণ বলিতে প্রাকৃত-গুণাতীত বা গুণসাম্য অথবা প্রকৃত সর্ব্বগুণসমষ্টি বুঝাইয়া থাকে। 'গৌড়ীয়'-শব্দ সেইপ্রকার পার্থিব ভাষা-মন অতিক্রম করিয়া নির্গুণ-স্বরূপ গুণের চরম অবস্থাকেই লক্ষ্য করে। তাই শ্রীবেদান্ত সমিতির মুখপত্র 'শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা' বিশুদ্ধ গৌড়ীয়।

স্বয়ং ভগবান্ গৌরসুন্দর সমগ্র অবতারের অবতারি-স্বরূপে বর্ত্তমান গঙ্গার পূর্ব্ব পারে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার অনুগত জনগণের দ্বারা জানাইয়াছেন,—"ন **ধর্ম্মং** নাধর্ম্মং শ্রুতিগণ-নিরুক্তং কিল কুরু" (দাসগোস্বামিকৃত মনঃশিক্ষা) ; সুতরাং গৌড়ীয়ের অপ্রাকৃত শিক্ষা শ্রুতিগণ-নিরুক্ত ধর্ম্মশিক্ষায় আবদ্ধ নহে। এমন কি, ভক্তরাজ কুলশেখরও উক্ত শ্রৌতধর্ম্মে অনাস্থা স্থাপন করিয়া বলিয়াছেন,—"নাস্থা **ধর্ম্মে** ন বসুনিচয়ে"। যাহারা বৈদিক ধর্ম্মের প্রচারক বলিয়া চীৎকার করিতেছেন, বিশুদ্ধ গৌড়ীয়গণ তাহাদিগকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত গৌড়ীয়-ধর্ম্মের সর্ব্বনিম্নতম স্তরেও অধিষ্ঠিত নহেন বলিয়া বিশ্বাস করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উন্নতোজ্জ্বলরসে পরাকাষ্ঠা লাভ না করা পর্য্যন্ত ধর্ম্ম অধর্ম্ম-

পর্য্যায়ে পর্য্যবসিত। সেইরূপ ধর্ম্মের অনুশীলনে পরাৎপর মোক্ষের কোন কথা-পরিদৃষ্ট হয় না। এই শ্রেণীর ধর্ম্মের ফল মোক্ষ নহে অথবা এইরূপ ধর্ম্ম যে কল্পিত মোক্ষ আনয়ন করিয়া থাকে, সেই মোক্ষ গৌড়ীয়গণের প্রচার্য্য বা গ্রহণীয় নহে। সমগ্র বিশ্ব যে ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গ লইয়া জীবন অতিবাহিত করিতেছে, বিশুদ্ধ গৌড়ীয়গণ তাহাদের মস্তকে পদক্ষেপ করিয়া ঝম্প দিয়া তদপেক্ষা উন্নততম স্থানে অধিরোহন করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা—মোক্ষ-ধিক্কারকারিণী। মোক্ষের স্বরূপ শ্রীমন্মহাপ্রভু যাহা শিক্ষা দিয়াছেন, শ্রীমধ্ব প্রভৃতি আচার্য্যবর্গ পূর্ব্ব হইতেই তাহার প্রতিধ্বনি করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। চারি সম্প্রদায়ের অন্যতম ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ে শ্রীমন্মহাপ্রভু আবির্ভাব-লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার প্রধান কারণ—ব্রহ্মসংহিতায় কৃষ্ণভক্ত ব্রহ্মা স্বয়ং বলিয়াছেন—"**ধর্ম্মান**ন্যান্ পরিত্যজ্য মামেকং ভজ বিশ্বসন্।" (ব্রহ্মসংহিতা ৫।৬১) —এই উক্তি তাঁহার প্রভু স্বয়ং কৃষ্ণের উক্তিরই প্রতিধ্বনি। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় তাঁহার সখা অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া শিক্ষা দিয়াছেন—"**সর্ব্বধর্ম্মান্** পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" (গীঃ ১৮।৬৬)। এতদ্ব্যতীত শ্রীমদ্ভাগবতেও নবযোগেন্দ্র উপাখ্যান-প্রসঙ্গে দেখা যায়,— "**ধর্ম্মান্** সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ" (ভাঃ ১১।১১।৩২)—এস্থলে বিচার্য্য এই যে, লোকাচারবশতঃ বেদই একমাত্র প্রমাণ, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাই বলিয়া বেদের পূর্ব্বপক্ষ অংশ সাধারণ জীবের লৌকিক মঙ্গলকর হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা প্রমাণ বলিয়া স্বয়ং ব্রহ্মা স্বীকার করেন নাই। চতুর্ম্মুখ স্বয়ং তাঁহার মুখচতুষ্টয় হইতে কৃষ্ণেচ্ছাক্রমে ঋক্-যজু-সাম-অথর্ব্ব—এই চারি-বেদ প্রকাশ করেন। তিনি ব্রহ্মসংহিতায় বলিয়াছেন,—**অন্য সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া** বিশ্বাসপূর্ব্বক আমার ভজন কর। বেদের বিভাগকর্ত্তা বেদব্যাস পঞ্চমবেদ মহাভারত রচনা করিয়া তাহার ভীষ্মপর্ব্বে গীতায় বলিয়াছেন—**সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া** আমারই শরণ গ্রহণ কর এবং শাস্ত্র-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতেও নিমিরাজের বৈদিক যজ্ঞাদি ধর্ম্মানুষ্ঠান বন্ধ করাইয়া শিক্ষা দিয়াছেন,—বৈদিক ধর্ম্মশাস্ত্রে ভগবানের উক্তিস্বরূপ ধর্ম্ম বলিয়া যাহা আদিষ্ট হইয়াছে তাহা বিচারপূর্ব্বক সেইসকল **ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সম্যগ্‌রূপে ত্যাগ করিয়া** যিনি আমার ভজন করেন, তিনি সমস্ত সৎ অর্থাৎ সাধুগণের মধ্যে তম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ।

ব্রহ্মা এবং বেদব্যাস—যাঁহাদের দ্বারা বেদ এই ভৌতিক জগতে স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন, সেই বেদের অভিজ্ঞাতা বলিতে তাঁহারাই দুইজন। তাঁহারা বেদ-সম্বন্ধে সর্ব্বতোভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া তাঁহাদের স্বরচিত বিভিন্ন গ্রন্থে যে-মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই বেদের সার। তাহা ব্যতীত অন্য অংশ লইয়া চীৎকারকারী বৈদিকগণ অসার বলিয়া গৃহীত হইবেন। একলক্ষ শ্লোকে বেদের পরিসমাপ্তি। তন্মধ্যে অশিতি সহস্র শ্লোকই পূর্ব্বকথিত পূর্ব্বপক্ষ অংশ। বেদের পূর্ব্বপক্ষ অংশকে সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করিলে বৈদিকগণের মঙ্গল কোথায়? বেদের এই গূঢ় রহস্য ব্রহ্মা

এবং বেদব্যাসই সকলকে তারস্বরে ব্যক্ত করিয়াছেন। আমরা এইজন্যই ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া বেদব্যাসের আনুগত্য করিতেছি। বেদের মধুপুষ্পিত উক্তিগুলি লইয়া ধর্ম্ম ও কর্ম্মমার্গে বিচরণশীল ব্যক্তিগণের পক্ষে গৌড়ীয় কোনরূপ সহায়তা করে না।

"পৃথিবীতে যত কথা ধর্ম্ম-নামে চলে। ভাগবত কহে তাহা পরিপূর্ণ ছলে॥" শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের এই শিক্ষা গৌড়ীয়ের হৃদয়ের ধন। শ্রীমদ্ভাগবতও এই কথাই বলিয়াছেন যে, যদি ধর্ম্ম পালন করিতে হয় তবে সেই ধর্ম্মই পালন করা কর্ত্তব্য, যাহা কৈতব বা ছলনাশূন্য—"ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত-কৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাম্" (ভাঃ ১।১।২)। সুতরাং গৌড়ীয় সর্ব্বোচ্চ-কণ্ঠে নির্ম্মৎসর সাধুগণের উপজীব্য প্রোজ্ঝিতকৈতব ধর্ম্ম একপাদরূপে আলোচনা করিবেন।

সমগ্র বিশ্বের আচার্য্যকুল-মুকুটমণি শ্রীল রূপপাদ যে নির্ম্মৎসর সাধুগণের চৌষট্টি (৬৪) প্রকার ভক্তিবৃত্তির বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহা গৌড়ীয়ের ষোড়শ বর্ষে ষোল কলায় পূর্ণ হইতে চলিয়াছে। ভক্তির চৌষট্টি (৬৪) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিচারই বেদের গুহ্যতম উপাসনা তত্ত্ব। ইহা বেদের চরমে বিংশতি সহস্র শ্লোকে ইঙ্গিত করা আছে। ৬৪ প্রকার অঙ্গ ১৬ কলায় পূর্ণ, অন্যপক্ষে ৬৪ প্রকার অঙ্গই সংক্ষিপ্ত আকারে একপাদ বিভূতি-স্বরূপ ভক্তির ষোড়শাঙ্গে প্রকাশিত দেখা যায়। ভক্তিবৃত্তি ত্যাজ্য ও গ্রাহ্যভেদে বাহ্যদৃষ্টিতে ভেদ লক্ষিত হইলেও অন্তর্দৃষ্টিতে উহা একায়ন-পদ্ধতি। অনুকূল-অনুশীলন ও প্রতিকূল-ত্যাগ যুগপৎ একই ভক্তি-বৃত্তির অন্তর্গত। যে অনুকূল-বৃত্তি গ্রহণ করিতে "উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাৎ" প্রভৃতি ৬টী বৃত্তি সমাদরের সহিত আলিঙ্গন করিতে হয়, ঠিক সেইপ্রকার অর্থাৎ ৬ প্রকারেই ত্যাজ্য বৃত্তিগুলিও পরিত্যাগ করিতে হয়। শ্রীল রূপপাদের গ্রাহ্য ও ত্যাজ্যবৃত্তি সমপর্য্যায়েই সেবকগণ গ্রহণ করিয়া থাকেন। ত্যাজ্য-বৃত্তি যেরূপ উৎসাহের সহিত পরিত্যাগ করিতে হয়, গ্রাহ্য-বৃত্তিও তদ্রূপ উৎসাহের সহিত গ্রহণ করিতে হয়। ৬৪ প্রকার ভক্ত্যঙ্গ নবধা ভক্তিতে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে, সঙ্কুচিত হয় নাই। আবার নবধা ভক্তি আণবিক বিস্ফোরণ-যন্ত্রের ন্যায় একমাত্র কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিতে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে—সঙ্কুচিত হয় নাই। একের মধ্যে বহুত্বের বিস্তৃতি দর্শন-শাস্ত্রের সার। ইহার উপলব্ধির অভাবে অপসাম্প্রদায়িক চিন্তাধারার উৎপত্তি হইয়াছে। চৌষট্টি সংখ্যার একপাদে ষোড়শ সংখ্যা পরিলক্ষিত হইলেও ষোড়শ সংখ্যাই অর্থাৎ পূর্ণ সংখ্যার বিস্তৃতি একপাদেই সম্পূর্ণ পরিলক্ষিত হইবে। "একমেবা-দ্বিতীয়ম্" বাক্য অনন্তকোটী সাংখ্য-তত্ত্বের বিস্তৃতি, সঙ্কোচ নহে।

—শ্রীগৌঃ পত্রিকা ১৬শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা।

সম্প্রদায়-বিজ্ঞানপর প্রবন্ধ—

গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীবলদেব

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর আলোচনা করিতে গেলে সর্ব্বপ্রথমেই তাঁহার কৃত বেদান্ত-ভাষ্য—শ্রীগোবিন্দ ভাষ্যের কথা স্মৃতিপটে জাগরিত হয়। তাঁহার ভাষ্যই তাঁহাকে চারি-সম্প্রদায় বৈষ্ণবের মধ্যে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে। এমন কি চারি সৎসম্প্রদায় ব্যতীত অন্যান্য প্রধান দার্শনিক সম্প্রদায়গুলিও আচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণের কথা স্মরণ করিয়া থাকেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত বৈষ্ণবগণের ত' কথাই নাই, প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ই তাঁহার প্রতিভার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া থাকেন।

সৎ ও অসৎ সম্প্রদায়

শ্রীশ্রীভগবানের শক্ত্যাবেশাবতার শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ণ ব্যাস তাঁহার স্বরচিত পদ্মপুরাণ শাস্ত্রে লিখিয়াছেন,—"সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ।" অর্থাৎ সম্প্রদায়বিহীন যে-সমস্ত মন্ত্র বর্ত্তমান যুগে পরিদৃষ্ট হইতেছে, তৎসমুদয়ই ফলপ্রদ নহে। এইস্থলে 'মন্ত্র'-শব্দের দ্বারা প্রণব ও স্বাহা-পুটিত দীক্ষামন্ত্র অথবা তদনুকূল শিক্ষাসমূহকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। সাম্প্রদায়িক শিক্ষা ব্যতীত অসাম্প্রদায়িক শিক্ষার প্রতিষ্ঠা নাই। বর্ত্তমান যুগে যে সাম্প্রদায়িকতার কুৎসিৎ চিন্তা প্রচলিত হইয়াছে ও হইতেছে তাহার সহিত শাস্ত্রোক্ত সাম্প্রদায়িকতার প্রচুর পার্থক্য আছে। একপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা লোককে অধঃপাতিত করে, অন্যপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা পতিত জীবকে উদ্ধার করিয়া সর্ব্বোত্তম স্থানে সমাসীন করায়। যাহারা সৎসম্প্রদায় স্বীকার করিতে অক্ষম, তাহারা সৎ-সম্প্রদায় হইতে পৃথক্ করিয়া অসৎ-সম্প্রদায়ের প্রশ্রয় দিতেছেন। এইরূপ অসৎ-সম্প্রদায়ের গণ্ডির মধ্যে বহু প্রতিমা দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারাও প্রত্যেকে অসৎ কার্য্যের প্রশ্রয় দিবার জন্য এক একটী সম্প্রদায় সংগঠন করিয়াছেন। এই প্রকার অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায়-সমূহের গণ্ডিগুলি যতই উৎসাদিত হইবে ততই জগতের মঙ্গল।

গলতাগাদীতে সৎ-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা

সৎ-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব, গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় যে প্রকৃত সৎ-সম্প্রদায় তাহা গলতার গাদীতে স্থাপন করেন। গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি তাঁহার মূল-পুরুষ শ্রীবলদেবের বিচার-বিজয়-বৈজয়ন্তী-ক্ষেত্র জয়পুরের নিকটবর্ত্তী গলতা পাহাড় শ্রীদ্বারকাধাম পরিক্রমাকালে সমস্ত ভক্তমণ্ডলীকে প্রদর্শন করাইয়াছেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন

এই গলতা পাহাড়েই তিনি রামানন্দী, শাঙ্কর, শৈব প্রভৃতি বহু ধর্ম্মযাজী পণ্ডিতগণের নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদর্শিত পথই যে সর্ব্বোত্তম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাহা শাস্ত্রযুক্তির দ্বারা স্থাপন করেন। বিচারে পরাস্ত হইয়া যাবতীয় ধর্ম্মসাম্প্রদায়িকগণ পদ্মপুরাণের উক্ত প্রমাণের দ্বারা তাঁহাকে আক্রমণ করেন। তাঁহারা বলিতে চাহিয়াছিলেন যে শ্রীমন্মহাপ্রভু শাস্ত্রোক্ত কোন সম্প্রদায় স্বীকার না করায় বলদেবের প্রদর্শিত বিচারযুক্তি যতই অকাট্য হউক না কেন উহা নিস্ফল বলিয়া গণ্য হইবে। আচার্য্য বলদেব তাঁহাদের এই উক্তির নিস্ফলতা প্রদর্শনকল্পে কয়েকদিনের মধ্যে বেদান্তের ভাষ্য রচনা করেন। এই সম্পর্কে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজে বলদেবের অলৌকিক শক্তির পরিচয়-সম্বন্ধে বহু ইতিহাস প্রচলিত আছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ মধ্ব-সম্প্রদায় ভুক্ত

শ্রীবলদেবই সেই সময় গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে ব্যাসোক্ত চারি সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ব্রহ্ম-মাধ্ব-সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া বিশ্ববাসীকে জানাইয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে বলদেবের এই বিচারের পূর্ব্বেও গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় মধ্ব-সম্প্রদায়ের একটী শাখাস্বরূপ বিবেচিত হইত। কারণ শ্রীমন্মহাপ্রভুই মধ্ব-সম্প্রদায়ের জনৈক আচার্য্য শ্রীশ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদকে আচার্য্য স্বীকার করিয়া তাঁহার অনুগত সম্প্রদায়কে শিক্ষা দিয়াছেন যে তাঁহারা সকলেই মধ্বসম্প্রদায়-ভুক্ত। আচার্য্য বলদেব আমাদিগকে যে-গুরুপরম্পরা শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুরই প্রদর্শিত পরম্পরা। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত আলোচনা করিলেও ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারা যায়। নিম্নে বলদেব-প্রদর্শিত শ্রীগুরু-পরম্পরা পাঠকবর্গের অবগতির জন্য প্রদত্ত হইল।

শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্ম-দেবর্ষি-বাদরায়ণ-সংজ্ঞকান্।
শ্রীমধ্ব-শ্রীপদ্মনাভ-শ্রীমন্নৃহরি-মাধবান্॥

অক্ষোভ্য-জয়তীর্থ-শ্রীজ্ঞানসিন্ধু-দয়ানিধীন্।
শ্রীবিদ্যানিধি-রাজেন্দ্র-জয়ধর্ম্মান্ ক্রমাদ্বয়ম্॥

পুরুষোত্তম-ব্রহ্মণ্য-ব্যাসতীর্থাংশ্চ সংস্তুমঃ।
ততো লক্ষ্মীপতিং শ্রীমন্মাধবেন্দ্রঞ্চ ভক্তিতঃ॥

তচ্ছিষ্যান্ শ্রীশ্বরাদ্বৈত-নিত্যানন্দান্ জগদ্গুরূন্।
দেবমীশ্বরশিষ্যং শ্রীচৈতন্যঞ্চ ভজামহে।
শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদানেন যেন নিস্তারিতং জগৎ॥ —প্রমেয় রত্নাবলী

শ্রীবলদেব রূপানুগ বৈষ্ণব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সহিত শ্রীগৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য বলদেবের যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ তাহা বলা বাহুল্য। বলদেবের আচার-বিচার ও ভজন-পদ্ধতি সর্ব্বতোভাবেই শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি অঙ্গীকার করিয়াছেন। যেহেতু বলদেব রূপানুগ বৈষ্ণব। তাঁহার রূপানুগত তাঁহার বিবিধ গ্রন্থ হইতে প্রচারিত আছে। যাঁহারা শ্রীবলদেবকে রূপানুগ বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত, তাঁহারা প্রকৃতই ভ্রান্ত ও বৈষ্ণব-অপরাধী। এমন কি তাঁহারা সম্প্রদায়-অনুগত গুরুপরম্পরায় গুর্ব্বানুগত্য ত্যাগ করিয়া শ্রীবলদেবের নাম উল্লেখ করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছেন। এরূপ অসৎ সম্প্রদায়কে—'কর্ত্তাভজা', 'কিশোরী-ভজা' বা 'ভজন-খাজা' সম্প্রদায় বলিয়া আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে।

শ্রীবলদেবের আবির্ভাব-কাল

শ্রীল বলদেবের আবির্ভাব-কাল সম্বন্ধে সুস্থির সিদ্ধান্তে আমরা এখনও উপনীত হইতে পারি নাই। তবে শ্রীল রূপ-গোস্বামীর সঙ্কলিত স্তবাবলীর টীকা প্রণয়নের কাল নিরূপণ করিতে গিয়া তিনি স্বয়ং ১৬৮৬ শকাব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাতে মনে হয় বর্ত্তমান সময়ের কিঞ্চিদূর্দ্ধ দুইশত বৎসর পূর্ব্বে তিনি ভৌম জগতে প্রকট ছিলেন। সেই সময়ে শ্রীশ্রীমদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বর্ত্তমান ছিলেন। আচার্য্য বলদেব তাঁহাকে তাঁহার শিক্ষাগুরু-রূপে বরণ করিয়াছিলেন। বলদেবের পাঞ্চরাত্রিক গুরু-পরম্পরা প্রদর্শন-কালে আমরা এই সম্বন্ধে আরও কিছু আলোচনা করিব।

শ্রীবলদেবের জাতি ও জন্মভূমি

শ্রীবলদেব গৌড়দেশ অর্থাৎ বাঙ্গলা দেশের উপকণ্ঠে উৎকল দেশে বালেশ্বর জেলার উপরিভাগের অন্তর্গত রেমুণার নিকটবর্ত্তী একটী পল্লীগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। উৎকল দেশে জন্মগ্রহণ করিলেও বলদেব কোনদিনই কোনপ্রকার প্রাদেশিকতার কালিমার প্রশ্রয় দেন নাই। শৌক্র-বৈশ্যকুলে উদ্ভূত বলিয়া তাঁহাকে কেহ বৈশ্য বলিয়া মনে করিতেন না। তিনি কৃষিজীবি খণ্ডাইৎ জাতির মধ্যে জন্মগ্রহন করিয়াও ব্রাহ্মণ-কুল-তিলক বৈষ্ণবাচার্য্য বলিয়া জগতে বিখ্যাত হইয়াছেন এবং বহু শৌক্র-ব্রাহ্মণ তাঁহার পদাবলেহন করিয়া শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাকে কেহই ব্রাহ্মণেতর কুলোদ্ভব বলিয়া অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন নাই। তিনি তাঁহার নিজের জীবনের দ্বারা জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন—

"যে তে কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নয়।
তথাপিহ সর্ব্বোত্তম সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥

কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই 'গুরু' হয় ॥—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত

শ্রীগীতাশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্ম-বিভাগশঃ।" অর্থাৎ গুণ ও কর্ম্মানুসারে স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র চারিটী বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছেন। ভাষ্যকার বলদেব নিজে আচরণ করিয়া এই সমস্ত শাস্ত্রবাক্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন, এমন কি তাঁহার বর্ণের মধ্যে অনেকেই আজও উপনয়ন-সংস্কার গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন।

শ্রীবলদেব দৈববর্ণাশ্রম প্রতিষ্ঠার অন্যতম আদর্শ

শ্রীল প্রভুপাদ এ-সম্বন্ধে আমাদিগকে যাহা জানাইয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল—"যে-সকল মতিচ্ছন্ন শৌক্রকুলোদ্ভূত ব্রাহ্মণব্রুব "যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্। স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ ॥"—এই স্মৃতি-বাক্য গোপন করিয়া আপনাদিগকে 'ব্রাহ্মণ-ব্রুব'-সংজ্ঞায় প্রচলিত করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারাই বলিয়া থাকেন যে ব্রাহ্মণ-ব্রুবেতর কুলে বৈষ্ণবাচার্য্যের জন্মগ্রহণ, বিদ্যাভূষণাদি সংজ্ঞা-গ্রহণ বা শ্রুত্যাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন সম্ভব নহে। তাঁহাদের ঐতিহ্যজ্ঞানের দরিদ্রতা নিতান্ত শোচনীয়। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ই এই কল্পিত যুক্তির বিভঞ্জনকারী। বৃত্ত-ব্রাহ্মণ হইতেই শৌক্র ব্রাহ্মণকুল উদ্ভূত হইয়া মন্বাদি-প্রচলিত স্মার্ত্তধর্ম্ম গ্রহণ করেন। গীতাশাস্ত্র এইসকল মতবাদের বিরোধী বৃত্ত-বর্ণেরই পক্ষ গ্রহণ করিয়াছেন। মহাভারতের স্থানে স্থানে, শ্রীমদ্ভাগবত ও তদনুগ গোস্বামি-গ্রন্থ, আগম-প্রামাণ্য ও নারদাদি পঞ্চরাত্র, রামার্চ্চন-চন্দ্রিকা প্রভৃতি পদ্ধতি-গ্রন্থের আলোচনাভাবে বঙ্গীয় স্মার্ত্তকুল শ্রৌত-পথের অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। শ্রীঠাকুর নরোত্তম, শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীহরিদাস ঠাকুর প্রভৃতি আচার্য্যকুল বহির্ম্মুখ অক্ষজবাদীর তর্কপথ-কুঞ্জর-দন্ত ভগ্ন করিয়া দিয়াছেন। শ্রৌতপন্থা ভক্তি-পথেরই নামান্তর। তর্কপন্থা বহির্ম্মুখ নাস্তিক সম্প্রদায়ের বাসনামূলে জাত।"

শুদ্ধ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ও একাকারত্ব এক নহে

তর্কপথের পথিকগণ সুবিধাবাদী। তাঁহারা স্ব স্ব বংশ-মর্য্যাদার অযথা বহুমানন করিবার জন্য শাস্ত্রযুক্তিকে উল্লঙ্ঘন করিতে বিন্দুমাত্র পশ্চাৎপদ নহেন। ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর উদার-নীতি অনুসারে সমাজ সংগঠিত হইলে জগতের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে। বর্ত্তমান সমাজ আপন আপন শৌক্র-পারম্পর্য্য অবলম্বন করিয়া যে বংশ-মর্য্যাদা স্থাপন করিতেছেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে শাস্ত্রকারগণের অভিপ্রেত নহে। বর্ত্তমান যুগের রাজনৈতিকগণও ইহার উৎসাদন-কল্পে যত্নবান্ হইতেছেন। প্রকৃত শাস্ত্রানুগত সমাজ সংগঠিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। অশাস্ত্রীয় ও উচ্ছৃঙ্খল একাকারত্ব জগতের মঙ্গল আনয়ন করিবে না।

ভাষ্যকারের গুরুপরম্পরা

ভাষ্যকারের গুরুপরম্পরা বিচার করিলে আমরা যে ঐতিহাসিক সত্য উপলব্ধি করি তাহা সংক্ষেপে আপনাদের নিকট বর্ণনা করিতেছি—তিনি প্রথমতঃ বিরক্ত-শিরোমণি পিতাম্বর দাসের নিকট ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়নে বিশেষ নৈপুণ্য লাভ করেন। পরে **রাধা-দামোদর দাস** নামক একজন কান্যকুব্জবাসী শৌক্র ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভূত বৈষ্ণবের নিকট পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষায় দীক্ষিত হন। শ্রীরাধা-দামোদর বেদান্ত-স্যামন্তকের **লে**খক এবং রসিকানন্দ মুরারীর পৌত্র। তিনি অপর একজন কান্যকুব্জীয় ব্রাহ্মণ **শ্রীনয়নানন্দদেব গোস্বামীর** নিকট দীক্ষালাভ করিয়াছিলেন। **রসিকানন্দ প্রভু** ভাষ্যকারের পাঞ্চরাত্রিক গুরুপারম্পর্য্যে চতুর্থ পূর্ব্বপুরুষ। রসিকানন্দ প্রভু **শ্রীশ্যামানন্দের** শিষ্য। পূর্ব্বে যে নয়নানন্দ দেব গোস্বামীর উল্লেখ করিয়াছি তিনি রসিকানন্দ প্রভুর পুত্র। শ্যামানন্দের গুরু **গৌরীদাস পণ্ডিত।** শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু গৌরীদাস পণ্ডিতকে কৃপা করিয়াছিলেন। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু আচার্য্য হৃদয় চৈতন্যের শিষ্য হইলেও পরবর্ত্তীকালে শ্রীজীব গোস্বামীর শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীরূপপাদের শিষ্য এবং রূপপাদ শ্রীসনাতনের শিষ্য। শ্রীসনাতন শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত সহচর।

ভাষ্যকারের শিষ্যপরম্পরা

শ্রীমন্মহাপ্রভু হইতে ভাষ্যকার বলদেব বিদ্যাভূষণ পর্য্যন্ত পাঞ্চরাত্রিক পরম্পরার উল্লেখ করিলাম। উদ্ধবদাস, কোথাও বা উদ্ধরদাস নামে ভাষ্যকারের শিষ্যরূপে উল্লেখ দেখা যায়। কাহারও মতে উহারা পৃথক্ ব্যক্তি। সে যাহাই হউক না কেন, উদ্ধবদাসের শ্রীমধুসূদন দাস নামে এক শিষ্য ছিলেন। শ্রীজগন্নাথ তাঁহারই শিষ্য। যিনি সিদ্ধ জগন্নাথ দাস নামে কিছুদিন পূর্ব্বে মাথুরমণ্ডল, ক্ষেত্রমণ্ডল ও গৌড়মণ্ডলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের আসন অধিকার করিয়াছিলেন। এই সিদ্ধ জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজকেই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ভাগবত-পারম্পর্য্যমতে ভজন-শিক্ষায় গুরুপদে বরণ করিয়াছিলেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সার্ব্বভৌম জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের নির্দ্দেশানুসারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান প্রকাশ করেন। শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের ভজন-গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ। গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ মদীয় গুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরকে দীক্ষামন্ত্রাদি প্রদান করিয়া শিষ্যত্বে বরণ করেন। এই পারম্পর্য্য যাঁহারা স্বীকার করিতে অক্ষম তাঁহারা তোতারাম বাবাজী মহারাজের উল্লিখিত তের অপসম্প্রদায়ের মধ্যে পরিগণিত অথবা চতুর্দ্দশ অপসম্প্রদায়ের উৎপত্তিকর্ত্তা।

পাঞ্চরাত্রিক-পারম্পর্য্য ও ভাগবত-পারম্পর্য্য

উল্লিখিত গুরুপরম্পরা হইতে আমরা দেখিতেছি শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত শ্যামানন্দ পরিবারভুক্ত। আচার্য্য শ্যামানন্দ শ্রীজীব গোস্বামীর আনুগত্য স্বীকার করায় এবং শ্রীজীব একান্ত রূপানুগ বিধায় শ্রীবলদেবও রূপানুগ বৈষ্ণব। যাঁহারা শ্রীবলদেবকে রূপানুগ মনে না করিয়া শ্যামানন্দ পরিবারভুক্ত বলিয়া উন্নত-উজ্জ্বল রসের পরমোচ্চতম সেবা-ভাগের অধিকারী নহেন বলিয়া মনে করেন তাঁহারা প্রকৃতই ভ্রান্ত ও অপরাধী। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ শ্রীরাধাদামোদর দাসের নিকট পাঞ্চরাত্রিক-দীক্ষায় দীক্ষিত হইলেও শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের নিকট শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্রের শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। **পাঞ্চরাত্রিক-পারম্পর্য্য ব্যতীত ভাগবত-পারম্পর্য্যের শ্রেষ্ঠত্ব আছে। ভাগবত-পারম্পর্য্য ভজন-নিষ্ঠার তারতম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভাগবত-পারম্পর্য্যে পাঞ্চরাত্রিক-পারম্পর্য্য অনুস্যূত থাকে বলিয়া ভাগবত-পারম্পর্য্যেরই মাধুর্য্য ও শ্রেষ্ঠত্ব। ইহাতে কালগত ব্যবধান থাকে না। শুদ্ধ-ভক্তির বিচারে পাঞ্চরাত্রিক এবং ভাগবত-সম্প্রদায় উভয় মতই একার্থ-প্রতিপাদক।** চৈতন্যচরিতামৃত বলেন,—'পঞ্চরাত্রে, ভাগবতে এই লক্ষণ কয়।'—(মধ্য-১৯।১১৯)। প্রাকৃত সাহজিক সম্প্রদায় যেরূপ 'শ্রীরূপগোস্বামীর অনুগত জন' পরিচয় দিয়া আচার্য্য শ্রীজীবের চরণে অপরাধরাশি সঞ্চয় করেন, অধুনাতন জাতি-গোস্বামীকুলের উচ্ছিষ্টভোজী কতিপয় সহজিয়া, 'কর্ত্তাভজা', 'কিশোরীভজা' ও 'ভজন-খাজা' সম্প্রদায় চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের অনুগত অভিমানে ভাষ্যকার শ্রীবলদেবের প্রতি নানাপ্রকার অবজ্ঞাসূচক বাক্য প্রয়োগ করিয়া অত্যন্ত ঘৃণীত নরকগামী হইয়া থাকেন।

শ্রীবলদেবের গ্রন্থ-পরিচয়

শ্রীবলদেব ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য ব্যতীত বহু গ্রন্থের রচয়িতা ও টীকাকর্ত্তা। তিনি 'প্রমেয় রত্নাবলী' নামে একখানি স্বল্পায়তন গ্রন্থ রচনা করিয়া তাহাতে প্রভূত প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের জনৈক শিষ্য কৃষ্ণদেব এই গ্রন্থের একটী সংস্কৃত টীকা রচনা করিয়াছেন। বেদান্তাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের যে ভাষ্য রচনা করেন তাহার নাম 'শ্রীগোবিন্দ ভাষ্য'। স্বয়ং গোবিন্দদেব তাঁহাকে এই ভাষ্য রচনা করিতে প্রেরণা প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া এই ভাষ্যের নাম 'গোবিন্দভাষ্য'। যে-কালে রামানুজীয় মতাবলম্বিগণ জয়পুরে শ্রীগোবিন্দজীর মন্দির অধিকারপূর্ব্বক শ্রীগৌড়ীয়গণের বৈষ্ণবাধিকার খর্ব্ব করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তৎকালে শ্রীবলদেবই শ্রীচক্রবর্ত্তী প্রমুখ বৃন্দাবনবাসী প্রাচীন বৈষ্ণবগণের অনুমতিক্রমে জয়পুরে গিয়া তাঁহাদিগকে উক্ত গোবিন্দভাষ্যের বিচারের দ্বারা পরাজিত করেন। সেই জয়পুরেই শ্রীগোবিন্দদেবের নির্দ্দেশ-অনুসারে

গোবিন্দভাষ্য রচিত হয়। এই ভাষ্যের একটী টীকাও তিনি রচনা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত 'সিদ্ধান্ত রত্ন' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ঐ গ্রন্থের অপর নাম 'ভাষ্যপীঠক'। ইহারও একটা টীকা তাঁহার নিজেরই রচিত। এতদ্ব্যতীত 'সাহিত্য কৌমুদী' নামে একখানি অলঙ্কার-গ্রন্থ নির্ণয়-সাগর-যন্ত্রে কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে মুদ্রিত হইয়াছে। তাঁহার রচিত 'ব্যাকরণ কৌমুদী' নামে একখানি সংস্কৃত ব্যাকরণ গ্রন্থ অদ্যাপি মুদ্রিত না হইয়া বৃন্দাবনের শ্রীরাধারমন ঘেরায় রহিয়াছে। বলদেব তত্ত্বসন্দর্ভের একটী টীকা রচনা করিয়া প্রভূত পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার রচিত দশখানি উপনিষদ্-ভাষ্যের সকলগুলি পাওয়া না গেলেও ঈশাবাস্যের ভাষ্য কয়েকটী সংস্করণ বৈষ্ণব-করকমল বিভূষিত করিতেছে। 'সিদ্ধান্ত দর্পণ', 'কাব্য-কৌস্তুভ' নামক গ্রন্থসমূহ তাঁহার কৃতিত্বের পরিচয় দিতেছে। ভাষ্যকার গোপালতাপনী-ভাষ্য, কৃষ্ণানন্দিনী টীকা, ছন্দকৌস্তুভ, লঘুভাগবতামৃতের টীকা প্রভৃতি অনেকগুলি ব্যাখ্যা-গ্রন্থ রাখিয়া গিয়াছেন। শুনা যায় তাঁহার রচিত শ্রীমদ্ভাগবতের একটী টীকাও প্রচারিত ছিল। জয়দেবের চন্দ্রালোক নামক অলঙ্কার-গ্রন্থের টীকা ও শ্রীরূপের নাটকচন্দ্রিকার টীকা তিনি রচনা করিয়া বৈষ্ণব জগতে অলৌকিক পাণ্ডিত্য প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। ভাষ্যকারের রচিত-গ্রন্থের সংক্ষেপ পরিচয় প্রদান করিয়া অদ্য ক্ষান্ত হইতেছি।

—শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা।

প্রতিবাদমূলক প্রবন্ধ—

অপদেবতার উপদ্রব নিবারণ

'অবতারের উপদ্রব' প্রবন্ধের উৎপত্তি

সাউড়ী হইতে প্রকাশিত সজ্জন-সঙ্গিনী নামক একখানা অপাঠ্য, অশ্রাব্য, অশিক্ষা-কুশিক্ষা-প্রচারক গ্রাম্য-বার্ত্তাবহের ১৩৬০ সালের আষাঢ় সংখ্যার ১৬৫ পৃষ্ঠায় **'অবতারের উপদ্রব'** শীর্ষক একটী প্রবন্ধ আমরা পাঠ করিয়াছি। এই প্রবন্ধটী শ্রীযুত নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত বি, এ (?) মহাশয়ের লিখিত বলিয়া প্রকাশ। আমরা তাঁহার লিখিত উক্ত প্রবন্ধের শেষ অংশ হইতে কিয়দংশ পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিম্নে উদ্ধার করিতেছি—

"ভণ্ডামী প্রশ্রয় পেলেই বেড়ে যায়। সুতরাং দেশের হিতাকাঙ্ক্ষী সকলেরই এখন ভণ্ডামীর বিরুদ্ধে প্রচার করা দরকার। একটু ধর্ম্ম-বিশ্বাসে আঘাত দিতে হয় তা'ও ভাল, তবু ধর্ম্মজগতে যারা প্রবঞ্চনা ও প্রতারণা-দ্বারা পসার জমিয়ে অবতার সাজতে চায়,

তাদের ভণ্ডামীর মুখোষ ছিঁড়ে ফেলাই কর্ত্তব্য। অতিরিক্ত চক্ষুলজ্জায় অনেক সময় বহু অনর্থের উৎপত্তি হয়।"

উক্ত প্রবন্ধের চরমে (*) নক্ষত্র চিহ্ন দিয়া উক্ত পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় ঐ প্রবন্ধ-সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"হিন্দু সমাজ এবং হিন্দু ধর্ম্মকে তথা শুদ্ধা ভক্তিকে যিনি প্রাণাপেক্ষা ভালবাসেন তাঁহারই এই সত্যদ্রষ্টা মহাত্মার আহ্বানে সাড়া দেওয়া কর্ত্তব্য—সম্পাদক"।

সত্য-দ্রষ্টার (?) আহ্বানে সাড়া

উক্ত সম্পাদকীয় মন্তব্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমরা বলিতে চাই, "শুদ্ধা ভক্তিকে আমরা প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিতে চেষ্টা করিতেছি ; সুতরাং সম্পাদকের নির্দ্দেশ-অনুসারে 'সাড়া' দিতে প্রস্তুত হইলাম। কিভাবে সাড়া দেওয়া আবশ্যক, তাহা প্রবন্ধ-লেখক স্বয়ং যেরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আমরা তাহাই এস্থলে অবলম্বন করিব। আমরা ইহা স্বীকার করি যে—"অতিরিক্ত চক্ষুলজ্জায় অনেক সময় বহু অনর্থের উৎপত্তি হয়।" সুতরাং চক্ষু-লজ্জার 'মাথা খাইয়া' নির্লজ্জভাবেই 'সাড়া দেওয়া কর্ত্তব্য'। ইহা প্রকৃতই সত্য—'ভণ্ডামী প্রশ্রয় পেলে বেড়ে যায়' ; সুতরাং 'ভণ্ডামীর বিরুদ্ধে প্রচার করা দরকার'। প্রবন্ধলেখক গুপ্ত মহাশয় আরও লিখিয়াছেন—"একটু ধর্ম্মবিশ্বাসে আঘাত দিতে হয় তা'ও ভাল"। আমরা সর্ব্বতোভাবে এই কথার যদিও অনুমোদন করি না তথাপি তাহার এই প্রবন্ধের প্রতিবাদকল্পে ঐ প্রকার উক্তির কিছুটা স্বীকার করিয়া লইতে পশ্চাৎপদ হইব না। সুতরাং নিবারণ বাবুর 'ভণ্ডামীর বিরুদ্ধে প্রচার' করিতে গিয়া লেখকের 'ধর্ম্মবিশ্বাসে আঘাত' দেওয়া অথবা তাহার 'মুখোষ ছিঁড়িয়া' কোন উক্তি করিলে আমাদের কোন দোষ হইবে না। কারণ, নিবারণ বাবুর ও সম্পাদক মহাশয়ের পরামর্শ-ই এইপ্রকার। অতএব আমরা এইপ্রকার তিক্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে বাধ্য হওয়ায় পাঠকবর্গের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

বি, এ-পাশের বানান ভুল

এক্ষণে শ্রীযুত নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত বি, এ, মহাশয়ের নাম, ধাম, শিক্ষা প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। তিনি নিজেকে 'বি, এ' উপাধিধারী বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এই উপাধিটী প্রকৃত কি না—জানা আবশ্যক। কারণ, তিনি যে সমালোচনা-মূলক অবৈধ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহার বহু স্থলেই আমরা বানান ভুল লক্ষ্য করিতেছি। আমরা এস্থলে তাহার উল্লেখ করিলাম না। তিনি প্রকৃত শিক্ষিত লোক হইলে উহা স্বয়ংই ধরিয়া লইতে পারিবেন এবং বিনয়-সহকারে তাহা স্বীকার করিবেন। তিনি

এই বর্ণ-বিন্যাসের ভ্রমগুলি ধরিতে না পারিলে আমরা পরবর্ত্তী সংখ্যায় তাহার তালিকা প্রকাশ করিব।

নিবারণ বাবু 'অবতারের উপদ্রব'-সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহার আদি, মধ্য ও অন্ত সর্ব্বত্রই ভ্রমে পরিপূর্ণ। শুধু তাহাই নহে, প্রবন্ধ পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে ইহা হিংসা, দ্বেষ, প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, পাপ-প্রবৃত্তি প্রভৃতি নানাপ্রকার দোষদুষ্ট। ইহা বি, এ, পাশ করা শিক্ষিত লোকের লেখনী-নিঃসৃত প্রবন্ধ বলিয়া আদৌ মনে হয় না। ইহা কোনও গুপ্ত-লেখকেরই প্রবন্ধ হইবে। এক্ষণে আমরা 'অবতারের উপদ্রব' প্রবন্ধের আদ্যন্ত সমস্তই ভুল দেখাইবার উদ্দেশ্যে সর্ব্বপ্রথম শিরোনামারই আলোচনা আরম্ভ করিতেছি।

'অবতারের উপদ্রব'—এই শিরোনামায় আপত্তি

'অবতারের উপদ্রব'—এই শিরোনামাটী অশাস্ত্রীয়, অযৌক্তিক এবং অপসিদ্ধান্তমূলক। শাস্ত্র বলেন—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম।
ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥" (গীঃ- ৪।৭-৮)

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—যখন ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয় এবং অসুর ও অপদেবতাগণের অধর্ম্ম ও উপদ্রব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তখন আমি স্বয়ং শরীর পরিগ্রহ করিয়া অবতীর্ণ হইয়া থাকি ; অথবা আমার নিজ প্রিয়জনকেও অবতীর্ণ করাইয়া থাকি। শুদ্ধ-বৈষ্ণব-সাধুগণের পরিত্রাণ ও ইঁচড়েপাকা প্রাকৃত সহজিয়া প্রভৃতি দুষ্কৃতগণের বিনাশের জন্য এবং প্রকৃত সদ্ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে অবতার স্বীকার করিয়া থাকি। ইহাই হইল অবতারের আবির্ভাবের উদ্দেশ্য। সুতরাং দেখা যাইতেছে,—অবতারগণের আবির্ভাবে জগতে উপদ্রব বিদূরিত হয়—কিন্তু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। দৈব-ভাবাপন্ন সাধক ব্যক্তিমাত্রেরই অবতারের আবির্ভাবে আনন্দই লক্ষ্য করা যায় ; কিন্তু অসুর ও অপদেবতাগুলি তাহাতে প্রমাদ গণিয়া থাকে। এমন কি, আসন্ন বিপদ উপস্থিত মনে করিয়া নানাপ্রকার চীৎকার করিয়া থাকে। আমরা শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভাষায় বলিতে পারি, বিষ্ণু-বৈষ্ণবের অবতরণে ও তাঁহাদের শ্রীনাম শ্রবণে—"পলায় দুরন্ত কলি পড়িয়া বিভ্রাটে"। যাহারা কলির প্রধান চর বা কলিপঞ্চকের দাস, তাহারা ভগবানের নাম শ্রবণ করিলেই উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। কিন্তু বৈষ্ণবমাত্রই ভগবানের নাম শ্রবণ করিলে আনন্দিত হন এবং তাঁহাদের হৃদয়ে সাক্ষাৎ ভগবানের স্মৃতি জাগরিত হয়। সুতরাং **'অবতারের উপদ্রব'**—এই শিরোনামা যিনি, যাহার বা যে

দল স্বীকার করিবেন, তাহারা যে অপদেবতা বা দৈত্য-দানব—এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তজ্জন্য উক্ত শিরোনামার প্রতিবাদকল্পে আমরা এই প্রবন্ধের শিরোনামাটি শাস্ত্র ও যুক্তি সম্মত করিয়া **"অপদেবতার উপদ্রব নিবারণ"**—স্থির করিয়াছি। আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের এইরূপ শিরোনামার ইহা প্রথম কারণ। অন্যান্য কারণ পরে উপযুক্তক্ষেত্রে আরও প্রকাশ করিব।

বৈষ্ণবের নাম-করণে 'বি, এ,' পাশের বিচার

নিবারণ বাবু বৈষ্ণবের নামকরণে ভগবানের নাম উল্লেখ করায় ঘোরতর আপত্তি করিয়াছেন। আমরা দেখিতে পাই,—ভগবানের সহস্র সহস্র নামের মধ্যে যে-কোনও একটী নাম অঙ্গীকার করিয়া পিতা-মাতা তাঁহাদের পুত্রের নাম রক্ষা করিয়া থাকেন। ভগবন্নামের অনুকরণে যদি কেহ 'কৃষ্ণ', 'বিষ্ণু', 'রাম', নারায়ণ', 'সীতানাথ' প্রভৃতি নাম রাখেন, তাহা হইলে নিবারণ বাবুর তাহাতে বিশেষ আপত্তি ও ক্রোধের উৎপত্তি হইতেছে। এইরূপ আপত্তি কোন অপদেবতা ও দৈত্য-দানবের পক্ষেই সমীচীন—কোন ভদ্র-সন্তান বা সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী এইরূপ নাম-করণে আপত্তি করিতে পারেন না। খ্রীষ্টিয়ান, মুসলমান প্রভৃতি অবর হীন জাতির মধ্যে দেখা যায়, তাহারা হিন্দুর দেবতা-গণের নামের প্রতি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। সনাতন হিন্দুর মধ্যে এইরূপ আপত্তি অভিনব। নিবারণ বাবু বলিতে চাহেন—ভগবানের নামে যদি কেহ নাম রাখেন, তখনই তাহাকে অবতার করা হইল। তিনি লিখিয়াছেন—"কলিকাতার উপকণ্ঠে নাকি **অবতার কোম্পানীর** মেলা ব'সেছে, তা'র মধ্যে কেহ **নরসিংহের অবতার,** কেহ **কেশবের অবতার,** কেহ **নারায়ণের অবতার**, কেহ বা **বামন ও ত্রিবিক্রমের যুগ্ম অবতার।** অতএব কলির জীবের বর্ত্তমান জীবনেই অবতার দর্শন হবে।"

উল্লিখিত শ্লেষ-সূচক উক্তির দ্বারা নিবারণ বাবু বলিতে চাহেন—কাহারও নাম 'নরসিংহ' রাখিলে তিনি নৃসিংহদেবের অবতার হইবেন; কেশব রাখিলে কৃষ্ণের অবতার হইবেন; নারায়ন নামক ব্যক্তি সাক্ষাৎ নারায়ন হইয়া পড়িবেন; বামন, ত্রিবিক্রম প্রভৃতি নাম যেখানে দৃষ্ট হইবে, সেইখানেই তত্তৎ অবতার প্রকাশিত হইল বুঝিতে হইবে। নিবারণ বাবুর এইরূপ চিন্তাস্রোতের বা যুক্তির মূল্য কোন নিরক্ষর বালকও দিতে রাজী হইবে না। ধন্য তাঁহার বি, এ উপাধি! আবার তিনি নির্লজ্জের ন্যায় গৌরব করিয়া তাঁহার নামের পশ্চাতে বি, এ-উপাধিটী যোজনাও করিয়াছেন! লেখক যেমন **'গুপ্ত'**, ঐ উপাধিটীও তেমনই গুপ্ত রাখিলেই লোকে ভাল বলিত। অবশ্য আমরা তাঁহার গুপ্ত রহস্য ক্রমশঃ প্রকাশ করিব।

নিবারণবাবুর নিজের নামকরণ

আমরা পাঠকবর্গের নিকট নিবেদন করিতেছি যে,—নিবারণ বাবু বৈদ্যকুলে উদ্ভূত হইয়া নানাপ্রকার ব্যাধির চিন্তায় পুরুষানুক্রমে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এই ব্যাধিটী সাধারণ ব্যাধি নয়—ইহা ভব-রোগ বা জন্ম-রোগ। গুপ্ত মহাশয়ের জন্ম-কাহিনী সমাজে গুপ্ত থাকিলেও আমরা তাহা, আলোচনা করিবার পূর্ব্বে তাঁহার নামটী সম্বন্ধে প্রথমে বিচার করিব। নিবারণ বাবুর পিতা-মাতা পুত্রের নাম-করণ-কালে তাহার স্বভাব বিচার করিয়া নাম রাখিলেন—নিবারণ। কারণ যাহাতে তাঁহার বংশে ভগবৎ-স্মৃতি সমূলে নিবারিত হয়, তজ্জন্যই পুত্রের নাম কোনও দেবতার নামের সহিত মিল না রাখিয়া কেবল **'নিবারণ'** রাখিয়াছেন। সুতরাং সেই নিবারণ বাবুর পক্ষে ভগবন্নামে যে আপত্তি হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? 'নিবারণ'—এই নামটী অপদেবতা বা দৈত্য-দানব ব্যতীত কোন দেব-দ্বিজ বা ভগবদ্ভক্তের নাম নহে। আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের নামকরণ 'অপদেবতার উপদ্রব নিবারণ'—লিখিবার ইহা দ্বিতীয় কারণ।

'নিবারণ চন্দ্র'- শব্দের অর্থ

আমরা জিজ্ঞাসা করি—'নিবারন চন্দ্র' বলিতে কি বুঝায়? 'চন্দ্র'-শব্দের পূর্ব্বে 'নিবারণ'-শব্দ ব্যবহৃত হওয়ায় ইহা কতকটা 'নিবারিত' এই অর্থে-ই বিশেষণ-রূপে ধরা যাইতে পারে। তাহা হইলে 'নিবারিত চন্দ্র' বলিলে 'রাহু' ব্যতীত অন্য কি হইবে? 'চন্দ্র' যাহার দ্বারা আক্রান্ত হয় বা নিবারিত হয়। 'রাহু' একটী অপদেবতা ও দৈত্য-দানব বিশেষ—ইহা প্রসিদ্ধ আছে। সুতরাং নিবারণ বাবুর ন্যায় কু-শিক্ষিত অপদেবতার উপদ্রব নিবারণ করাই সমগ্র বৈষ্ণবগণেরই একান্ত কর্ত্তব্য। আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের শিরোনামার ইহাই তৃতীয় কারণ।

শব্দের অর্থ-গ্রহণের পদ্ধতি

নিবারণচন্দ্রের অন্য যে-কোন অর্থ-ই গ্রহণ করা হউক না কেন, তাহা স্বাভাবিকভাবে কোনও মতেই বিষ্ণু-বৈষ্ণবকে লক্ষ্য করে না। এমন কি এই শ্রেণীর নাম নিরর্থক ও হিত-সাধনে পরাঙ্মুখ। শব্দের অভিধা-বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া লক্ষণা-দ্বারা বা কষ্ট কল্পনায় অনেক কিছু করা যাইতে পারে। নিরুক্তির সাহায্যে আক্ষরিক ব্যাখ্যাদ্বারাও হয়ত কিছু একটা কাঠাম খাড়া করা যায়, কিন্তু তাহা স্বাভাবিক ও সঙ্গত অর্থ বলিয়া গৃহীত হয় না। যদি কোনও মহাপুরুষ বলেন বিশেষ্য শব্দমাত্রই বিষ্ণুকে লক্ষ্য করে, এবং ক্রিয়া মাত্রই ভক্তি-নির্দ্দেশক; তবে অতিমর্ত্ত্য পরমহংস মহাপুরুষগণের দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত সাধারণ সাধক জীবের দৃষ্টিভঙ্গী এক নহে—ইহা কিন্তু সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে।

শব্দমাত্রই অপ্রত্যক্ষভাবে বিষ্ণুকে লক্ষ্য করিলেও সাক্ষাৎভাবে বিষ্ণু ও বিষ্ণুভক্তের উদ্দেশক নাম-গ্রহণই শাস্ত্রের ব্যবস্থা। 'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ' বলিলে, ভগবানের নামই উচ্চারণ করিতে হইবে। 'নিবারণ, নিবারণ' উচ্চারণ করিলে চলিবে না। আর যদি বলেন—নিবারণচন্দ্র বলিলেও ভগবানকে বুঝায়, তাহা হইলে, তাঁহারই যুক্তি অনুসারেই আমরা বলিতে পারি—তবে তিনি একজন অবতার সাজিলেন !

নামকরণের শাস্ত্রীয় রীতি

বৈষ্ণব-শাস্ত্রে নাম-করণের কি প্রকার পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়, তাহা নিবারণ বাবুর আদৌ জানা নাই। যদি কেহ বলেন তিনি বৈষ্ণব-শাস্ত্র অল্পও অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাহা হইলেও বলিব, তিনি উহার বিচার নিজে পালন করিতে একেবারেই ইচ্ছুক নহেন। আমরা বলি—তিনি নিতান্ত মূর্খ ও বিদ্বেষী বলিয়া বৈষ্ণব-বিরোধিতা করাই তাহার মৎসর-হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়াছে। 'বৈষ্ণব চিনিতে নারে দেবের শকতি'—অপদেবতার কা কথা। যাঁহারা বৈষ্ণব-স্মৃতি, ইতিহাস ও দর্শনশাস্ত্র আলোচনা করেন তাঁহারা সকলেই ভগবদ্দাস্যপর নাম গ্রহণ করিয়া থাকেন। বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তি-মাত্রেরই বিষ্ণুদাস্যপর নাম গ্রহণ করা একান্ত কর্ত্তব্য। শুধু কর্ত্তব্য বলিলে চলিবে না ; ভগবৎ-দাস্যপর নাম গ্রহণ না করিলে তাঁহাকে অপসম্প্রদায়ী, অপাঙ্‌ক্তেয়, অশুদ্ধ ও অস্পৃশ্য বলিয়া জ্ঞান করা হইবে। অজামিলের উপাখ্যান তিনি নিশ্চয়ই শ্রবণ করেন নাই। অজামিলের পুত্রের নাম নারায়ণ রাখায়, তাহাকে সম্বোধন করার সময় বিষ্ণু-স্মৃতিক্রমে অজামিল মুক্তি লাভ করেন। এজন্যই বৈষ্ণব-সমাজে বিষ্ণুদাস্যপর নাম গ্রহণের প্রথা বহু পূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত রহিয়াছে। বৈষ্ণব-মাত্রই পঞ্চ-সংস্কারে সংস্কৃত। পঞ্চ-সংস্কার বলিতে বৈষ্ণব-স্মৃতিকার গোপালভট্ট গোস্বামী লিখিয়াছেন—

তাপঃ পুণ্ড্রং তথা **'নাম'** মন্ত্রো যাগশ্চ পঞ্চমঃ।
অমী হি পঞ্চ-সংস্কারাঃ পরমৈকান্তিহেতবঃ॥ (পদ্ম পুরাণ)

অর্থাৎ (১) তাপ, (২) পুণ্ড্র, (৩) **নাম**, (৪) মন্ত্র, (৫) যাগ—এই ৫টী সংস্কার পরম ঐকান্তিকতা লাভের হেতু। এস্থলে নাম বলিতে ত্রিবিধ জপযোগ্য শ্রীনাম গ্রহণকে এবং বিষ্ণুদাস্যপর নাম নিজ-নামস্বরূপ অঙ্গীকার করাকে বুঝায়। নিজনাম গ্রহণ সম্বন্ধে গোপালভট্ট গোস্বামী 'নামকরণ' প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

নামাত্র কথিতং সদ্ভির্হরের্ভৃত্যত্ব-বোধকম্।
হরি-দাসাদিকমিতি কৃষ্ণ-দাসাদিকং তথা॥

অর্থাৎ—বৈষ্ণবগণ শ্রীহরির ভৃত্যত্ব-বোধক হরিদাস, কৃষ্ণদাস ইত্যাদি নামের উপদেশ করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুও প্রমেয়-

রত্নাবলী গ্রন্থে "তাপঃ পুণ্ড্রং' শ্লোকের অন্তর্গত 'নাম'-শব্দের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন— "নামাত্র গদিতং সদ্ভির্হরিভৃত্যত্ব-বোধকম্।" সুতরাং বৈষ্ণব-মাত্রেরই নাম-গ্রহণের বা নাম-করণের ইহাই পদ্ধতি। ইহা যিনি উল্লঙ্ঘন করিবেন, তিনি বৈষ্ণব হইতে পারিবেন না বা তাঁহাকে সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণব বলিয়া স্বীকার করা হইবে না। নিবারণ বাবুর এসব বালাই নাই। তাহার নামের সহিত ভগবানের নামের যখন কোনও মিল নাই তখন অন্যের নামই বা সেরূপ থাকে কেন? সব শৃগালেরই লাঙ্গুল কাটা থাকা দরকার।

সন্ন্যাসীর নামকরণ

সন্ন্যাসীর নাম-করণ ক্ষেত্রেও ভগবানের স্মৃতি ও তদ্দাস্য-সূচক নাম অঙ্গীকার করিতে হইবে। সন্ন্যাসের নাম-করণ সম্বন্ধে মুক্তিকোপনিষদ্ ও সাত্বত-সংহিতা হইতে 'গৌড়ীয় কণ্ঠহারে' উদ্ধৃত ১০৮টী নামের উল্লেখ দেখা যায়। কেহ কেহ তীর্থ, আশ্রম, বন, অরণ্য প্রভৃতি উক্ত ১০৮টী নামকে উপাধি বলিতে চাহেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে উহা উপাধি নহে—নাম। উপাধি-শূন্য হইয়াই সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হয়। ভক্তি নিরুপাধিকী বৃত্তি। উহা যত উপাধি-শূন্য হইবে ততই জীবের পক্ষে মঙ্গল। উক্ত (১০৮) অষ্টোত্তর-শত নামকে ভক্তির দ্বারা বিশেষিত করাই বৈষ্ণব-আচার্য্যবর্গের সিদ্ধান্ত। সন্ন্যাস-নামের সহিত 'ভক্তি'-শব্দ যুক্ত থাকিলেই 'দাস্য' বুঝাইবে। 'ভজ্' ধাতু হইতেই 'ভক্তি'-শব্দের উৎপত্তি এবং 'ভজ্'-ধাতুর অর্থ 'সেবা'। সুতরাং সন্ন্যাস-নামের পূর্ব্বে 'ভক্তি'-শব্দ থাকায় 'দাস বা সেবক' বুঝাইবে। যাঁহারা সন্ন্যাসের নাম-সমূহকে 'উপাধি' বিবেচনা করেন, তাঁহাদের অবগতির জন্য 'গৌড়ীয় কণ্ঠহারে'র ১৫শ 'রত্নে' শেষ শ্লোকটী আলোচনা করিতে অনুরোধ করি। এস্থলে তাহা সকলের অবগতির জন্য উদ্ধৃত হইল—

"কথ্যন্তে **যতিনামানি** প্রথিতানি মহীতলে।
অষ্টোত্তরশতানি তু বৈদিকাখ্যানি তানি হি ॥"

অর্থাৎ এই শ্লোকে 'অষ্টোত্তরশতানি **যতিনামানি** মহীতলে কথ্যন্তে' বুঝিতে হইবে। সুতরাং উহাকে উপাধি বলিয়া ভ্রমে পতিত হইবার কোন কারণ নাই। মুক্তিক-উপনিষদেও 'তীর্থাশ্রমাদি'-শব্দগুলিকে 'নাম' বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছে—উপাধি বলিয়া প্রকাশ করা হয় নাই। এখানে ঐ শ্লোকটীও দ্রষ্টব্য—

তীর্থাশ্রম-বনারণ্য-গিরি-পর্ব্বত-সাগরাঃ।
সরস্বতী ভারতী চ পুরী **নামানি** বৈ দশ ॥

উক্ত শ্লোকেও **'নামানি'**-শব্দের দ্বারা উপাধি বুঝাইতেছে না। আমরা সকলের বিশেষতঃ নিবারণ বাবুর শিক্ষার জন্য যে-কোন আশ্রমী ব্যক্তির নাম-করণ কি প্রকার হওয়া উচিত তৎসম্বন্ধে সাধু-বৈষ্ণবগণের চির আচরিত প্রথা ও বিচার প্রদর্শন করিলাম। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী সকলের পক্ষেই বিষ্ণু-বৈষ্ণব-দাস্য-সূচক নাম গ্রহণ করাই বৈষ্ণব-সদাচার।

ইহাতে আপত্তি করিলে কেবল যে বৈষ্ণব-সদাচারের বিরুদ্ধাচরণ করা হয়—এরূপ নহে; পরন্তু উহা হীন, ঘৃণিত, মৎসরতাপূর্ণ, দৈত্য-দানবোচিত চিত্তবৃত্তির পরিস্ফূরণ বলিয়া জানিতে হইবে। নিবারণ বাবু শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সর্ব্বোত্তম উন্নততম সন্ন্যাসি-বর্গের বিষ্ণুদাস্যপর নাম শ্রবণ ও প্রচার-প্রাচুর্য্য দর্শন করিয়া পরশ্রীকাতরতাবশে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া হিংসা-দ্বেষে জর্জ্জরিত হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি যে সাউড়ীর ন্যায় অত্যন্ত হীন কদর্য্য সম্প্রদায়ে নিজ মস্তক মুণ্ডন করিয়া আত্মবিক্রয় করিয়াছেন, সেই সম্প্রদায়ের কুৎসিত ক্রিয়া-কলাপসমূহ 'মুখোস খুলিয়া' ব্যক্ত করিলে, তিনি যে উন্মত্তের ন্যায় চিত্তবৃত্তি প্রকাশ করিবেন তাহাতে আর সন্দেহের বিষয় কি? যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে।

নিবারণ বাবুর মতে সীতানাথ বাবুও রামের অবতার

তিনি গৌড়ীয় পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসিগণের নামের বা নাম-করণের প্রতি কটাক্ষ না করিয়া যদি সর্ব্বাগ্রে তাঁহার নিজ সম্প্রদায়ের কর্ত্তৃপক্ষের নামগুলি আলোচনা করিতেন তাহা হইলে নিবারণ বাবুর ভ্রম নিবারিত হইত। মানুষ ক্রোধে অন্ধ হইয়া পড়িলে তাহার নিজের অবস্থা ভুলিয়া যায়। সুতরাং এস্থলে নিবারণ বাবুর স্মরণের জন্য তাহাদের দলের গোড়ার কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছি। সাউড়ীর সহজিয়া দলের সৃষ্টিকর্ত্তা মাননীয় **শ্রীযুক্ত সীতানাথ ভক্তিতীর্থ মহাশয়ের নাম** কি নিবারণ বাবুর স্মরণ নাই? এস্থলে 'সীতানাথ' নাম বলিলে কি তাঁহাকে রামচন্দ্রের অবতার বুঝিতে হইবে? অথবা সীতানাথ বলিলে সাক্ষাৎ অদ্বৈত প্রভুকেই বুঝিব? যদিও আমি প্রমাণ করিয়া দিতে পারি, সীতানাথ বাবুর চেলার দল তাঁহাকে ভগবান্ খাড়া করিতে বিন্দুমাত্রও পশ্চাৎপদ হন নাই। যাহা হউক সে-সব প্রসঙ্গ আমরা প্রবন্ধান্তরে আলোচনা করিব।

—শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা ৬ষ্ঠ বর্ষ, ২য় সংখ্যা।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্রের উত্তর

মাননীয় শ্রীযুত সত্যভূষণ চট্টোপাধ্যায় মহোদয় গত ১৩৫৭ (বঙ্গাব্দ) সালের ১৭ই পৌষ তারিখের একখানি পত্রে বসিরহাট মহকুমার তৃতীয় মুন্সেফ মাননীয় শ্রীযুত * * ঘোষ এম্, এ, বি, এল্, মহোদয়ের সহিত আচার্য্য শ্রীল শঙ্করের অদ্বৈতবাদ বা মায়াবাদ-বিচার অপেক্ষা গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্তের উৎকর্ষতা-সম্বন্ধে যে তুলনামূলক আলোচনা হইয়াছিল, তাহার প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। আমরা তাঁহার পত্রখানি শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকায় (৩য় বর্ষ ২য় সংখ্যায়) প্রকাশ করিয়াছি। তিনি ঐ পত্রে আমাদের প্রকাশিত বক্তৃতার এক অংশ উদ্ধার করিয়া লিখিয়াছেন—"'বিশ্ববাসী সুশিক্ষিত সম্প্রদায়কে ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিবার জন্য আহ্বান করিতেছি' বলিয়া Challenge থাকায় টাটানগরস্থ শ্রীযুক্ত * * মল্লিক মহাশয় কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া অত্রস্থ শিক্ষিত সমাজকে ঐ অংশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার জন্য অগ্রণী হইয়া পড়িয়াছেন।" তিনি এই পত্রের শেষে লিখিয়াছেন—"আমাদের এই প্রতিবাদ আপনার নিকট পঁহুছিয়াছে কিনা, জানিবার আগ্রহে রহিলাম। প্রার্থনা, প্রাপ্তি-স্বীকার করিয়া অনুগৃহীত করিবেন।"

উক্ত পত্রের আদি এবং অন্ত্য অংশদ্বয় যাহা আমি পাঠকবর্গের নিকট উল্লেখ করিয়াছি, তাহা আলোচনা করিলে পত্র-লেখক মহোদয়ের মনোগত ভাব স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তিনিও তাঁহার বক্তব্য বিষয় Challenge করিয়া লিখিয়াছেন। সুতরাং তিনি তাঁহার পত্র আমাদের পত্রিকায় প্রকাশ করিতে না বলিলেও আমি উহা বিদ্বৎসমাজে প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছি। অধিকন্তু আমার ২৪।১।৫১ তাংএর পত্রেও আমি তাঁহার পত্র প্রকাশ করিব বলিয়া তাঁহাকে জানাইয়াছি। তিনি সেই পত্রের আজও কোন উত্তর দেন নাই। তাহাতে বুঝিলাম—"মৌনং সম্মতি-লক্ষণম্" অর্থাৎ তিনি তাঁহার পত্র আমাদের পত্রিকায় প্রকাশ করিতে অনুমোদন করিয়াছেন।

বর্ত্তমান-ধর্ম্ম-জগতের চিন্তাস্রোত লইয়া যেরূপ গ্রন্থাদি রচিত হইতেছে, তাহা হইতে নিরপেক্ষ চিন্তাস্রোত খুঁজিয়া পাওয়া অতীব কঠিন। সুতরাং শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র "শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা" বিভিন্ন মতবাদসমূহের নিরপেক্ষ সুষ্ঠু আলোচনা করিয়া সর্ব্বোত্তম বিচার জগতের নিকট উপস্থিত করিবেন। ইহাতে বিচার, যুক্তি লইয়াই আলোচনা করা সঙ্গত; কিন্তু কোন বিচার উত্থাপন করিতে হইলে উক্ত বিচার কাহার, কে ঐ যুক্তি প্রদান করিয়াছেন, তাঁহার নাম স্বতঃই উল্লিখিত হইয়া পড়ে। এরূপ ক্ষেত্রে নামের উল্লেখ না করিয়া কখনও প্রমাণ বা যুক্তি প্রদর্শন করা অসম্ভব। বিশেষতঃ

কাহারও কাহারও কোন ব্যক্তি বিশেষের বিচার, যুক্তির প্রতি যথা ও অযথা শ্রদ্ধা থাকিতে পারে, তজ্জন্য তাঁহাদের হৃদয়ে কিঞ্চিৎ আঘাত লাগিলেও, কাহারও প্রাণে আঘাত দেওয়া সমালোচকের ও সমালোচনার উদ্দেশ্য নহে। কোন সিদ্ধান্তের তারতম্যমূলক বিচার করিতে গেলেই, কোন্ সিদ্ধান্ত উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছেন, কোন্‌টীর শ্রেষ্ঠত্ব অনুভূত হইতেছে এবং অপরটীর হেয়ত্ব বা অসারত্ব প্রমাণিত হইতেছে প্রভৃতি বলিলে স্তুতি বা কটূক্তি করা হইল—এরূপ বিচার সঙ্গত নহে। আচার্য্য শ্রীল শঙ্কর বিচার-স্থলে নিজ-মতের স্তুতি করিয়া পরমত-সম্বন্ধে তথাকথিত কটূক্তি হইতে আদৌ নিষ্কৃতি পান নাই। তিনি পরমতকে মতিচ্ছন্ন পাগলের উক্তি বলিয়া তাঁহার 'শারীরক-ভাষ্যে' উল্লেখ করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি বিচারে পরাস্ত হইয়া অপমানিত হওয়ায়, বিজেতাগণের প্রতি অস্ত্র-চালনার দ্বারা তাহাদের ধ্বংসসাধন করিয়া স্বমত স্থাপন করিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা করেন নাই, কটূক্তি ত' দূরের কথা। আমরা এই সম্পর্কে শঙ্কর-সম্প্রদায়ে প্রচলিত গ্রন্থাদি হইতে ইহার প্রমাণসমূহ মাননীয় সত্যবাবু ও পাঠকবর্গের সমক্ষে উপস্থিত করিব। অবশ্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত জন সকলেই তাঁহার আদেশে "কায়মনোবাক্যে প্রাণী মাত্রে উদ্বেগ না দিবে"—এই বাক্য সর্ব্বতোভাবে পালন করিয়া থাকেন।

'কটূক্তি' সম্বন্ধে বক্তব্য

মাননীয় চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে আমি শঙ্কর-সম্প্রদায়ের প্রতি 'কটূক্তি' করিয়াছি বলিয়া তিনি আমার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। আমার মতে, আমি কোন সম্প্রদায়ের প্রতিই 'কটূক্তি' করি নাই। সত্যবাবু এসম্বন্ধে আমার প্রতি অবিচার করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। শাসন-বাক্য, নির্দ্দেশ-বাক্য, উপদেশ-বাক্যগুলিকে কটূক্তি বলা চলে না। বেদ, উপনিষদ্, পুরাণ, ইতিহাস, স্মৃতি প্রভৃতি ঋষিবর্গের বাক্যসমূহকে শাস্ত্র বলা হয়। কারণ তাঁহাদের বাক্যের দ্বারা বদ্ধজীবগণ শাসিত হন। শাসন-বাক্য শাস্ত্রকারগণের কটূক্তি নহে। পরন্তু উহাই জীবের একান্ত মঙ্গলকর নির্দ্দেশ-বাণী ও উপদেশ। নির্দ্দেশ বা উপদেশ দিতে গিয়া, উপদেশক বা নির্দ্দেশক কোন প্রাক্তন আচার, ব্যবহার বা বিচার, সিদ্ধান্ত-সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া কোন কথা বলিলে তাহা কটূক্তি বলিয়া গণ্য হইবে না। বিশেষতঃ নিরপেক্ষ সমালোচকগণের এই অধিকার শাস্ত্রকারগণ স্পষ্টতঃই দিয়াছেন; ধর্ম্মপ্রচারকগণের ত' কথাই নাই। তারতম্যমূলক বিচারের সর্ব্বত্রই আদর আছে।

শ্রীব্যাসদেব "অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতিঃ" (পদ্মপুরাণ)—শ্লোকে অদ্বৈত-সম্প্রদায় প্রভৃতির প্রতি **'নারকী'**-শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, শ্রীমদ্ভাগবতেও "যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে" (ভাঃ ১০।৮৪।১৩) শ্লোকে কর্ম্মজড়-স্মার্ত্ত, নাস্তিক চার্ব্বাক-

সম্প্রদায়কে "স এব **গোখরঃ**" বাক্যের দ্বারা শাসন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতে বহুস্থানে শ্রীল বৃন্দাবনদাস দাস ঠাকুর "এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে। **তবে লাথি মারোঁ তার শিরের উপরে**॥ (আঃ ৯।২২৫, ১৭।১৫৮; মঃ ১১।৬৩, ১৮।২২৩, ২৩।৫২২; অঃ ৬।১৩৭) প্রভৃতি বাক্যের দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর বিরোধী সম্প্রদায়ের মস্তকে পদাঘাত করিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভুর 'তৃণাদপি সুনীচ'-বাক্যের ও "প্রাণী-মাত্রে কায়মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে"—ইহার সার্থকতা প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহার দ্বারা নিত্যানন্দ প্রভুর প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, ভক্তি, আসক্তি, প্রভৃতির নিদর্শন পাওয়া যায়। ইহাকে বৈষ্ণবগণ কখনও কটূক্তি বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। যেস্থলে কোন সিদ্ধান্ত বা বিচারের প্রতি প্রগাঢ় নিষ্ঠা, সেস্থলে এইরূপ বিচারই সর্ব্বতোভাবে আদরণীয়।

পূজ্যপাদ আচার্য্য শঙ্কর প্রতিপক্ষের মতবাদকে খণ্ডন করিতে গিয়া যে ব্যবহার ও কটূক্তি করিয়াছেন, আমি পূর্ব্বে তাহার ইঙ্গিত করিয়াছি। আচার্য্য শঙ্করের নিরপেক্ষ জীবনীকারগণ তাঁহার সম্বন্ধে আমাদিগকে জানাইয়াছেন—কর্ণাট-দেশে 'ক্রকচ' নামে এক ব্যক্তি কাপালিকগণের গুরু ছিলেন। আচার্য্য শঙ্কর বিচারে তাঁহাকে স্বমতে আনিতে না পারিয়া উজ্জয়িনীর তদানীন্তন রাণা সুধন্বার দ্বারা পাশব বলপ্রয়োগে যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে বধ করিয়াছিলেন। শঙ্করের যোগবল ও যুক্তিবল এক্ষেত্রে আদৌ কার্য্যকরী হয় নাই।

উক্তস্থলে আমার বক্তব্য, বিচার-যুক্তিতে পরাস্ত হইয়া ক্রোধ-সম্বরণ করিতে না পারিয়া একজন কাপালিক-আচার্য্যের প্রাণ-হত্যা করাকে কোন ধর্ম্ম-জগৎ নিশ্চয়ই ন্যায়-সঙ্গত ক্রিয়া বলিয়া স্বীকার করিয়া লইবেন না। আচার্য্য শঙ্কর আরও বহু ক্ষেত্রে সম্মুখ-বিচারে অপর পক্ষকে প্রাণে বিনষ্ট করিবার জন্য দম্ভ-ভরে যেরূপ অন্যায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেন, তাহা হইতেও আমরা তাঁহার মনোবৃত্তির পরিচয় পাইয়া থাকি। এমন কি, এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াই তিনি তিব্বত-প্রদেশে উত্তপ্ত তৈল-কটাহে নিজের জীবন উৎসর্গ করিতে বাধ্য হন। শঙ্কর-সম্প্রদায়ের জনৈক পণ্ডিত বিশ্বনাথ শিরোমণি মহাশয় "শব্দার্থ-মঞ্জরীর" পরিশিষ্টে যে-বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন, আমি পাঠকবর্গের সমক্ষে এস্থলে তাহা উল্লেখ করিলাম—"শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধ জগদ্‌গুরু তিব্বতের লামার সহিত বিচারে পরাস্ত হইয়া প্রতিজ্ঞা-অনুসারে উত্তপ্ত তৈলে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। ৮১৮ খৃষ্টাব্দে (?) জগতের উজ্জ্বল জ্যোতিঃ শঙ্করাচার্য্যের দেহত্যাগ ঘটে। তেত্রিশ বৎসর মাত্র তিনি জীবিত ছিলেন।" "অদ্যাপি তিব্বতের ঐস্থানকে 'শঙ্কর-কটাহ' (কড়াই) বলে।"

এস্থলে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, আচার্য্য শঙ্করের দ্বারা বৌদ্ধগণ পরাস্ত হইয়া ভারত ত্যাগ করিয়াছেন, ইহা কতদূর সত্য বিবেচনা করা আবশ্যক। অবশ্য

বৌদ্ধ-বিতাড়নের চেষ্টার মধ্যে আচার্য্য শঙ্করের উদ্যম স্বীকার করিলেও তাঁহার দ্বারাই সম্পূর্ণভাবে ভারতে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের বিলোপ ঘটিয়াছে—ইহা প্রকৃত ঘটনা কিনা পাঠকবর্গ বিচার করিবেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর ভৌম-লীলা আলোচনা করিলে এইপ্রকার নির্ম্মম ব্যবহারের দৃষ্টান্ত কুত্রাপি লক্ষিত হয় না। পরন্তু শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীশ্রীল হরিদাস ঠাকুরের প্রতি প্রভূত অত্যাচারের প্রতিক্রিয়াতে ব্রাহ্মণ ও মুসলমানগণই পরাভব স্বীকার করিয়া অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্বের অনুগত হইয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, তদানীন্তনকার ব্রাহ্মণগণের কর্ম্মজড়-স্মার্ত্ত-বিচার ও মুসলমানগণের নিরাকার অদ্বৈত-চিন্তাস্রোত অপেক্ষা অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্তের প্রাধান্যই স্বীকৃত হইয়াছিল।

আচার্য্য শঙ্কর বেদান্ত-দর্শনে সুগত বুদ্ধকে 'পাগল' বলিয়া কটূক্তি করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। সুগত বুদ্ধ বিষ্ণুর শক্ত্যাবেশ অবতার বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লিখিত হইয়াছেন। আচার্য্য শঙ্কর ভারতের মধ্যে এতবড় একজন ধুরন্ধর আচার্য্যরূপে আবির্ভূত হইয়াও যিনি বিষ্ণুর শক্ত্যাবেশ অবতার, তাঁহার প্রতি "অসম্বদ্ধ-প্রলাপিত্বম্" বাক্য প্রয়োগ-দ্বারা তাঁহার যথোচিত মর্য্যাদার হানি করিয়াছেন। আমরা পাঠকবর্গের অবগতির জন্য আচার্য্য শঙ্করের শারীরক-ভাষ্য হইতে সানুবাদ ঐ অংশ উদ্ধার করিলাম—

"অপি চ, বাহ্যার্থ-বিজ্ঞান-শূন্যবাদত্রয়মিতরেতরবিরুদ্ধমুপদিশতা সুগতেন স্পষ্টীকৃত-মাত্মনঃ **'অসম্বদ্ধ-প্রলাপিত্বং',** প্রদ্বেষো বা প্রজাসু—বিরুদ্ধার্থপ্রতিপত্ত্যা বিমুহ্যেয়ুরিমাঃ প্রজা ইতি সর্ব্বথাপ্যনাদরণীয়োঽয়ং সুগতসময়ঃ শ্রেয়স্কামৈরিত্যভিপ্রায়ঃ।"

(সূত্রভাষ্য—২।২।৩২)

"সুগত পরস্পর বিরুদ্ধ বাহ্যবস্তুবাদ, বিজ্ঞানবাদ, সর্ব্বশূন্যবাদ উপদেশ করিয়া আপনার **'অসম্বদ্ধ-প্রলাপিতা'** (পাগলামি) ব্যক্ত করিয়াছেন, অথবা তিনি প্রজা-বিদ্বেষী ছিলেন। প্রজাগণ বিরুদ্ধার্থ গ্রহণে বিমুগ্ধ হউক—ইহাই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। যাহাই হউক, শ্রেয়ঃ-কামী পুরুষের পক্ষে বৌদ্ধমত সর্ব্বপ্রকারে অগ্রাহ্য।"

যদি যুক্তির ভ্রান্তিকেই 'পাগলামি' বলিতে হয়, আচার্য্য শঙ্কর তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন কি? আমরা এসম্বন্ধেও ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে আচার্য্যের উক্তির অসামঞ্জস্য প্রদর্শন করিব। শুধু এক ক্ষেত্রেই আচার্য্য ঐরূপ উক্তি করিয়াছেন এরূপ নহে, আরও বহুস্থলে তাঁহার ঐরূপ ভাষা আমরা লক্ষ্য করিয়া থাকি। নিম্নে তাঁহার আরও দুই একটী তথাকথিত কটূক্তি ও বিদ্রূপোক্তির উল্লেখ করিতেছি—

"তদুভয়মপ্যসৎ" (সূত্রভাষ্য—২।২।২৮)—"বৌদ্ধের এ দুই আশঙ্কাও 'অসৎ' অর্থাৎ সাধু নহে।"

"অহো পাণ্ডিত্যং মহদ্দর্শিতম্" (সূত্রভাষ্য—২।২।২৮)—"অহো! বৌদ্ধ মহৎ পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছেন!"

আমি কেবলমাত্র "শঙ্কর-দর্শন অসার ও অযৌক্তিক, তাহা আমরা গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতিতে বালকদিগকে শিক্ষা দিয়া থাকি" এইমাত্র বলিয়াছি। 'বালকদিগকে শিক্ষা দিয়া থাকি' বলায় কি যত কটূক্তি করা হইল? অবশ্য আচার্য্য শঙ্করের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তি পূর্ব্বোল্লিখিত উক্তিগুলিকে নিশ্চয়ই অসঙ্গত উক্তি নয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিবেন। ইহাও অবশ্য স্বীকার্য্য যে, মতভেদের ক্ষেত্রে স্বমতের প্রতি নিষ্ঠাই এইরূপ উক্তির কারণ। তজ্জন্য আমরাও ইহাকে হেয়-জ্ঞান করি না। মাননীয় চটোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট আমাদের অনুরোধ, তিনি যেন এবিষয়ে আমাদের প্রতি নিরপেক্ষ বিচার করেন।

কোনও কোনও প্রাকৃত সাধারণ ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ বলেন—"পাপকে ঘৃণা করিও, পাপীকে ঘৃণা করিও না।" এই যুক্তি-অনুসারে চটোপাধ্যায় মহাশয় বলিতে পারেন—শঙ্করের যুক্তি-বিচারকে নাস্তিক্যবাদ বলিয়া ঘৃণা বা অগ্রাহ্য করিতে পারা যায়, কিন্তু আচার্য্য শঙ্করকে কখনও নিন্দা করা চলে না। আপাততঃ কথাটি শ্রুতিমধুর হইলেও উহা আদৌ বিচারসঙ্গত নহে। গুণী ব্যতীত গুণের অধিষ্ঠান অসম্ভব। গুণ কোন বস্তুকে আশ্রয় না করিয়া থাকিতে পারে না। তজ্জন্যই বৈদান্তিক শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে—"শক্তিশক্তিমতোরভেদঃ।" যাঁহারা গুণ ব্যতীত 'গুণী'র বিচার করিয়া থাকেন, তাঁহারা অবৈদিক ও শাস্ত্রজ্ঞানহীন বলিয়া মনে করিতে হইবে। বেদে বহু পাপ-কার্য্যের প্রায়শ্চিত্ত-বিধান লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পাপী যদি ঘৃণিত না হইল, পুণ্যবানের সহিত সে যদি সমান হইল, তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিবে কে? এমন কি, বর্ত্তমান জগতের আইন-আদালতগুলিও তাহা হইলে তুলিয়া দিতে হয়। কারণ চোরকে কিছু বলা চলিবে না—তাহার ত' কোন দোষ নাই, তাহার কর্ম্মের দোষ। সুতরাং চোরকে শাস্তি দিলে লাভ কি? এমন কি, কাহারও গৃহে চোর বা ডাকাইত প্রবেশ করিলে নিষেধ করা অন্যায় হইবে। গৃহস্থকে সাবধান করা পাপকার্য্য হইবে—চোর-ডাকাইতের সাজা দেওয়া অধর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত হইবে। সুতরাং যাঁহারা **"পাপকে ঘৃণা করিও, পাপীকে ঘৃণা করিও না"**—এইরূপ বলিয়া থাকেন, তাঁহারা তাঁহাদের পাপ-কার্য্যের প্রশ্রয় পাইবার জন্য ঐরূপ বলিয়া থাকেন। তাঁহারা পাপকার্য্য করিবেন অথচ তাঁহাদিগকে নিন্দা করিও না—ইহাই তাঁহাদের শিক্ষা হইয়া দাঁড়ায়। আমরা এইরূপ মতবাদের প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত নহি। ঐরূপ যুক্তির প্রতিযোগিতায় আরও বলা যাইতে পারে—পুণ্যকে প্রশংসা করিও, পুণ্যবান্‌কে প্রশংসা করিও না। এই যুক্তি কি কোন নীতিবাদী ধার্ম্মিক-সম্প্রদায় স্বীকার করিবেন? যদি পুণ্যবান্‌কে প্রশংসা করিতে হয়, তবে পাপীকে নিন্দা করিতেই হইবে। নচেৎ পুণ্য ও পাপের অনাদর ও আদর করিয়া পুণ্যবান্ ও পাপীর প্রতি সমান ব্যবহার করিতে হইবে অর্থাৎ প্রশংসা বা ঘৃণা করিতে হইবে না। এইরূপ উর্ব্বর-মস্তিষ্কের লোকবঞ্চনাপর শিক্ষাগুলি যে সমাজের কত হানিকর হইতেছে,

তাহা সমাজ দেখিয়াও দেখিতেছে না। কোন গৃহস্থের বাড়ীতে পূর্ব্বপরিচিত চোর বা ডাকাইত এবং সাধু বা সন্ন্যাসী উপস্থিত হইলে সমানভাবে আদর দেওয়া কর্ত্তব্য কি? কিন্তু শাস্ত্র আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন—"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।" বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অসৎসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক সৎসঙ্গ করিবেন—ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রশংসিত ও বহুমানিত শ্রীল শঙ্করাচার্য্যও আমার এই যুক্তি সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার শারীরক-ভাষ্যে এবিষয়ে প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যাইবে। এমন কি, তিনি মোহ-মুদ্গরেও লিখিয়াছেন—"ক্ষণমিহ **সজ্জনসঙ্গতি**রেকা, ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা।"

মাননীয় চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমার বসিরহাটে প্রদত্ত বক্তৃতার প্রতিবাদ-পত্রের উত্তর শেষ হইতে না হইতেই, পুনরায় আর একটী বিস্তৃত প্রতিবাদ পাঠাইয়াছেন। আমার প্রদত্ত উত্তরে প্রসঙ্গক্রমে আমি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে ১৩৫৭ সালের ২য় বর্ষ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকায় "শ্রীজন্মাষ্টমীতে দার্শনিক আলোচনা"- শীর্ষক প্রবন্ধগুলি পাঠ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তাহাতে অদ্বৈতবাদ বা মায়াবাদের অযৌক্তিকতা ও অসারতা স্পষ্টভাবে ও সর্ব্বতোভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। তিনি এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া অদ্বৈতবাদের বিপদ্ গণনা করিয়াছেন বুঝিলাম।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে পূর্ব্বে আমি প্রচ্ছন্ন মায়াবাদী বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। এখন দেখিতেছি, তিনি প্রকাশ্য এবং গোঁড়া মায়াবাদী। শুধু তাহাই নহে, তিনি যে প্রবন্ধ পাঠাইয়াছেন তাহাতে তাঁহার মনোগত ভাব যেরূপ প্রস্ফুটিত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাও নিরপেক্ষ সমালোচকগণের সমক্ষে ধরিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য মনে করি। তাঁহার বর্ত্তমান প্রবন্ধটি মূলতঃ "শ্রীজন্মাষ্টমীতে দার্শনিক আলোচনা"-প্রবন্ধের প্রতিবাদ। প্রকৃত-প্রস্তাবে দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, চট্টোপাধ্যায় মহাশয় চটিয়া যাওয়ায় আমার ঐ প্রবন্ধ ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন নাই। আমি সহৃদয় পাঠকবর্গকে উক্ত চারি সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধটী পাঠ করিতে অনুরোধ করি। তাহাতে কোন ভাষার জটিলতা নাই, সিদ্ধান্তের কূট বিচারসমূহ সুস্পষ্টভাবে আলোচিত হইয়াছে। তিনি আমাকে অযথা 'অসৎকারণবাদী' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমি সর্ব্বতোভাবে 'অসৎ-কারণবাদ'কে অস্বীকার করিয়া থাকি। প্রসঙ্গক্রমে আমি শ্রীল শঙ্করাচার্য্যের 'শারীরক-ভাষ্য' হইতে প্রমাণ তুলিয়া দেখাইয়া দিব যে, তিনি 'অসৎ-কারণবাদে'র কি-প্রকার প্রশ্রয় দিয়াছেন। বৈষ্ণবগণ সর্ব্বতোভাবে ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। ন্যায়-দর্শনকে অসৎ-কারণবাদী বলিয়া অস্পৃশ্য-বোধ থাকিলে অদ্বৈতবাদিগণ কখনই ন্যায়ের যুক্তি অবলম্বন করিয়া স্বমত-স্থাপনে 'উঠিয়া-পড়িয়া' লাগিতেন না। যদি ন্যায়ের সাহায্যে 'অদ্বৈতসিদ্ধি'র ন্যায় গ্রন্থ রচিত হইতে পারে, তাহা হইলে ন্যায়ের সাহায্যে উহা খণ্ডনও করা যাইবে না কেন? স্বার্থপরতাই যুক্তি-হীনতার লক্ষণ।

প্রতিবাদীর দ্বিতীয় প্রবন্ধে তাঁহার মনোগত ভাবের দুই একটী নিদর্শন এস্থলে উদ্ধার করিতেছি,—

(১) "শ্রীমদ্ মহারাজের নিকট প্রেরিত আমার প্রথম পত্রে আমার প্রতিবাদ পত্রটী ছাপাইবার জন্য অনুরোধ করি নাই ; কারণ এই যে—বাদ-প্রতিবাদ উঠিলেই অনেক সময় অপ্রিয় মন্তব্য আসিয়া পড়ে। ঐরূপ অবস্থার মধ্যে নিজেকে মগ্ন করিবার ইচ্ছা ছিল না।"

(২) "অদ্বৈতবাদিগণের উপর দৌরাত্ম্য করিতে গিয়া শ্রীমন্মহারাজ আত্মবিস্মৃত হইবার মত অবস্থায় পতিত হইয়াছেন বুঝিলাম।"

এস্থলে পূর্ব্বপ্রকাশিত কয়েকটী কথার প্রতি পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। প্রতিবাদী প্রথম পত্রের শেষ অংশে লিখিয়াছেন—"শঙ্করকে শ্রীকৃষ্ণের একনিষ্ঠ ভক্ত বিবেচনায় তাঁহাকে বৈষ্ণবের মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রবন্ধ প্রকাশ করত আমাদের * * চিরকৃতজ্ঞ করুন।"

এই উক্তি হইতে স্পষ্টতঃই বুঝা যায়, তাঁহার প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া শঙ্করাচার্য্যকে বৈষ্ণব সাব্যস্ত করা হউক। কিন্তু দার্শনিক সমাজ আচার্য্য শঙ্করকে বৈষ্ণব বলিয়া স্বীকার করেন নাই। বিশেষতঃ শঙ্কর-সম্প্রদায়ের লোকসকল অর্থাৎ অদ্বৈতবাদী বা মায়াবাদিগণ ইহা কখনই অঙ্গীকার করেন না।

ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণবগণ পরমব্রহ্ম ভগবানকে যেরূপ সচ্চিদানন্দ, নিত্য ও সনাতন বস্তু বলিয়া স্বীকার করেন, তদ্রূপ অণুচৈতন্য ভগবদ্ভক্ত জীবসকলও নিত্য ও সনাতন। এতদ্ব্যতীত জীব ও ভগবানের মধ্যবর্ত্তী ভক্তি-বৃত্তিও নিত্যা ও সনাতনী। সেব্য, সেবক ও সেবার নিত্যত্বই ভগবদ্ভক্তগণের নিকট শ্রীব্যাস-রচিত সিদ্ধান্তরূপে গৃহীত।

আচার্য্য শঙ্কর এই তত্ত্বত্রয়ের নিত্যত্ব কোথাও স্বীকার করেন নাই। দুঃখের বিষয়, চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 'শঙ্কর-ভাষ্যে'র আলোচনা নাই। থাকিলে তিনি এই সত্য অবনত-মস্তকে স্বীকার করিতেন। আচার্য্য শঙ্করের কষ্ট-কল্পনায়, তর্কে ও বিচারে একবস্তু ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তুর নিত্যত্ব স্বীকৃত হয় নাই। যাহা কিছু ভেদ বা দ্বৈত এবং যাহা কিছু প্রত্যক্ষ সমস্তই তিনি মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, যদিও ইহা আদৌ প্রতিপন্ন হয় নাই। আচার্য্য শঙ্কর নির্গুণ-শ্রুতির বহুমানন করিয়া অন্যান্য শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাসাদি বহু গ্রন্থাদিই তিনি অস্বীকার করিয়াছেন। এমন কি, বেদকেও তিনি মিথ্যা বলিয়া যুক্তি প্রদর্শন করিতে ত্রুটী করেন নাই। বেদের স্থির প্রামাণ্য করিতে হইলেও তাহাতে স্বকপোল-কল্পিত তর্কের আবশ্যকতা আছে বলিয়া বহু যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। অথচ "তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই"—ইহা বেদ ও বেদান্তের সুস্থির সিদ্ধান্ত।

অবশ্য একথা সত্য, 'শারীরক-ভাষ্যে' আচার্য্য শঙ্কর বহু ভাল কথা লিখিয়াছেন। প্রত্যেক ধর্ম্মশাস্ত্রেই যুক্তিসঙ্গতরূপে বহু ভালকথা নিপিবদ্ধ থাকে। নচেৎ তাহা সাধারণ লোকের গ্রহণে উৎসাহ হয় না। যিশুখৃষ্টের বাইবেল অর্থাৎ 'ওল্ড টেষ্টামেন্ট' (Old Testament) ও নিউ টেষ্টামেন্টের (New Testament) জ্ঞান ও বৈরাগ্য প্রভৃতি বহু ভাল কথা শঙ্কর-ভাষ্যে ও তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি, বৌদ্ধ, জৈন, কাপালিক, কর্ম্মী ও মুসলমানদেরও বহু ভাল কথা আচার্য্য শঙ্করের গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। তজ্জন্য শ্রীশঙ্করকে খৃষ্টিয়ান্, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান প্রভৃতি বলা চলিবে কি? পরস্পর ধর্ম্মগ্রন্থের মধ্যে সাধারণ বহু কথাই সমভাবে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তজ্জন্য সমস্ত ধর্ম্মমতগুলিকে এক বলা চলে না। কারণ, সমস্তই এক বলিয়া স্বীকৃত হইলে মনীষিগণের মধ্যে এইরূপ তারতম্যমূলক সম্প্রদায় পরিলক্ষিত হইত না। প্রত্যেক ধর্ম্মমতের মূল তত্ত্ববিচারের মধ্যে যে-পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, তাহা লইয়াই দার্শনিক পণ্ডিতগণের মধ্যে বিচার হইয়া থাকে। তাহা না হইলে আচার্য্য শঙ্করই বা কেন সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক, বৌদ্ধ, জৈন, কাপালিক প্রভৃতি মতবাদিগণের বিচার খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিবেন ?

দ্বিতীয়তঃ, চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করিয়া লিখিয়াছেন, —আমি অদ্বৈতবাদিগণের উপর দৌরাত্ম্য করিয়াছি। কিন্তু আমি ইহা সর্ব্বতোভাবে অস্বীকার করি। আমার বক্তব্য,—অদ্বৈতবাদ অসার ও অযৌক্তিক। ইহা আমি "শ্রীজন্মাষ্টমীতে দার্শনিক আলোচনা"-প্রবন্ধে অতি সংক্ষেপে প্রদর্শন করিয়াছি। তাহাই কি অদ্বৈতবাদিগণের উপর দৌরাত্ম্য হইল ? যদি বিচার-যুক্তিতে ও শাস্ত্রাদি প্রমাণমূলে মায়াবাদ ও অদ্বৈতবাদ অযৌক্তিক বলিয়া প্রতিপন্ন হয় এবং বৈষ্ণবগণের ভক্তিসিদ্ধান্তই যদি সার বলিয়া গৃহীত হয়, তাহাতে নিরপেক্ষ ব্যক্তিগণ পরিতুষ্টই হইবেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ইহাকে 'দৌরাত্ম্য' মনে করায় তাঁহার প্রকৃত মুখোস খুলিয়া পড়িয়াছে। তিনি যতই "শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব (?) জয়তি" এবং "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ইচ্ছাই পূর্ণ হউক"—এইরূপ লিখুন না কেন, তিনি যে শ্রীচৈতন্য-বিরোধী, ইহা তাঁহার লেখনীর প্রত্যেক ছত্রই প্রমাণ করিয়া দিতেছে। "একে নিন্দে, আরে বন্দে এই মত ভণ্ড"—শ্রীচৈতন্যভাগবতের এই উক্তিই তাহার প্রমাণ। কেহ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে মানেন, শ্রীজীব গোস্বামীকে মানেন না ; আবার জীব গোস্বামীকে মানেন, শ্রীকবিরাজ গোস্বামীকে মানেন না ; কবিরাজ গোস্বামীকে মানেন, কিন্তু শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণকে মানেন না ; কেহ আবার কবিরাজ গোস্বামীর সহিত শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের মিল খুঁজিয়া না পাইয়া শ্রীচৈতন্য-বিদ্বেষী হইয়া পড়েন ; কেহ বা 'বিমানবিহারী' হইয়া নিরাকার-নির্ব্বিশেষ আকাশে উড়িতে গিয়া ডানা ভাঙ্গিয়া মোহান্ধ-কূপে পতিত হন। ইহারা সকলেই "অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্বে"র ছদ্মবেশী দৌরাত্ম্যকারী। (অসম্পূর্ণ)

—শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা ৩য় বর্ষ, ৩, ৪, ৫, ৮-সংখ্যা।

হিন্দু সাধু-সন্ন্যাসি-নিয়ন্ত্রণ আইনের
প্রতিবাদ

ভারতীয় লোকসভায় সাধু-সন্ন্যাসীদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য বিগত ২৭শে জুলাই ১৯৫৬ তারিখে একটী বিল (**Bill**) বা বিধান উপস্থিত করা হইয়াছে। আমরা এই বিলের সম্পূর্ণ বিবরণ অবগত হইতে পারি নাই ; তবে যতটুকু অবগত হইতে পারিয়াছি, তাহাতে বিশেষ দুঃখিত ও মর্ম্মাহত হইলাম। এই বিধানের উদ্দেশ্য—"সাধু-সন্ন্যাসিগণের পাপাচার, ভিক্ষাদ্বারা জীবিকা, সমাজবিরোধী আচার-ব্যবহার প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করা বিশেষ প্রয়োজন। ইহার দ্বারা খাঁটী সাধুগণের বদনাম দূর হইবে ইত্যাদি।" ভারতীয় লোক-সভার বিস্তারিত বিধান প্রস্তাব (**Bill**) অবগত হইতে পারিলে আমরা ইহার যথাযথ মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারিব। অবশ্য সাধুগণের বিরুদ্ধে কোনও আইন পাশ করিতে হইলে তাহাদিগকে ঐ বিধান-বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে অবগত করান প্রয়োজন। তাহা না করাইয়া তাহাদের বিরুদ্ধে কোনও বিধান প্রস্তুত হওয়া সঙ্গত হইবে না।

ভারতের যাবতীয় আইন, বিধি-ব্যবস্থা সমস্তই শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে বিহিত হইয়া থাকে। শাস্ত্রবিধি-বহির্ভূত কোন বিধি ভারতে চলিবে না। সাধু-সন্ন্যাসিগণকে শাস্ত্রই নিয়ন্ত্রিত করেন, কোন ব্যক্তি বা সমাজ তাঁহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না। যেহেতু সমস্ত পুরাণ ও স্মৃতিশাস্ত্রে এই বাক্যের পোষকতা-প্রমাণ দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত প্রমাণ-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্র হইতে নিম্নলিখিত একটী শ্লোক উদ্ধার করিতেছি—

> সর্ব্বত্রাস্খলিতাদেশঃ সপ্তদ্বীপৈকদণ্ডধৃক্।
> অন্যত্র ব্রাহ্মণ-কুলাদন্যত্রাচ্যুত-গোত্রতঃ॥ (ভাঃ ৪।২১।১২)

অর্থাৎ মহারাজ পৃথু (যাঁহার নামানুসারে সমস্ত বিশ্বের নাম 'পৃথিবী' হইয়াছে) সমস্ত পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট্ ছিলেন। ঋষিকুল, ব্রাহ্মণ এবং অচ্যুত-গোত্রীয় বিষ্ণুভক্তগণ ব্যতীত অন্যান্য সকলের উপর তাঁহার দণ্ড এবং বিধি অস্খলিত ছিল। অর্থাৎ উক্ত ঋষি ও সাধু-সন্ন্যাসী ব্যতীত অন্য সকলের উপরেই তাঁহার আইন প্রযুক্ত হইত।

সাধুগণই ভারতের গৌরব ও শোভা। সমগ্র পৃথিবী ভারতের এই গৌরব ও শোভায় আকৃষ্ট হইয়া তাহাদের পারমার্থিক ও সামাজিক জীবন গঠন করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। ভারতীয় সাধু-সন্ন্যাসীগণ শান্তিপ্রিয়, তজ্জন্য সমগ্র পৃথিবী শান্তির জন্য ভারতের মুখাপেক্ষী হইয়াছে। রাজনৈতিক কারণে ভারতবর্ষ পৃথিবীর নিকট যত সম্মান লাভ করিয়াছে, তাহা অপেক্ষা শত-সহস্রগুণ অধিক সম্মান লাভ করিয়াছে—ধর্ম্মনৈতিক কারণে।

রাজনীতি অপেক্ষা ধর্ম্মনীতির শ্রেষ্ঠত্ব সর্ব্বদেশেই স্বীকৃত হইয়াছে। রাজনীতিদ্বারা ধর্ম্মনীতিকে নিয়ন্ত্রিত করা অত্যন্ত অবিধি।

ভারতীয় সংবিধান-তন্ত্র হইতে সর্ব্বপ্রথম ঘোষিত হইয়াছিল—**ভারত ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র**। সুতরাং ভারতীয় লোকসভা কোনও ধর্ম্মের নিয়ন্ত্রণ করিতে গেলে তাহা সম্পূর্ণ বেআইনী (against the constitutional Law) হইবে। এতদ্ব্যতীত ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইন (Penal code) ও ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইন (Criminal Procedure code) প্রভৃতি আইন-সমূহের অনেকক্ষেত্রে পরিবর্ত্তন করিতে হইবে, অথবা সেই সেই আইনগুলিকে সংশোধন করিতে হইবে। আমরা জিজ্ঞাসা করি,—যিনি এই প্রস্তাব লোকসভায় আনয়ন করিয়াছেন, তিনি ভারতীয় দেওয়ানী, ফৌজদারী আইন-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করিয়াছেন কি? তিনি কি জানেন না যে, দুর্নীতি দমন করিবার জন্য ভারতের সর্ব্বত্র একই আইন প্রচলিত আছে? দুর্নীতির মাপকাঠি বা মানযন্ত্র সাধু ও অসাধুপক্ষে একইরূপ নির্দ্ধারিত আছে। সুতরাং দুর্নীতি দমনের জন্য পৃথক্ কোনও আইন-প্রস্তুতের আবশ্যকতা নাই। আমরা বলিতে চাহি,—সাধু চুরি করিলে বা অসাধু চুরি করিলে Penal code-এর (দণ্ডবিধি আইন) ৩৭৯ ধারা কি নূতন করিয়া গড়িতে হইবে? একজন অসাধু পরস্ত্রী হরণ করিলে বা একজন সাধু পরস্ত্রী হরণ করিলে Rape case এর ৩৭৬ ধারা পরিবর্ত্তিত হইবে কি? সাধু প্রতারণা করিলে বা অসাধু প্রতারণা করিলে ৪২০ ধারার কিছু পরিবর্ত্তন হইবে কি? আমরা বুঝি,—ফৌজদারী দণ্ডবিধি সাধু-অসাধু সকলের উপরেই সমানভাবে প্রযুক্ত। দুর্নৈতিক ঘটনার তারতম্য ও গুরুত্বানুসারে দণ্ডেরও গুরুত্ব ও তারতম্য হইয়া থাকে। তজ্জন্য পৃথক্ আইন প্রস্তুতের কোনও আবশ্যকতা নাই।

যদি সাধুদের দুর্নৈতিকতার জন্য পৃথক্ আইন প্রস্তুতের আবশ্যকতা হয়, তাহা হইলে কংগ্রেসের ও অন্যান্য রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির পাপাচার, সমাজ-বিরোধী কার্য্য ও দুর্নৈতিকতার জন্যও পৃথক্ আইন আবশ্যক হইবে। Congress এর কোন নিরপেক্ষ সভ্য লোকসভায় এইরূপ বিল উত্থাপন করিবেন কি? সাধু-সন্ন্যাসীগণের মধ্যে যাঁহারা প্রধান বা আচার্য্যের কাজ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে নিয়ন্ত্রণ করিতে গেলে প্রথমে রাজনৈতিক পাণ্ডাগণের নিয়ন্ত্রণ হওয়া আবশ্যক। Black Marketing (চোরাবাজারী) নিয়ন্ত্রণ-আইন আজও প্রস্তুত হয় নাই। আমরা শুনিতে পাইতেছি—বর্ত্তমান শাসন-তন্ত্রের মধ্যে কেহ কেহ নানাবিধ দুর্নৈতিকতার প্রশ্রয় দিতেছেন। আমাদের প্রধান-মন্ত্রী শ্রীনেহেরুজী কোনও কোনও সময় ইহার জন্য গভীর দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের নিয়ন্ত্রণের কি ব্যবস্থা হইয়াছে? অবশ্য "তেজীয়সাং ন দোষায় "—এই বিচার-অনুসারে হয়ত তাঁহারা রেহাই লইবেন।

সাধু ও সন্ন্যাসীর বিচার—সাধু-সন্ন্যাসীরাই করিয়া থাকেন। অসাধুগণ কিরূপে সাধু চিনিয়া লইতে পারিবেন? যাহারা কোনও দিনই সাধুর কাছে যান নাই, তাহারা সাধুত্বের বিচার কেমন করিয়া করিবেন? আইন প্রস্তুত করিতে হইলে 'সাধু কাহাকে বলে', তাহার একটী আইন-সঙ্গত Schedule অর্থাৎ তপশীল প্রস্তুত করিতে হইবে। সেই তপশীলের বাহিরের লোকগুলিকে 'অসাধু'-সংজ্ঞা দিতে হইবে এবং 'অসাধু কাহাকে বলা হইবে, ইহারও একটী তপশীল প্রস্তুত করা প্রয়োজন। যাহারা সাধু ও অসাধু—এই দুই তপশীলের বাহিরে থাকিবেন, তাহাদিগকেও একটি তপশীল করিয়া মনুষ্যজাতির বহির্ভূত করিয়া রাখিতে হইবে। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—এই জগতে দেবতা ও অসুর-নামক দুইটী সম্প্রদায় মনুষ্য-নামে খ্যাত। অন্যপ্রকার মানব-জাতিকে মনুষ্য বলিয়া ধরা হয় নাই।

অসাধু নিয়ন্ত্রনের কোনও ব্যবস্থা নাই—সাধু-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থার জন্য অসাধুগন কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া পড়িয়াছেন। কলির বর্ত্তমান সময়ে ভোটের যুগ আরম্ভ হইয়াছে; সুতরাং অসাধুর সংখ্যা অধিক হওয়ায় সাধুগণের উপর অত্যাচার চালাইবার আইন প্রস্তুত হইতেছে। এইরূপ অবস্থায় সংখ্যালঘিষ্ঠের রক্ষা হইবে কিরূপে? আজকাল পাকিস্তানী সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানগন সংখ্যালঘিষ্ঠ হিন্দুগণের উপর যে-প্রকার অত্যাচার-অবিচার চালাইতেছেন, ভারতবর্ষেও সেইপ্রকার সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতি সংখ্যাগরিষ্ঠগণ অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাকে আমরা সুশাসন বলিতে পারি না।

ইহার মূলে সাধুদের প্রতি বিদ্বেষ, হিংসা প্রভৃতি লক্ষ্য করা যাইতেছে। অসাধুগণ নিজ নিজ দুষ্কৃতি ও দুর্নীতির জন্য সাধুগণের দ্বারা সমাজে হেয়-ঘৃণিত-অপমানিত-লজ্জিত হওয়ায় তাহার প্রতিহিংসা-স্বরূপ এইপ্রকার কলি-কালোচিত সাধু-নিয়ন্ত্রন-আইন প্রস্তুত হইতেছে। ইহার মূলে আমরা আরও একটী অসৎ-উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিতেছি। ভারতের যাবতীয় অসাধুগুলি সাধু-খাতায় নাম লেখাইয়া তাহাদের অসৎ-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার প্রচুর সুযোগ লাভ করিবে। সুতরাং এইপ্রকার আইন প্রস্তুত হইলে দুর্নীতি ক্রমশঃ বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইবে—কিন্তু হ্রাস-প্রাপ্ত হইবে না।

সাধুগণ নিজদিগকে লোকসমাজে 'সাধু' বলিয়া পরিচয় দিতে ইচ্ছা করেন না। আমি একজন 'Registered সাধু' অথবা 'Licensed সাধু',—এইপ্রকার পরিচয় দিতে তাঁহারা লজ্জাবোধ করিয়া থাকেন। সুতরাং কোনও সাধুই সরকারী সেরেস্তায় নাম Registry করাইতে যাইবেন না। বিশেষতঃ জেলাধীশ যদি মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতি কোনও হিন্দু-বিরোধী ব্যক্তি হন, তাহা হইলে তাঁহার নিকট হিন্দু-শাস্ত্রানু-মোদিত সাধুতার বিচার কি-প্রকার হইবে? উক্ত শ্রেণীর জেলাধীশ তাঁহার নিজ ধর্ম্ম-চিন্তানুযায়ী বিচার করিতে বাধ্য হইবেন। সুতরাং সাধুগণ তাঁহাদের নাম তালিকাভুক্ত করাইবার জন্য ঐরূপ ব্যক্তির নিকট কেন যাইবেন?

'সাধু' বলিতে গৃহস্থ ব্যক্তিকে বুঝাইবে কি না? অবশ্য সন্ন্যাসীরা গৃহস্থ নহেন। তাহা ছাড়া ব্রহ্মচারী ও বানপ্রস্থীদিগকে সন্ন্যাসী বলা হয় না। তাঁহাদিগকে কি বলা হইবে? যদি তাঁহাদিগকে 'সাধু' বলা হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থী—এই তিন শ্রেণীর লোককে 'সাধু' বলিতে হইবে। অথবা গৃহস্থগণকে বাদ দিলে তাঁহারা অসাধু-শ্রেণীভুক্ত হইবেন। এইরূপ ক্ষেত্রে কোনও গৃহস্থ উন্নত-স্তরের লোককে 'অসাধু' বলিয়া সম্বোধন করিলে দণ্ডবিধি-আইনে ৩৫২ ধারায় অপরাধ হইবে না। অথবা ঐ আইনে ৫০০ ধারা অনুসারে সম্মানের হানিও করা হইবে না।

কোনও গৃহস্থ ব্যক্তি যদি সাধু হইতে ইচ্ছা করেন অর্থাৎ গৃহস্থ-আশ্রমে থাকিয়াই যদি সাধুবৃত্তি অবলম্বন করিতে চাহেন, তাহা হইলে তাঁহাকেও লাইসেন্স্ লইতে হইবে এবং নাম রেজিষ্ট্রী করিতে হইবে। এরূপ ক্ষেত্রে আমরা অবগত আছি—জেলাধীশ অপেক্ষা অপেক্ষা অনেক উচ্চ-অধিকারী কর্ম্মচারী ধর্ম্ম-জীবন যাপন করেন। তাঁহারা ঊর্দ্ধপুণ্ড্র তিলকাদি-সহ বিচার আদালতে অফিসাদিতে উপস্থিত হইয়া স্ব-স্ব কার্য্য করিয়া থাকেন। তাঁহারা 'সাধু'-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইলে তাঁহাদিগকেও জেলাধীশের নিকট তাঁহাদের সাধুত্বের পরিচয় দিতে হইবে। জেলাধীশ তাঁহার বিচার করিয়া তাঁহাকে 'সাধু' বলিয়া লাইসেন্স্ দিবেন এবং আবশ্যক হইলে উহা কাড়িয়া লইবেন ও দণ্ড দিবেন—ইহা কি সঙ্গত হইবে?

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ আইন ও সর্দ্দা বা বাল্য-বিবাহ আইন প্রভৃতি যেরূপ সংবিধানে পাশ হইলেও ভারতীয় জনতা তাহা গ্রহণ না করায় সংবিধানের গ্রন্থাগারেই উহা সুরক্ষিত আছে, বর্ত্তমান আইনটীও জনসাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সংবিধানে পাশ করাইয়া তাঁহাদের উপর বলপ্রয়োগে চাপাইতে গেলে ইহারও সেইরূপ অবস্থা হইবে—ইহাতে সন্দেহ নাই। আর একটি কথা আমরা শুনিতেছি, ইহা আইনরূপে গৃহীত হইলে ভারতীয় Federal Court এ এই সংবিধানের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হইবে।

সুতরাং আমরা এইরূপ আইন নির্দ্ধারিত হইবার সর্ব্বতোভাবে বিরোধী এবং লোকসভার সভ্যগণের প্রতি আমাদের সকাতর নিবেদন এই যে, তাঁহারা যেন এইরূপ আইন কখনও পাশ না করেন। ভারতের সমগ্র সংবাদপত্র-সেবীগণকে অনুরোধ জানাইতেছি, তাঁহারা যেন সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া সাধু-নিয়ন্ত্রণ আইনের প্রবল প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। আমরা ভারতের সমগ্র জাতীয় সমাজকে, বিশেষতঃ সকল সাধু-সন্ন্যাসীগণকে নিবেদন জানাইতেছি,--তাঁহারা এই আইনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া প্রতিবাদ করুন।

সাধু সাবধান! সাধু সাবধান!! সাধু সাবধান!!!

—শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা ৮ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা।

জগন্নাথ-মন্দিরে ছুঁৎমার্গ (?)

[দৈনিক 'যুগান্তর'—৩রা নভেম্বর, ১৯৬৩, রবিবার]

"পুরীতে হাজারের অধিক টাকা মূল্যের ভোগ ভূ-প্রোথিত"

"অ-সেবায়েত স্পর্শদুষ্ট বলিয়া সূপকারদের হট্টগোল ঃ পুলিশের হস্তক্ষেপ"

"পুরী, ১লা নভেম্বর—আজ অপরাহ্নে জগন্নাথদেবের ভোগ দিবার পূর্ব্বেই জনৈক অ-সেবায়েৎ ছুঁইয়া দিয়াছে এই কারণে প্রথামত কয়েক হাজার টাকা মূল্যের ভোগ ভূ-প্রোথিত করা হয়।

"কয়েকদিন পূর্ব্বে মন্দির-পরিচালনা-কমিটি স্থির করিয়াছেন যে, কোটভোগ ছাড়া ব্যক্তিগত ভোগ সকালে পূজার সময় দেওয়া চলিবে না। আজ কয়েকজন সূপকার মন্দিরের ভিতর জোর করিয়া ব্যক্তিগত ভোগ দিতে গেলে মন্দিরের আদেশদানকারীরা তাহাদের বাধা দেয়। সূপকাররা চড়াও হইয়া উঠে এবং বলে যে, জনৈক অ-সেবায়েত ভোগ স্পর্শ করিয়াছে এবং ইহার পর ভোগ প্রোথিত করা হয়। পুলিশ ও মন্দির-কর্ত্তৃপক্ষ হস্তক্ষেপ করিয়া পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেন"। (ইউ, এন, আই)

আমরা শ্রীশ্রীজগন্নাথমন্দিরে উক্ত ঘটনা ঘটিবার জন্য সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। যে-সমস্ত ধর্ম্মধ্বজী ভগবৎ-সেবায় স্পর্শদোষের বিচার উৎসাদিত করিয়া তাহাকে ছুঁৎমার্গ বলিয়া শ্লেষ করেন তাহাদের শিক্ষার জন্য জগন্নাথদেব স্বয়ং এইপ্রকার ঘটনা ঘটাইয়াছেন। শ্রীজগন্নাথের এই শিক্ষা হইতে আমরা চিরদিনই শাস্ত্রীয় বিধান-অনুসারে ছুঁৎমার্গেই থাকিব এবং থাকিতে উপদেশ করিব। পাশ্চাত্য শিক্ষার বা বর্ত্তমান শিক্ষার ভণ্ডামী আমরা ভগবৎ-উপাসনার মধ্যে প্রবেশ করাইব না। আজও শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে খাদ্য-খাদকের বিচার লইয়া ভারতের নিজস্ব-তন্ত্র বজায় আছে। 'ছুঁমার্গী' বলিতে আমরা তাহাদিগকেই বুঝিব, যাহারা শাস্ত্রীয় স্পর্শদোষ মানে না অর্থাৎ ছুঁৎমার্গ ব্যাপারের সৃষ্টিকর্ত্তাগণ আমাদিগকে স্পর্শ না করিলেই শ্রীজগন্নাথদেবের সেবা সুষ্ঠুভাবে চলিবে।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের ভোগ হইবার পর যখন সূপকারগণের পাচিত অন্ন মহাপ্রসাদ বলিয়া শাস্ত্র নির্দ্দেশ দিয়াছেন, সেই মহাপ্রসাদে কোন স্পর্শ-দোষ নাই। কিন্তু ভোগ হইবার পূর্ব্বে শ্রীজগন্নাথদেবের সেবকগণ ব্যতীত অর্থাৎ যাঁহাদের ভোগ দিবার অধিকার আছে, তাঁহারা ছাড়া অন্য কাহারও স্পর্শ করিবার অধিকার নাই। শেষোক্ত অস্পৃশ্য ব্যক্তি-সকল ভগবানের ভোগের পূর্ব্বে স্পর্শ করিলে তাহা আর কখনও ভগবান্

শ্রীজগন্নাথদেবকে দেওয়া চলিবে না। এই বিচারই শুদ্ধ বিচার। শ্রীজগন্নাথের ভোগ শ্রীজগন্নাথদেব-কর্ত্তৃক গৃহীত হইলে মহাপ্রসাদ হয়; সুতরাং তাহাতে কোন স্পর্শদোষ থাকে না বা থাকিতে পারে না। শ্রীজগন্নাথ-ক্ষেত্র পুরীধামে অদ্যাপি সেই বিচার প্রবলভাবে প্রচলিত আছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, আজ পর্য্যন্ত পাশ্চাত্যদেশ হইতে আগত শাক-শব্জী, তরী-তরকারী অর্থাৎ আলু, ফুলকপি, টোম্যাটো, পালংশাক প্রভৃতি আমাদের ভারতবর্ষে উৎপন্ন হইলেও, তাহা শ্রীজগন্নাথদেবের ভোগে দেওয়া হয় না। শ্রীশ্রীজগন্নাথমন্দিরে আজ পর্য্যন্ত ভারতের প্রাচীন শাস্ত্রের সনাতন-পদ্ধতি সংরক্ষিত হইতেছে। ইহার পরিবর্ত্তন ঘটাইবার চেষ্টা আসুরিক এবং অবৈধ।

শাস্ত্র বলেন—

"ব্রহ্মবন্নির্ব্বিকারং হি যথা বিষ্ণুস্তথৈব তৎ।"

—হরিভক্তিবিলাস ৯।১৩৪ ধৃত বিষ্ণুপুরাণবচন

"মহাপ্রসাদ ব্রহ্মের ন্যায় নির্ব্বিকার, কোন স্পর্শদোষ থাকিতে পারে না"। কিন্তু ভোগ হইবার পূর্ব্বে স্পর্শদোষ অবশ্যই মানিয়া লইতে হইবে। এস্থলে শ্রীল হরিদাস ঠাকুর ও শ্রীল সনাতন গোস্বামীর আদর্শ সকলকে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে আলোচনা করিতে অনুরোধ করি।

কেহ কেহ হয়ত মনে করিবেন, শ্রীশ্রীজগন্নাথমন্দিরের সেবকগণ এত নির্ব্বোধ যে, তাঁহারা জগন্নাথদেবের পাচকগণের প্রচুর খাদ্য-দ্রব্যাদি রাস্তার সাধারণ লোককে না দিয়া মাটিতে পুতিয়া ফেলিলেন! ইহা তো ব্রাহ্মণের পাচিত দ্রব্য, সুতরাং সকলবর্ণেরই গ্রহণীয়। বহু দরিদ্র ব্যক্তি এই দুর্বৎসরে ইহা এক বেলা বা দুই বেলা খাইয়া বাঁচিতে পারিত। তাহা না করিয়া শ্রীমন্দিরের কর্ত্তৃপক্ষ উহা সমস্তই ভূ-প্রোথিত করিলেন কেন?

এস্থলে বক্তব্য এই যে, মন্দিরের কর্ত্তৃপক্ষ ইহা ঠিকই করিয়াছেন। যে দ্রব্য শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব গ্রহণ করিলেন না তাহা অন্য কাহাকেও দেওয়া যাইতে পারে না অর্থাৎ ভগবান্ যাহা গ্রহণ করিয়া থাকেন তাহাই মনুষ্যমাত্রের গ্রহণীয়। কোন জীবেরই ভগবান্‌কে নিবেদন না করিয়া পশুবৎ খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে। অনিবেদিত বস্তু শাস্ত্রে অখাদ্য ও নিষিদ্ধ খাদ্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এমন কি, তাহা মূত্রবৎ অগ্রহণীয় বলিয়া শাস্ত্রে ব্যবস্থা আছে :—

"ন দত্ত্বা হরয়ে যস্তু যদি ভুঙ্‌ক্তে নরাধমঃ।
অন্নং বিষ্ঠাসমং মূত্রসমং তোয়ং বিদুর্ব্বুধাঃ॥" (নারদ পঞ্চরাত্র-২।১।৪৩)

সুতরাং আমরা ইহার দ্বারা এই শিক্ষা পাইতেছি যে, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব আমাদিগকে ভগবানে অনিবেদিত কোন বস্তুই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নয়, সে-বিষয়ে সাবধান করিয়া দিতেছেন। ইহা হইতে আরও শিক্ষা পাই যে, যে যে দ্রব্য বিষ্ণুকে

দেওয়া যায় না, তাহা অমেধ্য ও অগ্রাহ্য। তাহা জাগতিক বিচারে অত্যন্ত উত্তম দ্রব্য হইলেও ভগবানের ভোগে দেওয়ার অনুপযুক্ত বিধায় তাহা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য অর্থাৎ মাছ, মাংস, ডিম, তামাক, বিড়ি-সিগারেট ইত্যাদি ভগবানের ভোগে লাগে না। এইসকল সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। যাহারা মাছ-মাংস, চপ্-কাটলেট, মাদক দ্রব্য ঠাকুর-সেবায় ব্যবহার করেন, তাহারা সনাতন হিন্দুধর্ম্ম-বহির্ভূত অধার্ম্মিক সম্প্রদায় বলিয়া গণ্য। শাস্ত্র তাহাদিগকে অন্ত্যজ-ম্লেচ্ছ নামে অভিহিত করিয়াছেন।

—শ্রীগোড়ীয় পত্রিকা ১৫ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা।

ত্যাগীর গৃহ-প্রবেশে কালাবৃত্তি

শুক্লবৃত্তির পরিবর্ত্তে কালাবৃত্তি অবলম্বন

"বহু জন্ম-জন্মান্তরের সুকৃতিক্রমে কাহারও সংসারের প্রতি তীব্র বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে" তিনি "কোন অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষের সাক্ষাৎ কৃপা লাভ করিয়া" থাকেন। মহাপুরুষের কৃপা লাভ করিয়া অনেককে ভজনে উন্নত দেখা গেলেও পুনরায় তাঁহাদের ক্রমশঃ অধঃপতিত হইতে দেখা যায়। তাহার ফলেই ত্যাগী গৃহে প্রবেশ করিয়া শুক্লবৃত্তির পরিবর্ত্তে কালাবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়।—ইহাই মায়ার খেলা।

কালা-কৃষ্ণদাসের ন্যায় কালাবৃত্তি

শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলায় আমরা দেখিতে পাই **কালা কৃষ্ণদাস** মহাপ্রভুর অত্যন্ত নিকটে থাকিয়াও, এমন কি, তাঁহার সাক্ষাৎ সেবা লাভ করিয়াও মায়ার প্রতিমূর্ত্তি-স্বরূপ ভট্টথারীগণের প্রবৃত্তিমার্গীয়া বৃত্তির দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু কালা-কৃষ্ণদাসের কালা বৃত্তিরূপ দুর্দ্দৈব প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে যাহা শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা বৈষ্ণব-মাত্রেরই আদর্শ। আমরা তাহা হইতে জানিতে পারি যে, হরি-গুরু-বৈষ্ণবের অত্যন্ত নিকটস্থ হইয়া থাকিলেও সেবক প্রকৃত সেবা না করিয়া অনেক সময়ে ভোগে পরিচালিত হয়।

মৎকুণ মসকাদির ন্যায় একত্রাবস্থানই অন্তরঙ্গ সেবকের লক্ষণ নহে

ইহ জগতে আমরা দেখিতে পাই, বহু পোকা-মাকর মানুষের সঙ্গ করিয়া থাকে। মৎকুণ মানুষের মস্তকে থাকে। ছারপোকা এক উপাধানে বা বালিশে অবস্থান করে

ও শয়ন করে। মশক বলপূর্ব্বক এক মশারীর মধ্যে অবস্থান করিতে চেষ্টা করে ও অবস্থান করে। তজ্জন্য মৎকুণ, ছারপোকা ও মশককে কাহারও অন্তরঙ্গ সেবক বলিয়া ধরা যায় না। কারণ তাহাদের সকলেরই উদ্দেশ্য—মানুষের রক্ত শোষণ করিয়া তাহাদের স্ব-স্ব-শরীর ও ইন্দ্রিয়ের পরিতুষ্টি করা। যাঁহারা এক বিছানায় শুইতে পান না, এক গৃহে থাকিতে পারেন না, এক মঠ বা আশ্রমে বাস করেন না, একই ধামের প্রত্যক্ষ সেবা করেন না, তাঁহারা কখনই সেবক নহেন—এইরূপ বিচার কোন শিক্ষিত বৈষ্ণব করিতে পারেন না।

বহুদূরে অবস্থান করিয়াও গুরু-বৈষ্ণবসেবার আদর্শ স্থাপন

আমরা "ত্যাগী ও গৃহস্থ-বৈষ্ণবের গুরুবৃত্তি" নামক প্রবন্ধের লেখক শ্রী * * বিদ্যা-রত্ন মহাশয়ের বৈষ্ণব-বিদ্বেষমূলক কটাক্ষ দেখিয়া বিশেষ দুঃখিত হইলাম। তিনি এখনও শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা কাহাকে বলে, তাহা শিক্ষা করেন নাই। মঠের মধ্যে বা গুরুর নিকট বসিয়া থাকিলেই মঠসেবা বা গুরুসেবা হয়, তাহাপেক্ষা দূরে থাকিলে মঠের বা গুরুদেবের সেবা করা যায় না—ইহা এক অভিনব বিচার। প্রকৃতপ্রস্তাবে তাঁহারাই শুদ্ধ হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবক বলিয়া গণ্য হইবেন, যাঁহারা বিপ্রলম্ভভাবে বিভাবিত হইয়া দূর হইতে সেবা-মগ্ন থাকেন। আমরা ভায়াকে স্মরণ করাইয়া দেই—শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর ১৯৩৭ সালের জুন মাসে তিনি এবং তাঁহার সহিত আরও কয়েকজন দল বাঁধিয়া গুরুদেবের মঠ-মন্দির, সেবাপূজাদি সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণ কলিকাতায় * * রোডে এক মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন। তখন তিনি ঐ মঠের একজন মালিক হইয়া বসিয়াছিলেন। শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ পরিত্যাগ করিয়া সুদীর্ঘ ৫।৭ বৎসর কাল দক্ষিণ কলিকাতায় অবস্থানকালে তাঁহারা স্বতন্ত্র মঠ প্রতিষ্ঠা করায় তাঁহাদের গুরু-দ্রোহিতা হইয়াছিল, স্বীকার করিতে হইবে। তখন তাঁহারা গুরু বা মঠ-মন্দিরের সেবা করেন নাই—ইহাই তাঁহাদের বর্ত্তমান উক্তি হইতে প্রতিপন্ন হয়। পক্ষান্তরে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি গুরুসেবার চরম আদর্শ প্রদর্শন করিয়া চিরদিনই শ্রীমায়াপুর গৌরধামের সেবা করিয়া আসিতেছেন ও করিবেন। উক্ত সমিতির (এই) দীন সেবক তাহাদের কল্যাণ কামনা করিয়া পুনরায় তাহাদিগকে ধামসেবায় নিযুক্ত করিয়াছে। তজ্জন্য সমিতির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পরিবর্ত্তে তাঁহাদের প্রতি বিদ্বেষ-বহ্নি উক্ত দলকে হরিভক্তি হইতে বিচ্যুত করিবে, সন্দেহ নাই।

গৌর-নিজজন জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদের আচার-প্রচারে গৌরলীলার প্রতিধ্বনি

ভোগী, ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তি নিজের বা স্ত্রী-পুত্র-ভ্রাতা-ভগ্নী আত্মীয়-স্বজনের ভরণ-পোষণার্থ মঠ-মন্দিরের বিত্ত-সম্পত্তির অপব্যবহার করিলে গুরু-বৃত্তি না হইয়া কৃষ্ণবৃত্তি

হইবে। মঠ-মন্দিরের সেবার নামে অর্থ সংগ্রহ করিয়া নিজের সম্পত্তি বৃদ্ধি করা অপেক্ষা আর পাপকার্য্য কিছুই থাকিতে পারে না। শ্রীমন্ মহাপ্রভু লীলা-বিলাসকালে তাঁহার বিভিন্ন সেবকের দ্বারা আমাদিগকে সাবধান করিয়া বহু শিক্ষা দিয়াছেন। আমরা ইহা তাঁহার লীলা-গ্রন্থ হইতে জানিতে পারি। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ আশ্রয়-বিগ্রহ জগদ্গুরু পরমহংসকুল-মুকুটমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রকট-লীলাতে তিনি তাঁহার সেবকগণের দ্বারা আমাদিগকে বহু শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন; আমরা সেই শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া একমাত্র তাঁহারই সেবায় নিযুক্ত থাকিব। আমরা শাস্ত্রে দেখিতে পাই,—"গৌরজন সঙ্গ কর 'গৌরাঙ্গ' বলিয়া।" তাই শ্রীমন্ মহাপ্রভুর নিজজন শ্রীল প্রভুপাদের আচার-প্রচারে গৌরলীলা প্রতিধ্বনিত হইতেছে। * * *

ত্যাগী ভোগী হইয়া পড়িলে ত্যাগের প্রতি তাহার প্রবল বিদ্বেষ

ত্যাগী যদি ত্যাগের প্রকৃত আস্বাদন লাভ করিতে না পারে, তবে তাহাকে নিবৃত্তিমার্গ পরিত্যাগ করিয়া প্রবৃত্তিমার্গে গৃহস্থ হইতে বাধ্য করায়। শুধু তাহাই নহে, ত্যাগী যখন ভোগী হইয়া পড়ে, তখন ত্যাগের প্রতি তাহার বিদ্বেষবহ্নি এত প্রবলভাবে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে যে, তাহা নির্ব্বাপিত করা সুকঠিন হইয়া পড়ে। আমরা উক্ত গৃহস্থের অশুক্ল-বৃত্তিতে তাহাই প্রস্ফুটিত দেখিতে পাইতেছি। তিনি ব্রহ্মচর্য্যের তুল্য ত্যাগ-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ত্যাগীর প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করত গৃহব্রত-ধর্ম্ম অঙ্গীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

কালাপাহাড়ের ন্যায় কালাবৃত্তি

আমরা **কালাপাহাড়ের** জীবনী হইতে এইরূপ বৃত্তির সুস্পষ্ট পরিচয় পাই। ব্রাহ্মণপুত্র নিরঞ্জন হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নবাব সুলেমানের ভ্রাতুষ্পুত্রী নজিরণের প্রেমে (?) মুগ্ধ হইয়া মুসলমান-ধর্ম্ম অঙ্গীকার করে। তখন তাহার নাম নিরঞ্জনের স্থলে 'কালাপাহাড়' হইয়াছিল। কালাপাহাড় হিন্দু হইয়া হিন্দুধর্ম্মের প্রতি যতটা অত্যাচার করিয়াছে, মুসলমান-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া মুসলমানেরা ততদূর করে নাই। কালাপাহাড়ের এই ঐতিহাসিক বৃত্তি সর্ব্বত্রই বিদিত। তজ্জন্য আমরা 'কালাবৃত্তি' বলিতে কালাকৃষ্ণ-দাসের বৃত্তি যেরূপ বুঝিয়া থাকি, অপর পক্ষে উক্ত শব্দদ্বারা কালাপাহাড়ের বৃত্তিও বুঝিয়া থাকি।

নিজের চিত্তবৃত্তি-অনুসারে সমগ্র জগদ্দর্শন

"ঘরপোড়া গরু সিন্দুরে মেঘ দেখিলেই ক্ষিপ্ত হয়।" 'গৃহস্থ-বৈষ্ণব' নিজে ত্যাগধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারেন নাই বলিয়া তিনি সকলকেই তাঁহার মত ভোগী বলিয়া মনে

করিতেছেন। অবশ্য একথা সত্য হইলেও হইতে পারে, তিনি যে দলে অবস্থিত আছেন তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা ত্যাগী, তাঁহারা সকলেই হয়ত বিদ্যারত্ন প্রভুর কষ্টিপাথরের পরীক্ষায় ত্যাগীব্রুব বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছেন। তিনি হয়ত প্রকৃতই তাঁহাদের দলের লোকসকলের মধ্যে দেখিয়াছেন—"ত্যক্তগৃহ ব্যক্তি ভিক্ষা করিয়া সেই অর্থ পূর্ব্বাশ্রমের আত্মীয়-স্বজনের সেবায় নিযুক্ত করেন।" এরূপ হইলে প্রকৃতই দুরবস্থা বা শোচনীয় পরিস্থিতি, সন্দেহ নাই।

গৃহস্থ ও ত্যাগীর শুক্লবৃত্তি-সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা

আমরা গৃহস্থ ও ত্যাগী-বৈরাগীর শুক্লবৃত্তি সম্বন্ধে মহাপ্রভুর শিক্ষা এইরূপ দেখিতে পাই,—

"গৃহস্থ, বৈরাগী—দুঁহে কহে গোরারায়।
দেখ ভাই, নাম বিনা (যেন) দিন নাহি যায়॥
একান্ত সরলভাবে ভজ গৌরজন।
তবে ত পাইবে ভাই শ্রীকৃষ্ণচরণ॥"

মহাপ্রভুর এই আদেশ হইতে জানা যায়, তিনি গৃহস্থ এবং ত্যাগী উভয়কেই এক বৃত্তি অবলম্বন করিয়া নামাশ্রয়ে জীবন অতিবাহিত করিতে বলিয়াছেন। অসরল ব্যক্তি প্রকৃত গৌরজনের ভজন করিতে অসমর্থ। সুতরাং ত্যাগী ও গৃহী উভয়েরই সরলতা অবলম্বন করিয়া গৌরজন শুদ্ধবৈষ্ণবের সেবা করাই একমাত্র কর্ত্তব্য। গৃহস্থ-বৈষ্ণবের কৃত্য সম্বন্ধে ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের শিক্ষা * * ভায়া খুঁজিয়া পান নাই। তিনি লিখিয়াছেন,—**"শুক্লবৃত্তি বলিতে বৈষ্ণবগণ কোন নির্দ্দিষ্ট বৃত্তিকে নির্দ্দেশ করেন নাই।"** ইহা কি ঠিক কথা? * * "মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া মুঠেগিরি করিয়া বা জুতা সেলাই করিয়া সেই বিত্তদ্বারা হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা" করাই পরম মঙ্গলজনক। ত্যাগী সন্ন্যাসীবর্গের ভিক্ষালব্ধ শুক্রবিত্তের দ্বারা স্ত্রী-পুত্র প্রতিপালন করা কখনই কোন গৃহস্থের কর্ত্তব্য হইতে পারে না।

গৃহী বৈষ্ণবের বৃত্তি সম্বন্ধে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

"গৃহী বৈষ্ণবের বৃত্তি"-প্রবন্ধে ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ যে অমূল্য উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা বিদ্যারত্ন মহাশয়ের অবগতির জন্য কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল।—

"গৃহস্থ ও গৃহত্যাগী এই উভয় দলের মধ্যে যিনি শুদ্ধ কৃষ্ণভক্ত, তিনি বৈষ্ণব। গৃহত্যাগী বৈষ্ণব ভিক্ষাদ্বারা শরীর রক্ষা করিবেন। গৃহস্থ-বৈষ্ণব বর্ণাশ্রম-অনুসারে বৃত্তি অবলম্বন-পূর্ব্বক দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন। যে-সকল গৃহস্থদিগের বর্ণাশ্রম নাই, তাঁহারাও স্বীয় স্বীয় স্বভাব ও প্রবৃত্তি-অনুসারে ন্যায্য বৃত্তি অবলম্বন করিবেন। ব্রহ্ম-স্বভাবপ্রাপ্ত

গৃহস্থ ব্রাহ্মণদিগের জন্য উপদিষ্ট যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ—এই ছয়টী জীবন-যাপনের বৃত্তি। রাজ্যপালন, যুদ্ধ ইত্যাদি ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি। কৃষি, গো-রক্ষা, বাণিজ্য ইত্যাদি বৈশ্য-বৃত্তি ও ত্রিবর্ণের সেবা—ইহাই শূদ্র-বৃত্তি। এইসকল বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ন্যায়পূর্ব্বক ধন সঞ্চয় করত প্রাণ রক্ষা করার নাম 'ধর্ম্ম'।"

বর্ণাশ্রমোচিত বৃত্তি-অবলম্বনই শুক্লবৃত্তি

শ্রীল ঠাকুরের উক্ত শিক্ষা হইতে কি বুঝা যায় যে, বৈষ্ণবের শুক্লবৃত্তি বলিয়া কোন নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি নাই? বর্ণাশ্রমের অন্তর্গত বৈষ্ণবগণের বর্ণাশ্রমোচিত বৃত্তি অবলম্বন করাই শুক্লবৃত্তি। এবং তাহাতে যে বিত্ত উপার্জ্জিত হয়, তাহাই শুক্লবিত্ত। যিনি আচার্য্যের নিকট হইতে স্বভাবানুযায়ী ব্রাহ্মণ-সংস্কার লাভ করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে জুতা-সেলাই করিয়া বা মুঠেগিরি করিয়া অর্থোপার্জ্জন করা শুক্লবৃত্তি বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। ব্রাহ্মণের বৃত্তি যে যজন, যাজন ইত্যাদি, তাহা ঠাকুরের উক্ত শিক্ষা হইতে জানিতে পারা যায়। তেলের ঘানি ঘুরাণো ব্যবসা বৈশ্যজাতির বৃত্তিবিশেষ। ইহা ব্রাহ্মণ-সংস্কারে সংস্কৃত ব্যক্তির পক্ষে শুক্লবিত্ত নহে। তবে যদি কোন ব্রাহ্মণ যজন-যাজনাদি কার্য্যে অক্ষম অথবা জগদ্বাসীকে ধর্ম্মশিক্ষা-প্রদানে অপারক হন, তবে তিনি কালাবাজারে কেনাবেচা প্রভৃতি না করিয়া রিক্সা টানিয়া অর্থোপার্জ্জন করিলে তাহাও মন্দের ভাল। কিন্তু উহাকে চারি বর্ণাশ্রমের বিশুদ্ধ বৃত্তি বলা যাইবে না।

নিবৃত্তি-মার্গীয় ত্যাগী-বৈষ্ণবগণের গৃহপ্রবেশে শাস্ত্রের অননুমোদন

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও যতি কখনই গৃহে প্রবেশ করিবে না।—ইহাই শাস্ত্র-নির্দ্দেশ। প্রবন্ধলেখক নিজের সুবিধা অনুসারে শ্রীল প্রভুপাদের নাম করিয়া একটী বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—"গৃহে প্রবেশ করা বৈষ্ণব-মাত্রেরই কর্ত্তব্য। কারণ তাহাতেই সুষ্ঠু হরিভজন হয়, গৃহব্রত-ধর্ম্মে হয় না। কৃষ্ণসেবা করিব, সঙ্কল্প করিয়া গৃহে প্রবেশ করাই শ্রেয়ঃ, ফল্গু মর্কট-বৈরাগ্য অপেক্ষা তাহা অতুলিত-গুণে শ্রেষ্ঠ"। উক্ত বাক্য নাকি শ্রীল প্রভুপাদ বক্তৃতায় বলিয়াছেন। তিনি কি জন্য কাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন—ইহাই এস্থলে বিচার করা প্রয়োজন। 'গৃহে প্রবেশ করা বৈষ্ণব মাত্রেরই কর্ত্তব্য'—এই বাক্যটী প্রভুপাদের নিজস্ব জীবনে দেখিতে পাই নাই। এমন কি, তিনি মঠমন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা করিয়া বহু ব্যক্তিকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেন নাই। প্রবন্ধ-লেখক শ্রীপাদ * * ব্রহ্মচারী মহাশয় গৃহে প্রবেশ করিতে গেলে তাঁহাকে উক্ত প্রকার গৃহপ্রবেশ-রূপ কার্য্য হইতে বিরত করিবার জন্য শ্রীল প্রভুপাদ এ অধমকে প্রেরণ করিয়াছিলেন—ইহা একবার তাঁহাকে স্মরণ করিতে অনুরোধ করি। ইহা দ্বারা কি বৈষ্ণব-

মাত্রেরই গৃহে প্রবেশ করা প্রমাণিত হয়? এরূপ ক্ষেত্রে বুঝা যাইতেছে, তিনি তাঁহার দলের সমস্ত সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারীদেরই 'কিশোরীভজা', 'বান্তাশী' 'অ'-বাসুদেবের ন্যায় গৃহ-প্রবেশের বন্দোবস্ত করিবেন। আমরা কিন্তু তাঁহার এইরূপ উক্তির সমর্থন করিয়া নিবৃত্তি-মার্গের ত্যাগী উন্নত বৈষ্ণবগণের গৃহ-প্রবেশ অনুমোদন করি না।

গৃহস্থ অবস্থাটী আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি ও শিক্ষার চতুষ্পাঠী-বিশেষ

ফল্গু-বৈরাগ্য বা মর্কট-বৈরাগ্যের তুলনায় বিশুদ্ধ বৈষ্ণব-গৃহস্থ অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ—এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। 'কৃষ্ণসেবা করিব'—এই প্রতিজ্ঞা লইয়া প্রবৃত্তি-মার্গের জীব গৃহে প্রবেশ করিবে। নিবৃত্তি-মার্গের জীব 'কৃষ্ণসেবা করিব'—এই প্রতিজ্ঞা লইয়া মঠে বাস করিবে। মঠত্যাগ করিয়া অর্থ-লালসায় বা কামনা-পূরণের জন্য ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে যাইবে না। যেখানে কৃষ্ণসেবাই মুখ্য উদ্দেশ্য, সেখানে কৃষ্ণসেবার অর্থ নিজের স্ত্রী-পুত্রের ইন্দ্রিয়-তর্পণে ব্যয় করা কিরূপে সম্ভবপর হয়? এইজন্যই "মুক্তকুলের প্রকৃষ্ট সঙ্গফলেই (গৃহস্থগণের) পারমার্থিক গৃহস্থ হইবার যোগ্যতা লাভ হয়।" সুতরাং গৃহস্থকে অনুক্ষণ সংসার-বাসনা হইতে মুক্ত বৈষ্ণবের সঙ্গ করিতে হইবে, যাহাতে তাহার সংসার-স্পৃহা ক্রমশঃ নিবৃত্তি লাভ করে। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার 'জৈবধর্ম্ম'-গ্রন্থের ৭ম অধ্যায়ে লিখিয়াছেন—

"গৃহস্থ অবস্থাটী জীবের আত্মতত্ত্ব উদিত করিবার ও শিক্ষা করিবার চতুষ্পাঠী-বিশেষ। **শিক্ষা সমাপ্ত হইলে চতুষ্পাঠী ত্যাগ করিতে পারে।**"

গৃহস্থাশ্রমই উন্নত অবস্থা নহে ; এ-সম্বন্ধে শ্রীল ঠাকুরের স্বয়ং আচরণমুখে শিক্ষা

ঠাকুরের উক্ত বাক্য হইতে জানা যায়, গৃহস্থাশ্রমে থাকাই উন্নত অবস্থিতি নহে। উহা সংযম শিক্ষাক্ষেত্র এবং সাধুসঙ্গ-প্রভাবে আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিবার বিদ্যালয়। উহা পরিত্যক্ত হইলেই তাহার অধিকার উন্নত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। "নাহি জান বদ্ধ হ'য়ে র'বে তুমি চিরদিন"—ইহা সর্ব্বদাই স্মরণীয়। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ স্বয়ং সংসার পরিত্যাগ করত সন্ন্যাস গ্রহন করিয়া 'ঘরপাগলা' প্রাকৃত-সহজিয়াগণকেও সংসার পরিত্যাগের শিক্ষা দিয়াছেন। অবশ্য জীবন্মুক্ত পার্ষদ-ভক্তগণের কথা স্বতন্ত্র; তাঁহারা যে-কোন আশ্রম অঙ্গীকার করিয়া আশ্রমকে কৃতার্থ করিয়া থাকেন। গৃহস্থ-জীবকে শিক্ষা দিবার জন্যই তাঁহারা গৃহস্থাশ্রম অঙ্গীকার করেন। তাঁহারা কখনই কর্ম্মফল-বাধ্য প্রবৃত্তি-মার্গের জীব নহেন। তাঁহাদের উদাহরণ দেখাইয়া সাধারণ গৃহস্থগণ যেন অপরাধ-পঙ্কে নিপতিত না হন।

—শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা ৫ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা।

যদু-বংশে একলব্য

যাঁহারা একলব্যের ইতিহাস বিদিত আছেন, তাঁহারা আমার উক্ত শিরোনামা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন। প্রথমে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেও আমার এই প্রবন্ধ সম্যক্‌-রূপে আলোচনা করিলে দেখিতে পাইবেন, আমি ঠিকই লিখিয়াছি। জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের আশ্রিত, অপ্রাশ্রিত বহু সজ্জন সাধকগণই আমাকে এই প্রবন্ধ লিখিতে প্রেরণা প্রদান করায় আমি এই প্রবন্ধের সূচনা করিতেছি। আমার এই প্রবন্ধের তীব্র সমালোচনা বহু নিরপেক্ষ সরল সাধকগণের আনন্দবিধান করিলেও স্বার্থান্ধ, কুটিল, ভণ্ড তাপসগণের প্রচুর পরিমাণে বিক্ষোভ উৎপাদন করিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। আমি পূর্ব্বেই সকলের নিকট নিবেদন করিয়াছি, আমরা অপ্রিয় সত্যের প্রচারক। বর্ত্তমান জগতে যে নীতি প্রচলিত আছে, আমরা সেই নীতি সর্ব্বতোভাবে অনুসরণ করিতে প্রস্তুত নহি। ইন্দ্রিয়-তর্পণ-পরায়ণ ঘর-পাগলা সম্প্রদায়ের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়—"সত্যং ব্রূয়াৎ, প্রিয়ং ব্রূয়াৎ, মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।" আমরা এই নীতি শ্রীল গুরু-পাদপদ্মের ইচ্ছানুসারে সর্ব্বতোভাবে উল্লঙ্ঘন না করিলে বৈষ্ণব-জগতের কোন মঙ্গল আশা করা যায় না।

আমরা একখানা বার্ত্তাবহে "শ্রীল প্রভুপাদের মঠ-মন্দির স্থাপনের উদ্দেশ্য" শীর্ষক একটী বৈষ্ণব-বিদ্বেষমূলক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছি। এই প্রবন্ধের লেখক কোন ভার্য্যাটিক শ্রীমান্ যদুনন্দন (বিদ্যার্ণব)। 'যদুনন্দন' বলিলে যদু-বংশই বুঝায়। সুতরাং যদুনন্দনের মস্তিষ্কে একলব্যের চিন্তাস্রোত যে- প্রকারে প্রবাহিত হইয়াছে, তাহারই সমালোচনা এই প্রবন্ধের মূল ভিত্তি।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গৃহমেধী সম্প্রদায়কে উন্নত করিবার জন্য প্রথম জীবনে তিনি যে গৃহস্থ-আশ্রমে অবস্থান করিবার অভিনয় করিয়াছিলেন, সেই লীলাভিনয়ের অনুসরণ করিতে না পারিয়া 'ভার্য্যাটিক' সম্প্রদায় একলব্যের আদর্শ অনুসরণ করিতে গিয়া শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে চিরতরে অপরাধ করিয়া বসিয়াছেন। এই অপরাধী জীবগণকে উদ্ধার করিবার জন্য শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করিয়া কৌপীন-বহির্ব্বাসাদি গ্রহণ করিয়াছিলেন। হরিসেবার উৎকর্ষ-সাধনের জন্য সন্ন্যাস-আশ্রম। ইন্দ্রিয়-তর্পন করিবার জন্য গৃহস্থ আশ্রম নহে। যদুবাবু ইহা স্বীকার করেন কি?

তিনি তাঁহার প্রবন্ধে সাপ্তাহিক গৌড়ীয়ের ১০ম খণ্ড, ৪৭ সংখ্যার **"ঠকিয়াছি কি জিতিয়াছি"** শীর্ষক একটী প্রবন্ধের কিয়দংশ উদ্ধার করিয়াছেন। এই প্রবন্ধটী কাহাকে কাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া লিখিত হইয়াছিল, যদুবাবু তাহার খবর রাখেন কি? আমরা এই প্রবন্ধটি আংশিক প্রকাশ না করিয়া সম্পূর্ণই প্রকাশ করিব এবং তাহার ব্যাখ্যা

করিয়া দেখাইয়া দিব, কাহাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য ঐ প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে। আমি বিশেষ দর্পের সহিত জানাইতেছি,—ঐ প্রবন্ধের উদ্দিষ্ট ব্যক্তিগণের প্রায় সকলেই যদুবাবুর দলে তালিকাভুক্ত হইয়া তাঁহাদের সঙ্ঘকে অলঙ্কৃত করিতেছেন। তিনি এ-বিষয়ে অনুসন্ধান করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, তিনি যে-দলভুক্ত হইয়া আছেন, সেই দলই একলব্যের দল বা একলব্য-সম্প্রদায়। তন্মধ্যে কতকগুলি ভার্য্যাটিক, গৃহমেধী, ঘর-পাগলা, সহজিয়া-সঙ্গী, কাঠ-পাথরের মিস্ত্রী, অম্বু-বাম্বু-সঙ্গী প্রভৃতি। এমন কি, ইহারা শ্রীগুরু-পাদপদ্মে মর্ত্ত্যবুদ্ধি, গুরুতে জাতিবুদ্ধি, গুরুদেবে গৃহস্থ-পরমহংস-বুদ্ধি, শ্রীগুরুকে অব্রাহ্মণ বুদ্ধি করিতে ক্রটীবোধ করেন নাই। সুতরাং ঘর-পাগলা একলব্য-সম্প্রদায়কে কে বা কাহারা, তাহার স্বরূপ উদ্ঘাটন করা একান্ত আবশ্যক হইয়াছে।

"শ্রীল প্রভুপাদের মঠ-মন্দির স্থাপনের উদ্দেশ্য" নামক প্রবন্ধের লেখক শ্রীমান্ যদুবাবুর ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধেও আমাদের কিছু আলোচনা করিবার প্রয়োজন আছে। কারণ, তিনি কি অবস্থায় অবস্থিত থাকিয়া শ্রীল প্রভুপাদের মঠ-মন্দির স্থাপনের উদ্দেশ্য বুঝিতে বসিয়াছেন, তাহা সমগ্র বৈষ্ণব জগৎকে জানানো আবশ্যক। একটা গৃহান্ধ-কূপে পতিত ঘৃণিত জীব কলির প্রভাবে কতদূর ধৃষ্টতা করিতে পারে, তাহার আদর্শ শ্রীমান্ অবিদ্যার্ণব যদুবাবুর চরিত্রে প্রস্ফুটিত হইয়া পড়িয়াছে। তাহার অসংযত জীবনের অসংযত লেখনী আমরা কিছুদিন হইতেই লক্ষ্য করিয়াছি। আমরা তাহার মঙ্গল কামনা করিয়া উপযুক্ত সময়ে তিনি সংশোধিত হইবেন, এই আশায় নিস্তব্ধ ছিলাম। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটী গ্রাম্য ন্যায় আমার স্মরণ-পথে জাগিতেছে—"বানরকে লাই দিলে মাথায় উঠে।" সুতরাং যদুবাবুর ন্যায় ভার্য্যাটিক গৃহমেধীকে প্রশ্রয় দিলে সত্যানুরাগী ব্যক্তিসকল অধঃপতিত হইয়া অসৎসঙ্গে ও সঙ্ঘে নিমজ্জিত হইবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। এই প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদের আদৃত সেবকগণের একান্ত অনুরোধে আমি যদুবাবুকে শিক্ষা দিবার জন্য ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য বর্ত্তমান প্রবন্ধ লিখিতে উদ্যত হইয়াছি।

ঘর-পাগলা যদুবাবু তাহার নিজকৃত অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনান্তে তাহার পরিচালিত বার্ত্তাবহে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া অপরাধ ক্ষালন করিবেন,—আমরা ইহাই আশা করি। তবে সাধারন নীতি—"উপদেশো হি মূর্খানাং প্রকোপায় ন শান্তয়ে।" অর্থাৎ মূর্খকে উপদেশ দিলে ক্রোধে উৎক্ষিপ্ত হয়, কিন্তু শান্তি ও শিক্ষা লাভ করে না। তিনি বি, এ পাশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের 'অনুকরণ' ও 'অনুসরণ' শব্দদ্বয়ের অর্থ অনুভব করিয়াছেন কি? তাহার নিজ-জীবনে উহা কখনও প্রতিফলিত করিতে পারিয়াছেন কি? বা তাহার ভবিষ্যৎ জীবনেও উহার অর্থ বুঝিতে পারিবেন কি? শ্রীল প্রভুপাদ চিরদিনই Ontology ও Morphology অর্থাৎ অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ও বাহ্য-ব্যবহারের পার্থক্য সম্বন্ধে প্রচুর শিক্ষা দিয়াছেন। যদুবাবু তাহার এক বিন্দুও আপনার জীবনে অঙ্গীকার করিতে পারেন নাই। প্রভুপাদ গৃহান্ধকূপে পতিত তাঁহার শিষ্যব্রুবগণকে উত্তোলন করিয়া

হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য প্রচুর চেষ্টা করিয়াও বিফল-মনোরথ হইয়া কত দুঃখ করিয়াছেন, যদুবাবু তাহা জানেন কি? যাহারা স্ত্রী-পুত্র-কন্যার মায়া-মমতা হইতে বিন্দুমাত্রও পৃথক্ থাকিতে সমর্থ নহে, তাহারা বৈষ্ণবগণের ক্রিয়া-মুদ্রা কিরূপে জানিবে? কলির প্রভাবে পরোপদেশে পাণ্ডিত্যের ধারা আমরা কিছু দেখিতে পাই, কিন্তু পর-শাসনের ধারা প্রবাহিত করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে নিজেরই শাসিত হওয়া প্রয়োজন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেন,—

"আপনি আচরি' ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।
আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখানো না যায়॥"

আরও দেখিতে পাই,—"জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার।" যদুবাবু কি শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষা কিছু আচরণ করিয়াছেন? তিনি কি তাঁহার নিজের জীবন সার্থক করিয়াছেন? তিনি কি একদিনের জন্যও শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা করিয়াছেন? তিনি কি শ্রীল প্রভুপাদের সেবার জন্য এক কপর্দ্দকও কখনও দিতে পারিয়াছেন? তিনি এখনও কি কোন দূরদেশে যাইতে হইলে মঠের তহবিল হইতে পাথেয় খরচ লইয়া থাকেন? তিনি কি তাহার পুত্র-কন্যাকে বৈষ্ণব-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে পারিয়াছেন? তাহারা কি তিলক-মালাদি ধারণ করিয়া থাকে? তাহারা সকলেই নিরামিষ আহার করে কি? বৈষ্ণবসদাচারের কোন্ অংশ তিনি গ্রহণ করিয়াছেন, জানাইলে বাধিত হইব। তাহাদের সঙ্গ-প্রভাবে যদুবাবুর বৈষ্ণব-সেবায় রুচি হওয়া দূরে থাকুক, তিনি বৈষ্ণব চিনিয়াই উঠিতে পারিতেছেন না। নিজের ওজন বুঝিয়া প্রবন্ধাদি না লিখিলে অপরাধ অবশ্যম্ভাবী।

সার কথায় ও অসার কথায় পার্থক্য আছে। শয়তানও তাহার নিজ-পক্ষ সমর্থনের জন্য মহাপুরুষের উক্তি বা শাস্ত্র-প্রমান উদ্ধার করিয়া থাকে। শয়তানের শাস্ত্র-প্রমাণের 'দাপটে ধর্ম্ম একরূপ দেশান্তরিত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে'। আমরা তাহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত একটী একটী করিয়া লোক-চক্ষে দেখাইয়া দিব। আনুকরণিক ঘর-পাগলা সম্প্রদায় সন্ন্যাসের অভিনয় করিলেও তাহাতে গুরুপাদপদ্মের বিচারে আস্থাহীনতার প্রমাণ প্রস্ফুটিত হইয়াছে। ভক্তির বাহ্য-লক্ষণ অন্তর্লক্ষণ-শূন্য হইলে তাহা 'কর্ম্ম'-নামে অভিহিত হয় অথবা তাহা আধ্যক্ষিকগণের অসৎ প্রচেষ্টার প্রক্রিয়া মাত্র। অর্জ্জুনের দ্রোণাচার্য্যের প্রতি ভক্তির অন্তর্লক্ষণ ও একলব্যের দ্রোণাচার্য্যের প্রতি তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে গিয়া যে বাহ্যলক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার পার্থক্য আমরা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়া দিব। সাধারণ বিচারে আমরা অর্জ্জুনের বৃত্তিকে Ontological aspect ও একলব্যের বৃত্তিকে Morphological aspect বলিয়া গণ্য করি।

অবিদ্যা-কূপমণ্ডূক যদুবাবু ভক্তানুষ্ঠানের বাহ্য ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া অর্থাৎ Morphological aspectএ আকৃষ্ট হইয়াই উক্ত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। উক্ত প্রবন্ধ হইতে

আমরা তাহার 'বিদ্যার্ণব'-উপাধির কিছুমাত্রও লক্ষণ দেখিতে পাইলাম না। তজ্জন্য তাহাকে আমরা অবিদ্যা-কূপমণ্ডূক বলিয়াই জানিলাম। তিনি মনে করিয়াছেন,—একলব্যের ন্যায় মাটিয়া দ্রোণের পূজা করিয়াই প্রকৃত গুরুসেবার ফল লাভ করিবেন। একলব্য দ্রোণাচার্য্যের প্রকৃত রূপ সাক্ষাদ্ভাবে পরিত্যাগ করিয়া অপ্রকৃত মাটিয়া রূপেরই তপস্যা করিয়াছে। আমরা কোন মাটিয়া গুরু-পাদপদ্মের সেবক নহি বা ঐ প্রকার মাটিয়া গুরুর সেবা করিতেও কাহাকে উপদেশ করি না। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার নিজ আদর্শ-জীবনে এই প্রকার মাটিয়া গুরুর পূজা-পদ্ধতির ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের মঠ-মন্দির স্থাপনের ইহাই একটী প্রধানতম উদ্দেশ্য। অবিদ্যা-কূপমণ্ডূক যদুবাবু ইহা কি বুঝিতে পারিয়াছেন ?

শ্রীল প্রভুপাদ বজ্র-গভীর-স্বরে সর্ব্বদাই আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন,—"আমরা কেহ কাঠ-পাথরের মিস্ত্রী হইতে আসি নাই, আমরা চৈতন্য-বাণীর পিয়ন মাত্র।" 'বাণীর পিয়ন' বলিলে অবিদ্যা-কূপমণ্ডুকের মস্তিষ্কে কি ইহার অর্থ কিছু উপলব্ধ হয় না ? তিনি যে সাপ্তাহিক গৌড়ীয় ১৪শ খণ্ড, ৮ম সংখ্যা, ১২৩ পৃষ্ঠা হইতে শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষাটি উদ্ধার করিয়াছেন, সেই শিক্ষার উদ্দেশ্য তিনি বিন্দুমাত্রও উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। অথবা জ্ঞান-খলের ন্যায় বুঝিয়াও কপটতাপূর্ব্বক স্বীয় দলপুষ্টির জন্য প্রবঞ্চনা-মূলে শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষার মূল অংশ পরিত্যাগ করিয়া তাহার নিজের মতের অনুকূল-প্রায় (?) অংশটুকু প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি যে একজন প্রধান আনুকরণিক, তাহা এখানেই পরিস্ফুট হইয়াছে। 'অনুকরণ'কেই 'অনুসরণ' বলিয়া চালাইবার চেষ্টা—কলির প্রধান শয়তানী। আমি এস্থলে শ্রীল প্রভুপাদের উক্তির আনুপূর্ব্বিক সমস্ত শিক্ষাই নিম্নে উদ্ধার করিতেছি। পাঠকবর্গ ইহা পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারিবেন, কে বা কাহারা নির্ভীকভাবে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বাণী অথবা শ্রীল প্রভুপাদের নিছক অপ্রিয়-সত্যবাণী প্রচার করিয়া গুরুসেবার আদর্শ প্রদর্শন করিতেছেন—

শ্রীল প্রভুপাদ ১৯৩৫ সালে জুন মাসে যখন দার্জ্জিলিং শৈলে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন রাজর্ষি কুমার রাও সাহেব শ্রীযুত শরদিন্দুনারায়ন রায়, এম-এ, প্রাজ্ঞ, বেদান্তভূষণ মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের সাক্ষাতে উপস্থিত হইলে তাঁহার সহিত কথোপকথন-মুখে যে অপূর্ব্ব অপ্রাকৃত বাণীর প্রবাহ চলিয়াছিল, তাহা সাপ্তাহিক গৌড়ীয় পত্রিকার ১৪শ বর্ষের ৭ম ও ৮ম সংখ্যায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অবিদ্যা-কূপমণ্ডুক যদুবাবু তাহার দলের প্রশংসা করিতে গিয়া অতিশয় উক্তির অনুকূলে যে কথাটুকু পাইয়াছেন, সেইটুকুই প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার সম্পূর্ণ অংশ প্রকাশিত না হইলে "শ্রীল প্রভুপাদের মঠ-মন্দির স্থাপনের উদ্দেশ্য" সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করা যাইবে না। আমি পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিম্নে তাহা উদ্ধার করিলাম,—

"প্রাজ্ঞ (শ্রীশরদিন্দুনারায়ণ রায়, এম-এ)—প্রভুপাদের কৃপায় কিছুদিনের মধ্যেই ভারতে ও ভারতের বাহিরে পঞ্চাশটী মঠ প্রতিষ্ঠিত হল। **পৃথিবীর কত লোক আপনার কথা গ্রহণ করছেন ?**

প্রভুপাদ—**পঞ্চাশটী মঠের পরিবর্ত্তে যদি আমি সত্যি সত্যি ৫০টী মানুষ পেতাম, তা' হলে আমি আমাকে বেশী লাভবান্ মনে ক'রতাম।** আমি চাই, চেতনের মঠ। চৈতন্যমঠ প্রকাশের জন্যই এত মঠ স্থাপনের প্রয়োজন হ'য়েছে।

প্রাজ্ঞ—তা'ও তো আপনি পেয়েছেন। আপনার এক একজন শিষ্য ত' এক একজন দিক্‌পাল।

প্রভুপাদ—**ইঁহারা ত' চেপে কথা বলছেন। নির্ভীকভাবে শ্রীচৈতন্যের বাণী ঘোষণা করতে পারছেন কোথায় ? শ্রীচৈতন্যের চরণে একান্ত আত্ম-সমর্পণ না হ'লে সেই নির্ভীকতা আসে না। জগতের সকল লোক যদি সত্য-কথার বিরোধী হয়েও যায়, তথাপি শ্রীচৈতন্যের নিজ-দাসগণের পদরেণু দ্বারা মাথার মুকুট তৈরী করে নির্ভীক-কণ্ঠে সত্য কথা বলতে হবে। সত্য কথা বলতে গেলে লোকপ্রিয়তা, জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করা যাবে না।** একথা বলছি না যে, দুনিয়ার লোককে চটিয়ে দিলেই সত্য কথা বলা হল। যিনি সত্যের প্রচারক, তিনি তৃণাদপি সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হয়ে সত্য প্রচার কর্‌বেন ; **তিনি যেন মনে না করেন, জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করাই অর্থাৎ লোকের নিকট জড়-প্রতিষ্ঠা-প্রাপ্তিই —অপর ভাষায় সত্যকে আবরণ করাই তৃণাদপি সুনীচতা।"**

যদুবাবু উক্ত প্রসঙ্গের যে অংশ প্রকাশ করিয়াছেন,তাহা পাঠকগণের তুলনা করিবার জন্য নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায়' এম্-এ, প্রাজ্ঞ মহাশয়ের "শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় কিছুদিনের মধ্যেই ভারতে ও ভারতের বাহিরে পঞ্চাশটী মঠ প্রতিষ্ঠিত হ'ল"—এই কথার প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"পঞ্চাশটী মঠের পরিবর্ত্তে যদি আমি সত্যি সত্যি পঞ্চাশটী মানুষ পেতাম, তা' হ'লে আমি আমাকে বেশী লাভবান্ মনে করতাম। **আমি চাই চেতনের মঠ। চৈতন্যমঠ-প্রকাশের জন্যই এত মঠ স্থাপনের প্রয়োজন হ'য়েছে।"**

যদুবাবুর উদ্ধৃত অংশে প্রাজ্ঞ মহোদয়ের প্রশ্নের মধ্যে "পৃথিবীর কত লোক আপনার কথা গ্রহণ ক'চ্ছেন ?"—এই অংশ উল্লিখিত হয় নাই। তৎপরে ঐ প্রশ্নের উত্তর যদুবাবু উদ্ধার করিয়াছেন। প্রাজ্ঞ মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের উত্তর শ্রবণ করিয়া যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা যদুবাবুর ভাল লাগে নাই বলিয়া সেই অংশ উদ্ধৃত হয় নাই। শুধু তাহাই নহে, প্রাজ্ঞ মহাশয়ের অভিমত প্রকাশের পর শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগৌড়ীয়

বেদান্ত সমিতির ভাবী উদ্ভবের সূচনা করিয়া যে অপূর্ব্ব ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, তাহাও যদুবাবু উদ্ধার করেন নাই। কারণ, তিনি শ্রীল প্রভুপাদের এই শিক্ষাটুকু অনাবশ্যক বা অপ্রাসঙ্গিক মনে করিয়াছেন।

আমরা এস্থলে শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষা-স্বরূপে যদুবাবু যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার আলোচনা করিতেছি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যদুবাবু অবিদ্যাকূপমণ্ডূক বলিয়া, শ্রীল প্রভুপাদের এই শিক্ষার মূল তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কেবল বাহ্য স্থূল অংশ অর্থাৎ **Morphological aspect**ই ধরিয়াছেন। আমি তাহাকে সাপ্তাহিক গৌড়ীয়ে প্রকাশিত "বাণী ও বপু" প্রবন্ধটী পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিতে বলি। শ্রীল প্রভুপাদ বলিতেছেন,—আমার ৫০টি মঠ মঠ নহে, ইহা কাঠ-পাথরের মিস্ত্রীগণের আশ্রয়স্থল। শ্রীল প্রভুপাদ চাহেন,—চেতনের মঠ অর্থাৎ আদর্শ জীবন। তাই তিনি বলিয়াছেন,—৫০টী মঠের পরিবর্ত্তে আমি ৫০ জন মানুষ পাইলেই বেশী লাভবান মনে করিতাম। এস্থলে কি কোন ভৌম-জগতের প্রাকৃত দৃষ্টি-সম্পন্ন ব্যক্তির কোন স্থান, গৃহ বা মঠকে লক্ষ্য করা হইতেছে? তিনি 'চৈতন্যমঠ' বলিতে বৈষ্ণবের ব্যক্তিত্বকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ, প্রফেসর নিশিকান্ত সান্যালের রচিত ইংরাজী-ভাষায় লিখিত **"Sri Krishna Chaitanya"** গ্রন্থখানি দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিয়াছিলেন,—নিশিবাবু আমার লক্ষ লক্ষ টাকার মঠ-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন। যদুবাবু কি একথা কোনদিনই শুনেন নাই?

যদুবাবুর ইচ্ছা, শ্রীল প্রভুপাদের অন্তর্নিহিত জগন্মঙ্গলকর ভগবৎ-কথার সর্ব্বতোভাবে সমাধি দিয়া ঠাট বজায় রাখিয়া কাঠ-পাথরগুলি রক্ষা করা হউক। আমাদের কাঠ-পাথর রক্ষা করিবার যত্ন অপেক্ষা শ্রীল প্রভুপাদের আচার-প্রচার রক্ষা করাকেই গুরুসেবা মনে হইয়াছে। যদুবাবুর মনোগত ভাব,—ইট, কাঠগুলি বজায় করিলেই গুরুসেবা করা হইল; তাঁহার বাণীর সেবা করিলে গুরুসেবা হয় না। কেহ যদি ভারতের সর্ব্বত্র শ্রীল প্রভুপাদের বাণী প্রচার করেন, এমন কি ভারতের বাহিরে বহু দূরে পাশ্চাত্য দেশে অবস্থান করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের কথা প্রচার করেন, তাহা হইলে তাঁহার গুরুসেবা হইবে না। যদুবাবুর ধারণা,—তাহার ন্যায় প্রাকৃত দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির চক্ষে যে সীমা-বিশিষ্ট 'মায়াপুর'-গ্রাম পরিলক্ষিত হয় সেই গ্রামের বাড়ী, স্কুল, ঘর-দুয়ার, ডাক্তারখানা, ছাপাখানা প্রভৃতির মধ্যে আবদ্ধ না হইলে হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা হইবে না। আমরা এইরূপ চিন্তাস্রোতকে অবিদ্যা-কূপে পতিত নিত্যবদ্ধ জীবের বৈষ্ণবাপরাধ-মূলক চিন্তাস্রোত বলিয়া মনে করি।

যদুবাবু যদি কাঠ-পাথরের মধ্যে আবদ্ধ থাকা 'ভজন' বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে আমার জিজ্ঞাস্য,—এইরূপ ভজন পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত

মঠ-মন্দির ছাড়িয়া দিয়া শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দক্ষিণ কলিকাতায় স্বতন্ত্র মঠ স্থাপন করা কি ভক্তির অনুকূল হইয়াছিল? যতুবাবুর বিচারে পৃথক্ মঠ করিলেই ত' অপরাধ! অথচ দক্ষিণ কলিকাতায় সেই অপরাধকুণ্ড আজও সংরক্ষিত হইতেছে এবং তাহাতে যতু-বাবুর ন্যায় বহু অপরাধী জীব নিমজ্জিত হইতেছেন। সাধারণ বিচারে দক্ষিণদিক্ মৃত্যুর জন্যই সংরক্ষিত হয়। লোকে বলে,—যমের দক্ষিণ দুয়ার। গুরুভক্তির মৃত্যু ঘটাইতে হইলে কলির (কলিকাতার) দক্ষিণ দ্বারে উপস্থিত হওয়াই স্বাভাবিক। সুতরাং ভক্ত ও ভক্তির বিনাশ সাধন করিবার জন্য দক্ষিণ-কলিকাতায় একটা আখড়া স্থাপিত হইয়াছিল, এবং এই আখড়া বা ক্যাম্পের চেষ্টায় শ্রীধাম মায়াপুর হইতে শ্রীল প্রভুপাদের ঐকান্তিক সেবকগণকে বিতাড়িত করিয়া তথায় ঘর-পাগলা সম্প্রদায় স্থাপিত হইয়াছে। ইহাকেই কি গুরুসেবা বলিতে হইবে?

দক্ষিণ কলিকাতা ক্যাম্প হইতেই শ্রীল প্রভুপাদের মঠ-মন্দির ভাগ-বাটোয়ারা হইয়া দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের ৬৪ ভক্ত্যঙ্গের বাণী প্রকাশের ৬৪টী কেন্দ্র-মধ্যে দশ আনা-ছয় আনা ভাগ করিয়া দশ আনা অংশ একটা অসুরের হাতে সমর্পণ করা হইয়াছে। ইহা কি গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা হইয়াছে? এই দশ আনা অংশে শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত ৪০।৪২ টী মঠ যেভাবে পরিচালিত হইতেছে, তাহাতে কি যতুবাবু বলিবেন, সেখানেও শ্রীল প্রভুপাদের সেবা হইতেছে? ইহা তিনি নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন না। কারণ তিনি কোন একটী প্রবন্ধে 'অ'-বাসুদেব ও তাহার দলের বিচারের বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়াছেন। তথাপি যতুবাবুর দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া আমি বলিতে চাই,—নবীন * * মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের ছয় আনা সেবক এবং প্রবীণ * * মহারাজের ভ্রাতা 'অ'-বাসুদেব শ্রীল প্রভুপাদের দশ আনা সেবক। দশ আনা, ছয় আনা আংশিক সেবকগণকে পাশ্চাত্য তর্ক-শাস্ত্রানুসারে 'সেবক' বলা হয় না। কারণ আংশিক সত্য সত্য নহে। 'Part truth is no truth." সুতরাং আমরাই শ্রীল প্রভুপাদের ষোল আনা সেবক, এ বিষয়ে আর সন্দেহ কি?

এখন আমার বক্তব্য,—শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত মঠ-মন্দিরে থাকিলেই গুরুসেবা হইবে, ইহা কখনও সিদ্ধান্ত বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া যায় না। ইহা অবিদ্যাগ্রস্ত কূপ-মুণ্ডুকেরই বিচার। পুত্র দূরে থাকিয়া পিতার সেবার সামগ্রী সংগ্রহ করিলে কি পুত্রের পিতৃসেবা হইবে না? এস্থলে আমি বলি—পিতার সহিত একগৃহে একশয্যায় অবস্থান করিয়া মশক ও মৎকুণের ন্যায় পিতার রক্ত পান অপেক্ষা দূরে থাকিয়া পিতার মহিমা প্রচার—সর্ব্বতোভাবে উন্নত সেবা। উৎকুণ মস্তকের কেশগুচ্ছে অবস্থিত থাকিয়া মস্তকের রক্তপান করিয়া থাকে। তজ্জন্য উৎকুণকে কেহ সেবক বলে না। শ্রীল প্রভুপাদের মঠ-মন্দিরে অবস্থান করিয়া যাহারা মশক-মৎকুণের ন্যায় শ্রীল প্রভুপাদের বক্ষের শোণিত পান করে, তাহাদিগকে কি গুরুসেবক বলিতে হইবে?

আমরা প্রথমেই জানাইয়াছি—"আমরা এই প্রবন্ধ আংশিক প্রকাশ না করিয়া সম্পূর্ণ-ই প্রকাশ করিব এবং তাহার ব্যাখ্যা করিয়া দেখাইয়া দিব, কাহাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য ঐ প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে।" সুতরাং আমরা সাপ্তাহিক 'গৌড়ীয়' ১০ম খণ্ড ৪৭ সংখ্যায় প্রকাশিত "ঠকিয়াছি, কি জিতিয়াছি" প্রবন্ধটী সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিতেছি। প্রবন্ধটী অতি বৃহৎ এবং ইহাতে বহু শিক্ষার বিষয় আছে। পাঠক-পাঠিকাগণ প্রবন্ধটী বিশেষ মনোযোগপূর্ব্বক আলোচনা করিবেন।—

"ঠকিয়াছি, কি জিতিয়াছি ?

'হরিভজন' ছাড়িয়া দিলেই 'ঠকা'-'জিতা'র 'খতিয়ান' খুলিয়া বসিতে হয়—আমারও তাহাই হইয়াছে। যিনি সত্য সত্য অকপটে হরিভজন করেন, তাঁহার কিন্তু 'খতিয়ান' অন্য রকমের—তিনি প্রতিমুহূর্ত্তে বিচার করেন, তাঁহার প্রত্যেক সেবাকার্য্যে হরি-গুরু-বৈষ্ণবের কতটা ইন্দ্রিয়-তর্পণ হইতেছে ; তাঁহাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণ না হইলে যেন তাঁহার প্রাণ-পতঙ্গ ধারণই বৃথা ; তাঁহার এইরূপ অবিচ্ছিন্ন অকপট চিত্তবৃত্তি—লোক-দেখান বা 'ঢেঁটরা' পিটাইয়া সাধারণে উহার বিজ্ঞাপন-প্রচারের চিত্তবৃত্তি নহে।

আমি যে খতিয়ান প্রস্তুত করিয়াছি, তাহাতে আমি কৃষ্ণের (?) নিকট হইতে কতটা 'আমদানী' করিতে পারিতেছি, আমার ইন্দ্রিয়-সন্তার কতটা 'জমা'র (?) ঘর বৃদ্ধি করিতেছে, তাহারই হিসাব-নিকাশ করিয়া থাকি। গুরুপদাশ্রয়ের অভিনয় করিয়া—গুরুর প্রিয়-সেবকাভিমানের পতাকা উঠাইয়া—হরিভজনকারীর মুখোস পরিয়া—গুরুর অনুক্ষণ সঙ্গকারী ও বিশ্রম্ভসেবকের লোক-চোখ্-ঝলসান রঙ গায়ে মাখিয়া আমি আমার খতিয়ানের পাতায় হিসাব-নিকাশ লিখিতে থাকি—"আমি যে হরিভজন করিতে আসিলাম, তাহাতে আমার কতগুলি নূতন নূতন দেশ দেখা হইল—কতগুলি চিড়িয়াখানা আমি দেখিতে পারিলাম—কতগুলি সহর দেখিলাম, রাজধানী দেখিলাম, প্রাসাদ দেখিলাম, নূতন নূতন রাস্তাঘাট, পাহাড়-পর্ব্বত, নদ-নদী, প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিলাম,—কতগুলি কল-কারখানা, আফিস-আদালত দেখিলাম—কতগুলি নূতন নূতন দ্রব্য রসময় আস্বাদন করিতে পারিলাম—কতটা সম্মান পাইলাম—মুখস্থ 'বুলি' বলিয়া কতটা বাহাবা কুড়াইলাম,—কতগুলি রাজা-মহারাজা-বড়লোকের প্রাসাদে ও অট্টালিকায় বাস করিতে পারিলাম—কতটা তাঁহাদের অন্দরমহলের অসূর্য্যম্পশ্যাগণের দর্শন ও তাঁহাদের প্রদত্ত অর্ঘ্যলাভ করিলাম—রাজা-মহারাজার মত শয়ন-গৃহ, ভোজন-গৃহ, বহির্দ্দেশ-গমনের স্থান, যাহা আমি আমার বিদ্যা, ধন, শক্তি, পূর্ব্বপুরুষগণের আভিজাত্য প্রভৃতি কোন বস্তুর বিনিময়ের দ্বারাই আমার সমগ্র জীবনে স্পর্শ দূরে থাকুক্, চোখে দেখিবারও সুযোগ পাইতাম না, সেইসকল দেবভোগ্য দ্রব্যের কতটা স্পর্শানুভূতি বা ইন্দ্রিয়ানুভূতি লাভ করিতে পারিলাম ?"

বিদ্যা-বুদ্ধির অপটুতার কারণেই হউক্ বা অন্য অসামর্থ্য-জন্যই হউক, যদি গুরু-বৈষ্ণবের সঙ্গে দেশ-দেশান্তর-গমনের সুযোগ না হয়, বা ইন্দ্রিয়-যজ্ঞের ঘৃতাহুতি কোন প্রকারে কম হয়, তবে আমার ঠকা-জিতার হিসাবনিকাশ তখন হইতে থাকে। আমি তখন ভাবি—আমি কম চতুর হইয়া কি 'আক্কেল-সেলামি'ই না পাইলাম—একটুকু চতুর হইতে পারিলে সেবা-ছলনার 'বহুরূপী' সাজিয়া কত দেশ-দেশান্তর দেখিতে পারিতাম, কতভাবে আখেরের বন্দোবস্ত করিয়া লইতে পারিতাম! সুতরাং এখন হইতে কোন আদর্শ-চতুরের অনুকরণে চতুরতা আয়ত্ত করিতে হইবে। কারণ চতুর হওয়াটাই যে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম—"যেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর। যদি চতুর হইতে না পারিলাম, আখেরের বন্দোবস্তের সহিত নিজের বুঝ্‌টি ষোয়াষোল আনা বুঝিয়া লইতে না পারিলাম, তাহা হইলে আমার হরিভজন হইল কৈ? 'কাকের মত অতি চতুর হইতেছি'—এটাই যা ভয়!'

আমি গুরুর সঙ্গী, গুরুর সেবক কতক্ষণ?—যতক্ষন 'ঠকা-জিতা'র 'নিক্তি' ঠিক আছে। আখেরের বন্দোবস্ত নেপথ্যের নিভৃত অবগুণ্ঠনে ষোলকলায় পূর্ণ রাখিয়া—আমার 'ফাজিল' (উদ্বৃত্ত) সময়টুকুর উপর শুভঙ্করী করিয়া যখন দেখিতে পাই,—বিনা ব্যয়ে, বিনা খাই-খরচে, অনেক সময় বিনা গাড়ী-ভাড়ায়, বিনা বাড়ী-ভাড়ায় ন্যূনাধিক আমার ইন্দ্রিয়ের জমার দিকে আনা যায় তখন এরূপ সুযোগে সেবকের প্রতিষ্ঠাটুকু ছাড়ে কে?

এই 'ঠকা-জিতা'র শুভঙ্করীতে কতকগুলি লোক খুব তুখড়'—গণিতাচার্য্য শুভঙ্কর বাঁচিয়া থাকিলে তাঁহাকেও হার মানাইয়া দিতে পারিতেন, আবার কতকগুলি লোক আমারই মত গো গর্দ্দভ। অঙ্ক কষিতে তীক্ষ্ণবুদ্ধি নাই বলিয়াই মনে করি, আফিসের সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা-পরিশ্রমের পরে সন্ধ্যার সময় অঞ্চলধ্বক্ হইয়া বৈদ্যুতিক বীজন-যন্ত্রের বায়ু-সেবন ও বিশ্রামানুকুল নানাপ্রকার দুনিয়ার সংবাদ সংগ্রহ বা খোস গল্প করিবার জন্য আমার হরিভজনের পোষাকী পতাকা 'মালার-ঝোলা'টী নাচাইতে নাচাইতে হরিকথা শুনিবার বাহ্য আবরণের মধ্যে—'অপ্রাকৃত' ও 'অধোক্ষজ'-শব্দের আনুকরণিক মৌখিকতার রক্ষা-কবচের মধ্যে যদি আরামাবাসের সকল সুযোগটী আমার ইন্দ্রিয়ের জমার ঘরে পরিপূরণ করিতে পারিলাম, তবেই ত' আমার 'জিৎ' হইল!

যাহারা 'ঠকা-জিতা'র অঙ্কে কুশল, তাঁহারা কিন্তু আমাকে 'গোখর', 'গৃহব্রত' প্রভৃতি বলিয়া আমার উপর টেক্কা দিয়াছেন। তাঁহারা মনে করিয়াছেন, 'আমি কি বোকা'! একটি নির্দ্দিষ্ট হাড়মাসের কামিনী-মূর্ত্তির পায়ে আত্মবিক্রয় করার দরুণ, আমি কত ভাল ভাল দেশ, বড় বড় লোক, বড় বড় কল-কারখানার দর্শন, মুক্ত পাখীর মত মুক্ত জীবন-যাপন, মুক্ত বায়ু সেবন, বিনা খরচে দেশ-ভ্রমণ, নানাপ্রকার সুযোগ-সুবিধা, সম্মান, অর্থ ও প্রকৃতি-দর্শন, সম্ভাষণ, কিছুই লাভ করিতে পারিতেছি না। কিন্তু জানি না, কে যেন চকিতের মত আমার কানে কানে বলিয়া দিয়াছেন—গো-গর্দ্দভ, তোমার

বোকামীর মত, অতি চতুরেরাও শুভঙ্করীতে ভুল করিয়াছে। তুমি বোকা হইয়া ঠকিয়াছ, তাহারা অনেক চতুর হইয়া 'জিতিয়াছি' মনে করিয়া ঠকিয়াছে। তোমরা উভয়েই "১" ছাড়িয়া 'ঠকা-জিতা'র প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিয়াছ। যদি সেই একের—অদ্বয়জ্ঞানের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য অকপট হইতে, তবে সে-অজিতকেও জয় করিয়া সর্ব্বজয়ী হইতে পারিতে।

আমার 'ঠকা-জিতা'র খতিয়ানটী এত বিস্তৃত যে, তাহা একটি মাত্র প্রবন্ধে সমাবেশ করা অসম্ভব।

অনেক সময় ভাবি, আমি স্ত্রী-পুত্র হইতে পৃথক্ হইয়া হরিসেবার চেষ্টা দেখাইতে গিয়া কি ঠকাটাই না ঠকিয়াছি! কখনও ভাবি, 'সর্ব্বস্বং বিষ্ণবে দত্ত্বা মূঢ় বর্ত্তিষ্যসে কথম্' —এই শুক্র-নীতির বিদ্রূপকারী মায়াবী বৈষ্ণবগণের কথায় পড়িয়া যাবতীয় 'আখেরের বন্দোবস্তে'র প্রতি উদাসীন হওয়ায় আমি ভীষণ ঠকিয়াছি; কখনও বা মনে করি, আমি হঠাৎ ঝোঁকে পড়িয়া বানপ্রস্থের বেশ কাষায়-বস্ত্রাদি গ্রহণ করিয়া যারপরনাই ঠকিয়াছি; সাদা পোষাকে থাকিলে "পুনর্ম্মূষিকো ভব" মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে তত বেগ পাইতে হইত না! কখনও ভাবি, আমি ব্রহ্মচারীর কাষায় বেশ পরিয়া ঠকিয়াছি; সাদা বেষ থাকিলে সমাবর্ত্তন করিবার কালে বেশী 'হৈ' 'চৈ' হইত না। আবার কখনও মনে করি,—সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থ ও ব্রহ্মচারীর সকল সুবিধা, সুযোগ ও সম্মান, এমন কি, তাঁহাদের অপেক্ষাও অধিক লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা যদি তাঁহাদের মত বেষ ও কৃচ্ছ্রতা স্বীকার না করিয়াও প্রাপ্ত হইতে পারি, তবে আমার মত 'চতুর', 'জয়ী' কে?

আমার এ-সকল 'ঠকা-জিতা'র তৌলদণ্ডের পরিমাপ কি? আমি দেখি,—আমি স্ত্রী-পুত্র হইতে পৃথক্ থাকিয়া, সর্ব্বস্ব সমর্পণের পোষাকে পরিহিত হইয়াও যতটা অধিক আদর-আপ্যায়ন না পাই, তদপেক্ষা অনেকগুণে অধিক আদর-যত্ন স্ত্রী-পুত্র-পরিবেষ্টিত জন পাইয়া থাকেন! আমি লক্ষ্য করি, এত নির্ম্মম ত্যাগ করা সত্ত্বেও মাত্র আমার নিজের ভাগ্যেও আমার কৃত বাহাদুরীর উপযুক্ত প্রশংসা ও তজ্জন্য যথোচিত আদর-সম্মান-লাভ ঘটে না, আর স্ত্রী-পুত্রাসক্ত ব্যক্তি স্ত্রী-পুত্র-পারম্পর্য্যে কিরূপ সমাদৃত ও সযত্নে পরিচর্য্যা-প্রাপ্ত হইয়া থাকেন! আমি সমস্ত বিসর্জ্জন করিয়াও প্রতিষ্ঠা পাই না; আর কোন কোন ব্যক্তি সমস্ত সংরক্ষণ করিয়াও আমা-অপেক্ষা কোটিগুণ অধিক আদর-যত্ন পাইয়া থাকেন। ইহা লক্ষ্য করিতে করিতে আমার কানে জল প্রবেশ করে—কুল-ক্রমাগত অনুর্ব্বর মস্তিষ্কটীও তখন উর্ব্বরতা-শক্তি লাভ করে—তখন আমি চিন্তা করি—'আমি করিয়াছি কি?' আমি ত' ভাল কাজ করি নাই। আমিও ত' এরূপ সবদিক্ বজায় রাখিয়া—আখেরের সকল বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া সাধুদিগের আদর-যত্ন পাইতে পারিতাম! আমি কৃষ্ণকে আমার কতটা পরিচর্য্যায় লাগাইতে পারিলাম! কৃষ্ণের জন, কৃষ্ণের ভাণ্ডার হইতে

আমার সেবায়, আমার ইন্দ্রিয়-তর্পণে, আমার প্রতিষ্ঠা-বর্দ্ধনে যতটা অধিক জমা হইল, সেই পরিমাণে আমি জিতিলাম—আর যে-পরিমাণ তাহা কম হইল, সেই পরিমাণে আমি হারিলাম—ইহাই আমার 'হারা-জিতা'র মাপ-কাঠি।

আমি মনে করি—আমি ব্রহ্মচারী হইয়া সমাবর্ত্তন করিবার সময়ই যত চীৎকার, আমি ব্রহ্মচারী হইয়া সাদা-কাপড় পরিলেই যত আপত্তি, আমি গৃহে গেলেই যত শাস্ত্র-নিষেধ, আমি পড়া-শুনা করিলেই যত অসুবিধার আশঙ্কা, আমি চাকুরী বা ব্যবসায় বাণিজ্যের দ্বারা অর্থার্জ্জন করিতে গেলেই যত সহস্রকণ্ঠে প্রতিবাদ—সকলের জন্য ত' সেরূপ নহে! আবার অন্য সময় বিনা বাধায় সমাবর্ত্তন করিতে পারিয়া, গৃহে প্রবেশ করিতে পারিয়া, অপিচ বাহ্যে আমার ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর কার্য্যে সাধু-গুরুবর্গের দ্বারা বঞ্চনা-ময় আনুকূল্য লাভ করিয়া আমি মনে করি—"আমিই জিতিয়াছি; আমার অধিকার—উন্নতাধিকার, আমি অধিকতর গুরু-বৈষ্ণবের স্নেহভাজন।" কেননা, আমি যাহাই করি, তাহাতে বিশেষ কোন তীব্র প্রতিবাদ নাই। আমি ঐ উভয় অবস্থায়—উভয় বিচারেই কিন্তু 'হারা-জিতা'র ভুল বিচার করিয়াছি। এদিকে কৃষ্ণের নিকট হইতে আমার প্রেয়ঃ পরিবর্দ্ধনের ইন্ধন আকাঙ্ক্ষা করিতে গিয়া যেরূপ আমি বঞ্চিত, আর একদিকে আমার দুর্দ্দৈব-ফলে গুরু-বৈষ্ণবের বঞ্চনাকে স্নেহ বা 'আমার উন্নতাধিকার' ভাবিয়া ততোধিক বঞ্চিত হইয়াছি। আমি যাহাকে আমার প্রতি গুরু-বৈষ্ণবের প্রগাঢ় স্নেহ মনে করিয়াছি, তাহা তত প্রগাঢ়তর বঞ্চনা। ইহার স্বরূপ গুরু-বৈষ্ণবের অবঞ্চনাময়ী কথা-কষ্টিপাথরে প্রতিফলিত। শ্রীগুরুদেব ইহাই পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করেন যে, কৃষ্ণ কখনও কাহারও ইন্দ্রিয়-তর্পণ করিতে ধাবিত হন না, ইহাই কৃষ্ণের কৃষ্ণত্ব; যাহা ইন্দ্রিয়তর্পণ করে—আমার প্রেয়ঃ সাধন করে—আমার প্রেয়ের আনুকূল্য-বিধান করে, তাহা 'কৃষ্ণ' নহে,—'কৃষ্ণ-মায়া'; তাহা কৃষ্ণ-দর্শনের যবনিকা। সাধু সাবধান! গুরু-বৈষ্ণবের স্নেহ-ভ্রমে যেন বঞ্চনাকে বরণ না করি। গুরুদেব বা বৈষ্ণব আমার জন্য যে চাকুরীটি (?) করেন আমার বহির্ম্মুখ প্রেয়ের জন্য যে কোনও প্রকার সুপারিশ বা উদ্যমের আভাসও প্রদর্শন করেন, তাঁহা আমার প্রতি তাঁহার 'স্নেহ' নহে—ইহা তাঁহার অত্যন্ত অধিক বঞ্চনা, তাঁহার স্বরূপকে—তাঁহার ভজনপথকে আমার নিকট অত্যন্ত ঘনীভূত আবরণে আবৃত রাখিবার চেষ্টা—ইহা আমার প্রতি তাঁহার অত্যন্ত নির্ম্মম দণ্ড। আমার উপর হইতে আমার নিত্য নিয়ামক যখন শাসনদণ্ড উঠাইয়া লইলেন বা সাক্ষাদ্ভাবে সেই শাসনদণ্ডের প্রয়োগ করিতে ক্ষান্ত হইলেন কিংবা আমার উপর পক্ষপাতিত্বের বাহ্য আদর্শ প্রদর্শন করিয়া আমাকে তাঁহার সেবা করিবার সুযোগ-দানের পরিবর্ত্তে তাঁহার নিকট হইতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে সেবা গ্রহণ করিবার অবসর দিলেন, তখন আমার ভাগ্য অত্যন্ত বিপর্য্যস্ত। এ বঞ্চনার ব্যূহ ভেদ করিয়া তাঁহার প্রকৃত অমন্দোদয়-দয়া-বিতরণকারি-স্বরূপ দর্শন করা তখন আমার পক্ষে সুদুষ্কর।

এরূপ 'ঠকা-জিতার, হিসাব-নিকাশ করিয়া আমি যখন দেখি যে, আমি হরিভজন করিতে আসিয়া কোন কোন ব্যাপারে ঠকিয়াছি, তখন গুরুবৈষ্ণবের নিকট হইতে সুদে-আসলে সেই ঠকার ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে বদ্ধপরিকর হই। আমি গৃহ-সুখ ছাড়িয়া যে-পরিমাণ ঠকিয়াছি—ভার্য্যা ও পুত্রাদির সুখ-দুঃখ-মিশ্রিত পরিচর্য্যা হইতে বিরত হইয়া যে-পরিমাণে ঠকিয়াছি—অর্থার্জ্জনের প্রভুত্ব ও নিয়ামকত্ব বর্জ্জন করিয়া যে-পরিমাণে ঠকিয়াছি, ঐসকল মূলধন উচ্চতম হারের চক্রবৃদ্ধি সুদসমেত ততোধিক পরিমাণে আদায় করিয়া জয়ী হইতে চাই! তখন গুরুসেবক-গণকে আমার পরিত্যক্ত ভোগ্য পদার্থের স্থানে আনয়ন করিয়া আমি আমার ক্ষতিপূরণ করিতে চাহি; তখন বহু পরিশ্রম করিয়া—মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া যোষিৎসেবা করিবার ফলে যোষিতের নিকট হইতে যে দুঃখমিশ্রিত পরিচর্য্যাটুকু পাইতাম, তৎপরিবর্ত্তে বহু সম্ভ্রান্ত বা সরল-প্রাণ আশ্রিতের (?) দ্বারা বিনা পরিশ্রমে—বিনা আয়াসে অনাবিল ভূরিসেবা লাভ করিবার চেষ্টা করি! অর্থার্জ্জনের প্রভুত্ব ও নিয়ামকত্ব অন্যভাবে অধিকতর প্রবল-পরাক্রমে পরিচালনা করিবার জন্য কৌশল আবিষ্কার করি! কখনও মনে করি, 'কামিনী' পরিত্যাগ করিয়া যে-পরিমাণ ঠকিয়াছি, তাহার সমস্ত সুদ সহ ক্ষতিপূরণ উহারই অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী কনক ও প্রতিষ্ঠাদ্বারা সাধন করিব! যখন দেখি, 'কনক' পরিত্যাগ করিয়া ঠকিয়াছি, তখন 'কামিনী'র দ্বারা কনকের ক্ষতিপূরণ সাধন করিবার চেষ্টায় থাকি! কখনও বা 'কৃষ্ণের কনক' আমার উদ্বৃত্ত ধনকোষের খতিয়ানের জমার ঘর বৃদ্ধি করিয়া আমার 'আখেরের বন্দোবস্তে'র সাধক হয়, কখনও বা কৃষ্ণের কনকে অবৈধভাবে আমার হস্ত প্রসারিত হয়। "ঠকা-জিতা"র খতিয়ান খুলিলেই এইরূপ কত কি উৎপাত উপস্থিত হয়। কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা—ইহারা পরস্পর অবিচ্ছিন্ন সহচর; একটির অভাব আর একটির দ্বারা পূর্ণ করিতে গেলেই তৎক্ষণাৎ একটি বন্ধু আর একটি বন্ধুকে ডাকিয়া আনে।

"ঠকা-জিতা"র সমস্যা আমাকে যেন কংসের কৃষ্ণচিন্তার মত পাইয়া বসিয়াছে। এখন আর হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবার চিন্তা নাই—হরিকথা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও অনুস্মরণ নাই, সেগুলি সকলই পচা সংবাদ (stale news) এর মত একঘেয়ে অথবা মুখস্থ গদ-মাত্র হইয়া পড়িয়াছে। হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবার যে মুখোসটী আছে, হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনের যে বাহ্য অভিনয়টুকু আছে, তাহাও "আমার দাঁড়ে ছোলা"র জন্য—আমি যেখানে যেখানে ঠকিয়াছি, সে-সকল স্থানের ক্ষতিপূরণ করিয়া আমার ইন্দ্রিয়ের ভাণ্ডার পূর্ণ করিবার জন্য। আমার এখন হরিকথা-শ্রবণাভিনয়—গুরুদেবকে, বৈষ্ণবগণকে ফাঁকি দিয়া অন্তরালে অন্যকার্য্য সাধনের জন্য; আমার কীর্ত্তন—শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মের শ্রবণানুশাসিত কীর্ত্তন বা আত্মোপকার ও পরোপকার চেষ্টা নহে; তাহা আমার 'কনক', 'কামিনী,' 'প্রতিষ্ঠা'-সংগ্রহের পুষ্পবাণ, আমার সেই কীর্ত্তনাভিনয়—কেবল আমার কণ্ঠস্বরের, আমার পল্লবগ্রাহিতার, আমার চৌদ্দপোয়ার রূপ-গৌরবের 'বাহাবা' কুড়াইবার যন্ত্রবিশেষ।

তোতাপাখীর মত কেবল কণ্ঠযন্ত্রমধ্যে ধার-করা কথা আবৃত্তি করিয়া আমি বলি—"দেহ কিছু না, মন কিছু না"। কিন্তু বহুরূপিণী মায়ার ভ্রূভঙ্গীবাণে যখনই বিদ্ধ হই, তখনই কার্য্যতঃ সেই বোলটীও থাকে না—তখন দেহই সারাৎসার, মনই পরাৎপরতত্ত্ব হইয়া পড়ে—তখন বাউলগণের দেহতত্ত্ব রস আস্বাদনের জন্য বাতুল হইয়া পড়ি! চাঁদবাউলের * গীত আর তখন মনে থাকে না; মন-বাউল যাহা চায়, তাহাতেই ঝাপাইয়া পড়ি। এই ত' আমার ঠকা-জিতার হিসাব-নিকাশের দৌড়!

আবার যখন দেখি, গুরু-বৈষ্ণবের সুরক্ষিত দুর্গের অভ্যন্তরে থাকিয়া আমার 'ঠকা-জিতার' হিসাব-নিকাশটী পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারে না, তখন আমি বৈষ্ণব-দুর্গের বাহিরে সরিয়া গিয়া অবৈষ্ণব-দুর্গের মধ্যে আখেরের বন্দোবস্তের হাটপত্তন করি। বৈষ্ণব-দুর্গের মধ্য হইতে যে-সকল অস্ত্র গোপনে সরাইতে পারিয়াছিলাম, এখন সেইগুলিই আমার আখেরের দিনের অবলম্বন হয়। আচার্য্যের সহিত কপটতা করায় অস্ত্রগুলির প্রয়োগ-সম্বন্ধে আচার্য্য আমাকে যে বঞ্চনা করিয়াছেন, তাহাতে আমার যথার্থ অস্ত্রকৌশল শিক্ষা হয় নাই; সুতরাং এখন ঐ সকল অস্ত্র প্রয়োগ করিতে গিয়া আমার নিক্ষিপ্ত অস্ত্রগুলি আমার উপরই প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আমাকে হনন করে। আমি আচার্য্যের সাক্ষাৎ অকপট কৃপা-লাভে বঞ্চিত হওয়ায় দূরে সরিয়া একলব্যের অনুকরণে যে 'গুরুনিষ্ঠা', 'গুরুভক্তি' প্রভৃতির নামে গুরুদ্রোহিতাচরণ বা আমার প্রতি গুরুর ব্যবহারের প্রতিশোধ লইবার অভিসন্ধিতে গুরু-বিমুখ-সমাজের চোখ ঝলসাইয়া দেই, তাহাতে আমি বিষ্ণু-মায়ার দ্বারা নিহত হই। আমি 'ঠকা-জিতা'র 'বুঝ' করিতে গিয়া অপ্রাকৃত কল্যাণ-কল্পতরু শ্রীজগদ্‌গুরুর কোটিচন্দ্রসুশীতল পাদপদ্মান্তিকে—গুরুগৃহে বাস করিতে না পারিয়া সেই একলব্যেরই আদর্শে গুরুবৈষ্ণবের সহিত পাল্লা দিবার জন্য আমার নিরয়প্রাপক গৃহে কখনও 'আশ্রম', কখনও 'সমিতি', কখনও 'মন্দির,' কখনও 'মঠ' কত কি খুলিয়া বসি; কখনও প্রচারক সাজি, প্রচারকের বেশে 'প্রতারক' হইয়া অর্থ সংগ্রহ করি, কখনও সেবাদাসীর সেবামুগ্ধ হইয়া ধাম-সেবার নামে গ্রাম্য-সেবা করি, কখনও বা অবৈধ অনুকরণ করিয়া জয়পুর হইতে বিগ্রহ আমদানী করি, কল্পনা করিয়া বিগ্রহের নাম রাখি, মহোৎসব করি, প্রকৃতি-সম্ভাষণের সুবর্ণসুযোগ আবিষ্কারের জন্য পত্র ছাপাইয়া স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে সকলকে নিমন্ত্রণ করি। সকল কার্য্যই আমার অনুকরণ—গুরু-বৈষ্ণবের সহিত প্রতিযোগিতা। আচার্য্যের কীর্ত্তিত অনুকরণ ও অনুসরণের উপদেশগুলি আমার 'ঠকা-জিতা'র উত্তেজনার প্রবল বন্যায় কোথায় ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে, ঠিক নাই। এখন গুরুদেবের সহিত—বৈষ্ণবগণের সহিত আমার ইন্দ্রিয়-রুচিকর সকল ব্যাপারে পাল্লা

* শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার বাউল-সঙ্গীত রচনায় নিজকে 'চাঁদ-বাউল' বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

দেওয়াই আমার গুরু-গৃহ-বাসকালীন যাবতীয় ক্ষতিপূরণের একমাত্র অস্ত্র হইয়াছে। অবৈধ আনুকরণিক বা পাল্লাদার হইতে গিয়া বিশ্বশ্রবা-পুত্রের উপবীত দণ্ড, বুলি, ঝুলি —যাহা কিছু অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিতেছি, তাহাতে "রাবণের বিষ্ঠা" হইয়া পড়িতেছি। 'ঠকা-জিতা'র মেরুদণ্ডস্বরূপ প্রতিষ্ঠা-শৌকরী-বিষ্ঠা আমাকে কনক-কামিনীর পদতলে নিষ্পেষিত করিয়া অবশেষে 'রাবণের বিষ্ঠা'য় পরিণত করিতেছে।

'ঠকা-জিতা'র অঙ্ক কষিতে গিয়া যখন দেখিতে পাই যে, আমার মনঃকল্পিত রায় রামানন্দের আদর্শের (?) অনুকরণেই লাভের ভাগ অধিক, তাহাতে 'যুক্ত বৈরাগ্যে'র নামে সকল রসাস্বাদনই হয়, তখন আর শ্রীরূপ-সনাতনের "এক এক বৃক্ষের তলে এক এক রাত্রি শয়ন"—এই ফল্গু-বৈরাগ্যের (?) আদর্শ গ্রহণ করিয়া ঠকিয়া লাভ কি? বিশেষতঃ "এক এক বৃক্ষের তলে এক এক দিন শয়নে"র 'রূপকথা' এখন পয়ারী পুঁথির ঠাকুরদাদাদের ঝুলির মধ্যে থাকাই ভাল—আজকালকার নবীনযুগে সে-সকল কথা চলে না। আবার অন্য প্রণালীতে "ঠকা-জিতা"র অঙ্ক কষিতে গিয়া দেখি, শ্রীরূপ-সনাতনের এক এক বৃক্ষের তলে এক এক দিন শয়ন, 'শুষ্ক চানা রুটী ভক্ষণে'র সহিত পাল্লা দেওয়া ত' মন্দ নহে,—শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের নবদ্বীপের ধর্ম্মশালার পায়খানায় প্রবেশ (?) বা মড়ার পরিত্যক্ত কাপড় (?) পরিধান কিংবা অপক্ক তণ্ডুল-ভক্ষণের (?) সহিত পাল্লা দিলেও ত' আমার লভ্যাংশ অধিক থাকে—অনেক প্রতিষ্ঠা, গোপনে অনেক কামিনী, কনক সংগ্রহ করা যায়, তখন 'ঠকা-জিতা'র অঙ্ক-কষার ফল আমাকে শ্রীরূপ-সনাতন বা শ্রীল গৌরকিশোর প্রভৃতির প্রতি একটি মুখভঙ্গীকারী মর্কট করিয়া তোলে!

আমরা কেবল খাটিয়া দেই, আর যাঁ'রা 'সেয়ানা', তাঁ'রা যত অভিনন্দনের অগ্রভাগ আত্মসাৎ করেন! ইহা দেখিয়া আমার আর 'উৎসাহ' থাকে না। 'উৎসাহ' থাকিবেই বা কেন? যে-জন্য উৎসাহ, তাহারই অভাব হইলে উৎসাহ কিরূপে থাকিবে? আমার উৎসাহ ও উদ্যম ছিল—আমার "ঠকা-জিতা"র মূলধন লইয়া। আমার ইন্দ্রিয়-তর্পণ—আমার সুখ-সুবিধা-প্রতিষ্ঠাই যদি এত কম হইল, তবে আর উৎসাহ থাকিবে কিরূপে? যদি প্রকৃত আত্মবস্তুর সেবায় উৎসাহী হইতাম, তাহা হইলে ত' অজস্র প্রতিবন্ধকে—বাধাবিপত্তিতে মহীশূরের প্রতিহত-স্রোতা কাবেরী হইতে সমুত্থিত কৃষ্ণরাজ-সাগরের ন্যায় আমার উৎসাহ-উৎস-বেগ আরও সহস্র অশ্ব-শক্তিতে বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইত।

আমি ত' আমার ইন্দ্রিয়ের লাভ-লোকসানের খতিয়ান লইয়াই প্রমত্ত থাকিলাম —অন্যমনস্ক রহিলাম—অভূতপূর্ব্ব অমন্দোদয়-দয়াবতার অতিমর্ত্ত্য আচার্য্যের কথা শুনিলাম কৈ? বুঝিলাম কৈ? তাঁহার গতিবিধি, অনুধাবন ও অনুসরণ করিলাম কৈ? আমি তাঁহার কীর্ত্তিত পথের ঠিক বিপরীত পথে চলিয়াছি, আর উহাকেই তাঁহার প্রদর্শিত পথ মনে করিয়া রাখিয়াছি। আমার হরিসেবার্থ চেতনের আত্মবৃত্তির প্রগতি

কোথায় ? হৃদয় একঘেয়ে, রুদ্ধ, পচা, দুর্গন্ধ পানাপুকুরের মত শত শত অনর্থের বীজাণু পরিপূর্ণ আমি আচার্য্যের কোন কথাই বুঝি নাই—তাঁহার প্রদর্শিত পথে এক পা'ও প্রদান করি নাই—তাঁহার মন্দিরের দ্বারেও আসিতে পারি নাই ; আমি 'ঠকা-জিতা'র অর্থনীতি লইয়া ব্যস্ত আছি বলিয়া তিনি আমার নিকট একজন মস্ত বঞ্চক সাজিয়াছেন —পরমার্থনীতি হইতে আমি সম্পূর্ণ দূরে রহিয়াছি, একথা ইঙ্গিতে আচার্য্য খুলিয়া বলিলেও আমি ঠকা-জিতার গুটীই কাঁচা-পাকা করিতেছি।

ধার-করা কথায় কতক্ষণ 'দম' রাখা যায় ?—ধার-করা বুলিতে কতক্ষন নিজের ধৈর্য্য, স্থৈর্য্য রাখা যায় ?—ধার-করা কথার কি কখনও আচরণ ও উপলব্ধির নিদর্শন পাওয়া যায় ? শ্রৌত উপলব্ধির কথা এক, ধার-করা বুলি আর এক ; শ্রৌত উপলব্ধির বাণীর মধ্যে জড়ীয় ভাষা, ছন্দ, সাহিত্য, ব্যাকরণের রূপসী মূর্ত্তি না থাকিলেও তাহা সঞ্জীবনী শক্তিতে লক্ষ্য-ভেদ করিতে পারে—জীবনহীনকে 'জীবন'দান করিতে পারে—রুদ্ধচিত্ত-সরোবরে চৈতন্যসেবার স্রোত-সহস্রধারা প্রবাহিত করিতে পারে, লোককে নিজ-আচরণের অমোঘ-শক্তিসঞ্চারে আচরণশীল করাইতে পারে। যেখানে 'আচরণ' ও 'বাণী' পৃথক্ নহে, সেখানে আচরণই—বাণী, বাণীই আচরণরূপে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া সেবা-গঙ্গোত্রী প্রকাশ করিয়াছে।

'আচরণ' নাই কেবল বাক্যবাগীশতা, 'প্রাণ' নাই, কেবল অঙ্গভঙ্গী, আত্মবৃত্তির কোন উন্মেষ নাই, কেবল দেহ ও মনের ব্যায়াম-প্রদর্শন-দ্বারা কখনও কি আত্মোপকার বা পরোপকার হইতে পারে ? ঐ সকলের দ্বারা কেবল নিজে ঠকা যায় ও অপরকে ঠকান যায়। তাহা কখনই আচার্য্যের প্রদর্শিত পথ বা শিক্ষা নহে।

ইন্দ্রিয়ের 'ঠকা-জিতা' লইয়াই আমি ব্যস্ত থাকিলাম, কিন্তু প্রকৃত লাভের জন্য ব্যাকুল হইলাম কৈ ? কৃষ্ণান্বেষণ, কৃষ্ণপ্রীতি-অনুসন্ধানের পরিবর্ত্তে মাঝপথে আমার বিবিধ ভোগান্বেষণ ; আমার ইন্দ্রিয়-প্রীতি অনুসন্ধানের বহুরূপীকে দেখিয়াই সকল কথা অন্তরাত্মায় ভুলিয়া গেলাম—বাহিরে কেবল বুলি ও অভিনয়-দোরস্ত রাখিলাম। অপরের ছিদ্রান্বেষণ করিতে গিয়া নিজের ছিদ্রের উপরে যবনিকা টানিলাম, ধার-করা বদহজমী বিচারের দ্বারা অপরের দোষ-গুণ বিচার করিতে গিয়া আত্মবিচারের মুখ আচ্ছাদন করিলাম। ধ্রুব কাচমণি অন্বেষণ করিতে আসিয়া চিন্তামণির খোঁজ পাওয়ায় কাচমণি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক চিন্তামণিরই চিরগ্রাহক হইয়াছিলেন, আর অধ্রুব আমি চিন্তামণির অন্বেষণের অভিনয় করিয়াও—চিন্তামণির খনির রাজকীয় পথের খোঁজ পাইয়াও কাচমণির মোহে আসল বস্তু হারাইলাম। আনুকরণিক বুলি-মাত্রে 'চা-খড়ি'-গোলা ও দুধ, শ্যামাঘাস ও ধান, সোণা ও ক্যামিকেলের দৃষ্টান্ত বলিতে বলিতে নিজেই দুধ ফেলিয়া চা-খড়ির গ্রাহক হইলাম, ধান ছাড়িয়া শ্যামাঘাসকে বরন করিলাম, সোণা ফেলিয়া ক্যামিকেলকে আঁচলে বাঁধিলাম। এই ত' আমার 'ঠকা-জিতা'র হিসাব-নিকাশের ফলাফল।

আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বঞ্চিত দলের অপেক্ষা আমাকে অধিক 'চতুর' সাজাইতে গিয়া আমি ঐ সকল বঞ্চিতগণ অপেক্ষাও অধিকতর বঞ্চিত হইলাম। আত্মরক্ষার কবচগুলিকেই আত্মহত্যার অস্ত্র করিয়া ফেলিলাম। সর্ব্বোচ্চতম আদর্শের কথা শ্রবণের অভিনয় করিয়া সর্ব্বনিম্নতম—এমন কি, দুর্নৈতিক, বিগর্হিত আদর্শকে আমার বরণীয় বিষয় বলিয়া স্থির করিলাম! কৃষ্ণ ছাড়িয়া—শ্রীগুরু-পাদপদ্মের অকপট অনুসরণ ছাড়িয়া নিজের হারা-জিতার হিসাব করিতে গেলে এইরূপই হয়। আর শ্রীকৃষ্ণের সহিত—শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্মের সহিত পাল্লা দিয়া (আনুকরণিক হইয়া) নিজের লভ্যাংশ খুঁজিলে কৃষ্ণমায়া জীবকে ঐরূপ উপযুক্ত পুরস্কারই প্রদান করে—বিষ্ণুমায়া জীবকে প্রাকৃত বাউল করিয়া দেয়; আমিও তাহাই হইয়াছি—আমি আজ ইন্দ্রিয়ের হার-জিতের বাউল হইয়াছি। কখনও মনে করিতেছি, যখন হরিভজনের ছলনা করিতে আসিয়াছি, তখন আমার সমগ্র জীবনে আমার ব্যক্তিগত সমগ্র ক্ষুদ্র চেষ্টায় যে-সকল ভোগ পাইতাম না, তাহা যদি কৃষ্ণের সেবার্থ সঙ্ঘবদ্ধ ব্যক্তিগণের বিরাট্ ও প্রবল চেষ্টার দ্বারা অর্জ্জন করাইয়া আমার ভোগ-ভাণ্ডারে জমা করিয়া লইতে পারি, তাহা হইলেই ত' বাজি জিতিলাম! কৃষ্ণের প্রাপ্য, কৃষ্ণের প্রকাশ-বিগ্রহের প্রাপ্য প্রতিষ্ঠা, উপায়নগুলি যদি কৃষ্ণের সেবার ছলনায়—গুরু-পূজার ছলনায়—গুরু-কৃষ্ণের গৃহে প্রবেশের অভিনয় দেখাইয়া মেকী পূজকের শালগ্রামের পৈতা-চুরির ন্যায় আত্মসাৎ করিতে পারি, তবেই লাভের নিক্তিটী আমার দিকে ভারি থাকিল। ঠকা-জিতার সমস্যা-সমাধান করিতে গিয়া সর্ব্বদাই ভাবি—কেন শ্রীগুরুদেব হইতে আরম্ভ করিয়া কৃষ্ণসেবার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ সকল সেবক আমার সুখ-সুবিধা লইয়াই সর্ব্বক্ষন ব্যস্ত থাকেন না? এদিকে আমি অন্তরে সেবা-গ্রহণের বিরাট্ প্রবৃত্তি লইয়া বাহ্যে ভোগ-স্পৃহাহীনতা বা উদাসীনতার অভিনয় প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহ করিতে থাকি, আর শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের অন্যান্য সকল কৃত্য পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বক্ষণ আমার সুখ-সুবিধার মালমসলার সরবরাহ ও উহার অনুসন্ধানার্থ-ই সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকুন। যখন দেখি, তাঁহারা আমার সুখ-সুবিধার প্রতি তত মনোযোগী হইলেন না—তাঁহারা আমার দিকে তাকাইলেন না, তখন আমি অন্তরে তাঁহাদের বিরুদ্ধে লক্ষ শ্লোকের মহাভারত (?) রচনা করিয়া—"বুক ফাটে ত' মুখ ফাটে না" এই ভীষণ যন্ত্রণাময়ী অবস্থায় পতিত হইয়া নিজের বুঝ বুঝিবার জন্য—নিজের লাভের তোলদণ্ডটী লইয়া সরিয়া পড়ি। দূর ছাই! তোমরা যখন আমার ইন্দ্রিয়-যজ্ঞের ইন্ধনই যোগাইলে না, তখন তোমাদের দলে কে থাকে? আমার দাঁড়ে ছোলার জন্যই ত' তোমাদের দলে ঢুকিয়াছিলাম—তোমাদের ঘরে প্রবেশ করিয়াছিলাম; যদি তাহাই না হইল, তখন আমার ভোগের ঘর ছাড়ি কেন?

আমি জানি, গুরুবৈষ্ণব আমার নিকট কোন্ কোন্ জায়গায় ঠেকা আছেন। কাজেই সেই সকল জায়গায় আমাকে তাঁহাদের তোষামোদ করিতেই হইবে—সেই সময়

আমিও আমার লভ্যাংশ আদায় করিয়া লইতে পারিব—আমি যত কিছুই অন্যায় করি না কেন, দায়ে পড়িলে তাঁহাদিগকে আমার পায়ে ধরিতেই হইবে। বঞ্চনার যূপকাষ্ঠে গলা পাতিতে চাহিলে এইরূপই বুদ্ধি হয়। ধন্য মায়াদেবি! তোমার বিশ্ববিস্তারিণী বঞ্চনা-বিদ্যা! অকৈতব হরিভজন এত গুহ্যতম সম্পুট-মধ্যে সংরক্ষিত বলিয়াই বুঝি তাঁহার এত মূল্য—কোটি মুক্ত-মধ্যে তাই কৃষ্ণভক্ত সুদুর্ল্লভ।

আমি আমার ইন্দ্রিয়ের হার-জিতের অঙ্ক কষিতে গিয়া আমার দুর্দ্দশার কথা সব ভুলিয়া গিয়াছি। আমার কি ভ্রম! মনে করিয়াছি, কৃষ্ণসেবায় আমার লাভ নাই—আমার সঞ্চয় নাই—কৃষ্ণেরই লাভ। কেবল ইন্দ্রিয়-সেবারই আমার লাভ! মুখে কিন্তু ঠিক আছি, কৃত্রিম মুদ্রায় বাহির-দোরস্ত আছি, কিন্তু কার্য্য-কালে আমার ঐরূপ চিত্ত-বৃত্তির কার্য্য ব্যতীত আর কিছুই নাই।

আমি মনে করিয়াছি—সম্ভোগময় চিন্তাস্রোত-পরিপোষণেই লাভ, কিন্তু গৌরজন-গণের চিন্তাস্রোত—"জীবের পক্ষে অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভ বা কৃষ্ণানুসন্ধানে নিরন্তর অতৃপ্তিময়ী চিত্তবৃত্তিই পরম মঙ্গল-লাভের পথ।" আমি কর্ম্মবুদ্ধিতে অর্থাৎ অন্তরে ফল-কামনা লইয়া শরীর ও মনকে নিয়োগ করি বলিয়াই যেন হরিসেবা-ছলনার চুক্তি-কাজ করিবার পর ধরাকে সরা-জ্ঞান করি, গুরু-সেবকগণকে আমার পরিচর্য্যার উপকরণ বিচার করি, তাঁহাদের উপর হুকুম চালাই, আমার সেবায় একটুকু ত্রুটী হইলে আর রক্ষা থাকে না! তখন আর আমাকে পায় কে? সকলে সভয়ে সকল উপকরণ লইয়া আমার সেবায় নিযুক্ত হউক্—আমি অন্তরে এই ভাব পোষণ করি। "আমার উপর বীজন-যন্ত্র প্রবাহিত হউক্—আমার পদ-সেবায় পরের হস্ত প্রসারিত হউক্—আমার ভোগের জন্য উৎকৃষ্ট ও বিশিষ্ট নৈবেদ্য প্রস্তুত হউক্—এই সকল বহু প্রচ্ছন্ন আকাঙ্ক্ষা আগ্নেয়গিরির মত আমার অন্তরকে অধিকার করে। তখন যদি কেহ কোন প্রকার হরিসেবার বা হরি-কীর্ত্তনের অবসর উপস্থিত করেন, তখন আমি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠি—এত খাটুনির পর আবার হরিকথা! যাও পারিব না—আর বকর বকর করিতে পারি না—আমার ক্রোধাগ্নির নিকট তখন আমার চতুষ্পার্শ্বস্থিত সেবকগণ ক্ষুদ্র সলভপ্রায় হইয়া সভয়ে অবস্থান করে। আহা! আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রত্যক্ষ আদর্শ হইতে আমার এই চিত্তবৃত্তি কত তফাৎ, তাহা একবার ভাবিয়া দেখিয়া লাভ-লোকসানের পরিমাপ করিয়াছি কি?

আমি আমার মক্কেলের তোষামোদে—পরিচর্য্যায়—আদর-আপ্যায়নে যতটা ব্যস্ত, অপরের কোন ব্যক্তির জন্য অনেক সময় মতলব করিয়াই যেন ততটা উদাসীন। ইহার কারণ কি? এখানেও কি আমার লাভ-লোকসানের জমা-খরচ? আমি বুঝিয়া রাখিয়াছি এবং সেরূপভাবেই আমার প্রকৃতি গঠিত হইয়া পড়িয়াছে যে, যদি আমি

আমার মক্কেলের জন্য সময় ও শক্তি প্রদান করি, তাহাতে তাঁহার নিকট হইতে যে রসদ পাওয়া যাইবে, উহার লভ্যাংশ আমার—তাহাতে আমার প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি হইবে; কিন্তু অপরের কোনও ব্যক্তির জন্য সময় ও শক্তি প্রয়োগ করিলে অপরে আমার পরিশ্রমের দ্বারা ফলপ্রাপ্তির কালে প্রতিষ্ঠার ভাগরূপ লভ্যাংশটী পাইলে আমার তাহাতে লোকসান ব্যতীত লাভ কিছুই নাই! অদ্বয়জ্ঞান-কৃষ্ণের সেবায় সকলেরই সমান স্বার্থ—কৃষ্ণই সকল ফলের প্রাপক—শ্রীগুরুপাদপদ্মের এই শিক্ষা হইতে বিচ্যুত হওয়ায় আমার ব্যক্তিগত ঠকা-জিতার হিসাব-নিকাশ করিতে গিয়া আমার এইরূপ যে সহস্র সহস্র চিত্তবৃত্তি হইয়াছে তাহাকে 'সেবা' বলিব, না অত্যন্ত কপটতাপূর্ণ 'কর্ম্মফল-ভোগবাদ' বলিব? এই জন্যই সে-দিন শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন যে, আমার সকল কার্য্যই—সকল চেষ্টাই 'কর্ম্ম' হইয়া পড়িতেছে; আমি শ্রীগুরুদেবের কোনও কথাই শুনি নাই—বুঝি নাই—শ্রীগুরুদেবের পথ দিয়াই যাই নাই—কেবল ইন্দ্রিয়ের পথ দিয়া ইন্দ্রিয়কে 'গুরু' করিয়া চলিয়াছি। তাই বলিতেছিলাম,—আমি ত' এক যুগ যাবৎ নানা প্রকার অভিনয় করিতেছি; সত্য সত্য ভাবিয়াছি কি,—'আমি ঠকিলাম, না জিতিলাম'?"

—শ্রীগৌঃ পত্রিকা ৭ম বর্ষ, ২য়-৫ম সংখ্যা।

চালনী ও সূচ

ভাই চালনী! ভাল জিনিষ ছাড়িয়া দেওয়া যাহার অভ্যাস এবং ছাইপাঁস বুকে করিয়া রাখা যাহার স্বভাব, তাহার দ্বারা সংস্কৃত শ্লোকের ছাইপাঁস অর্থ ছাড়া ভাল অর্থ প্রকাশ পাইবে কেমন করিয়া। তন্মধ্যে তুমি ভাই সংস্কৃতের 'স'ও জাননা; পঞ্চম শ্রেণীর বিদ্যায় আর কত হইবে। অল্প বিদ্যা হইলেও সংস্কৃত টোলে পড়িলে কিছু শিখিতে পারিতে। যাহা হউক 'আলোচনা-প্রসঙ্গ' লিখিতে গিয়া সংস্কৃত ব্যাকরন জানা কোন পণ্ডিতের সাহায্য লইয়া লিখিলেই ভাল হইত। অথবা তুমি যদি কাহারও সাহায্য লইয়া থাক, সে তোমার দ্বারা একটা তামাসা সৃষ্টি করিবার জন্য হরিভক্তিবিলাসের পঞ্চদশ বিলাসের ১৩শ শ্লোকটীর একটী হাস্যোদ্দীপক অর্থ লিখাইয়া দিয়াছে। আমি ক্রমশঃ তোমাকে তাহা দেখাইয়া দিতেছি। এইজন্য নিশ্চয়ই তোমার মূর্খতা প্রকাশ পাইবে, তাহাতে লজ্জিত হইলেও চটিও না! যদিও আমি জানি—তুমি চটিবে; কারণ নীতিশাস্ত্র বলে—"উপদেশোহি মূর্খানাং প্রকোপায় ন শান্তয়ে"।

স্থচের ধর্ম্ম বিচ্ছিন্ন বস্তুকে স্থত্রের দ্বারা এক করা। স্থতরাং পরস্পর মিলন, সঙ্গতি প্রভৃতি কার্য্য স্থচের দ্বারা হইয়া থাকে। বেদান্ত-স্থত্রের দ্বারা ব্যাসদেব সমস্ত শাস্ত্রের সঙ্গতি ও মিলন করিয়াছেন। হরিভক্তিবিলাসের তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে, শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি মর্ত্ত্যবুদ্ধি পরিত্যাগ করিতে হইবে। অতিমর্ত্ত্য পরমহংস গুরু-পাদপদ্মের প্রতি যাহারা অযথা জাতি বুদ্ধি করে, তাহারা তাঁহার গৌড়ীয় ভাষ্যের ভুল ধরিবেন, ইহাতে আর সন্দেহ কি! ধন্য ভাই তোমার গুরু-ভক্তি। তুমি নির্ল্লজ্য বেহায়ার মত কেমন করিয়া লিখিতে সাহস পাইলে যে, 'প্রমেয় রত্নাবলীর' (শ্রীল প্রভুপাদ-রচিত) 'গৌড়ীয় ভাষ্য' ভুল হইয়াছে। তোমরা দেখিতেছি নিজেদের দলের মত পোষণের জন্য অঘটন ঘটাইতে পার। সম্পত্তির লোভে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়কে শূদ্রে পরিণত করা বা পরমহংস মহাভাগবত বৈষ্ণবকে কোন জাতির অন্তর্গত করা তোমাদের একটা পেশা। ভাই, ইহার দ্বারা তোমাদের কোন মঙ্গল হইবে না। স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ নারদকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, ভগবদ্-বিরোধী ব্যক্তিগণেরই ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হয়। তাহার ফলে নানা দোষ আসিয়া পড়ে। যাহা হউক এক্ষণে সংস্কৃত শ্লোকের অর্থ করিতে গিয়া তুমি যে মূর্খ পঞ্চাননের পরিচয় দিয়াছ, তাহা নিম্নে প্রদর্শন করিতেছি।

ভাই তোমার কি হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থখানি আছে? না থাকিলে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির বিরাট্ গ্রন্থাগারে উহার কয়েকটী সংস্করণ দেখিয়া যাইবে।—

স্নানে বাচমনে চৈব বর্জ্জয়িত্বোদকং বুধঃ।
উপযুঞ্জীত নৈবান্যদ্-ব্রতভঙ্গোঽন্যথা ভবেৎ॥ (হঃ ভঃ বিঃ ১৫।১৩)

আমি উক্ত শ্লোকের স্বাভাবিক অর্থ যাহা লিখিয়াছি, তাহা সংস্কৃত ভাষাবিৎ পণ্ডিত-গণের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে অনুমোদিত। স্থধী পাঠকবর্গের নিকট আমি আমার প্রকাশিত ঐ শ্লোকের অর্থ নিম্নে উদ্ধার করিতেছি—

স্নানে বা আচমনেও পণ্ডিত ব্যক্তি জল বর্জ্জন করিবেন। এবং অপর সকল প্রকার উপভোগই ত্যাগ করিবেন, নচেৎ ব্রত ভঙ্গ হইবে।

উক্ত অর্থ-ই সংস্কৃত সাহিত্য-অনুযায়ী ও ব্যাকরণ-সঙ্গত অর্থ হইয়াছে কিনা পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন। আমার ঐ প্রকার অর্থের অনুমোদনে আরও দুইজন বিখ্যাত পণ্ডিতের অনুবাদ নিম্নে উদ্ধার করিতেছি।—

(১) বঙ্গাব্দ ১৩০৪ সালে শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী-কর্ত্তৃক প্রকাশিত হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে ২৮৯ পৃষ্ঠায় উক্ত 'স্নানে বাচমনে' শ্লোকের যেরূপ অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল।—

স্নানে বা আচমনেও জল ত্যাগ করা বিচক্ষণের কর্ত্তব্য, অপর সকলপ্রকার ভোগই বর্জ্জন করিবে নচেৎ ব্রত ভঙ্গ হইবে।

শ্রীযুত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার ভূমিকার 'দুই আনা' পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—"পণ্ডিত-প্রবর **শ্রীযুত কালিপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন** মহোদয় বহু পরিশ্রম স্বীকারপূর্ব্বক এই মহাগ্রন্থের আদ্যোপান্ত **অনুবাদ** ও স্থানে স্থানে আবশ্যকীয় টিপ্পনি প্রভৃতি সন্নিবেশিত করিয়াছেন।"

(২) বৈষ্ণব গ্রন্থের প্রসিদ্ধ অনুবাদক **শ্রীরাম নারায়ণ বিদ্যারত্ন** মহাশয়কৃত উক্ত শ্লোকের অনুবাদ যাহা ১৩৪৭ সালের বৈশাখ মাসে বহরমপুর রাধারমণ-যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা নিম্নে উদ্ধার করিলাম।—

স্নানে বা আচমনেতেও পণ্ডিত ব্যক্তি জল বর্জ্জন করিবেন, অন্য কোন উপভোগ করিবেন না, করিলে ব্রত ভঙ্গ হইবে।"

পাঠকবর্গ মৎকৃত অনুবাদের সহিত উক্ত পণ্ডিতগণের উল্লিখিত অনুবাদদ্বয় মিলাইয়া দেখিবেন। আমার অনুবাদ হইতে ইঁহাদের কিছুমাত্র ভেদ লক্ষিত হইবে না।

আমাদের সমালোচক শ্রীযুত * * বিদ্যারত্ন মহাশয় উক্ত শ্লোকটীর "সরল সহজ অবিতর্ক্য অনুবাদ" নাম দিয়া যে অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা পাঠকগণের সমক্ষে তাঁহার 'দেবভাষা-জ্ঞানের' পরিচয়ার্থ নিম্নে উদ্ধার করিতেছি।—

স্নান ও আচমনার্থ জল ব্যতীত বিচক্ষণ ব্যক্তি অন্য কিছু উপভোগ করিবেন না, অন্যথায় ব্রত ভঙ্গ হইবে।

এস্থলে * * প্রভুর অনুবাদ সংস্কৃত-ভাষায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের যে হাস্য আনয়ন করিবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই! হরিভক্তিবিলাসের ১৫শ বিলাসের নির্জ্জলা একাদশী-প্রসঙ্গে এই শ্লোকটী পদ্ম-পুরাণ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে 'নির্জ্জলা' বলিলে কি বুঝাইবে, তাহাই গোপালভট্ট গোস্বামীর বক্তব্য বিষয়। উক্ত শ্লোকের উদ্দেশ্য কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে জল বর্জ্জন করা আবশ্যক, তাহাই প্রকাশ করায়। 'স্নান' বা 'আচমনের' মহিমা ও তত্তৎ সম্বন্ধে কি কৃত্য তাহা প্রকাশ করা এই প্রসঙ্গের উদ্দেশ্য নহে। এই প্রসঙ্গ নির্জ্জলা উপবাস-সম্বন্ধেই লিখিত হইয়াছে। প্রতিবাদক মহোদয় ইহা সম্পূর্ণভাবে ভুলিয়া গিয়া এই শ্লোকের সদর্থ পরিত্যাগ করিয়া দেব-ভাষানভিজ্ঞ কাণ্ডজ্ঞান-রহিত ব্যাকরণ-জ্ঞানশূন্য মূর্খের ন্যায় অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন। * *

ভায়া হে! হরিভক্তিবিলাস-ধৃত "স্নানে বাচমনে চৈব বর্জ্জয়িত্বোদকং বুধঃ" শ্লোকটীর অন্বয় করিয়া তোমার অর্থের সহিত মিল করিয়া দিতে পারিবে কি? 'স্নান ও আচমনার্থ জল, যদি অনুবাদ করিতে হয়, তাহা হইলে 'স্নানে' বা 'আচমনে' বাক্যে সপ্তমী বিভক্তি রাখিবে কেমন করিয়া? স্নান ও আচমনে সপ্তমী বিভক্তি থাকায় ইহার অধিকরণ ব্যতীত কোন অর্থ-ই সঙ্গত হইতে পারে না। সাধারণ ব্যাকরণে কারক, বিভক্তির অধ্যায়ের পাতা উল্টাইলেই ইহা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে। এতদ্ব্যতীত 'বর্জ্জয়িত্বা' শব্দটী সকর্ম্মক ক্রিয়া; 'জলম্' উক্ত ক্রিয়ার কর্ম্মে দ্বিতীয়া বিভক্তি হইয়াছে।

উহা কি তুমি বুঝিতে পারিতেছ না? তোমার যদি ব্যাকরণ-জ্ঞান থাকিত, অথবা দেব-ভাষায় কিছুমাত্র অধিকার থাকিত, তাহা হইলে তুমি ঐরূপ অর্থ কখনই করিতে পারিতে না। তোমার ঐরূপ অর্থ করা দেখিয়া পণ্ডিত সমাজ তোমাকে যে বিদ্রূপ করিতেছে, তাহা বুঝিয়া উঠিবার ক্ষমতা তোমার আছে কি? তোমার অর্থ বড় চমৎকার হইয়াছে; উহা পুনরায় উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারি না। যথা—

"স্নান ও আচমনার্থ জল ব্যতীত বিচক্ষণ ব্যক্তি অন্য কিছু উপভোগ করিবে না। অন্যথায় ব্রত ভঙ্গ হইবে।" তোমার এই অনুবাদ হইতে দুইটী রহস্যের কথা মনে হইতেছে। তাহা তোমাকে স্মরণ করাইয়া দিবার পূর্ব্বে জিজ্ঞাসা করি—স্নানে ও আচমনে তুমি জল ব্যতীত আর অন্য কি কি বস্তু ভোগ করিয়া থাক, যাহা পরিত্যাগ না করিলে ব্রত ভঙ্গ হইবে? তোমার ন্যায় বিচক্ষণ ব্যক্তির পক্ষেই স্নানে ও আচমনে, জল ব্যতীত অন্য কিছু ভোগ করিবে না—ইহা উক্ত শ্লোকের দ্বারা বিধি ব্যবস্থাপিত রহিয়াছে। আমার মনে হয়, তুমি গ্রাম্য ন্যায় অনুসরণ করিয়া ঐরূপ অনুবাদ করিয়াছ। সাধারণ লোকে বলিয়া থাকে—'ডুব দিয়া জল খায়, একাদশীর বাবাও জানিতে পারে না।' এই বাক্যটী স্নান-কর্ম্মে প্রযুক্ত। আর একটী কথা মনে পড়ে—'ঠাকুর ঘরে কে?'—'কলা খাই নাই।'—এই বাক্যটী লক্ষ্য করিয়া আচমনার্থ প্রয়োগ করিয়াছ। আমরা ভাই অর্চ্চনক্ষেত্রে জানি—আচমনের সময় জল ব্যতীত অন্য কোন বস্তুই কেহ কোনদিন উপভোগ করে না। তবে তুমি যদি ঠাকুর ঘরে কলা মুখে দিয়া আচমনের ব্যবস্থা তোমাদের দলে করিয়া থাক, তাহা হইলে তোমার 'আচমনার্থ জল ব্যতীত অন্য কিছু উপভোগ করিবে না'—এইরূপ অর্থের সার্থকতা হয়। স্নানের সময়ও জল ব্যতীত অন্য কি উপভোগ সাজে, যাহা পরিত্যাগ করা বিশেষ প্রয়োজন? তোমরা কি স্নান করিতে করিতেও অনেক কিছু উপভোগ করিয়া থাক? শাস্ত্রে অনেক প্রকার স্নানের উল্লেখ আছে। তুমি কি জলস্নান ব্যতীত অপর প্রকার বৈধ স্নানগুলিকে নিষেধ করিতেছ? ভাই! সংস্কৃত শ্লোকের অর্থ করা তোমার দ্বারা কখনও সম্ভবপর হইবে না। ঐরূপ করিতে গেলেই তুমি যে কিরূপ 'বিদ্যারত্ন', তাহা ধরা পড়িয়া যাইবে।

আরও একটী কথা তোমাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি। তুমি লিখিয়াছ—শ্লোকটীতে **'বর্জ্জয়িত্বা'**-পদের অর্থ এখানে **বিনা** বা **ব্যতীত**। বিনা-শব্দটী অব্যয়; ভাবে ইহার 'বর্জ্জন' অর্থ-টী করা যাইতে পারে। কিন্তু শ্রীল সনাতন গোস্বামী ঐ শ্লোকের টীকায় 'বর্জ্জয়িত্বা বিনা ইত্যর্থ' লিখিলেন না কেন? এইরূপ লিখিলেও তোমার কৃত অনুবাদ কোন প্রকারেই 'সরল সহজ অবিতর্ক্য অনুবাদ' বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। পূজ্যপাদ টীকাকার উক্ত শ্লোকের যেরূপ অর্থ করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে স্বীকৃত —ইহা আমি মূল প্রবন্ধে জানাইয়াছি। তবে তিনি 'স্নানাচমনয়োর্যদুদকং তদ্ বিনা

ইত্যর্থ' এইরূপ টীকা করিয়া মূল শ্লোকের সরলার্থ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এইরূপ অর্থ করিবার যথেষ্ট কারণ বর্ত্তমান; কি-কারণে তিনি ঐরূপ অর্থ করিয়াছেন, তাহা আবশ্যক হইলে পরে আলোচনা করিব।

পাঠক বর্গের নিকট আমার নিবেদন,—শ্লোকের সরলার্থ বিচার করিতে গিয়া আমার নিজ-কৃত অর্থের **স্বপক্ষে** শ্রীযুত কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন ও শ্রীযুত রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন পণ্ডিত মহাশয়-দ্বয়ের অনুবাদ মিল করিয়া দেখিবেন; তাহাতে কিছুমাত্র পার্থক্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। মূল শ্লোকের অনুবাদ করিতে হইলে পূর্ব্বাপর শ্লোকগুলির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াই অনুবাদকের অনুবাদ করা কর্ত্তব্য। এস্থলে আমি হরিভক্তি-বিলাসের পূর্ব্বাপর কয়েকটী শ্লোক পাঠকবর্গের নিকট উদ্ধার করিয়া দেখাইব যে, আমি সরলার্থ গ্রহণ করিয়াছি। প্রতিবাদী ভায়া আমার, সরলার্থ গ্রহণ করেন নাই।—

অথ নির্জ্জলৈকাদশী

শ্রীভীমসেন উবাচ

পিতামহ হ্যশক্তোঽহমুপবাসে করোমি কিম্।
অতো বহুফলং ব্রূহি ব্রতমেকমপি প্রভো ॥১১॥

ব্যাস উবাচ

বৃষস্থে মিথুনস্থেঽর্কে শুক্লা হ্যেকাদশী হি যা।
জ্যৈষ্ঠে মাসি প্রযত্নেন সোপোষ্যা জলবর্জ্জিতা ॥১২॥
স্নানে বাচননে চৈব বর্জ্জয়িত্বোদকং বুধঃ।
উপযুঞ্জীত নৈবান্যদ্ব্রতভঙ্গোঽন্যথা ভবেৎ ॥১৩॥
উদয়াদুদয়ং যাবদ্বর্জ্জয়িত্বা জলং বুধঃ।
সপ্রযত্নাদবাপ্নোতি দ্বাদশ-দ্বাদশী-ফলম্ ॥১৪॥
ততঃ প্রভাতে বিমলে দ্বাদশ্যাং স্নানমাচরেৎ ॥১৫॥ ইত্যাদি

"অনন্তর নির্জ্জলা একাদশীর বিষয় কথিত হইতেছে। পদ্মপুরাণে ভীমের উক্তি আছে, হে পিতামহ! আমি উপবাসী থাকিতে অসমর্থ, অতএব কি করি? হে প্রভো, বহু-ফলপ্রদ একটী মাত্র ব্রত মৎসকাশে কীর্ত্তন করুন ॥১১॥ ব্যাস বলিলেন, বৃষরাশি বা মিথুন-রাশিগত আদিত্যে জ্যৈষ্ঠমাসে শুক্লা একাদশীতে জল পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া যত্ন-সহকারে উপবাসী থাকিবে ॥১২॥ **স্নানে বা আচমনেও জল ত্যাগ করা বিচক্ষণের কর্ত্তব্য, অপর সকল প্রকার উপভোগই বর্জ্জন করিবে, নচেৎ ব্রত ভঙ্গ হইবে** ॥১৩॥ সযত্নে এক সূর্য্যোদয় হইতে অন্যোদয় পর্য্যন্ত জল ত্যাগ করিলে দ্বাদশ দ্বাদশীর ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥১৪॥ তৎপর কৃতকৃত্য জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি দ্বাদশীর সুপ্রকাশিত প্রাতঃ-কালে স্নান করিবেন ॥১৫॥" (কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন-কৃত অনুবাদ)

উক্ত শ্লোকসমূহের অনুবাদ আলোচনা করিয়া দেখিলেই মৎকৃত অনুবাদের সত্যতা উপলব্ধি হইবে। এতদ্ব্যতীত প্রতিবাদী উপরিউক্ত ত্রয়োদশ শ্লোকে 'এব' এই শব্দের কোন অর্থ-ই করেন নাই। স্নান এবং আচমনে-'ও' জল বর্জ্জনীয়, ইহাই ব্যাসের উক্তি। তাঁয়া যেরূপ অর্থ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি 'এব'-শব্দের অর্থ পরিত্যাগ না করিলে তাহার মতবাদ স্থাপিত হয় না।

নির্জ্জলা একাদশী-প্রসঙ্গে জল বর্জ্জনের কথাই উক্ত শ্লোকের পূর্ব্বাপর সর্ব্বত্র দেখা যাইতেছে। সুতরাং জল ছাড়া অন্য বর্জ্জন করিতে হইবে অথবা অন্য বর্জ্জন করিয়া জল গ্রহণ করিতে হইবে—ইহা হরিভক্তিবিলাসের নির্জ্জলা একাদশীর প্রসঙ্গে বর্ণনীয় নহে। অবশ্য টীকাকারগণ অন্যান্য শাস্ত্রের সহিত অসামঞ্জস্য দেখিলে টীকার দ্বারা তাহার সঙ্গতি রক্ষা করিয়া থাকেন। ইহাই টীকাকারগণের পাণ্ডিত্য ও মাধুর্য্য। সনাতন গোস্বামী তাহাই করিয়াছেন। অন্যান্য ক্ষেত্রের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে গিয়া মূল শ্লোকের সাধারণ অর্থ পরিবর্ত্তন করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। সুতরাং কোন বিধি-ব্যবস্থা-ক্ষেত্রে শাস্ত্রে পূর্ব্বাপর এবং বিরোধ বাক্যাদি-সমূহের সঙ্গতি করাই বিচারকের প্রধান কর্ত্তব্য। প্রতিবাদী মাননীয় * * বিদ্যারত্ন মহোদয় যদি সমস্ত শাস্ত্রের সঙ্গতি রক্ষা করিয়া প্রতিবাদ করিতেন, তাহা হইলে আমরা আনন্দিত হইতাম এবং পণ্ডিতবর্গও তাঁহার পাণ্ডিত্যের প্রশংসা করিতেন।

—শ্রীগৌঃ পত্রিকা ৫ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা।

স্মৃতি-জ্যোতিষপর প্রবন্ধ—

শ্রীজন্মাষ্টমীর বিশুদ্ধ-বিচার

আমরা জন্মাষ্টমীর বিশুদ্ধবিচার সম্বন্ধে কয়েকটী প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ করিতেছি। এই প্রবন্ধ কয়টী পাঠকবর্গকে **পর পর পর্য্যায়ক্রমে** বিশেষ ধীরভাবে পাঠ করিয়া অনুধাবন করিতে অনুরোধ জানাইতেছি। প্রবন্ধগুলি, যথা :—

(১) হরিবাসর

(২) ব্রতাদি-পালনে বিধি ও নিষেধ

(৩) উমামাহেশ্বরী-তিথি ও যোগমায়ার জন্ম

(৪) ব্রত-পালন-সম্বন্ধে কয়েকটী বিচার

(১) হরিবাসর

'হরিবাসর বলিলে কেবলমাত্র একাদশীকে বুঝায় না। 'হরিবাসর'-শব্দে বিষ্ণু-জয়ন্তীকেও লক্ষ্য করা হয়। দ্বাদশীর প্রথমপাদের নামও 'হরিবাসর'—"দ্বাদশ্যাঃ প্রথমঃ পাদো হরিবাসর-সংজ্ঞকঃ" (হঃ ভঃ বিঃ ১৩।১ সংখ্যাধৃত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর-বচন)। একাদশীর জ্যোতিষ-শাস্ত্রীয় সংজ্ঞা—নন্দা। কিন্তু নন্দা বলিলে একাদশী ব্যতীত আরও দুইটী তিথিকে লক্ষ্য করা হয়। "প্রতিপদেকাদশী ষষ্ঠী নন্দা জ্ঞেয় মনীষিভিঃ"—নন্দা বলিতে একাদশী ব্যতীত প্রতিপৎ ও ষষ্ঠীতিথিকেও লক্ষ্য করে। তথাপি ক্ষেত্রবিশেষে 'নন্দা'-শব্দে কেবল একাদশীকেই বুঝায়। তদ্রূপ 'হরিবাসর' বলিলে ক্ষেত্রবিশেষে কেবল একাদশীকেই বুঝাইলেও দ্বাদশী, জয়ন্তী প্রভৃতিকে বুঝাইবে না—ইহা কখনও শাস্ত্রকার-গণের অভিমত নহে। আমরা শাস্ত্রে বহু ক্ষেত্রে দেখিতে পাই, হরিবাসর বলিলে দ্বাদশী ও জয়ন্তীকে স্পষ্ট করিয়া লক্ষ্য করা হইয়াছে—ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বিভিন্ন শাস্ত্রাদিতে বহুস্থলে একাদশীকে **'শ্রীকৃষ্ণব্রতবাসর', 'কৃষ্ণবাসর'** প্রভৃতি বলা হইয়াছে। নিম্নে তাহার প্রমাণ উদ্ধৃত হইল :—

সত্যং সর্ব্বাণি পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকানি চ।
সন্ত্যোবৌদনমাশ্রিত্য **শ্রীকৃষ্ণব্রতবাসরে** ॥

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ-শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ২৬।১৩)

সশল্যং যে প্রকুর্ব্বন্তি **বাসরং কৃষ্ণসংজ্ঞকম্**।
প্রেতত্বং দুঃসহং পুত্র দুঃসহা যমযাতনাঃ ॥

(হরিভক্তিবিলাস ১২।৯৫ সংখ্যাধৃত দ্বারকা-মাহাত্ম্য)

আবার জন্মাষ্টমীকেও **'কৃষ্ণবাসর'** প্রভৃতি বলা হইয়াছে, যথা—

অতীতানাগতস্তেন কুলমেকোত্তরং শতং।
পাতিতং নরকে ঘোরে ভুঞ্জতা **কৃষ্ণবাসরে** ॥

(হরিভক্তিবিলাস ১৪।১৪৬)

উক্ত শ্লোকের টীকায় শ্রীল সনাতন গোস্বামী লিখিয়াছেন—**"কৃষ্ণবাসরে শ্রীকৃষ্ণ-জন্মদিনে।"** তিনি "একাদশ্যাং ন ভোক্তব্যং কর্ত্তব্যো জাগরঃ সদা। পলার্দ্ধেনাপি বিদ্ধন্ত ভোক্তব্যং **বাসরং** তব॥ (হঃ ভঃ বিঃ ১০।৩৫৯) শ্লোকের টীকায়ও 'বাসর'-শব্দের অর্থ **"বাসরং একাদশী জন্মাষ্টম্যাদি"** বলিয়া লিখিয়াছেন। 'আদি'-শব্দে রামনবমী, নৃসিংহ-চতুর্দ্দশী প্রভৃতিকে বুঝায়। "ইত্থঞ্চ জন্মাষ্টম্যাদি" (১২।১৪৩) শ্লোকের টীকায় গোস্বামিপাদ জানাইয়াছেন—**"আদি-শব্দেন রামনবমী নৃসিংহচতুর্দ্দশ্যাদি ॥"** এতদ্-

ব্যতীত তিনি হরিভক্তিবিলাসের টীকায় 'ব্রত'-শব্দের অর্থ **"ব্রতানি একাদশী-জন্মাষ্টমী-কার্ত্তিকাদি নিয়মাঃ"** ও 'পর্ব্ব'-শব্দে **"পর্ব্বাণি জন্মাষ্টমী চাতুর্ম্মাস্যৈকা-দশ্যাদীনি"** এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া হরিভক্তিবিলাসের বিভিন্ন স্থানে :—একাদশীকে 'হরের্দ্দিন' (১২।৮৯, ১৩,১১১), (১) **'বৈষ্ণবীতিথি'** (১২।১৪৯ ও টীকা) 'হরিদিন' (১২।১১৩); ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে :—একাদশী তিথিকে (২) **'শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতিজনক'** (কৃষ্ণজন্মখণ্ড ২৫।৪); পদ্মপুরাণে :—একাদশীকে 'হরের্দ্দিন', 'বাসুদেবদিন' (৩) **'বাসুদেববাসর'**, 'বাসুদেবদিবস' (ক্রিয়াযোগসার ১৪শ অধ্যায়), 'বিষ্ণোর্দ্দিবস' (ক্রিয়াযোগসার ১৫শ অঃ), 'হরিদিন', (৪) **'পদ্মনাভদিন'** (স্বর্গখণ্ড ১৫শ অঃ), 'বিষ্ণুদিন', (৫) **'জগন্নাথবল্লভা'**, (৬) **'জয়ন্তীবাসর'** (সর্গখণ্ড ৪৪শ অঃ), (১) **'বৈষ্ণবী তিথি'**, 'মদ্দিন', 'মম বাসর' (উত্তরখণ্ড ২১শ অঃ) 'বিষ্ণুব্রত', 'হরের্বাসর', (৫) **'বিষ্ণুবল্লভা'**, (৭) **'হরিপ্রিয়া'** (উত্তরখণ্ড ২২শ অঃ), 'বিষ্ণোর্বাসর' (ঐ ২৩শ অধ্যায়), (৮) **'পাপনাশিনি'** (ঐ ২৪শ অঃ) প্রভৃতি বলা হইয়াছে।

আবার হরিভক্তিবিলাসের বহুস্থলে :—জন্মাষ্টমীকে (১)**'বৈষ্ণবীতিথি'** (১৫।১৫৮), (৩) **'কৃষ্ণবাসর'** (১৫।১৪৬), (৮) **'পাপনাশিনী'** (১৫।১৫৮), (৫) **'কৃষ্ণবল্লভা,** (১৫।১৪১) ; ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে :—জন্মাষ্টমী তিথিকে (২) **'শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিহেতুক'** (কৃষ্ণজন্মখণ্ড ৮।৫), (৬) **'জয়ন্তী-বাসর'** (কৃষ্ণজন্মখণ্ড ৮।৬৫) ; পদ্মপুরাণেঃ—জন্মাষ্টমীকে (৬) **'জয়ন্তী-বাসর'** (স্বর্গখণ্ড ৩৭শ অঃ, উত্তর খণ্ড ১৯শ অঃ), (৭) **'হরিপ্রিয়া'** (উত্তর খণ্ড ২৪শ অঃ), (৫) **'হরিবল্লভা'**, (৪)**'পদ্মনাভবাসর'** (স্বর্গখণ্ড ৩৭শ অঃ), 'জন্মবাসর', 'হরের্ব্রত' প্রভৃতি আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত একাদশীকে **ব্রত** এবং জন্মাষ্টমীকে **'মহাব্রত'** বলিয়াও উল্লিখিত হইয়াছে (পদ্মপুরাণ, ভূমিখণ্ড)। সুতরাং শাস্ত্রের বহুস্থলে 'একাদশী' ও 'জন্মাষ্টমী'—শব্দের পরস্পর সাম্য-সম্বন্ধ লক্ষ্য করা যাইতেছে। এসম্পর্কে শ্রীহরিভক্তিবিলাসের—দশমী 'হরিদিন' এবং উহাতে কেশবব্রত (১৩।২-৩), একাদশী-সংকল্প-বাক্যে শ্রীকৃষ্ণপূজাবিধি (১৩।৯), দ্বাদশীতে দেবকীসূনুর মাহাত্ম্য-পাঠে একাদশী অপেক্ষা ফল-শ্রেষ্ঠত্ব (১৩।৭২-৭৩), "একাদশ্যাদি জাগরঃ" শ্লোকের টীকা (১১।৩৭৭) প্রভৃতি বিশেষভাবে আলোচ্য।

সুতরাং উক্ত প্রমাণাদি বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, হরি-বাসর' বলিলে একাদশী ও জন্মাষ্টম্যাদি জয়ন্তী-তিথিসমূহকেও লক্ষ্য করে। প্রতিপক্ষগণ শাস্ত্রযুক্তিমূলে কখনই ইহার প্রতিবাদ করিতে সক্ষম হইবেন না। যদি জন্মাষ্টমী প্রভৃতিকে 'হরিবাসর' বলিয়া গ্রহণ করিতে কোন বাধা না থাকে, তাহা হইলে "হরিবাসরবর্জ্জিতা" (হঃ ভঃ বিঃ ১২।১২০) বাক্যের অর্থে আমরা জন্মাষ্টমীকেও পাইয়া থাকি।

(২) ব্রতাদি পালনে বিধি নিষেধ

আমরা ব্রতাদি পালন করিতে গিয়া কেবলমাত্র বিধিকেই অবলম্বন করিলাম, নিষেধকে অগ্রাহ্য করা হইল—এইরূপ হইলে ব্রতের সুষ্ঠুতা পালন হয় না। শাস্ত্রে যেরূপ পালন করিতে আদেশ দিয়াছেন, সেইরূপ নিষেধ গর্হন করিবার আদেশও প্রদত্ত হইয়াছে। 'অন্বয়' ও 'ব্যতিরেক' যুগপৎ সমভাবে গৃহীত না হইলে শাস্ত্র-উল্লঙ্ঘন-জনিত প্রত্যবায়-দোষে দোষী হইতে হয়। একপক্ষে যেমন বিধি পালন করিতে হইবে, সঙ্গে সঙ্গে অপর-পক্ষে নিষেধও গর্হণ করিতে হইবে। **ব্রতাদি-পালনে আমরা কেবল নিষেধই গর্হণ করিব, বিধি পালন করিব না—ইহা সর্ব্বতোভাবে সুষ্ঠু বিচার নহে।** ব্রতাদি পালনে পূর্ব্বতিথি-সংস্পর্শ-দোষ অগ্রাহ্য করিতে হইবে—ইহা নিষেধার্থক ক্রিয়া; অপরপক্ষে পরতিথি-সংযোগে গ্রহণ করিতে হইবে—ইহা বিধিবাক্য। জন্মাষ্টমী পালনে পূর্ব্বতিথিতে সপ্তমী-সংযোগে যেরূপভাবে পরিত্যাগ করিতে হইবে, ঠিক সেইরূপভাবেই পরতিথি নবমী-সংযোগে অষ্টমী পালন করিতে হইবে—ইহা বিধিবাক্য। সুতরাং আমাদের সর্ব্বদা কর্ত্তব্য—সপ্তমী-সংযোগ পরিত্যাগ করিয়া নবমী-সংযোগে উপবাস করা। কেহ যদি সপ্তমী-সংযোগ-পরিত্যক্ত অষ্টমীতেই উপবাস মনে করেন, তাহা হইলে শাস্ত্রের এক পক্ষ রক্ষা করা হইল, অপরপক্ষ রক্ষিত হইল না। অর্থাৎ পরতিথি-যোগে উপবাস—ইহা পালিত হইল না। এসম্বন্ধে শ্রীহরিভক্তিবিলাসে শ্রীল সনাতন গোস্বামী যেসকল বিধি ও নিষেধ-বাক্য আমাদিগকে পালন ও গর্হণের জন্য জানাইয়াছেন, নিম্নে তাহার কয়েকটী শ্লোক উদ্ধার করিলাম—

(ক) **পরবিদ্ধা সদা কার্য্যা, পূর্ব্ববিদ্ধাস্তু বর্জ্জয়েৎ।**
অষ্টমী সপ্তমীবিদ্ধা হন্যাৎ পুণ্যং পুরাকৃতম্‌ ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১৫।১৮১)

[সর্ব্বদা পূর্ব্ববিদ্ধা অর্থাৎ সপ্তমীবিদ্ধা পরিত্যাগ করিয়া **(নিষেধ-বাক্য),** পরবিদ্ধায় অর্থাৎ নবমীবিদ্ধায় ব্রত করিবে **(বিধি-বাক্য),** যেহেতু সপ্তমীবিদ্ধা অষ্টমী পূর্ব্বকালের সঞ্চিত পুণ্যসকল বিনষ্ট করিয়া দেয়।]

(খ) **বর্জ্জনীয়া** প্রযত্নেন **সপ্তমীসংযুতাষ্টমী।**
বিনা ঋক্ষেণ **কর্ত্তব্যা নবমীসংযুতাষ্টমী।**

(হঃ ভঃ বিঃ ১৫।১৭৫)

[সপ্তমী-সংযুক্তা অষ্টমী যত্নসহকারে বর্জ্জন করিবে **(নিষেধ-বাক্য),** রোহিণী নক্ষত্রের যোগ না থাকিলেও কেবল নবমীযুক্তা অষ্টমীতে ব্রত করিবে **(বিধিবাক্য)।**]

(গ) **জন্মাষ্টমীং পূর্ব্ববিদ্ধাং** সঋক্ষাং সকলামপি।
বিহায় নবমীং শুদ্ধামুপোষ্য ব্রতমাচরেৎ ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১৫।১৭৬)

[সম্পূর্ণ রোহিণী-নক্ষত্র-সংযুক্ত জন্মাষ্টমী হইলে পূর্ব্ববিদ্ধা পরিত্যাগ করিয়া (**নিষেধ-বাক্য**), কেবল নবমীতে উপবাস করিয়া ব্রত করিবে (**বিধি-বাক্য**)।]

(ঘ) বিনা ঋক্ষেণ **কর্ত্তব্যা নবমীসংযুতাষ্টমী।**
সঋক্ষাপি **ন কর্ত্তব্যা সপ্তমীসংযুতাষ্টমী ॥**

(হঃ ভঃ বিঃ ১৫।১৭৬)

[রোহিণী-নক্ষত্র ব্যতিরেকেও নবমী-সংযুক্ত অষ্টমীতে ব্রত করিবে (**বিধি-বাক্য**), কিন্তু রোহিণী-নক্ষত্রান্বিত সপ্তমী-বিদ্ধা অষ্টমীতে ব্রত করিবে না (**নিষেধ-বাক্য**)।]

পূজ্যপাদ শ্রীল সনাতন গোস্বামীর উল্লিখিত (ক), (খ), (গ) ও (ঘ) চিহ্নিত শ্লোক-চতুষ্টয়ে বিধি ও নিষেধ-বাক্য সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। সপ্তমী-বিদ্ধা অষ্টমীতে উপবাস করিতে হইবে না—ইহা যেরূপ **নিষেধ-বাক্য**, তদ্রূপ নবমীযুক্তা অষ্টমীতে উপবাস করিতে হইবে—ইহা **বিধি-বাক্য**। ব্রত-পালন করিতে হইলে শাস্ত্রের উক্ত উভয় বাক্যই অবশ্য স্বীকার ও আদর করিতে হইবে।

এস্থলে একটী বিচার বিশেষভাবে লক্ষ্য করা আবশ্যক। জন্মাষ্টমীর উপবাস করিতে হইলে নবমীযুক্তা অষ্টমীর উপবাসের বিধি কেন? শাস্ত্রকারগণের জন্মাষ্টমীর পর নবমী-তিথির এত মর্য্যাদা দিবার কারণ কি? ইহা বৈষ্ণবমাত্রেরই অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। এতৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে গিয়া হরিভক্তিবিলাসে শ্রীসনাতন গোস্বামী যে-কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা আমরা পাঠকবর্গকে জানাইতেছি।

(৩) উমামাহেশ্বরী-তিথি ও যোগমায়ার জন্ম

অষ্টমী নবমীবিদ্ধা **উমামাহেশ্বরী তিথিঃ।**
সৈবোপোষ্যা সদা পুণ্যকাঙ্ক্ষিভিরোহিণীং বিনা ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১৫।১৮১)

[অষ্টমী যদি নবমী-বিদ্ধা হয়, তাহা হইলে উহার নাম—**উমামাহেশ্বরী-তিথি**। যাঁহারা পুণ্য আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহারা রোহিণী-যোগ ব্যতিরেকেও সর্ব্বদা ঐ তিথিতে উপবাস করিবেন।]

নবমী-তিথিতে উপবাসের মাহাত্ম্য "উমামাহেশ্বরী-তিথি"তেই প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে হরিভক্তিবিলাসে শ্রীল সনাতন গোস্বামী আরও জানাইয়াছেন যে, অষ্টমী-

তিথিতে হরির (কৃষ্ণের) জন্ম হইয়াছে এবং তৎপরেই নবমী-তিথিতে যোগনিদ্রা বা যোগমায়াদেবীর জন্ম হইয়াছে। সুতরাং লীলাবিস্তারিণী শক্তি যোগমায়াদেবীর জন্ম-তিথিকে উল্লঙ্ঘন করিয়া জন্মাষ্টমীর উপবাস 'রাজ্যহীন রাজার পূজা'র ন্যায় নিরর্থক হইয়া পড়ে। সুতরাং গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের পক্ষে লীলাবিস্তারিণী শক্তি যোগমায়াদেবী, সর্ব্বতোভাবে যিনি কৃষ্ণলীলা প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহার জন্মতিথিকে উল্লঙ্ঘন করা উচিত নহে। বিশেষতঃ কৃষ্ণের জন্মলীলা-প্রকাশে যোগনিদ্রাই প্রধানা নায়িকা। কৃষ্ণজন্মের সঙ্গে সঙ্গে যোগমায়ার জন্ম—ইহা কৃষ্ণ-জন্মাষ্টমীর প্রধান আলোচ্য বিষয়। জন্মাষ্টমী-তিথি পালন করিতে হইলে যোগমায়াদেবী-কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের এই জন্মলীলা অবশ্য পাঠ্য, আলোচনীয় ও স্মরণীয়। যে-ক্ষেত্রে আমরা কৃষ্ণ-জন্মদিনে যোগমায়ার স্মৃতি কোনক্রমেই বিস্মৃত হইতে পারি না, সে-ক্ষেত্রে যোগমায়াদেবীর জন্মতিথি কি করিয়া উপেক্ষিত হইবে? তজ্জন্যই শাস্ত্রকারগণ সর্ব্বত্রই নবমীযুক্তা জন্মাষ্টমীতে ব্রতের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সপ্তমী-বিদ্ধা অষ্টমী পরিত্যক্ত হইলেও, কেবলমাত্র অষ্টমীতে জন্মাষ্টমী-ব্রত-পালন সুসঙ্গত নহে। এইপ্রসঙ্গে শ্রীহরিভক্তিবিলাসে সনাতন গোস্বামী জানাইয়াছেন—

নবম্যাং যোগনিদ্রায়াঃ জন্মাষ্টম্যাং হরেস্ততঃ।

নবম্যা সহিতোপোষ্যা রোহিণী-বুধ-সংযুতা ॥ (হঃ ভঃ বিঃ ১৫।১৭০)

উক্ত শ্লোকে দেখা যাইতেছে যে, নবমীতে যোগনিদ্রার জন্ম হইয়াছে এবং অষ্টমীতে শ্রীহরি কৃষ্ণের আবির্ভাব হইয়াছে। এইজন্যই যোগনিদ্রার জন্ম এবং কৃষ্ণজন্ম উভয়েরই মিলিত তিথিতে জন্মাষ্টমী-ব্রত পালন করার বিধি শাস্ত্রকারগণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বিশেষতঃ শিব এবং পার্ব্বতী অর্থাৎ উমা ও মহেশ্বর উভয়েই এই নবমীযুক্তা অষ্টমীতে ব্রত করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার বিশেষ সংজ্ঞা—"উমা-মাহেশ্বরী-তিথি"। "বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ।" আমরা শম্ভুকে বৈষ্ণবাচার্য্য বলিয়া সম্মান করিয়া থাকি। সুতরাং তাঁহার সস্ত্রীক আচরিত জন্মাষ্টমী-ব্রত সর্ব্বতোভাবে গ্রহণীয়। এতদ্ব্যতীত আমরা অন্যান্য শাস্ত্রেও যোগনিদ্রার জন্ম-প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণজন্মের সঙ্গে-সঙ্গেই নবমী-তিথিতেই লক্ষ্য করিয়া থাকি। এ-সম্বন্ধে হরিবংশে—

যা তু সা নন্দগোপস্য দয়িতা ভুবি বিশ্রুতা।
যশোদা নাম ভদ্রং তে ভার্য্যা গোপ-কুলোদ্বহা ॥
তস্যাস্ত্বং নবমো গর্ভঃ কুলেঽস্মাকং ভবিষ্যসি।
নবম্যামেব সঞ্জাতা কৃষ্ণপক্ষস্য বৈ তিথৌ ॥
অহং '**ত্বভিজিতো যোগে**' নিশায়াং যৌবনে স্থিতে।
অর্দ্ধরাত্রে করিষ্যামি গর্ভমোক্ষং যথাসুখম্ ॥
অষ্টমস্য তু মাসস্য জাতাবাবাং ততঃ সমম্ ॥

(হরিবংশ-বিষ্ণুপর্ব্ব ২।৩৪-৩৭)

[হে দেবি ! তোমার মঙ্গল হউক, গো-পতি নন্দগোপের যশোদা নাম্নী যে গোপকুল-শ্রেষ্ঠা দয়িতা ভার্য্যা আছে, তুমি আমাদের কুলের নবম-গর্ভস্বরূপ হইয়া তদীয় গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবে। **তুমি কৃষ্ণপক্ষের নবমী তিথিতে জন্মগ্রহণ করিবে** এবং আমিও অর্দ্ধরাত্রে সময় **'অভিজিৎ-যোগে'** গর্ভ হইতে যথাসুখে নির্গত হইবে এবং আমরা অষ্টম মাসেই সমকালে প্রসূত হইয়া বসুদেব কর্তৃক পরিবর্ত্তিত হইব।]

যোগমায়া ও কৃষ্ণের জন্ম সম্বন্ধে হরিবংশে আরও বিস্তারিত লিখিয়াছেন। নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল—

দেবক্যজনয়দ্বিষ্ণুং যশোদা তাং তু দারিকাম্।
মুহূর্ত্তেঽভিজিতি প্রাপ্তে সার্দ্ধরাত্রে বিভূষিতে॥

(হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব্ব ৪।১৪)

[বিভূষিত অর্দ্ধরাত্র-সময়ে **'অভিজিৎ'** নামক মুহূর্ত্তে দেবকী বিষ্ণুকে (বাসুদেব)ও যশোদা সেই কন্যাকে (যোগমায়া) প্রসব করিলেন।]

মহাভারতের টীকাকার আচার্য্য শ্রীনীলকণ্ঠ-কৃত উক্ত শ্লোকের টীকাও এতৎপ্রসঙ্গে বিশেষ আলোচ্য :—"দেবকী বিষ্ণুম্ 'অভিজিতি মুহূর্ত্তে'ঽজনয়ৎ। 'বিভূষিতে' বিভোঃ বিষ্ণোঃ উষিতে প্রোষিতে ব্রজং প্রতি প্রবাসে জাতে সতি 'সার্দ্ধরাত্রে' চতুর্ভাগায়া রাত্রেঃ সার্দ্ধভাগেঽবশিষ্টে সতি যশোদা তাং কন্যকামজনয়দিত্যর্থঃ। **অর্দ্ধরাত্রে জাতস্য বিষ্ণোর্যশোদাং প্রতি আনয়নে অর্দ্ধযাম-মাত্রং জাতং তদানয়ন-সমকালমেব যশোদা দারিকামসূত, অতএব তস্যাঃ জন্ম নবম্যামিতি** প্রাগুক্তং সঙ্গচ্ছতে।"

'বিভূষিতে' অর্থাৎ বিভু বিষ্ণুর উষিতে, প্রকৃষ্টরূপে 'উষিতে' অর্থাৎ ব্রজের প্রতি প্রবাসে গমনকালে, 'সার্দ্ধরাত্রে' অর্থাৎ রাত্রির চতুর্থভাগে **দেবকী 'অভিজিৎ-মুহূর্ত্তে' বিষ্ণু অর্থাৎ কৃষ্ণকে প্রসব করিলেন এবং অবশিষ্ট অর্দ্ধরাত্র-ভাগে যশোদা সেই কন্যাকে (যোগমায়াকে) প্রসব করিলেন।** অর্দ্ধরাত্রে প্রসূত বাসুদেবকে যশোদার নিকট আনয়নে **অর্দ্ধযামমাত্র** অর্থাৎ ৯০ মিনিট সময় অতিবাহিত হয়। উক্ত সময় মধ্যে যশোদা যোগমায়াদেবীকে প্রসব করেন। অতএব যোগমায়া-দেবীর জন্ম নবমীতে। ইহা পূর্ব্বেও উক্ত হইয়াছে।

আচার্য্য নীলকণ্ঠ উক্ত টীকায় যোগমায়াদেবীর জন্ম সম্বন্ধে যেরূপ সুস্পষ্ট উক্তি করিয়াছেন, সেইরূপ কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। সমস্ত ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের আচার্য্য-বর্গই মহাভারতের নীলকণ্ঠ-টীকার সম্মান করিয়াছেন। সুতরাং উক্ত টীকা আলোচনায় আমরা প্রকৃষ্টরূপে বুঝিতে পারি যে, কৃষ্ণের জন্মরাত্রির প্রথম অর্দ্ধ-ভাগের শেষ মুহূর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইয়াছিল এবং অবশিষ্ট অর্দ্ধরাত্রের প্রথম মুহূর্ত্তে যোগমায়াদেবী জন্মগ্রহণ করেন। এইজন্যই শাস্ত্রকারগণ তারস্বরে মেঘগম্ভীর হুঙ্কারে সর্ব্বত্র নবমীযুক্তা অষ্টমীতে জন্মাষ্টমীর ব্রত নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। ইহা উপেক্ষা করা কোন বৈষ্ণবের সঙ্গত হইবে কি ?

(৪) ব্রত-পালন-সম্বন্ধে কয়েকটী বিচার

(ক) শ্রীহরিভক্তিবিলাসে পূজ্যপাদ শ্রীল সনাতন গোস্বামীর উপদেশ :—

একাদশী তথা ষষ্ঠী পৌর্ণমাসী চতুর্দ্দশী।
তৃতীয়া চ চতুর্থী চ অমাবশ্যাষ্টমী তথা।
উপোষ্যাঃ পরসংযুক্তা নোপোষ্যাঃ পূর্ব্বসংযুতাঃ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১২।৭৪)

[একাদশী, ষষ্ঠী, পৌর্ণমাসী, চতুর্দ্দশী, তৃতীয়া, চতুর্থী, অমাবশ্যা এবং অষ্টমী—এই সকল পরসংযুক্ত হইলে উপবাসযোগ্য, পূর্ব্বসংযুক্ত হইলে উপবাসযোগ্য হয় না।]

বৃহন্নারদীয়পুরাণেও এসম্বন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে—

একাদশ্যষ্টমী ষষ্ঠী পৌর্ণমাসী চতুর্দ্দশী।
অমাবশ্যা দ্বিতীয়া চ উপবাস-ব্রতাদিষু॥
পরবিদ্ধাঃ প্রশস্তাঃ স্যুর্ন গ্রাহ্যাঃ পূর্ব্বসংযুতাঃ॥

(বৃহন্নারদীয়পুরাণ ২৭।৩-৪)

[উপবাস প্রভৃতি ব্রতে একাদশী, অষ্টমী, ষষ্ঠী, পূর্ণিমা, চতুর্দ্দশী, অমাবশ্যা এবং দ্বিতীয়া—এই সমস্ত তিথি পরতিথির যোগে প্রশস্ত ; পূর্ব্বতিথির সহিত সংযুক্ত হইলে গ্রহণ করিবে না।]

এস্থলে বিচার্য্য এই যে, ব্রতাদি ব্যতীত অনেকেই তিথি পালন করিয়া থাকেন। ইহাও যদিও একপ্রকার ব্রত তথাপি ইহাকে সাধারণতঃ তিথি-পালন বলে। এস্থলে আমার বক্তব্য এই, যাঁহারা তিথি পালন করিতে গিয়া অষ্টমী তিথি পালন করিবেন, তাঁহাদের পক্ষে প্রতিমাসে কৃষ্ণ ও শুক্লপক্ষের অষ্টমীতে উপবাস বিধেয়। এবং সেই অষ্টমী নবমী-সংযুক্তা না হইলে উপবাসযোগ্য নয়।

(খ) শাস্ত্র বলেন,—এক তিথি তিন দিবসকে স্পর্শ করিলে 'ত্র্যহস্পর্শ' হইয়া থাকে ; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের পঞ্জিকাকারগণ একদিবসে ৩টী তিথির স্পর্শ হইলে তাহাকে ত্র্যহস্পর্শ লিখিয়া থাকেন। ইহা শাস্ত্রসঙ্গত সুবিচার নহে। 'ত্র্যহস্পর্শ' ও 'অবম' উভয়ই অশুভ। ইহাতে শাস্ত্রকারগণ কোন শুভ কার্য্যের বিধান দেন নাই। বর্ত্তমান পঞ্জিকাকার-গণের মত :—তাঁহারা এক তিথি সাবন-তিন-দিবসকে স্পর্শ করিলে তাহাকে 'ত্র্যহস্পর্শ' না বলিয়া 'অবম' বলিয়া থাকেন। এই অবম বা ত্র্যহস্পর্শ তিথিতে কোন শুভ কার্য্য সম্পন্ন হওয়া উচিত নহে। তজ্জন্য শাস্ত্রকারগণ বলেন—

"স্যুস্তিস্রস্তিথয়ো বারে একস্মিন্নবমা তিথিঃ।
তিথিবারত্রয়ে চৈকা ত্রিদ্যুস্পৃগ্‌ দ্বেহপি নিন্দিতে॥

কৃতং যন্মঙ্গলং তত্র ত্রিদ্যুস্পৃগবমে দিনে।
ভস্মীভবতি তৎ ক্ষিপ্রমগ্নৌ সম্যগ্‌ যথেন্ধনম্ ॥" (বশিষ্টসংহিতা)

এসম্বন্ধে রত্নমালা টীকায় বলিয়াছেন—**"যাবদবম-ত্রিস্পৃশোর্ভোগস্তাবন্ন শুভকর্ম্ম কুর্য্যাৎ।"**

সুতরাং বর্ত্তমান বর্ষের ৭ই ভাদ্র জন্মাষ্টমী এক সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া অন্য সূর্য্যোদয়ের পরেও অবস্থিত থাকায় উহা বর্ত্তমান মতে 'অবম' অথবা অন্যমতে 'ত্র্যহস্পর্শ' হইয়াছে। এই দিবস কোন শুভকার্য্য সমাধা হইতে পারে না। আমাদের মতে পরদিবসে জন্মাষ্টমী-ব্রত করিলে এইরূপ দোষ ঘটিবে না।

(গ) শ্রীহরিভক্তিবিলাস বলেন—জন্মাষ্টমী একাদশীর ন্যায় পূর্ব্ববিদ্ধা পরিত্যাগ করিয়া পালন করিতে হইবে। ইহার দ্বারা আমরা কি কেবল ইহাই বুঝিব যে, একাদশীতে বিদ্ধা উপবাসে যে দোষ, জন্মাষ্টমীর বিদ্ধা উপবাসে সেই দোষ, ইহা ছাড়া অন্য কিছু বুঝাইবে না?—অথবা স্মার্ত্তমতে একাদশী সূর্য্যোদয়-বিদ্ধা পালন না করিলে যে দোষ হইবে, জন্মাষ্টমীও সূর্য্যোদয়বিদ্ধা হইলে সেইরূপ দোষ হইবে? এস্থলে আমাদের বক্তব্য এই যে, হরিভক্তিবিলাসে স্মার্ত্তমতে একাদশী পালিত না হইলে অর্থাৎ সূর্য্যোদয়-বিদ্ধা একাদশী পালিত না হইলে যে কি দোষ হইবে, তাহা কুত্রাপি লিপিবদ্ধ হয় নাই। অথচ হরিভক্তিবিলাস বলেন—

ইত্থঞ্চ **জন্মাষ্টম্যাদি** ব্রতান্যপি ন বৈষ্ণবৈঃ।
বিদ্ধেষ্বহঃসু কার্য্যাণি **তাদৃগ্‌দোষগণাশ্রয়াৎ** ॥
(হঃ ভঃ বিঃ ১২।১৪৩)

[বৈষ্ণবগণ এইপ্রকার একাদশীর ন্যায় জন্মাষ্টমী প্রভৃতি ব্রতসকলও বিদ্ধদিনে করিবেন না, করিলে **লিখিত দোষসকল** উপস্থিত হইবে।]

উক্ত শ্লোকের টীকায় পূজ্যপাদ সনাতন গোস্বামী এইরূপ লিখিয়াছেন—

"আদিশব্দেন রামনবমী নৃসিংহচতুর্দ্দশ্যাদি তাদৃশানাং 'বিদ্ধৈকাদশী-ব্রতোক্তসদৃশানাং' দোষাণাং গণস্যাশ্রয়াৎ।"

এস্থলে বিচার্য্য এই যে, সনাতন গোস্বামীর "বিদ্ধা একাদশী-ব্রতোক্ত-সদৃশানাং" বাক্যের তাৎপর্য্য কি? রামনবমী, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি সমুদয় জয়ন্তী তিথিই একাদশী-তিথির ন্যায় বিদ্ধোপবাসে যাবতীয় দোষসমূহ ব্রতাচারী ব্যক্তির পক্ষে আশ্রয় করিবে। এস্থলে আমরা কেবল সূর্যোদয়বিদ্ধা একাদশীর কথা কোনক্রমেই বুঝিতে পারিতেছি না; যেহেতু একাদশীর বিদ্ধোপবাসে চারিপ্রকার দোষের উল্লেখ হরিভক্তিবিলাসে ইতঃপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। সেই চারি প্রকার দোষ, যথা—বেধ, অতিবেধ, মহাবেধ ও যোগ। এই ৪টী দোষই অরুণোদয়কাল হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত চারি দণ্ডের মধ্যে আবদ্ধ আছে।

জন্মাষ্টমী প্রভৃতিতে বিদ্ধোপবাসে এই ৪টী দোষ পূজ্যপাদ সনাতন গোস্বামীর বিচার অনুসারে স্বীকার করিতে হইলে জয়ন্তী-বাসরেও অরুণোদয়-বেধ স্বীকার করাই একান্ত কর্ত্তব্য হইয়া পড়ে। নচেৎ "দোষাণাং গণস্য আশ্রয়াৎ" বাক্যের সার্থকতা থাকে না।

(ঘ) শ্রীহরিভক্তিবিলাস (১৪শ বিলাস) **কোন কোন সকাম বৈষ্ণবের পক্ষে শিবচতুর্দ্দশী-ব্রত-পালনের ব্যবস্থা দিয়াছেন**। সেস্থলেও অবিদ্ধ-চতুর্দ্দশী-ব্রতপালনের কথাই লিখিত হইয়াছে। তাহাতে সূর্য্যোদয়ের দুই দণ্ডের মধ্যে ত্রয়োদশী থাকিলে বৈষ্ণবের পক্ষে উপবাস হইবে না—লিখা আছে। 'যোগ' ও 'বেধ' সেস্থলে মানা হইয়াছে। এস্থলে আমার বক্তব্য এই যে, শিবচতুর্দ্দশী ব্রতের সময় সূর্য্যোদয়-বেধ মানা হয় নাই। অবশ্য অরুণোদয়-বেধও গৃহীত না হইলেও সূর্য্যোদয় ও অরুণোদয়ের মধ্যবর্ত্তী সময় গৃহীত হইয়াছে। শিবরাত্রের যদি এইরূপ ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি সম্বন্ধে কিরূপ হওয়া কর্ত্তব্য ? * * *

—শ্রীগৌঃ পত্রিকা ৩য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

শ্রীরাম-নবমী-ব্রত

বর্ত্তমান প্রবন্ধ লিখিবার কারণ

শ্রীরামনবমী ব্রত সম্বন্ধে কয়েকটী কথা নিবেদন করা বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে। কারণ, বর্ত্তমান সময়ে বাংলাদেশের পঞ্জিকাকারগণ সকলেই স্মার্ত্ত। তাঁহারা স্মার্ত্তবিধির অনুগামী হইবেন. ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? তথাপি তাঁহারা দিনপঞ্জিকায় গোস্বামি-মতের বিচার করিয়া ব্রত উপবাসাদি-বিধানেরও উল্লেখ করিয়া থাকেন। কিন্তু এবৎসর সমুদয় পঞ্জিকাকারগণই রামনবমীর বিশুদ্ধ বিচার প্রদর্শন করেন নাই। যাঁহারা স্মার্ত্ত-বিচার না মানিয়া গোস্বামি-বিচারই গ্রহণ করিয়া থাকেন বলিয়া সাধারণে প্রচার করেন, তাঁহারাও এবৎসর রামনবমী-ব্রত সম্বন্ধে বিশুদ্ধ বিচার প্রদর্শনে উদাসীন রহিয়াছেন। আমি তজ্জন্যই এই প্রবন্ধ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

শ্রীল সনাতন-কৃত শ্রীহরিভক্তিবিলাস

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের ব্রত-উপবাসাদি পালনের বিধি-নিষেধাদি মূলতঃ শ্রীহরিভক্তি-বিলাস গ্রন্থরাজেই সম্পূর্ণরূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই গ্রন্থের অনুকূলে অন্যান্য শাস্ত্রীয়

প্রমাণাদিও গৃহীত হইতে পারে। শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থখানি পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমৎ সনাতন গোস্বামী-কর্ত্তৃক রচিত। সাধারণতঃ লোক-সমাজে ইহা ছয় গোস্বামীর অন্যতম শ্রীশ্রীমদ্ গোপালভট্ট গোস্বামি-কৃত বলিয়া প্রচার। কিন্তু প্রকৃত-প্রস্তাবে মূলতঃ এই গ্রন্থ শ্রীসনাতন-কৃত। শ্রীহরিভক্তিবিলাস সম্বন্ধে নানাকথা প্রচলিত থাকিলেও ইহাই সুস্থির সিদ্ধান্ত যে, গোপাল-ভট্টগোস্বামী সনাতন গোস্বামীর বিপুলায়তন "হরিভক্তিবিলাস" গ্রন্থকে সংক্ষিপ্তভাবে সঙ্কলন করিয়া উহা "ভগবদ্ভক্তিবিলাস" নামে প্রচার করেন। প্রকৃত-প্রস্তাবে বর্ত্তমানে মুদ্রিত 'হরিভক্তিবিলাস' শ্রীল সনাতন গোস্বামীরই রচিত—ইহাতে কোন মতভেদ নাই। কিন্তু পূজ্যপাদ **সনাতন** গোস্বামীর স্বকৃত উক্ত মূল স্মৃতিগ্রন্থের একটী বিস্তৃত টীকা তিনি স্বয়ং রচনা করিয়াছিলেন। কাহারও মতে, ঐ টীকা পূজ্যপাদ গোপালভট্ট গোস্বামীর শিষ্য শ্রীল গোপীনাথ কবিরাজ মহোদয়ের সংক্ষিপ্ত সঙ্কলন-স্বরূপে আজ "দিগ্‌দর্শনী"-টীকা নামে প্রচারিত হইয়াছে। সে যাহা হউক, বর্ত্তমান-প্রচলিত হরিভক্তিবিলাসের মূল **শ্রীল সনাতন গোস্বামীর নিজ-কৃত**—এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমরা এই হরিভক্তিবিলাস অবলম্বন করিয়া শ্রীরামনবমী-ব্রতের বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতেছি।

শ্রীরামচন্দ্রের জন্মতিথি

চৈত্রমাসের শুক্ল-নবমীতে শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম। এবং মধ্যাহ্নে তিনি আবির্ভূত হইয়াছেন বলিয়া শাস্ত্রকারগণ প্রকাশ করেন। শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম লইয়াই এই ব্রতের উৎপত্তি। আমরা অগস্ত্য-সংহিতায় দেখিতে পাই—

চৈত্রে মাসি নবম্যান্তু জাতো **রামঃ স্বয়ং হরিঃ**।
শ্রীরামনবমী প্রোক্তা কোটিসূর্য্যগ্রহাধিকা।
চৈত্রশুক্লা তু নবমী পুনর্ব্বসুযুতা যদি॥
তেন **'মধ্যাহ্নযোগেন'** মহাপুণ্যতমা স্মৃতা। (২৮।১,৩-৪)

অর্থাৎ চৈত্রমাসের শুক্লা নবমীতে ভগবান্ হরি রামরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। চৈত্রমাসের শুক্ল-নবমীতে পুনর্ব্বসুনক্ষত্র যুক্ত হইলে তাহাকে শ্রীরামনবমী বলা হয়। উহা কোটিসূর্য্য-গ্রহণ অপেক্ষা অধিক ফলদায়িনী হয়; তন্মধ্যে মধ্যাহ্ন সময়ে যদি উক্ত নক্ষত্রের যোগ হয়, তাহা হইলে উহা মহাপুণ্যতমা হইয়া থাকে।

শ্রীরামনবমী-ব্রত পালন-অপালনের ফলাফল

পালনে যথা—

মুমুক্ষবোঽপি হি সদা শ্রীরাম-নবমীব্রতম্।
ন ত্যজন্তি সুরশ্রেষ্ঠো দেবেন্দ্রোঽপি বিশেষতঃ॥

তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা সর্ব্ব কৃত্বৈবং নবমীব্রতম্।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো যাতি ব্রহ্ম সনাতনম্॥ (অঃ সং ২৭।৩৬-৩৭)

অর্থাৎ যাহারা মুক্তির কামনা করে তাহারাও, অধিক কি দেবতারা পর্য্যন্ত সকলে, এমন কি স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র পর্য্যন্তও এই শ্রীরামনবমী-ব্রত পরিত্যাগ করেন না। সুতরাং সকলে সর্ব্বান্তঃকরণে এই রামনবমী-ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া সকল পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন ও সনাতন ব্রহ্মকে লাভ করিয়া থাকেন।

অপালনে, যথা—

প্রাপ্তে শ্রীরামনবমী-দিনে মর্ত্ত্যো বিমূঢ়ধীঃ।
উপোষণং ন কুরুতে **কুম্ভীপাকেষু** পচ্যতে॥ (অঃ সং ২৭।৯)
যস্তু রামনবম্যান্তু ভুঙ্‌ক্তে মোহাদ্বিমূঢ়ধীঃ।
কুম্ভীপাকেষু ঘোরেষু পচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥ (অঃ সং ২৮।৮)

যে মূঢ়বুদ্ধি মনুষ্য শ্রীরামনবমী দিন প্রাপ্ত হইয়াও তাহাতে উপবাস করে না, সে কুম্ভীপাক নরকে পচিয়া মরে। মূঢ়-বুদ্ধি লোক মোহবশতঃ যদি রামনবমীতে ভোজন করে, সে ঘোর কুম্ভীপাক নরকে পচিবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

উক্ত শ্লোক চতুষ্টয়ের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বৈষ্ণবমাত্রেরই রাম-নবমী ব্রত পালন করা কর্ত্তব্য, অকারণে প্রত্যবায় ইহাও প্রদর্শিত হইয়াছে।

শ্রীরামনবমী-ব্রত-বিধি হরিভক্তি-বিলাসে দ্রষ্টব্য

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, মধ্যাহ্নযোগে পুনর্ব্বসু-নক্ষত্রযুক্ত হইলে এই দিন মহাপুণ্যতমা হইয়া থাকে। হরিভক্তিবিলাস আমাদিগকে আরও জানাইয়াছেন—

শঙ্খপাত্রাসনার্চ্চাঞ্চ কুর্য্যাদযামেষ্বতন্দ্রিতঃ।
যামে দ্বিতীয়ে সংপূজ্য **মধ্যাহ্নে জন্মভাবয়েৎ॥**
(হঃ ভঃ বিঃ ১৪।৯৭)

শঙ্খ, পাত্র ও আসন—প্রতি যামে এই সকলের অবশ্য পূজা করিবে। দ্বিতীয় যামে এই প্রকার পূজা করিয়া **মধ্যাহ্নে জন্ম চিন্তা করিবে।**

হরিভক্তিবিলাসে প্রত্যেক যামেই কিরূপে ব্রত পালন করিতে হইবে তাহা নির্ণীত হইয়াছে। এবং ব্রতের যাবতীয় কর্ত্তব্যও বিস্তারিতভাবে চতুর্দ্দশ বিলাসে বর্ণিত হইয়াছে। প্রবন্ধ-বিস্তার-ভয়ে এস্থলে তাহার উল্লেখ করিলাম না। ব্রতপালনেচ্ছু বৈষ্ণববৃন্দ, পূজ্যপাদ শ্রীল সনাতন গোস্বামীর হরিভক্তিবিলাসের ১৪শ বিলাসের শ্রীরামনবমী-প্রসঙ্গ বিশেষভাবে আলোচনা করিবেন।

বিদ্ধা ও অবিদ্ধা নবমীর বিধি ও নিষেধ

নবমী **চাষ্টমীবিদ্ধা ত্যাজ্যা** বিষ্ণুপরায়ণৈঃ।
উপোষণং নবম্যাং বৈ **দশম্যামেব পারণম্‌** ॥
(হরিভক্তিবিলাস-ধৃত অঃ সংহিতা ২৮।১৪)

অর্থাৎ, বিষ্ণুপরায়ণ বৈষ্ণবগণ **অষ্টমীবিদ্ধা নবমী পরিত্যাগ করিয়া** নবমীতে উপবাস এবং দশমীতেই পারণ করিবেন। উক্ত শ্লোকের টীকায় এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

"নন্থ বৈষ্ণবৈর্বিদ্ধা সর্ব্বত্র বর্জ্জ্যেতি পূর্ব্বং নিশ্চিতং। অত্রাপি তথৈবোক্তং নবমী চাষ্টমী বিদ্ধা ত্যাজ্যেতি। তত্র চ নবমীক্ষয়ে সতি তিথিহ্রাসক্রমেণ একাদশ্যাশ্চ শুদ্ধত্বে কিং কর্ত্তব্যং তত্রাহ উপোষণমিতি।"

অর্থাৎ, সর্ব্বত্র বৈষ্ণবগণ-কর্ত্তৃক বিদ্ধা বর্জ্জনীয়া—ইহা পূর্ব্বেই নিশ্চিত হইয়াছে। এস্থলেও পূর্ব্বের ন্যায় অষ্টমীবিদ্ধা নবমী সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্যা। নবমী ক্ষয় হইলে তিথি হ্রাসক্রমে পরবর্ত্তী একাদশী তিথি শুদ্ধা হইলে কি কর্ত্তব্য, তৎসম্বন্ধে মূলে বলিতেছেন, নবমীতে উপবাস করিয়া দশমীতেই পারণ করিবে। **এস্থলে দশমীতে পারণের প্রতি জোর দৃষ্ট হয়।** অর্থাৎ দশমীতে পারণের নিশ্চয়তাহেতু নবমীর উপবাস অষ্টমী-বিদ্ধা হইলেও সেই বিদ্ধা দিবসেই বৈষ্ণবগণেরও উপবাস কর্ত্তব্য। কিন্তু একাদশীর উপবাসে বাধা না ঘটিলে, অষ্টমীবিদ্ধা নবমীতে কোনপ্রকারেই উপবাস হইবে না। তজ্জন্য হরিভক্তিবিলাস বলিতেছেন—

দশম্যাং পারণায়াশ্চ নিশ্চয়ান্নবমীক্ষয়ে।
বিদ্ধাপি নবমী গ্রাহ্যা বৈষ্ণবৈরপ্যসংশয়ম্‌ ॥
(হঃ ভঃ বিঃ ১৪।৯১)

অর্থাৎ দশমীতে পারণের নিশ্চয়তাহেতু নবমীর ক্ষয় উপস্থিত হইলে বৈষ্ণবগণও নিঃসংশয়-চিত্তে উপবাস-বিষয়ে অষ্টমীবিদ্ধা নবমী গ্রহণ করিবেন। এতৎসম্বন্ধে উক্ত শ্লোকের 'দিগ্‌দর্শনী' টীকায় লিখিত হইয়াছে—

নিশ্চয়াদ্দশম্যামেবেত্যেবকারতঃ। অন্যথোপবাসদ্বয়-প্রসঙ্গাদিতি দিক্‌।

এস্থলে বিচার্য্য এই যে, দশমীতিথির মধ্যেই পারণ করিতে হইবে। নচেৎ একাদশী শুদ্ধা হইলে সেইদিন একাদশীর উপবাসের ব্যাঘ্যাত ঘটিয়া যায়। অর্থাৎ নবমী অষ্টমী-বিদ্ধা হইলে পরদিবস দশমীতে উপবাস করিলে 'দশমীতেই পারণ করিতে হইবে'—এই বাক্য সংরক্ষিত হয় না। এতদ্ব্যতীত একাদশীতে পারণ আসিয়া পড়ে। তজ্জন্য **দশমীতে পারণ বজায় রাখিয়া শুদ্ধ নবমীতে উপবাস কর্ত্তব্য।** দশমীতে পারণ বজায়

রাখিতে গিয়া এবং শুদ্ধা একাদশীর উপবাস অবশ্য পালনীয় বিধায় **আবশ্যক বোধে অষ্টমীবিদ্ধা নবমীতে রামনবমীর উপবাস করা চলিবে। কিন্তু একাদশীর উপবাসের ব্যাঘাত না ঘটিলে কোন ক্রমেই অষ্টমীবিদ্ধা নবমীর উপবাস হইবে না।** * * *

শ্রীরাম-নবমী সম্বন্ধে 'তিথিতত্ত্ব' ও 'স্মৃতি-চিন্তামণি' গ্রন্থদ্বয়ের বিচার

এতদ্ব্যতীত 'তিথিতত্ত্বম্' ও 'স্মৃতি-চিন্তামণি'-গ্রন্থদ্বয়েও উক্ত ব্রত-সম্বন্ধে বৈষ্ণবগণের কিরূপ বিচার গ্রহণীয়, তৎসম্বন্ধে যে বিচার প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতেও আমাদের উক্ত সিদ্ধান্ত সর্ব্বতোভাবে সমর্থিত হইয়াছে। নিম্নে তাহাদের প্রমাণ উদ্ধার করিলাম। তন্মধ্যে তিথিতত্ত্ব-কার উল্লিখিত অগ্যস্ত-সংহিতার অষ্টাবিংশ অধ্যায়ের চতুর্থ ও উনবিংশ শ্লোক উদ্ধার করিয়া অর্থাৎ 'চৈত্রে শুদ্ধা তু নবমী' (২৮।৪) ইত্যাদি ও "নবমী চাষ্টমীবিদ্ধা ত্যাজ্যা বিষ্ণুপরায়ণৈঃ" (২৮।১৯) প্রভৃতি প্রমাণ-বাক্য গ্রহণ করিয়া তাহার টীকায় রাম-নবমীতে বৈষ্ণব-বিচার সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন,—

"এতদ্বচনদ্বয়ং কালমাধবীয়েঽপি কিন্তু মহাপুণ্যেত্যত্র মহাফলেতি পাঠঃ। অত্র শুদ্ধেতি শ্রবণাৎ সর্ব্বত্র শুদ্ধায়ামৃক্ষাদরো, ন বিদ্ধায়ামিতি। অতএবাষ্টমীবিদ্ধা নবমী সনক্ষত্রাপি নোপোষ্যেতি মাধবাচার্য্যঃ। সৈব তাদৃগ্যেব ন তু বিদ্ধা। যদা তু পরদিনে একাদশ্যাং দশমী-পারণযোগ্যা তদা দশমীযুক্তা নবম্যুপোষ্যা বৈষ্ণবৈর্বিষ্ণু-পরায়ণৈরিতি শ্রবণাৎ।"

অর্থাৎ—এই বচনদ্বয়ে কালমাধবীয়ে 'মহাপুণ্য' স্থলে 'মহাফল'—এইরূপ পাঠ দৃষ্ট হয়। এস্থলে অর্থাৎ উক্ত শ্লোকে 'শুদ্ধা' এই শব্দ শ্রবণহেতু সর্ব্বত্র শুদ্ধা নবমীতেই পুনর্ব্বসু-নক্ষত্রের আদর বুঝিতে হইবে, কিন্তু বিদ্ধায় নহে। অতএব অষ্টমীবিদ্ধা নবমী উক্ত নক্ষত্র-যুক্তা হইলেও তাহাতে উপবাস হইবে না—ইহাই মাধবাচার্য্যের মত। সুতরাং রাম-নবমী তিথি শুদ্ধাই পালনীয়া, বিদ্ধা নহে। যদি পরদিনে একাদশী-তিথিতে পারণযোগ্যা দশমী পাওয়া যায়, তাহা হইলে দশমীযুক্তা নবমীতে বিষ্ণুপরায়ণ বৈষ্ণবগণ উপবাস করিবেন—ইহাই শাস্ত্র হইতে শ্রুত হয়।

স্মৃতিচিন্তামণি-গ্রন্থেও উক্ত শ্লোকদ্বয় উদ্ধৃত হইয়াছে এবং তদবলম্বনে নিম্নলিখিত বিচার বঙ্গানুবাদ-সহ প্রদত্ত হইয়াছে—

"যদা নবমীয়মখণ্ডা সতী পুনর্ব্বসুযুক্তা ভবতি, তদ্দিনে ব্রতম্। খণ্ডিতায়াস্তু একাদশী-দিনে দশমী পারণযোগ্যা চেৎ, তদা অষ্টমীযুক্তাং বিহায় দশমীযুক্তায়াং নবম্যাং ব্রতং কর্ত্তব্যম্।"

অর্থাৎ—যে-দিন এই নবমী অখণ্ডা (একদিনমাত্র ব্যাপিনী) হইয়া পুনর্ব্বসুযুক্ত হইবে, সেইদিনে শ্রীরাম-নবমী-ব্রত করিবে। নবমী খণ্ডিতা হইলে অর্থাৎ দুইদিন পাইলে, একাদশীর দিনে দশমী পারণযোগ্য কাল পাইলে অর্থাৎ পারণ করিতে পারা যায় এমন একটু দশমী পাইলে, অষ্টমীযুক্ত নবমীখণ্ড ত্যাগ করিয়া দশমীযুক্ত নবমীখণ্ডে অর্থাৎ পরদিন মুহূর্ত্তান্যূন কালব্যাপিনী নবমীখণ্ডে শ্রীরাম-নবমী-ব্রত করিবে। * * *

—শ্রীগৌঃ পত্রিকা ৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা।

চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত

চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী সকলেরই পালনীয়। এই ব্রত বৈধী-ভক্তির অন্তর্গত। শাস্ত্রে ভক্তির বিধি শত-সহস্র প্রকার থাকিলেও চৌষট্টি প্রকার ভক্ত্যঙ্গই শ্রীরূপানুগ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের আদরণীয়। সাধন-ভক্তি বাদ দিয়া হঠাৎ ইহার উল্লঙ্ঘন করিলে উচ্ছৃঙ্খলতাই প্রকাশ পাইবে। যদিও উক্ত চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত উদযাপন উক্ত চৌষট্টি প্রকার ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে উল্লিখিত হয় নাই, তথাপি শ্রীমন্মহাপ্রভু চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত-পালন শিক্ষা দিবার জন্য পুরী ও দক্ষিণদেশ প্রভৃতি স্থানে অবস্থানকালে নিজে স্বয়ং ইহা পালন করিয়া জগজ্জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন। সুতরাং এই ব্রত পালন অবশ্য কর্ত্তব্য। চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত কেবল গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণেরই কৃত্য এমন নহে, ইহা কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, অন্যাভিলাষী প্রভৃতি যাবতীয় স্মার্ত্ত-বিধানানুগামী সকলেরই পালনীয়। সুতরাং আমাদের বিশেষ অনুরোধ পাঠক-পাঠিকাবর্গ সকলেই বিশেষ দৃঢ়তার সহিত এই ব্রত পালনে কৃত-সঙ্কল্প হইবেন।

বিধি উল্লঙ্ঘন করিলে সাধক-জীবন রক্ষিত হয় না। বৈধ-ভক্তি অপেক্ষা রাগানুগা-ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব সর্ব্বশাস্ত্রেই পরিগীত হইয়া থাকে। তজ্জন্য রাগের ভাণ দেখাইয়া 'আমাদের বিধির আবশ্যকতা নাই, আমরা উন্নতমার্গে পহুছিয়া পরমহংস হইয়াছি'—এইরূপ অকাল-পক্কতা লাভ করিলে সমূহ অমঙ্গল জানিতে হইবে। "সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদ-বিধিগোচরঃ"—শাস্ত্রের এই বাক্য পরমহংস মহাভাগবতগণের উদ্দেশ্যে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমরা তাঁহাদের আচরণ অনুকরন করিলে বিপদ্গ্রস্ত হইয়া পড়িব। রাগমার্গে প্রবেশ করিতে হইলে বিধি উল্লঙ্ঘন করা চলিবে না। "বিধিমার্গ-রত জনে, স্বাধীনতা-রত্ন দানে, রাগমার্গে করান প্রবেশ।"—মহাজনগণের এই বাক্য সর্ব্বদা হৃদয়ে অবরুদ্ধ রাখিতে হইবে। সুতরাং অনুরাগের সহিত বিশেষ প্রীতিযুক্ত হইয়া এই চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতের যাবতীয় বিধিসমূহ পালন করা আমাদের সকলেরই কর্ত্তব্য।

"যো বিনা নিয়মং মর্ত্ত্যো ব্রতং বা জপ্যমেব বা।
চাতুর্ম্মাস্যং নয়েন্মূর্খো জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥" (হঃ ভঃ বিঃ-১৫।৬০)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিয়ম, ব্রত কিংবা জপ ব্যতিরেকে চাতুর্ম্মাস্যাদি যাপন করে, সে মূর্খ এবং জীবিত অবস্থায়ই মৃততুল্য। সুতরাং বিনা নিয়মে জীবন যাপনকারীর উচ্ছৃঙ্খলতাকে শাস্ত্রকারগণ মঙ্গলের পথ বলিয়া অনুমোদন করেন নাই।

কেহ কেহ ক্রমপথ উল্লঙ্ঘন করিয়া অনধিকার-চর্চ্চার মেয়েলী ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া পড়েন। আজকাল উচ্ছৃঙ্খল-সমাজ স্ত্রীজাতির পূজায় আত্মনিয়োগ করিতে গিয়া যে অমঙ্গল আনয়ন করিয়াছেন, তাহার ফল সকলেই অনুভব করিতেছেন ও করিবেন। অধোক্ষজ-ভক্তির উল্লঙ্ঘন করিয়া কাহারও অপ্রাকৃত হইবার বাসনাকে আমরা উচ্ছৃঙ্খলতা-স্ত্রৈণবুদ্ধি বলিয়া মনে করি। শ্রীল প্রভুপাদ এই প্রাকৃত-সহজিয়াগণকে অপ্রাকৃত তত্ত্বের অনধিকারী বিচার করিয়াছেন। অপ্রাকৃত বস্তুই অধোক্ষজ। আবার অধোক্ষজ বস্তুই অপ্রাকৃত। সুতরাং আমরা সকলেই কার্ষ্ণ হইলেও বৈষ্ণব। এই বৈষ্ণব-সংজ্ঞাই আমাদিগকে মাধুর্য্যের উন্নততম স্থানে স্থাপন করিয়া থাকেন। সুতরাং আমরা বৈষ্ণব নহি—এইরূপ বিচার মেয়েলী-বিচার। জীবমাত্রই স্বরূপতঃ প্রকৃতি হইলেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর ঔদার্য্যলীলায় আমরা তাহা হইতে বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়া থাকি। রূপানুগ ধারায় যাঁহারা স্নাত, তাঁহারা বিষ্ণুপ্রিয়া অপেক্ষা কৃষ্ণপ্রিয়ারই আদর করিয়া থাকেন। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর পিতৃদেব শ্রীজগন্নাথ মিশ্রবরের সেবিত 'অধোক্ষজ'-বস্তুর সেবকসূত্রে আমরা বলিতে চাহি,—

সরস্বতী কৃষ্ণপ্রিয়া, কৃষ্ণভক্তি তাঁ'র হিয়া,
বিনোদের সেই সে বৈভব।

সুতরাং আমরা গুরুপাদপদ্ম-শুদ্ধা-সরস্বতী-স্বরূপিনী কৃষ্ণপ্রিয়ারই আনুগত্য করিব। বিষ্ণুপ্রিয়া আমাদের মস্তকে থাকেন থাকুন।

শুদ্ধা-সরস্বতীর নির্দ্দেশমত আমরা চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতাদি পালন করিব। অনধিকার-চর্চ্চায় প্রবেশ করিব না। শ্রাবণ মাসে শাক, ভাদ্র মাসে দধি, আশ্বিন মাসে দুগ্ধ এবং কার্ত্তিক মাসে আমিষ (মাষকলাই) ভোজন সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

"শ্রাবণে বর্জ্জয়েচ্ছাকং দধি ভাদ্রপদে তথা।
দুগ্ধমাশ্বযুজে মাসি কার্ত্তিকে চামিষং ত্যজেৎ॥
(শ্রীহরিভক্তিবিলাস-১৫।৬১)

এতদ্ব্যতীত চারি মাসের জন্য শিম, পটোল, পুঁইশাক, কলম্বী শাক, লাউ, বেগুন প্রভৃতি সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। গৃহস্থগণের পক্ষে ব্রতের চারিমাস ক্ষৌর-কর্ম্মাদি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তবে ত্যাগী সন্ন্যাসিগণের পক্ষে ভাদ্র পূর্ণিমায় বিশ্বরূপ-ক্ষৌর অবলম্বন করা চলিতে পারে। এই ব্রত পালনকালে যাবতীয় বিলাসসম্ভার সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জনীয়।

—শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা ১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা।

চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত

আমাদের মধ্যে অনেকেই চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত পালন না করিয়া কেবলমাত্র কার্ত্তিক-ব্রত বা দামোদর-ব্রত পালন করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন,—শ্রীল রূপগোস্বামী ৬৪ প্রকার ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে 'উর্জ্জাদর'-ভিন্ন চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতের উল্লেখ করেন নাই। সুতরাং আমরা চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত পালন না করিয়া কেবলমাত্র উর্জ্জব্রত বা দামোদর-ব্রতের আদর করিব। কিন্তু তাঁহাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, শ্রীল রূপগোস্বামী লিখিয়াছেন,—"উর্জ্জাদরো **বিশেষেণ** যাত্রা-জন্মদিনাদিষু" (ভক্তি-রসামৃতসিন্ধুঃ ১।২।২৩)। এস্থলে 'বিশেষণ'-পদের প্রতি আমি ব্রতাচারি বন্ধুবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। বিশেষভাবে কার্ত্তিকব্রত বা দামোদর-ব্রতের পালন বলিলে—চাতুর্ম্মাস্য পালন অবশ্যই করিতে হইবে, তন্মধ্যে কার্ত্তিকব্রত বা দামোদর-ব্রত বিশেষভাবে অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে পালন করিতে হইবে—ইহাই বুঝাইতেছে। কার্ত্তিক-ব্রত—চাতুর্ম্মাস্যের শেষ আনুষ্ঠানিক ব্রত। ব্রত মাত্রেরই শেষ রক্ষা সম্বন্ধে শাস্ত্রাদিতে বিশেষ উল্লেখ দেখা যায়।

এই সম্বন্ধে শ্রীল সনাতন গোস্বামীও হরিভক্তিবিলাসে কোন্ মাসে কিরূপ সদাচার গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এমন কি, যিনি চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত পালন করিবেন না, তিনি অতি মূর্খ এবং জীবিতাবস্থায়ও মৃত—

যো বিনা নিয়মং মর্ত্ত্যো ব্রতং বা জপ্যমেব বা।
চাতুর্ম্মাস্যং নয়েন্ মূর্খো জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১৫।৬০ সংখ্যাধৃত ভবিষ্যপুরাণ-বচন)

কেহ যদি বলেন, আমরা রূপানুগ, সনাতনানুগ নহি। আমরা ঐরূপ বিচার-পরায়ণ ব্যক্তিকে রূপানুগ বলিয়া ত' স্বীকার করিবই না, বরং কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় তাহাকে ভণ্ড বলিব। কারণ "একে মানে, আরে না মানে, এই মত ভণ্ড" (চৈঃ চঃ)। শ্রীল রূপপাদ শ্রীল সনাতন গোস্বামীরই শিষ্যত্ব অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। সুতরাং যাঁহারা চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত পালন করিবেন না, ক্লেশ স্বীকার করিতে পরাঙ্মুখ হইয়া নিজ নিজ ইন্দ্রিয়-তর্পণের ব্যাঘাতের জন্য উক্তপ্রকার কূট-তর্ক-যুক্তির আবাহন করিবেন, তাঁহারা শ্রীহরি-ভক্তিবিলাস মতে নিতান্ত মূর্খ ও মৃত ব্যক্তির ন্যায় সাধক-ভক্তগণের অস্পৃশ্য।

শ্রীল রূপ গোস্বামী "বিশ্রম্ভেন গুরোঃ সেবা সাধুবর্ত্মানুবর্ত্তনম্"—বাকের দ্বারা বিশ্বাসের সহিত গুরুসেবা এবং সাধু-বর্ত্মের অনুবর্ত্তন, এই দুইটী ৬৪ প্রকার ভক্ত্যঙ্গের অন্যতম অবশ্য কর্ত্তব্যরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং সাধুগণ যে ব্রত-তপস্যাদি অবলম্বন করিয়া ভগবানকে লাভ করিবার শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা না করিলে মায়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া ভগবৎসেবায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারা যাইবে না। তাই আমরা এস্থলে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের আচরণ ও শিক্ষা সম্বন্ধে দুই-একটী কথা বলিয়া আমাদের বক্তব্য সমাপন করিব।

চাতুর্ম্মাস্য-সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীল প্রভুপাদ

জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত পালন করিয়া তাঁহার অনুগত জনগণকে এবং ধর্ম্মপিপাসু বিশ্ববাসী সকলকেই শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। আমরা শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকার প্রচ্ছদপটে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতোদযাপনকারী জগদ্‌গুরু শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের শ্রীমূর্ত্তি মুদ্রিত করিয়াছি। চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতের চারিমাস কাল ক্ষৌরকার্য্য নিষিদ্ধ। শ্রীল প্রভুপাদ 'চাতুর্ম্মাস্য'-নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—"**একদণ্ডী জ্ঞানিগণ ও ত্রিদণ্ডী ভক্তগণ উভয়েই চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত ধারণ করেন।** শ্রীশঙ্কর-মতাবলম্বিগণের মধ্যে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতের ব্যবস্থা আছে। **শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরও চাতুর্ম্মাস্য উপস্থিত হইলে কাবেরিতে শ্রীরঙ্গ-মন্দিরে চারিমাস কাল বাস করিয়াছেন।** শ্রীগৌড়ীয় ভক্তগণ চারিমাস কাল নীলাচলে শ্রীগৌর-পাদপদ্মে প্রত্যেক বৎসরই গমন করিতেন ও তথায় তাঁহাদের অবস্থানের কথা লীলা-লেখকগণের গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। **চারিপ্রকার আশ্রমেই চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত গ্রহণের ব্যবস্থা আছে।** কষ্টসাধ্য বলিয়া ঐসকল প্রাচীন রীতি ক্রমশঃ সমাজ-বক্ষ হইতে সুদূরে চলিয়া যাইতেছে। ফলকামী কর্ম্মিগণে অথবা নিষ্কাম ভক্ত-সম্প্রদায়ে ব্রত-পালনের অনুষ্ঠান কিছু কিছু ভিন্ন হইলেও ব্রতের সম্মান হিন্দুমাত্রই সকলেই করিয়া থাকেন। **ইহাতে ভোগ-ত্যাগের বিধান পূর্ণমাত্রায় অভিব্যক্ত হইয়াছে।** ভোগ-ত্যাগ-বিধান—কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্ত ত্রিবিধ সমাজেই সমধিক আদরের বস্তু। সুতরাং ত্রিবিধ পথাবলম্বী আর্য্যগণ সকলেই চারি আশ্রমে চাতুর্ম্মাস্যের সম্মান করেন। যাঁহারা নিতান্ত অসমর্থ, তাঁহারা সুদীর্ঘকাল নিয়মের অধীন হওয়া সুবিধাজনক মনে না করায় ক্রমশঃ ঐসকল ব্রতাদিতে শিথিলভাব প্রদর্শন করিতেছেন।"

জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের উক্ত মহোপদেশপূর্ণ বাক্য হইতে জানা যায়, শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরও চাতুর্ম্মাস্য উপস্থিত হইলে কাবেরীতে শ্রীরঙ্গ-মন্দিরে চারিমাস কাল বাস করিয়াছিলেন এবং গৌরভক্তগণ নীলাচলে প্রতিবৎসরই শ্রীশ্রীগৌরপাদপদ্মে চারিমাস কাল অবস্থান করিয়া চাতুর্ম্মাস্যের সম্মান করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পাঠকবর্গ ইহা সর্ব্বতোভাবে অবগত আছেন।

চাতুর্ম্মাস্যের কালনির্ণয়

চাতুর্ম্মাস্যের কালনির্ণয়-প্রসঙ্গে বরাহ-পুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—

আষাঢ়-শুক্লদ্বাদশ্যাং পৌর্ণমাস্যামথাপি বা।
চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতারম্ভং কুর্য্যাৎ কর্কট-সংক্রমে॥

অর্থাৎ আষাঢ় মাসের শুক্লা-দ্বাদশী তিথি হইতে কার্ত্তিকের শুক্লা-দ্বাদশী পর্য্যন্ত চারিটী চান্দ্রমাস এই ব্রত পালন করিবে, অথবা আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা তিথি হইতে কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমা পর্য্যন্ত চারিটী চান্দ্রমাস কাল এই ব্রতের নিয়ম, অথবা কর্কট-সংক্রান্তি অর্থাৎ সৌর-শ্রাবণ হইতে সৌর-কার্ত্তিক শেষ পর্য্যন্ত চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত পালনের নিয়ম।

চাতুর্ম্মাস্যের নিয়ম

চাতুর্ম্মাস্যের নিয়ম **সম্বন্ধে** হরিভক্তিবিলাসে শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী ও শ্রীল সনাতন গোস্বামী স্কন্দপুরাণের প্রমাণ উদ্ধার করিয়া নিম্ন বিধি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

শ্রাবণে বর্জ্জয়েচ্ছাকং দধি ভাদ্রপদে তথা।
দুগ্ধমাশ্বযুজে মাসি কার্ত্তিকে চামিষং ত্যজেৎ॥ (হঃ ভঃ বিঃ ১৫।৬১)

অর্থাৎ—চাতুর্ম্মাস্যের প্রথম **মাস শ্রাবণে** সর্ব্বপ্রকার শাক, **ভাদ্রমাসে** দধি, **আশ্বিনে** দুগ্ধ এবং **কার্ত্তিকমাসে** আমিষ বর্জ্জন করিবে। ভারতের পশ্চিম বিভাগে 'শাক' বলিতে যে-কোন পক্ব ব্যঞ্জনকে বুঝাইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত লাউ, বেগুন, পুঁই, কলমীশাক, শিম, বরবটী, পটল, কলাই ক্ষৌরকার্য্য চারিমাস কাল অবশ্য বর্জ্জনীয়।

আমিষ কাহাকে বলে?

কার্ত্তিকমাসে 'আমিষ'-ভোজন-নিষেধের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার দ্বারা আমিষভোজী স্মার্ত্ত, কর্ম্মী, জ্ঞানী, অন্যাভিলাষীকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে; যেহেতু বৈষ্ণবগণ স্বভাবতঃ নিরামিষাশী। তাঁহাদের পক্ষে জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত কোন সময়েই আমিষ বা অমেধ্য গ্রহণের ব্যবস্থা নাই। সুতরাং কার্ত্তিকে আমিষ বর্জ্জন বলিলে, বৈষ্ণব-পক্ষে মাষকলাই প্রভৃতিকেই বুঝাইবে। ইহা বৈষ্ণবগণ কার্ত্তিকমাসে কখনই গ্রহণ করিবেন না। মাষকলাই হইতে বড়া, বড়ি, পাঁপড়, মিষ্টদ্রব্যাদি প্রস্তুত হয়, তাহাও কার্ত্তিকে বর্জ্জনীয়। এতদ্ব্যতীত শাস্ত্রে আমিষ বলিতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহাও নিম্নে উল্লিখিত হইল। ইহা সর্ব্ব সময়েই সকলেরই বর্জ্জনীয়। যথা—

"প্রাণ্যঙ্গমামিষং চূর্ণং ফলে জম্বীরমামিষম্।
ধান্যে মসূরিকা প্রোক্তা অন্নং পর্য্যুষিতং তথা॥
অজা-গো-মহিষী-দুগ্ধাদন্য-দুগ্ধাদি চামিষম্।
দ্বিজ-ক্রীতা রসাঃ সর্ব্বে লবণং ভূমিজং তথা॥
তাম্রপাত্র-স্থিতং গব্যং জলং চর্ম্মণি সংস্থিতম্।
আত্মার্থং পাচিতং চান্নমামিষং তদ্‌বুধৈঃ স্মৃতম্॥"

(অর্থাৎ) জন্তুর অঙ্গোদ্ভূত চূর্ণ—আমিষ, ও ফলের মধ্যে জম্বীর অর্থাৎ গোড়ানেবু—আমিষ। ধান্যের (শস্যের) মধ্যে মসূরিকা ও পর্য্যুষিত (বাসী, পান্তা, পকাল) অন্ন—আমিষ। অজা, গো, মহিষের দুগ্ধ ব্যতীত অন্য দুগ্ধ (অর্থাৎ মেষ বা ভেড়া, উট, ঘোড়া, গাধা প্রভৃতির দুগ্ধ)—আমিষ। ব্রাহ্মণের বিক্রীত সর্ব্বপ্রকার লবণ ও **ভূমি-জাত লবণ,** তাম্র পাত্রস্থিত গব্য, চর্ম্মস্থিত (ভিস্তির) জল ও **নিজের জন্য পাচিত অন্ন**—আমিষ-মধ্যে গণিত।"

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ-কৃত 'পুরুষোত্তম-মাস-কৃত্য' প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত)

অতএব কার্ত্তিক মাসে আমিষ-ত্যাগ বলিলে এই সমস্ত আমিষ পরিত্যাগ বুঝাইবে। ভক্তি-সাধকগণ ইহা হইতে সাবধান থাকিবেন।

—শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা ১০ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা।

কার্ত্তিক-ব্রত

অনেকে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত পালন করিতে কষ্টবোধ করেন। কিন্তু প্রকৃত মঙ্গলেচ্ছু সাধকগণ বিশেষ যত্ন করিয়া চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত পালন না করিলে ভগবদ্ভক্তি লাভ করা কঠিন হয়। শ্রীনামের দ্বারাই যখন সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয়, তখন দীক্ষা-পুরশ্চর্য্যা-ব্রতাদি গ্রহণ করিয়া কষ্ট-স্বীকারের আবশ্যকতা কি? এইরূপ বিচার করিয়া সহজিয়া বা মিছাভক্তের দল চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত পালন করেন না ও দীক্ষাদি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তাও মনে করেন না। এই বিচার গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজ সর্ব্বতোভাবে গর্হণ করিয়া থাকেন। চৌষট্টি প্রকার ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে 'ঊর্জ্জাদরঃ' কথার উল্লেখ থাকায় অনেকে চাতুর্ম্মাস্যকে অনাবশ্যক-জ্ঞানে কেবল-মাত্র কার্ত্তিক-ব্রতেরই ভক্ত্যঙ্গত্ব স্বীকার করেন। ইহা পরম্পরাগত গোস্বামীবর্গের বিচারের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। সহজিয়াগণ 'তাম্বুল-মঞ্জরী' সাজিয়া প্রত্যহ পান খাইয়া থাকেন, 'বিলাস-মঞ্জরী' সাজিয়া পরস্ত্রী-গ্রহণ করেন, "কেশব-ধৃত-মীন-শরীর" বিচার-অনুসারে নানাপ্রকার ক্রিয়াকলাপে মীন-মহোৎসবাদি করিয়া বিবিধ কু-বিচার ও অসদাচারের প্রশ্রয় দিয়া থাকেন।

দুঃখের বিষয়, যাঁহারা শুদ্ধ-গৌড়ীয়-বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিয়া ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস প্রভৃতি গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেও আজকাল চাতুর্ম্মাস্যের নিয়ম-পালন একপ্রকার উঠিয়া গিয়াছে। এই জন্য শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দ চাতুর্ম্মাস্য-কালে অনেক মঠ-মন্দিরে আতিথ্য গ্রহণ করিতে পরাঙ্মুখ হন। বৈষ্ণবতার নামে আচার-ব্যবহারের উচ্ছৃঙ্খলতা আনয়ন করিলে ভাবী বৈষ্ণবগণ আদর্শ-বিচ্যুত হইয়া পড়িবেন। শ্রীল প্রভুপাদের প্রদর্শিত বিধি-নিষেধ তাঁহার ধারার অনুকূলে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করা আবশ্যক।

কার্ত্তিক-ব্রতও নিকটবর্ত্তী হইল। এই ব্রত সম্বন্ধে কাহারও কোন মতভেদ নাই। ইহা স্মার্ত্ত, অদ্বৈতবাদী যে কোন ধর্ম্মপিপাসুই যত্ন-সহকারে পালন করেন। কেবল উচ্ছৃঙ্খল অপসম্প্রদায়, সঙ্ঘ-মিশনাদি এই ব্রতের কোন সংবাদ রাখেন না। তাঁহাদের ধর্ম্মাচরণের বিচারাদির মধ্যে সর্ব্বদাই বন্যা ও দুর্ভিক্ষ লাগিয়া আছে।

কার্ত্তিক-ব্রত পালনে স্থূলতঃ তিনটী বিধি লক্ষ্য করা যায়। (১) সৌর কার্ত্তিকমাস অর্থাৎ ১লা কার্ত্তিক হইতে কার্ত্তিক সংক্রান্তি পর্য্যন্ত, অথবা (২) আশ্বিন মাসের বিজয়া

দশমীর পর একাদশী হইতে আরম্ভ করিয়া উত্থান একাদশী পর্য্যন্ত, অথবা (৩) লক্ষ্মী-পূর্ণিমা হইতে আরম্ভ করিয়া হৈমন্তিক রাসপূর্ণিমা পর্য্যন্ত। তবে মঠবাসী ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসিগণপক্ষে এবং তাঁহাদের অনুগত ব্রহ্মচারী, বানপস্থীগণের পক্ষে শেষোক্ত পূর্ণিমা হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত ব্রত উদ্‌যাপনই শ্রেষ্ঠ, যেহেতু সন্ন্যাসিবর্গকে ও তদাদর্শে তাঁহাদের অনুগত জনগণকে পূর্ণিমা-তিথিতেই ক্ষৌরকার্য্য সমাধা করিতে হয়। ক্ষৌরকার্য্যের দ্বারা নিয়ম ভঙ্গ হইয়া থাকে। একাদশীপক্ষে ব্রত আরম্ভ করিলে প্রথম পূর্ণিমা-ক্ষৌর ব্রতভঙ্গের মধ্যে গণ্য হইবে। সুতরাং সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারীগণের পক্ষে পূর্ণিমা হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত ব্রত-পালনই মঙ্গলজনক। সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে কার্ত্তিক-ব্রত পালনের বিধি সম্বন্ধে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সজ্জনতোষণীর ১০ম খণ্ড, ৭ম সংখ্যায় অর্থাৎ ১৩০৫ বঙ্গাব্দের (১৯৮৮, অক্টোবর) সংখ্যায় যে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা প্রমাণস্বরূপে সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে মুদ্রিত করিলাম। গৃহস্থ ব্যক্তিগণ শ্রীল ঠাকুরের প্রবন্ধ পাঠ করিয়া নিয়মিতভাবে ব্রত উদ্যাপন করিবেন, ইহাই প্রার্থনা।

"কার্ত্তিক ব্রত

কার্ত্তিক-ব্রত পালন বৈষ্ণবদিগের একটী প্রধান কর্ত্তব্য।—

আশ্বিনস্য তু মাসস্য যা শুক্লৈকাদশী ভবেৎ।
কার্ত্তিকস্য ব্রতানিহ তস্যাং কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ॥"

এই বচনানুসারে প্রতি বৎসরে বিজয়া দশমীর পর দিবস যে একাদশী হয়, সেই দিবস হইতে ব্রতারম্ভ। আর উত্থান-একাদশীতে ঐ ব্রত সমাপ্ত হইবে। এই এক মাসের মধ্যে যে ব্রত পালন করা হয়, তাহার নাম 'নিয়ম-সেবা'। নিয়ম-সেবার বিধি এই, সেই মাসের প্রতি দিবসে রাত্রের শেষ যামে শুচি হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে মঙ্গলারতি করিবে। প্রাতঃ-স্নান করিয়া দামোদরার্চ্চন করিবে। রাত্রে ঘৃত দীপ বা তিল-তৈলের দীপ ভগবন্মন্দিরে, তুলসী-তলে এবং আকাশে প্রজ্জ্বলিত করিবে। কার্ত্তিক মাসে নিরামিষ্য এবং ভগবানের প্রসাদান্ন ভোজন করিবে। পরান্ন, পরশয্যা, তৈল, মধু ও কাংসপাত্র ব্যবহার পরিত্যাগ করিবে। প্রসাদ সেবনান্তে বৈষ্ণব-সঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতাদি-শ্রবণ বা পঠন করিবে। নিরন্তর হরিনাম কীর্ত্তন ও স্মরণ করিবে। এইপ্রকার বিধি অবলম্বনপূর্ব্বক উক্ত মাস যাপন করত উত্থান একাদশীতে নিরম্বু উপবাস ও কৃষ্ণ-কথায় রাত্রি জাগরণ করিবে। পরদিন প্রাতে শুচি হইয়া হরি-কীর্ত্তনান্তে আত্মীয় বৈষ্ণবগণকে সেবা করাইয়া অবশেষে স্বয়ং প্রসাদ সেবন করিবে। সেই দিবস রাত্রশেষে ব্রত সমাপ্ত করিবে।"

—শ্রীগৌঃ পত্রিকা ৮ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা।

পুরুষোত্তম-ব্রত

পুরুষোত্তম মাস ও মলমাস

শ্রীহরিভক্তিবিলাস-মতে পুরুষোত্তম-মাসেই পুরুষোত্তম-ব্রত হইয়া থাকে। স্মার্ত্তগণ এই মাসকে মলমাস বা অধিমাস বলিয়া থাকেন। শুধু তাহাই নহে, ইহাকে 'মলিম্লুচ' (চোর), মলিন মাস ইত্যাদি নাম দিয়া এই অধিমাসকে ঘৃণিত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে এই মাসে কোন শুভকার্য্য সম্পন্ন হইবে না ; তজ্জন্যই ইহা মাসের মধ্যে মলস্বরূপ। সুতরাং সাধারণতঃ তাঁহারা ইহাকে মলমাস বলিয়াই লোকের নিকট পরিচিত করিয়াছেন। স্মার্ত্তগণের এইরূপ বিচার বৈষ্ণবগণ কখনই অনুমোদন করেন না।

শাস্ত্রও আমাদের দেশে দুইপ্রকার পরিলক্ষিত হয়। নিজ নিজ রুচি-অনুসারে লোক শাস্ত্রের উক্তিসকল গ্রহণ করিয়া থাকে। তজ্জন্য পারমার্থিক শাস্ত্র স্মার্ত্ত-শাস্ত্র হইতে পৃথক্। যাঁহারা নিতান্ত ভোগ-প্রবণতার বশবর্ত্তী হইয়া কর্ম্মমার্গে প্রবেশ করেন, তাঁহারাই স্মার্ত্ত-শাস্ত্রের বহুমানন করেন। এই স্মার্ত্ত-মতেই মলমাসে বা অধিমাসে একমাস-কাল নিষ্ক্রিয় হইয়া জীবন-যাপন করিতে হয়। শরীর ও মন নিষ্ক্রিয় হইলেই তাহাতে শয়তান কারখানা খুলিয়া বসে। শয়তানের কর্ম্মিগণকে উৎপীড়িত করিবার ইহাই সুবর্ণ সুযোগ।

বৈষ্ণবগণ একমুহূর্ত্তও হরিসেবা ব্যতীত কালক্ষেপ করেন না। 'অব্যর্থকালত্ব' বৈষ্ণব-মাত্রেরই ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে একটী প্রধান অঙ্গ। শ্রীপুরুষোত্তম-মাস ২ বৎসর, ৮ মাস, ১৬ দিন, ৪ ঘন্টার পরে একবার আবির্ভূত হন। সুতরাং বৈষ্ণবগণের পক্ষে ইহা মলমাস নহে, পরন্তু প্রচলিত দ্বাদশ মাস অপেক্ষা সর্ব্বোত্তম অধিমাস। এমন কি, সৌর-গণনায় দ্বাদশ মাসের মধ্যে বৈশাখ, কার্ত্তিক, মাঘ—৩ মাস মহাপুণ্যমাস বলিয়া কথিত হইলেও তদপেক্ষা এই অধিমাসের শ্রেষ্ঠত্ব নারদীয় পুরাণের একত্রিংশ অধ্যায়ের বচনানুসারে স্বীকৃত হইয়াছে।

পুরুষোত্তম মাস সম্বন্ধে নারদীয় পুরাণ

সৌর দ্বাদশ মাসের সহিত চান্দ্র-রাশিস্থিত মাসের সহিত মিল রাখিবার জন্য ৩২ মাস, ১৬ দিন, ৪ ঘন্টা পরে একটী চান্দ্রমাস অর্থাৎ এক অমাবস্যা হইতে অপর অমাবস্যা পর্য্যন্ত একটী অতিরিক্ত উন্নততম মাস স্বীকার করিতে হয়। স্মার্ত্ত-মতে ইহাই বৎসরের মল। এই অধিমাসের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে নারদীয় পুরাণে একটী আখ্যায়িকা বর্ণিত আছে। তাহাতে অধিমাসের প্রতি স্মার্ত্ত-কর্ম্মিগণের ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া অধিমাস বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণের নিকট অভিযোগ আনয়ন করেন। বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণ

তাহার অভিযোগ শ্রবণ করিয়া স্মার্ত্ত-কর্ম্মিগণের ব্যবহারে অত্যন্ত দুঃখিতভাবে তাহার প্রতিকারের জন্য অধিমাসকে সঙ্গে লইয়া গোলোকপতি শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ অধিমাসের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া দয়ার্দ্র হইয়া বলিলেন,—

অহমেতৈর্যথা লোকে প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ।
তথায়মপি লোকেষু প্রথিতঃ **পুরুষোত্তমঃ** ॥
অস্মৈ সমর্পিতাঃ সর্ব্বে যে গুণা ময়ি সংস্থিতাঃ।
মৎসাদৃশ্যমুপাগম্য **মাসানামধিপো ভবেৎ** ॥
জগৎপূজ্যো জগদ্বন্দ্যো মাসোঽয়ং তু ভবিষ্যতি।
সর্ব্বে মাসাঃ সকামাশ্চ **নিষ্কামোঽয়ং** ময়া কৃতঃ ॥

*   *   *   *

যেনাহমর্চ্চিতো ভক্ত্যা মাসেঽস্মিন্ পুরুষোত্তমে।
ধন-পুত্র-সুখং ভুংক্ত্বা পশ্চাদ্গোলোকে বাসভাক্ ॥

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—আমি যেরূপ এজগতে 'পুরুষোত্তম' বলিয়া বিখ্যাত, এই অধিমাসও সমস্ত জগতে 'পুরুষোত্তম' বলিয়া প্রথিতনামা হইবে। আমাতে যে-সমস্ত গুণ আছে, সেই সমস্তই এই অধিমাসে অর্পিত হইল। আমার সদৃশ হইয়া **এই অধিমাসে অন্য সকল মাসের অধিপতি হইবে।** এই মাস জগৎপূজ্য ও জগদ্বন্দ্য। অন্য সকল মাস সকাম, এই মাসটী নিষ্কাম অর্থাৎ কামী জীবমাত্রই ফল-কামনা চরিতার্থ করিবার জন্য প্রচলিত দ্বাদশ চান্দ্রমাসে নানা-প্রকার কাম্যকর্ম্মে লিপ্ত হয়, ইহাতে সকাম পুরুষগণের কোন কামনার পূর্ত্তি না থাকায় এই মাস নিষ্কাম। সুতরাং নিষ্কাম ভগবদ্ভক্তগণ এই পুরুষোত্তম মাসে ভক্তিপূর্ব্বক আমার অর্চ্চন করিলে আপনা হইতেই ধন-পুত্রাদি সুখভোগ অবাঞ্ছিতরূপে তাহাদিগকে আশ্রয় করিবে, এবং অবশেষে মুক্তিলাভ করিয়া তাঁহারা নিত্যানন্দময় গোলোকবাসী হইবেন।

সুতরাং স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণের প্রার্থনাক্রমে অধিমাসের সর্ব্বোত্তমতা আত্মমঙ্গলেচ্ছু প্রাণিগণের নিকট জ্ঞাপন করিলেন। সর্ব্বশাস্ত্র-তাৎপর্য্যবিৎ বৈষ্ণব-পণ্ডিতগণ তজ্জন্যই অধিমাসকে 'পুরুষোত্তম' মাস জ্ঞান করিয়া এই মাসে পুরুষোত্তম-ব্রত পালন করিয়া থাকেন। এই ব্রতে কার্ত্তিক-ব্রতের যাবতীয় নিয়মই সর্ব্বতোভাবে পালনীয়; আহার-বিহারাদি সম্বন্ধে একই বিধি অবলম্বনীয়। তাহা ছাড়া এই ব্রতের বিধি-নিষেধ বিশেষভাবে জানিতে ইচ্ছা করিলে জগদ্গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের 'শ্রীপুরুষোত্তম-মাস-মাহাত্ম্য' ও 'শ্রীপুরুষোত্তম-মাস-কৃত্য' প্রবন্ধদ্বয় পাঠ করিবেন।

সাত্ত্বিক শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, যদি কোন শাস্ত্রে অধিমাসকে মলমাস বা মলিম্লুচ বা মলিনমাস বলিয়া উল্লেখ থাকে, তবে বৈষ্ণবগণ তাহা কেন মানিবেন না? এস্থলে আমাদের বক্তব্য এই যে, এই অধিমাস 'পুরুষোত্তম-মাস' বলিয়াও শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে। তন্মধ্যে কোন্ শাস্ত্রের প্রাধান্য দেওয়া কর্ত্তব্য, তাহাই এস্থলে বিচার্য্য। অষ্টাদশ পুরাণ তিন ভাগে বিভক্ত—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। তন্মধ্যে সত্ত্বগুণই সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে শ্রেষ্ঠ। সাত্ত্বিক পুরাণের অন্তর্গত নারদীয় পুরাণ অধিমাসকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ 'পুরুষোত্তম' মাস আখ্যা দিয়াছেন। সুতরাং আমরা সাত্ত্বিক পুরাণের প্রমাণকেই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছি। স্মার্ত্তগণের অভিরুচি-অনুসারে রাজসিক-তামসিক পুরাণের বাক্য গ্রহণে আমরা অসমর্থ। তবে যে-স্থলে সাত্ত্বিক পুরাণের অনুসরণ করিয়া রাজসিক-তামসিক পুরাণ যে-যে বাক্য ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা গ্রহণ করিতে কোন বাধা নাই। কারণ, রাজসিক-তামসিক প্রবৃত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে সত্ত্বগুণে উন্নীত করিবার উদ্দেশ্যও উহাতে নিহিত আছে।

সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণের মধ্যে সত্ত্বগুণই শ্রেষ্ঠ। শ্রেষ্ঠত্ব ও অপকৃষ্টত্বের পরিচয় ফলের দ্বারাই নির্ণীত হয়। যে গুণের ফল শ্রেষ্ঠ, সেই গুণই শ্রেষ্ঠ। এসম্বন্ধে গীতা-শাস্ত্র আমাদিগকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন। যাঁহারা গীতার চতুর্দ্দশ অধ্যায় ভালরূপ আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের এবিষয়ে আর কোনরূপ সন্দেহ নাই। সত্ত্বগুণই নির্ম্মল—জ্ঞান ও সুখের সঙ্গ প্রদান করিয়া ঊর্দ্ধগতি দান করে। রজস্তমোগুণ জীবকে নিম্নগামী, দুঃখময় ও অজ্ঞান-অন্ধকারে নিক্ষেপ করে। এস্থলে গীতার দুই-একটী শ্লোক উদ্ধার করিয়া পাঠক-বর্গের কৌতুহল নিবৃত্তি করিতেছি।—

তত্র **সত্ত্বং** নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখ-সঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞান-সঙ্গেন চানঘ॥
রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণা-সঙ্গ-সমুদ্ভবম্॥
তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম্॥
কর্ম্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্ম্মলং ফলম্।
রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্॥
ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ॥
জঘন্য-গুণ-বৃত্তিস্থা অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ॥

(গীঃ ১৪।৬, ৭, ৮, ১৬, ১৮)

গীতা সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বী সকলেই সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এবং ইহা সাক্ষাৎ গোলোকপতি শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ-বাণী বলিয়া ইহাকে বেদের ন্যায় গীতো-

পনিষৎ জ্ঞান করিয়া পূজা করিয়া থাকেন। সুতরাং শ্রীগীতোপনিষদের উক্ত বাক্যসমূহ হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, সাত্ত্বিক গুণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং তাহার দ্বারাই বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করিয়া উর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। রজোগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে জীবের কর্ম্মাগ্রহিতা প্রবল হইয়া থাকে। এই কর্ম্মই জীবের বন্ধনের কারণ। তাহা হইতে লোভ, নানা-প্রকার কামনা, সদসৎ ক্রিয়াতে প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে। এই সম্বন্ধে গীতাও তারস্বরে আমাদিগকে জানাইয়াছেন—

লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্ম্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্তেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ॥ (গীঃ ১৪।১২)

গীতার প্রমাণানুসারে কেহ হয়ত বলিবেন, সত্ত্বগুণই শ্রেষ্ঠ ও সাত্ত্বিক শাস্ত্রের প্রমাণই আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গ্রহণীয়; কিন্তু নারদীয় পুরাণখানি যে সাত্ত্বিক পুরাণ, তাহার প্রমাণ কি? তৎসম্বন্ধে আমরা ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া সন্দেহ নিরসন করিতেছি। অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে কোন্ কোন্ পুরাণ কি কি গুণান্বিত, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ তাহা স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন।—

বৈষ্ণবং **নারদীয়ঞ্চ** তথা ভাগবতং শুভম্।
গারুড়ঞ্চ তথা পাদ্মং বরাহং শুভদর্শনে।
সাত্তিকানি পুরাণানি বিজ্ঞেয়ানি মনীষিভিঃ॥
ব্রহ্মাণ্ডং ব্রহ্মবৈবর্ত্তং মার্কণ্ডেয়ং তথৈব চ
ভবিষ্যং বামনং ব্রাহ্মং রাজসানি নিবোধত।
মাৎস্যং কৌর্ম্মং তথা লৈঙ্গং শৈবং স্কান্দং তথৈব চ।
আগ্নেয়ঞ্চ ষড়েতানি তামসানি নিবোধত॥

অর্থাৎ, অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে মনীষিগণ বিষ্ণুপুরাণ, নারদীয়পুরাণ, মঙ্গলময় ভাগবত পুরাণ, গরুড়পুরাণ, পদ্মপুরাণ এবং বরাহপুরাণ—এই ছয়টী পুরাণকে **'সাত্ত্বিক'** বলিয়া থাকেন। ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, মার্কণ্ডেয়, ভবিষ্য, বামন ও ব্রহ্মপুরাণ—এই ছয়টী **'রাজসিক'** এবং মৎস্য, কূর্ম্ম, লিঙ্গ, শিব, স্কন্দ ও অগ্নিপুরাণ—এই ছয়টী **'তামসিক'** বলিয়া কথিত হয়।

এস্থলে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ রাজসিক পুরাণের অন্যতম। রজস্তমোগুণান্বিত ব্যক্তিগণকে সাত্ত্বিক শাস্ত্রে আকৃষ্ট করিবার উদ্দেশ্যেই সাত্ত্বিক শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রসমূহের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। যদি সাত্ত্বিক পুরাণের অন্তর্গত কোন পুরাণ সাত্ত্বিক পুরাণের মহিমা কীর্ত্তন করিতেন, তাহা হইলে রজস্তমোগুণান্বিত ব্যক্তিগণ তৎক্ষণাৎ যুক্তি উত্থাপন করিয়া বলিতেন,—নিজ নিজ মহিমায় সকলেই গৌরবান্বিত হইতে ইচ্ছা করে; সুতরাং সাত্ত্বিক শাস্ত্র নিজ মহিমা ত' কীর্ত্তন করিবেই; অতএব উহা গ্রহণীয় নহে। এস্থলে রাজসিক পুরাণ সাত্ত্বিক পুরাণের মহিমা কীর্ত্তন করায় স্ব-মহিমা-কীর্ত্তনের দোষ আরোপিত হইল না।

অতএব অধিমাসকে আমরা 'মলমাস'রূপে গ্রহণ না করিয়া সাত্ত্বিক পুরাণের বাক্যানুসারে 'পুরুষোত্তম-মাস' বলিয়াই ইহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিব। ইহা সর্ব্বশুভ-কর্ম্মের আকর-স্বরূপ এবং এই মাস স্বভাবতঃই সর্ব্ববাঞ্ছিত ফলপ্রসূ।

অধিমাসকে মলমাস বলার অযৌক্তিকতা

যদি একই শাস্ত্রকর্ত্তার বিভিন্ন মত একস্থানে পরিলক্ষিত হয়, তাহা হইলে কোন্‌টী গ্রহণীয়, এসম্বন্ধে আরও বিচার করা আবশ্যক। শাস্ত্রের বিরোধ-ক্ষেত্রে যুক্তিই একমাত্র সঙ্গতি স্থাপন করে।—

"কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যা বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীন-বিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥"

এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপিত হইলেও আমরা যুক্তির দ্বারাও ইহা স্থাপন করিতে পারি যে, অধিমাসকে 'মলমাস' বলিয়া গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ এই অধিমাস চান্দ্র-মাসের অভাব-পূরণকারী। শুধু তাহাই নহে, ইহা সৌর-বর্ষের মিলন-কর্ত্তা। যিনি অভাব পূরণ করেন, তাহাকে হেয় জ্ঞান করা দুর্নৈতিকতা মধ্যে পরিগণিত। কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণ মলের দ্বারা অভাব পূরণ করিতে গেলে যুক্তিবাদী নৈতিকগণ তাহা মানিয়া লইবেন কেন? যে চন্দ্র সূর্য্যালোকে প্রদীপ্ত হইয়া আত্মগরিমা ব্যক্ত করিয়া থাকেন, সেই চন্দ্রের গতি ৩২ মাসে হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে তাহার সূর্য্যের সহিত মিলিত হইবার আকাঙ্ক্ষা প্রবলা হয়। এই অধিমাস সৌর-বর্ষের সহিত চান্দ্র-বর্ষের মিলনকারী। সুতরাং এই মিলনকারী অধিমাসকে সর্ব্বোত্তম 'পুরুষোত্তম' জ্ঞান না করিয়া 'মল' বা 'মলিম্লুচ' জ্ঞান করিলে নৈতিকগণ উপহাস করিবেন। 'মলিম্লুচ'-শব্দের অর্থ চোর। 'চোরের রাত্রি-বাসে' যে মিলন, তাহা সর্ব্বত্রই উপহাস্যাস্পদ ও ঘৃণ্য। সুতরাং স্মার্ত্তমতে অধিমাসকে মলিম্লুচ বা মলমাস বলিয়া গণ্য করা কোনমতে যুক্তিসঙ্গত হইতেছে না।

—শ্রীগৌঃ পত্রিকা ১০ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা।

অতিবাড়ীর স্মার্ত্তাচার

চাতুর্ম্মাস্য-সমাপ্তি সম্বন্ধে পঞ্জিকার ভ্রান্তি

মূর্খকে উপদেশ করিলে সে তাহা গ্রহণে শান্তি লাভ করিতে পারে না, অধিকন্তু ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া পাগলের ন্যায় অনধিকার-চর্চ্চা করত অসংযত ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে। এরূপক্ষেত্রে শাস্ত্র বলেন,—"মূর্খস্য লাঠ্যৌষধিঃ"। শ্রীমদ্ভাগবত এইরূপ শ্রেণীর জীবকে পশুশ্রেণীভুক্ত করিয়া ব্যবস্থা দিয়াছেন—"পশূনাং লগুড়ো যথা"। সাধারণ কথায় বলে,—"ভাঙ্গবে তবু মচকাবে না"। আমরা দুঃখের সহিত মূর্খগণকে শাসনের জন্য দণ্ডধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছি।

চাতুর্ম্মাস্যব্রত-সমাপ্তি সম্বন্ধে অতিবাড়ী * * মহারাজ যে স্মার্ত্ত-পঞ্জিকাকারগণের পদলেহন করিয়া তাঁহাদের বিচার-যুক্তির শরণগ্রহণ করত জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদের বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্তমুলক পঞ্জিকার হৃৎপিণ্ড উৎপাটন করিয়াছেন, আমরা পূর্ব্বে তাহা বহুবার প্রদর্শন করিয়াছি। পুনঃ পুনঃ বৈষ্ণবজগতে স্মার্ত্তাচার প্রবর্ত্তন করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীল প্রভুপাদের নামের সুযোগ লইয়া তিনি যথেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় দিতেছেন। ইহাই * * মহারাজের প্রচ্ছন্ন স্মার্ত্ত ও বৌদ্ধ-বিচার।

যাবতীয় স্মার্ত্ত-পঞ্জিকাকারগণ বিদ্ধা তিথিতেই ব্রতারম্ভ ও ব্রত-সমাপ্তি করিয়া থাকেন। * * মহারাজ বলিতে চাহেন,—ব্রত আরম্ভের সময় শুদ্ধা তিথি গ্রহণ করিতে হইবে এবং বিদ্ধা তিথিতেই উহার সমাপ্তি মানিতে হইবে। **শুদ্ধায় আরম্ভ করিয়া বিদ্ধায় ব্রত-সমাপ্তির ব্যবস্থা প্রদর্শন—অভিনব বলিতে হইবে।** যে-সমস্ত বৈষ্ণব-ব্রত ১ দিনের জন্য নিয়মিত হইয়াছে, সেই সমস্ত ব্রতের প্রারম্ভ বিচারই * * মহারাজের ছানিপড়া চোখে পতিত হইয়াছে। যে-সমস্ত ব্রত একাধিক দিনব্যাপী পালনীয়, অর্থাৎ ৫ দিন বা ১ মাস, অথবা ৪ মাসব্যাপী, **সেই সমস্ত ব্রতগুলিও শুদ্ধায় আরম্ভ করিয়া বিদ্ধায় শেষ করিবার বিধি তিনি কোথায় পাইলেন?** স্মার্ত্তগণই শুদ্ধবৈষ্ণবগণের উপর এইরূপ বিচার ঈর্ষামূলে বা দুরভিসন্ধিমূলে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক। জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থের নামের সুযোগ লইয়া স্বকপোল-কল্পিত অসদাচার প্রবর্ত্তন করাকেই গুরুদ্রোহিতা বা অতিবাড়িত্ব বলা হয়। ইহা গুরুভোগি-সম্প্রদায়ের একটী প্রধান লক্ষণ।

গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈকরক্ষক শ্রীল সনাতন গোস্বামী বলেন,— "বৈষ্ণবানাং **সর্ব্বথা সর্ব্বত্র** বিদ্ধাত্যাগং দৃষ্টান্তেন স্মারয়তি বিদ্ধেতি। এতচ্চৈকাদশী-প্রকরণে স্পষ্টং লিখিতমেব।"—(হরিভক্তিবিলাস—দিগ্‌দর্শিনী টীকা)

অর্থাৎ বৈষ্ণবগণের সর্ব্বক্ষেত্রে এবং সর্ব্বকালে বিদ্ধাত্যাগ সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ইহা শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ একাদশী-ক্ষেত্রেও প্রসঙ্গক্রমে নির্ণয় করিয়াছেন। নিম্নে আমরা পাঠকবর্গের অবগতির জন্য একাদশী-প্রসঙ্গে যে যাবতীয় ব্রতাদিতেই বিদ্ধাত্যাগ করিতে হইবে, তাহার প্রমাণ উদ্ধার করিতেছি। তিনি একাদশী-বিচার বলিতে গিয়া বলিতেছেন,—

"প্রসঙ্গা**দ্বৈষ্ণব-ব্রতেষু সর্ব্বেষ্বপি** সবেধদিনানীত্থং পরিত্যাজ্যানি।" অর্থাৎ প্রসঙ্গক্রমে যাবতীয় বৈষ্ণব-ব্রতেই বিদ্ধাদিবস পরিত্যাগ করিতে হইবে।

উক্ত বাক্যদ্বয় শ্রীল সনাতন গোস্বামী একাদশী, জন্মাষ্টমী, রামনবমী প্রভৃতি হরি-বাসর ব্যতীতও অন্যান্য সমস্ত ব্রতপক্ষেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহা কেবলমাত্র ব্রতের আরম্ভপক্ষে গৃহীত হইবে—এইরূপ নহে। **"বৈষ্ণবব্রতেষু সর্ব্বেষু** অপি" বলিলে এবং **"সর্ব্বথা সর্ব্বত্র বিদ্ধাত্যাগং"** বলিলে, কেবলমাত্র ব্রতারম্ভকেই লক্ষ্য করিতেছে না। ইহা আরম্ভ, সমাপ্তি এবং মধ্যবর্ত্তী ক্রিয়াকেও লক্ষ্য করিতেছে। যথা—চাতুর্ম্মাস্য ব্রতের আরম্ভ একাদশী, দ্বাদশী বা পূর্ণিমা তিথি হইতে হইলে ইহা যেমন বৈষ্ণবপক্ষে শুদ্ধাই গ্রহণ করিতে হইবে, তদ্রূপ উক্ত চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতের মধ্যবর্ত্তী আনুষঙ্গিক বা একান্ত আবশ্যকীয় ব্রতাদিও শুদ্ধায় করিতে হইবে,—বিদ্ধায় করিতে হইবে না। স্মার্ত্ত কি বলিতে চাহেন, যাঁহারা দামোদর-ব্রত বা উর্জ্জব্রত পালন করিবেন, তাঁহাদের শুদ্ধা তিথিতে আরম্ভ করিয়া মধ্যবর্ত্তী ব্রতোপবাসগুলি বিদ্ধা তিথিতে করিলেও চলিবে। তিনি হয়ত বলিবেন, দামোদরব্রতের মধ্যবর্ত্তী একাদশ্যাদি ব্রত পৃথক্ ব্রত। কিন্তু একাদশী ব্যতীত দামোদর-ব্রতের অন্তর্গত কৃষ্ণ ও শুক্লপক্ষীয় অধিকাংশ তিথিরই কৃত্য হরিভক্তিবিলাসে লিখিত হইয়াছে। সেই তিথিগুলি কি বিদ্ধায় করিতে হইবে? দামোদর-ব্রতের শুক্লা চতুর্দ্দশী-কৃত্য ৩রা অগ্রহায়ণ বিদ্ধা চতুর্দ্দশীতেই করিতে হইবে কি? আমরা বলি,— ৪ঠা অগ্রহায়ণ (প্রাতঃ) ৭।২ মিনিট পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশী থাকায় চতুর্দ্দশীকৃত্য ৪ঠা শুক্রবারেই করণীয়। **পূর্ণিমাকৃত্য তৎপরদিবস পূর্ণিমা না থাকিলেও ৫ই অগ্রহায়ণ শনি-বারে শুদ্ধা তিথিতে সম্পন্ন করিতে হইবে।** বিদ্ধা পূর্ণিমায় কোন-প্রকারেই ব্রত সমাপ্তি করা যাইতে পারে না।

* * মহারাজ স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন,—সাধারণতঃ শুদ্ধা তিথিতেই ব্রতের পারণ হইয়া থাকে। ১ দিবসের ব্রতের পারণ সম্বন্ধে হরিভক্তিবিলাস পৃথক্ পৃথক্ বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন; তদনুসারেই পারণ কর্ত্তব্য। যদিও বৈষ্ণবগণ সর্ব্বদাই ব্রতাদিতে বিদ্ধাত্যাগ করিবেন, তথাপি অন্য ব্রতের হানি ঘটিলে বিদ্ধা তিথিতেও ব্রত-উপবাসের ব্যবস্থা হরিভক্তিবিলাস প্রদান করিয়াছেন। সেই সমস্ত ব্রতের বিধি পৃথক্‌ভাবে বিশেষ করিয়া লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বিশেষ বিধিকে সাধারণ বিধির সহিত

এক করিয়া লওয়া মূর্খতার পরিচায়ক। * * মহারাজের উক্ত বিশেষ বিধিগুলিকে সাধারণ বিধির সহিত একত্র করিয়া বিচার প্রদর্শন দেখিয়া বিচার-জগতের সাধারণ শিশুও বিদ্রূপ করিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিতেছে না।

স্মার্ত্ত প্রতিবাদী তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিতে গিয়া ব্যাকরণের ধাতুপ্রত্যয় এবং কাব্যের অর্থ-বিজ্ঞান প্রভৃতি নানাকথার অবতারণা করিয়াও কাহারও হাস্য নিবারণ করিতে পারেন নাই। তিনি কাব্য-ব্যাকরণের সাহায্যে লিখিয়াছেন—"যে দিবস পর্য্যন্ত পালিত হইলে ব্রতের পূর্ণাপ্তি হয়, তাহাই তাহার সমাপ্তি।" তাঁহার এই কথা মানিয়া লইলেও, ৪ঠা অগ্রহায়ণ শুক্রবার ব্রত-সমাপ্তি হয় না। অর্থাৎ ৪ঠা পর্য্যন্ত সম্যক্‌রূপে ব্রত পালন করিয়া তৎপরদিবস পারণ করিলেই ব্রতসমাপ্তি হইবে। আমরা শুনিতে পাইলাম,—* * মহারাজের পঞ্জিকার বিচারে সন্দিহান হইয়া শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি-প্রকাশিত পঞ্জিকানুসারে শ্রীধাম মায়াপুর * * মঠে ৫ই অগ্রহায়ণ শনিবার দিবসেই ব্রতভঙ্গের মহোৎসব হইয়াছে। কেহ কেহ নাকি গোঁড়ামি করিয়া বা দু'কুল বজায় রাখিতে গিয়া ৪ঠা অগ্রহায়ণ শুক্রবারে ক্ষৌরকার্য্য সমাধা করিয়া ৫ই অগ্রহায়ণ শনিবারে আহার-বিহারের নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছেন। এইরূপ করিবার সার্থকতা কি? সাধারণ লোক তাঁহাদের পঞ্জিকার ব্যবস্থায় বিশ্বাস করিয়া স্মার্ত্তানুগত বিধি পালন করিলে তজ্জন্য প্রত্যবায়ভাগী হইবে কে? ইহাকেই বলে—"বিশ্বাসঘাতকতা।"

প্রতিবাদী আরও লিখিয়াছেন—"পৌর্ণমাস্যারম্ভপক্ষে দামোদরমাসের শেষ দিবসেই এই ব্রত সমাপ্ত হইয়া থাকে।" ইহা শুনিয়া কাহার না হাসি পায়? দামোদর মাস বর্ত্তমান থাকিতেই যদি দামোদরব্রত-সমাপ্তির ব্যবস্থা হইয়া থাকে তাহা হইলে আমরা বলিতে চাহি,—দামোদর মাসের শেষ দিবসেই অর্থাৎ পূর্ণিমা-তিথিতেই রাসযাত্রা বা ধাত্রীব্রত আরম্ভের দিন নির্দ্ধারিত আছে। উক্ত রাসযাত্রা ও ধাত্রীব্রত দামোদর মাসের শেষ দিবসেই হইয়া থাকে। * * মহারাজ কি-বিচারে দামোদর মাস পার করিয়া কেশব মাসে ঐ ব্রতদ্বয় নির্দ্দেশ করিলেন? তিনি দামোদর মাসের শেষ দিবস বিদ্ধা পূর্ণিমা বিচার করিয়া দামোদর মাস অন্তে ১লা কেশব, ৫ই অগ্রহায়ণ তারিখে উক্ত-ব্রত-দ্বয়ের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দামোদর মাসেই দামোদর ব্রত শেষ করিতে হইবে ইহাই যদি তাঁহার সঙ্গত যুক্তি হইয়া থাকে, তাহা হইলে দামোদর মাসেই রাসযাত্রা ও ধাত্রীব্রত হইবে—ইহাও তাঁহার ব্যবস্থা দেওয়া উচিত ছিল। সুতরাং তাঁহার এই যুক্তিও তাঁহার অশুদ্ধ পঞ্জিকা হইতে স্থিরীকৃত হইতেছে না। * *

—শ্রীগৌঃ পত্রিকা ৫ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা।

রথযাত্রার তিথি-বিচার

উৎকল-মতে রথযাত্রা কর্ত্তব্য

মাননীয় ডাক্তার শ্রী * * ব্রহ্মচারী ওরফে শ্রী * * মহারাজ একখানি পঞ্জিকা সম্পাদন করিয়া তাহা বিশুদ্ধ ও বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত সম্মত বলিয়া সর্ব্বসাধারণে প্রকাশ ও প্রচার করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা দিবসের বিচার উক্ত পাঁজিতে যাহা দেখিয়াছি, তাহা বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত বা গোস্বামি-মতের বিচারে সম্পূর্ণ বিপরীত।

বিগত ২১শে আষাঢ় ১৩৫৭, ৫ই জুলাই ১৯৪৯, দশমী তিথি, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা দিবস বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রকৃতপ্রস্তাবে গোস্বামি-মতে এই দিবস পুনর্যাত্রা নহে। তাহার পরদিন ২২শে আষাঢ় একাদশী তিথিতেই প্রকৃত বিশুদ্ধ ও গোস্বামি-সিদ্ধান্ত-সম্মত পুনর্যাত্রা। উক্ত ডাক্তার বাবু যে-সমস্ত পঞ্জিকা আদর্শ মনে করিয়া থাকেন, তাঁহারা সকলেই স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন—"২১শে আষাঢ় **স্মার্ত্তমতে**" শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের পুনর্যাত্রা। সুতরাং গোস্বামি-মতে ঐ দিন পুনর্যাত্রা নহে, ইহা ত' সাধারণ জ্ঞান। শুধু তাহাই নহে, উক্ত স্মার্ত্ত-পঞ্জিকাকারগণ তাহার পরদিবস ২২শে আষাঢ় **উৎকল-মতে** শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতেও * * মহারাজের চোখের ছানি কাটে নাই। তিনি হয়ত মনে করিয়াছেন, উৎকল-মত সকলে গ্রহণ করিবে কেন? কিন্তু রথযাত্রাদি-সম্বন্ধে উৎকল-মত গ্রহণ করাই যে গোস্বামি-সম্মত বিচার, তাহা বোধ হয় তিনি জানেন না। গোস্বামি-মতের একমাত্র বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তপূর্ণ স্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাসের প্রমাণ এই সম্বন্ধে নিম্নে উদ্ধার করিলাম। প্রমাণটী ডাক্তারবাবু ভাল করিয়া দেখিয়া ভবিষ্যতে সাবধান হইলে সুখী হইব। যথা—

কিন্ত্বীদৃগ্ ভক্তিসংদর্শি **জগন্নাথানুসারতঃ।**
দোলা-চন্দন-কীলাল-**রথযাত্রাশ্চ** কারয়েৎ॥

(শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ১৪শ বিলাস ১০৪)

ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গোস্বামী শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু-চরণ ইহার টীকায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহাও আমাদের আলোচ্য। যথা—

কিন্ত্বিতি—ঈদৃশী মূর্ত্তিপূজা, যাত্রোৎসবাদিরূপা যা ভক্তিঃ তস্যাঃ সম্যগ্ দর্শনশীলস্য লোকগ্রাহকস্য **শ্রীজগন্নাথদেবস্য অনুসারতঃ যস্মিন্ দিনে যথা তৎক্ষেত্রে ভবেৎ তদ্দিনেঽপি তথা** দোলযাত্রাং, চন্দনযাত্রাং, জলযাত্রাং, **রথযাত্রাঞ্চ** কুর্য্যাদেবেত্যর্থঃ।

অর্থাৎ—কিন্তু এই প্রকার মূর্ত্তিপূজা ও যাত্রোৎসবাদি ভক্তির আদর্শ-স্বরূপ, লোকগ্রাহক জগন্নাথদেবের অনুসারে (উৎকলমতে) দোলযাত্রা, চন্দনযাত্রা, স্নানযাত্রা ও রথযাত্রা করিবে। তথায় এই সকল যাত্রা যে যে দিনে হইয়া থাকে তদনুসারে করিতে হইবে।

সুতরাং দোলযাত্রা, রথযাত্রাদি কয়েকটী পর্ব্ব উৎকলমতেই পালন করিতে হইবে। ইহা শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী ও শ্রীল সনাতন গোস্বামীর মত। ইহা উল্লঙ্ঘন করিয়া স্মার্ত্তানুগত্য কখনও বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না।

রথযাত্রার প্রথম দিবস

আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে শ্রীশ্রীরথযাত্রা-উৎসবের দিন উৎকলমতে স্থির আছে। এসম্বন্ধে কাহারও কোনও মতভেদ দৃষ্ট হয় না। সুতরাং এ-স্থলে অধিক আলোচনা না করিয়া এই সম্বন্ধে দুই একটী প্রমাণ উদ্ধার করিয়াই নিরস্ত হইব।

স্কন্দপুরাণ উৎকল খণ্ড ৩৩ অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে—

আষাঢ়স্য সিতে পক্ষে দ্বিতীয়া পুষ্যসংযুতা। ৩৫ ॥

* * * *

বিজয়স্ব রথে নাম গুণ্ডিচামণ্ডপং প্রতি ॥ ৩৭ ॥

অর্থাৎ আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষীয় পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত দ্বিতীয়াতে * * * আপনি রথারোহণে গুণ্ডিচা-মণ্ডপে যাত্রা করুন।

এই সম্বন্ধে বিষ্ণুধর্ম্মে যাহা দেখিতে পাই তাহাও উক্ত বচনের অনুরূপ যথা—

আষাঢ়স্য সিতে পক্ষে দ্বিতীয়া পুষ্যসংযুতা।
তস্যাং রথে সমারোপ্য রামং মাং ভদ্রয়া সহ।
যাত্রোৎসবং প্রবৃত্ত্যাথ প্রীণয়েচ্চ দ্বিজান্ বহূন্ ॥

অর্থাৎ আষাঢ় মাসের পুষ্যানক্ষত্রযুক্তা শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে শ্রীজগন্নাথদেবের রথ-যাত্রার অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। সুভদ্রা ও বলরামের সহিত জগন্নাথদেবকে রথে আরোহণ করাইয়া এই উৎসব করিতে হয়। "ঋক্ষাভাবে তিথৌ কার্য্যা"—এই ন্যায় অনুসারে পুষ্যা নক্ষত্র না পাইলেও কেবল দ্বিতীয়া তিথির উপরই নির্ভর করিয়া উৎসব করিবে। যাহা হউক্ এ-সম্বন্ধে কাহারও কোনও মতভেদ না থাকায় অধিক লেখা নিষ্প্রয়োজন।

একাদশী তিথিতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা

পুনর্যাত্রা লইয়াই অযথা মতভেদ লক্ষিত হয়; সুতরাং এসম্বন্ধে দু'একটী অকাট্য প্রমাণ বিশেষ প্রয়োজন। স্কন্দ পুরাণের উৎকল খণ্ড ৩৫ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে—

অষ্টমেঽহ্নি পুনঃ কৃত্বা দক্ষিণাভিমুখান্ রথান্।
ভূষয়েদ্বস্ত্রমাল্যৈশ্চ পতাকৈশ্চামরাদিভিঃ ॥ ৭ ॥
নবম্যাং বাসয়েদ্দেবান্ তেষু প্রাতঃ **সমৃদ্ধিমৎ**।
দক্ষিণাভিমুখী যাত্রা বিষ্ণোরেষা সুদুর্ল্লভা ॥ ৮ ॥
কার্য্যা প্রযত্নতঃ সা হি ভক্তিশ্রদ্ধাসমন্বিতৈঃ।
যথা পূর্ব্বা তথা চেয়ং তে বিমুক্তিপ্রদায়িকে ॥ ৯ ॥
যাত্রাপ্রবেশৌ দেবস্য এক এবোৎসবে যতঃ।
পুরাবিদো বদন্ত্যেতাং **যাত্রাং নবদিনাত্মিকাম্** ॥ ১০ ॥

অর্থাৎ **অষ্টম দিবসে** রথত্রয়কে পুনরায় দক্ষিণাভিমুখ করিয়া বস্ত্র, মাল্য, পতাকা ও চামরাদি-দ্বারা সুসজ্জিত করিবে। তৎপরে **নবমী তিথিতে** (নবম দিবসে) প্রাতঃকালে মহাসমারোহের সহিত সেই রথত্রয়োপরি দেবত্রয়কে পূর্ব্ববৎ অধিষ্ঠিত করিবে। ভগবান্ বিষ্ণুর দক্ষিণাভিমুখী এই পুনর্যাত্রা অতি দুর্ল্লভ। মানবগণকে ভক্তিশ্রদ্ধাসমন্বিত হইয়া সাতিশয় যত্নসহকারে উহা সম্পাদন করিতে হইবে। পূর্ব্বযাত্রা ও পুনর্যাত্রা, উভয়ই মুক্তিদায়ক। ভগবানের নিজ মন্দির হইতে মহাবেদীতে যাত্রা ও তথা হইতে পুনর্ব্বার যে, নিজ মন্দিরে প্রবেশ, এই উভয় কার্য্য একই উৎসব বলিয়া পুরাবিৎ পণ্ডিতগণ ভগবানের ঐ **রথযাত্রাকে নব-দিনাত্মিকা** যাত্রা বলিয়া থাকেন।

উক্ত স্থলে 'নবম্যাং' শব্দে নবমী তিথি বুঝাইলেও উহার অর্থ নবমী তিথি কেহই স্বীকার করেন না। বিশেষতঃ * * মহারাজও নবমী পার করিয়া দশমীতেই পুনর্যাত্রা বিধেয় বলিয়া পাঁজিতে লিখিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত উহা নবমী তিথি অর্থ ধরিলে, উহার পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষা হয় না। উক্ত ১০ম শ্লোকে বলা হইয়াছে যে রথযাত্রা উৎসব **নবদিনাত্মিকা**। সুতরাং দ্বিতীয়া হইতে নব-দিনাত্মিকা রথ-যাত্রা হইলে, পুনর্যাত্রা একাদশী তিথিতেই সাব্যস্ত হয়। অষ্টম দিবসে রথত্রয়কে দক্ষিণাভিমুখে ঘুরাইয়া বিবিধ মাল্য পতাকাদ্বারা সাজাইবার উপদেশ আছে। সুতরাং উহা 'নবমী তিথি' এই অর্থে না হইয়া, 'নবম দিবস'-অর্থে 'নবম্যাং' আর্ষ প্রয়োগ হইয়াছে।

পুনর্যাত্রা সম্বন্ধে পদ্মপুরাণ

এতদ্ব্যতীত পদ্মপুরাণ-বচন দেখিলে সকল বিবাদই মিটিয়া যায়। নিম্নে উহা উদ্ধৃত হইল—

আষাঢ়স্য দ্বিতীয়ায়াং রথং কুর্য্যাদ্বিশেষতঃ।
আষাঢ়**শুক্লৈকাদশ্যাং** জপহোম-মহোৎসবম্ ॥

অর্থাৎ আষাঢ় মাসের শুক্লা দ্বিতীয়াতে রথযাত্রা করিয়া শুক্লা **একাদশীর দিন পুনর্যাত্রা** করিতে হইবে। এইদিন জপহোমাদি-মহোৎসব বিধেয়।

সুতরাং স্মার্ত্তমতে দশমীতে পুনর্যাত্রা হইবার কোনও যুক্তি বা কারণ নাই। একাদশী তিথিই সর্ব্বতোভাবে শুদ্ধ ও শাস্ত্রসম্মত। কোথাও "সপ্তাহং সরিতস্তীরে মম যাত্রা ভবিষ্যতি" (বিষ্ণুধর্ম্মের অন্যত্র) এরূপ উক্তি দৃষ্ট হইলেও উহার সঙ্গতি করা বিশেষ প্রয়োজন। এখানে সপ্তাহ বলিলে "যাত্রা ও পুনর্যাত্রা" এই দুই দিবস বাদে অন্ততঃ নির্খুত সাতদিন সরোবর-তীরে অবস্থান বুঝিতে হইবে। সুতরাং 'সপ্তাহং' শব্দের এরূপ অর্থ করিলে শাস্ত্রের সমস্ত বাক্যের সহিতই সামঞ্জস্য রক্ষা হয়।

মাননীয় শ্রীপাদ * * মহারাজ ওরফে ডাক্তার * * ব্রহ্মচারী মহাশয় তাঁহার ভ্রম স্বীকার করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিলেই আনন্দিত হইব এবং ভবিষ্যতে পঞ্জিকা সংশোধন করিয়া প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিবেন ইহাই প্রার্থনা। নচেৎ এরূপ ভুল-পঞ্জিকা প্রকাশ করিয়া মঙ্গলেচ্ছু সরল ব্যক্তিদের পরমার্থ নষ্ট করিবেন না।

রথযাত্রা সম্বন্ধে দু'চারটী কথা

পুরীর রথ বৌদ্ধ-রথের অনুকরণ নহে

আজকাল পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত উদ্‌ভ্রান্ত স্বশ্রীকাতর ব্যক্তিগণের মধ্যে শুনিতে পাওয়া যায়, ভারতীয় বিশেষতঃ শ্রীশ্রীপুরীধামের রথযাত্রা-মহোৎসব বৌদ্ধগণের রথযাত্রার অনুকরণে হইয়াছে। বৌদ্ধ শ্রমণগণ বুদ্ধদেবের জন্মোৎসব দিবসে রথযাত্রা মহোৎসব করিতেন। অবশ্য ইহা ন্যায়সঙ্গত ভাবে অনুমান করা যাইতে পারে যে, শ্রমণগণ গোস্বামিমতে রথোৎসব করিতেন না। বৌদ্ধগণের মধ্যে রথযাত্রার প্রচলন সম্বন্ধে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় বলেন যে ফাহিয়ান্ নামক একজন চীন-দেশীয় পরিব্রাজকের উক্তিই প্রধান প্রমাণ। তিনি খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে বুদ্ধের রথযাত্রা দর্শন করিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে ভারতে অন্য কোনও রথের সন্ধান উক্ত ডাক্তার বাবু আর পান নাই। গোস্বামিবর্গ প্রাচীনতম শাস্ত্রাদিতে যে রথের সন্ধান পাইয়া তাহার বিধি-ব্যবস্থা যেরূপভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা বোধহয় ডাক্তারী-বিদ্যা আলোচনার ফলে ডাক্তার রাজেন বাবু ও ডাক্তার * * ব্রহ্মচারী ওরফে * * মহারাজের চোখে (বৌদ্ধ ও স্মার্ত্ত) ছানি পড়ায় দেখিতে পান নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বৌদ্ধ-সম্বন্ধ যেন স্বভাবতঃই উভয় ডাক্তার বাবুর হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। বৈষ্ণব বিচার ত্যাগ করিলেই বৌদ্ধ, প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বা স্মার্ত্ত হইতে হয়।

রথারোহণের অপর নাম পাহাণ্ডি বা পাণ্ডুবিজয়

উক্ত পঞ্চম শতাব্দির ফাহিয়ানের জন্মের আরও ২০০ শত বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে দ্রাবিড়ের অন্তর্গত পাণ্ড্যদেশ নামক একটী দেশে পাণ্ডু-বিজয় বা পাণ্ড্য-বিজয় নামে একজন মহা পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে

বৌদ্ধগণের প্রবল প্রতাপের ফলে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম কিয়ৎ পরিমাণে ক্ষীণপ্রভ হইয়াছিল। সেই সময় উক্ত রাজার শ্রীদেবেশ্বর নামে একজন পুরোহিতের সুমন্ত্রণা-প্রভাবে পাণ্ড্যরাজা সমস্ত বৌদ্ধ-বিপ্লব ধ্বংস করিয়া শুদ্ধ সনাতন ধর্ম্মের সদাচার ও উৎসবাদির অনুষ্ঠান পুনঃ প্রবর্ত্তন করেন। তিনি শ্রীশ্রীজগন্নাথ, বলদেব ও সুভদ্রাদেবীকে রথে করিয়া সুন্দরাচলে নির্জ্জনে সংরক্ষণ করেন। এখনও শ্রীজগন্নাথদেবের রথারোহণকে সেই রাজা পাণ্ড্যবিজয়ের নামানুসারে "পাণ্ডুবিজয়" বা "পাহাণ্ডি" বলিয়া থাকে এবং পাণ্ড্য-বিজয়ের পুরোহিতের নামানুসারে সেবাইতগণের নাম 'পাণ্ডা' হইয়াছে।

ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসের প্রাচীনতা

উক্ত পাণ্ডুবিজয় রাজার পুরোহিত বা মন্ত্রী শ্রীদেবেশ্বর। তাঁহার পুত্র দেবতনু ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া 'আদি বিষ্ণুস্বামী' নামে পরিচিত হন এবং অষ্টোত্তরশত-নামী ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসী শিষ্য করেন। তিনি বৌদ্ধমত ধ্বংস করিয়া সর্ব্বত্র বৈষ্ণব মত প্রচার করেন। ইহা আচার্য্য শ্রীল শঙ্করের আবির্ভাবের বহু শত বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা। দশনামী সন্ন্যাসীর কথা আধুনিক, পৌরাণিক নহে। যুগ-সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসের কথা প্রচলিত রহিয়াছে; কিন্তু কেবলমাত্র দশনামীর একদণ্ড-সন্ন্যাস অত্যন্ত আধুনিক এবং সেদিনের শঙ্কর-প্রবর্ত্তিত সন্ন্যাস মাত্র।

বৈদিক যুগে রথ ও রথযাত্রা

প্রাচীন বৈদিক যুগেও রথের চলন ছিল। কঠোপনিষদের তৃতীয় বল্লীতে রথ-শব্দের উল্লেখ দেখা যায়। যদিও তাহা রূপকভাবে ব্যক্ত হইয়াছে, তথাপি তাহার দ্বারা সেই যুগে রথের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। তৃতীয় মন্ত্র যথা—

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং **রথ**মেব তু।
বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥

এতদ্ব্যতীত বেদের অন্যত্র বিষ্ণুর ও সূর্য্যের রথের কথার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। রামায়ণ, মহাভারত, পদ্মপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, বিষ্ণুধর্ম্ম, উৎকল-খণ্ড, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি প্রাচীন পুরাণশাস্ত্রেও রথের উল্লেখ আছে। অনেকে মনে করেন, অর্জ্জুনের রথে কৃষ্ণ সারথী ছিলেন বলিয়া প্রাচীনকালে যুদ্ধের যানবাহনকেই রথ-শব্দের দ্বারা আখ্যাত করিত। ইহার মূলে কিছু সত্যতা থাকিলেও 'রথ' ও রথযাত্রা-পর্ব্বাদি যে বৌদ্ধ-যুগেরও অনেক পূর্ব্বেকার, এবিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

হিন্দুর সনাতন ধর্ম্মের ঐতিহ্য অতি প্রাচীন; সুতরাং তাঁহারা কাহারও আনুকরণিক নহেন, পরন্তু পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ভারতীয় ধর্ম্ম-চিন্তাস্রোতে অনুপ্রাণিত হইয়া অন্যান্য ধর্ম্ম-

বিজ্ঞান রচিত হইয়াছে। "যাহা নাই বেদে, তাহা নাই জগতে"—এই সত্য কথাটী ভারতের সর্ব্বত্রই সাধারণের মধ্যে প্রচলিত আছে। আমরা ইহার প্রমাণস্বরূপ Oldfield (ওল্ডফিল্ড) নামক জনৈক প্রবীণ পাশ্চাত্য পণ্ডিতের উক্তি নিম্নে উদ্ধার করিলাম।—

The Buddhist Festival is evidently adopted from the Hindu Festival of Jagannath, in honour of Jagannath and His Brother Balaram and Kumari representing their sister Subhadra.—Oldfield's sketches from Nepal vol.-II P.-316.

অর্থাৎ বৌদ্ধগণের রথযাত্রা উৎসব জগন্নাথের রথযাত্রা উৎসব হইতেই গৃহীত হইয়াছে। এই উৎসব জগন্নাথ, তাঁহার ভ্রাতা বলরাম ও তাঁহাদের উভয়ের ভগ্নী সুভদ্রার সম্মানের জন্য করা হয়।

আমরা দুঃখের সহিত ডাক্তার বাবুর ন্যায় আধুনিক ইংরাজী-শিক্ষিত ভদ্র মহোদয়গণকে বলিতে চাই যে, ইয়োরোপের বা পাশ্চাত্য-দেশীয় পণ্ডিতগণ বিশেষ জোরের সহিতই বলিয়া থাকেন "বৌদ্ধ রথ ভারতীয় রথের অনুকরণে হইয়াছে।" আর আমাদের দেশীয় তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তিসকল বলেন—"ভারতীয় রথই বৌদ্ধ রথের অনুকরণে হইয়াছে।" ইহা হইতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি হইতে পারে? অতএব আমরা বলিতে বাধ্য হইতেছি, তাঁহারা স্বশ্রীকাতর এবং পরশ্রী-গৌরব। খোলা ভাষায় বলিতে গেলে নিজ-শ্রী দর্শনে কাতর ও দুঃখিত, কিন্তু পরশ্রীতে গৌরবান্বিত বোধ করেন।

ইয়োরোপ ও নেপালে রথযাত্রা

উক্ত ওল্ডফিল্ড সাহেব নেপালের রথযাত্রা প্রসঙ্গ লিখিতে গিয়া ঐ প্রকার কথা লিখিয়াছেন। নেপালে শিবের ও বুদ্ধের উভয়েরই বিভিন্ন প্রকার রথযাত্রার কথা তিনি উল্লেখ করিয়াছেন।

এই রথযাত্রা কেবল ভারতে বা তাহার সন্নিকটস্থ দেশেই হইয়া থাকে, এরূপ নহে। আজকাল যাহাকে আমরা সুসভ্য দেশ বা জাতি বলিয়া মনে করি, তাহাদের মধ্যেও ইহার প্রচলন রহিয়াছে। ইয়োরোপের অন্তর্গত সিসিলি দ্বীপেও করুণাময় দেবতার মাতা মেরীর সম্মানার্থ এইরূপ রথযাত্রা হইত এবং পূর্ব্বে পুণ্যলাভের জন্য ভারতে যেরূপ বীভৎস ও নির্ম্মম কাণ্ড হইত, সিসিলিতেও সেইরূপ হইত। আমরা পাশ্চাত্য বিদুষী শ্রীমতী কারাসিওলোর (Madam Henrietta Caraciolo) লিখিত প্রবন্ধের কিয়দংশ পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে উদ্ধার করিলাম।—

A Colossal Car is dragged by a long team of buffaloes through the irregular and illpaved streets. Upon this are erected a great variety of objects, such as Sun, Moon and principal planets, set in rotary motion

and diminishing proportionately in size as they opproach the summit of the structure. This erection is in itself really imposing ; sumptuously decorated and put in movement in honour of her who gave birth to the God of charity. But its function recalls to mind the famed car of Jagannath.
—Memories of Henrietta Caraciolo P.-21.

অর্থাৎ সুদীর্ঘ মহিষশ্রেণী-দ্বারা একটী বিরাট রথ প্রস্তর-নির্ম্মিত বন্ধুর পথের উপর দিয়া আকর্ষণ করা হয়। এই রথোপরি বিবিধ দৃশ্যাবলী সজ্জিত থাকে, তন্মধ্যে ঘূর্ণ্যমান চন্দ্র-সূর্য্যাদি প্রধান প্রধান গ্রহরাজি উল্লেখযোগ্য। এই গ্রহসমূহ ঘুরিতে ঘুরিতে রথের শীর্ষদেশের দিকে অগ্রসর হইতে থাকিলে ক্রমশঃ উহারা ক্ষুদ্র দেখাইতে থাকে। এই দৃশ্যটী বস্তুতঃই মনোহর। করুণাময় দেবতার জননীর (মেরী) প্রতি সম্মান প্রদর্শন-কল্পে এই বস্তুটী নির্ম্মিত ও বহু অর্থব্যয়ে সজ্জিত হইয়া চালিত হয়। কিন্তু এই উৎসবটী **প্রসিদ্ধ জগন্নাথের রথের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।**

রথযাত্রায় গুণ্ডিচা মন্দির

রথযাত্রা মহোৎসবের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান অঙ্গই গুণ্ডিচা মন্দির। সুভদ্রা ও বলদেবসহ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব প্রতিবৎসর এখানে কয়েকদিন অবস্থান করিতে যে যান-বাহন অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাহাই সমগ্র পৃথিবী-বিখ্যাত 'রথ'-নামে খ্যাত। গুণ্ডিচা মন্দিরে শ্রীজগন্নাথদেব 'যাত্রা ও পুনর্যাত্রা'র দিবসদ্বয় ব্যতীত অন্ততঃপক্ষে নিখুঁত এক সপ্তাহকাল তথায় অবস্থান করেন। এখানকার ইতিহাস এই যে, সত্যযুগে ইন্দ্রদ্যুম্ন-নামে একজন ধর্ম্মপ্রাণ বৈষ্ণব মহারাজ ছিলেন। তিনি শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পরম ভক্ত এবং পুরীতে তাঁহার প্রচুর সেবা-কীর্ত্তি আজও বর্ত্তমান। তাঁহারই মহিষীর নাম ছিল 'গুণ্ডিচাদেবী'; তাঁহার নামানুসারেই এই মন্দিরের নাম "গুণ্ডিচা-মন্দির" হইয়াছে। পুনর্যাত্রার সময় শ্রীজগন্নাথদেব এখান হইতেই পুনরায় তাঁহার অভ্রভেদী অত্যুচ্চ শ্রীমন্দিরে গমন করিয়া থাকেন।

গুণ্ডিচা মন্দির হইতে ফিরিয়া যাইবার দিন নির্দ্ধারণ লইয়াই গোস্বামিগণের বিচারের সহিত স্মার্ত্ত ও বৌদ্ধগণের মতভেদ হইয়াছে। গোস্বামিগণের বিচারই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ও বিশুদ্ধ এবং শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ এই বিচারই অবলম্বন করিয়া থাকেন। আমাদের ডাক্তার-বাবু গোস্বামি-মত ত্যাগ করিয়া ভ্রমক্রমে তাঁহার প্রচারিত পঞ্জিকায় স্মার্ত্তমতে বা বৌদ্ধমতে শ্রীজগন্নাথদেবের রথের পুনর্যাত্রার দিন স্থির করিয়া বিচার-বিদ্গণের নিকট হাস্যাস্পদ হইয়াছেন। আমরা সর্ব্বপ্রকার যুক্তিদ্বারাই তাঁহার উক্ত দিন নির্ণয়ের ভ্রান্তি প্রকাশ করিয়াছি। ইহাতে তাঁহার ভ্রম দূর হইবে বলিয়া আশা পোষণ করি।

—শ্রীগৌঃ পত্রিকা ১ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা।

শ্রীশ্রীঝুলনযাত্রার তিথি-বিচার

বর্ত্তমান বর্ষে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি-কর্ত্তৃক প্রকাশিত "শ্রীচৈতন্যপঞ্জিকায়" (৪৭৩ গৌরাব্দ) ২৮শে শ্রাবণ ১৩৬৬, ১৪ই আগষ্ট ১৯৬০, শুক্রবার একাদশী-তিথি হইতে ১লা ভাদ্র, ১৮ই আগষ্ট, মঙ্গলবার পূর্ণিমা-তিথি পর্যন্ত পাঁচ দিন শ্রীশ্রীঝুলনযাত্রা মহোৎসব নিরূপিত হইয়াছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ শ্রীহরিভক্তিবিলাসের বিশুদ্ধ বিচার অনুসরণ করিয়াই উক্ত তিথি-পঞ্চকে ঝুলনযাত্রা নিরূপণ করিয়াছেন। ইহাই গোস্বামীবর্গের অনুগত গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের বিশুদ্ধ মত। দুঃখের বিষয়, শ্রীমায়াপুর হইতে * * মহারাজের ইচ্ছানুসারে শ্রীপাদ * * মহারাজ এই বৎসর যে পঞ্জিকা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে দেখিতে পাইতেছি, তিনি ২৯শে শ্রাবণ, ১৫ই আগষ্ট, শনিবার দ্বাদশী তিথি হইতে ঝুলনযাত্রা আরম্ভ বলিয়া লিখিয়াছেন এবং ১লা ভাদ্র, ১৮ই আগষ্ট, মঙ্গলবার পর্য্যন্ত চারি দিনে ঝুলনযাত্রা সমাপ্তির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে তাঁহাদের নিতান্ত ভ্রান্তিবশতঃই এইরূপ ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীহরিভক্তিবিলাসের সূক্ষ্ম বিচারের মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারাই এইরূপ ভ্রান্তির কারণ। গৌড়ীয় গোস্বামি-মতে একাদশী-তিথি হইতে পূর্ণিমা-তিথি পর্য্যন্তই ঝুলনযাত্রার বিধি প্রচলিত। যদিও শ্রীহরিভক্তিবিলাস ঝুলনযাত্রা-সম্বন্ধে কোন কথাই উল্লেখ করেন নাই, তথাপি বাংলাদেশে ও বৃন্দাবনে এই ঝুলনযাত্রা-মহোৎসব বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী **মাধ্যাহ্নিক** বৃন্দাবনীয় ঝুলনযাত্রা-মহোৎসবের জয়গান করিয়া বলিয়াছেন—

আভীরীভিঃ সচ্ছম্পাভিঃ সম্বীতাঙ্গঃ কৃষ্ণাব্দঃ
কৌন্দী-বৃন্দাদীনাং চক্ষুর্বাপীহালী-তৃষ্ণাহৃৎ।
লীলা-কীলালালী-ধারাপাতৈঃ সিঞ্চন্ বিশ্বংশ্রী-
বৃন্দারণ্যেঽসৌ জীয়াদেবং দোলা-লীলাখেলঃ॥

—(শ্রীশ্রীগোবিন্দলীলামৃতম্ ১৪।৭৬)

তিনি **পূর্ব্বাহ্ণ-লীলায়ও** এই হিন্দোল-লীলার বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কবিরাজ গোস্বামীর মাধ্যাহ্নিক-লীলোচিত ঝুলনযাত্রার অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত প্রাচীন পদকর্ত্তৃগণ ঝুলন-সম্বন্ধে বিভিন্ন রাগ-রাগিণীতে কীর্ত্তন রচনা করিয়াছেন। অবশ্য সে-সমুদায় কীর্ত্তনগুলিই যে সিদ্ধান্ত-সমন্বিত, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তন্মধ্যে কতকগুলি স্পষ্টতঃই গৌরনাগরী-বাদের প্রতিধ্বনি। তাঁহাদের রচিত বা বর্ণিত ঝুলনলীলা যে একদিনেই আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। তবে সকলেরই বর্ণনার মধ্যে শ্রাবণ মাসেই ঝুলন হইয়াছে—এইরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। পদকর্ত্তা উদ্ধবদাস মল্লার-রাগে কীর্ত্তন লিখিয়াছেন—

আষাঢ় গত পুন **মাহ শাঙন**
সুখদ যমুনা-তীর।
চান্দিনী রজনী সুখময় সুখদয়
মন্দ মলয় সমীর॥

* * * *

কল্পদ্রুম তল ছাহ শীতল
রচিত-রতন-**হিঁডোর**।
ঝুলয়ে তছু পর গৌরি শ্যামর
ঝুলায় সখী দুই ওর॥
—(সাহিত্য-পরিষৎ-প্রকাশিত 'পদকল্পতরু'-৪৪৬ পৃঃ)

শ্রীউদ্ধবদাসের এই পদ হইতে জানা যায়, আষাঢ়-মাসের পরই শ্রাবণ-মাসে যমুনার তীরে কল্পদ্রুম-তলে **চাঁদনী রাতে** অর্থাৎ শুক্লপক্ষে ঝুলন হইয়াছিল। ইহা হইতে শ্রাবণ-মাস, শুক্লপক্ষ এবং রজনী-যোগেও ঝুলনযাত্রার বিধি দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং সমস্ত **দিবারাত্র, পূর্ব্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ, সায়াহ্ন সর্ব্বসময়েই ঝুলন হইতে পারে।**

এক্ষণে বিচার্য্য হইতেছে এই—বৈধমার্গে কৃষ্ণ-প্রীতি-কামনায় সেবকগণ কোন্ তিথি অবলম্বন করিয়া ঝুলনযাত্রা আরম্ভ করিবেন এবং কোন্ তিথিতে সমাপ্ত করিবেন? বৃন্দাবনে বা ব্রজে বহুকাল হইতেই শ্রাবণ-মাসের শুক্লা-তৃতীয়াতে ঝুলনযাত্রা আরম্ভ হইয়া পূর্ণিমাতে সমাপ্ত হয়। কিন্তু অন্যত্র, বিশেষতঃ বঙ্গদেশে শ্রাবণ-মাসের একাদশী-তিথি হইতে ইহা আরম্ভ করিয়া পূর্ণিমাতে সমাপ্ত হইয়া থাকে। বঙ্গদেশে এই রীতি সম্বন্ধে কাহারও কোন মতভেদ নাই।

সুতরাং শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে শ্রীমৎ ত্রিবিক্রম মহারাজ পূর্ব্বোল্লিখিত-মত পাঁচটী তিথিতেই ঝুলনযাত্রা নিরূপণ করিয়া বিশুদ্ধ বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সূর্য্যোদয়-বিদ্ধা পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধা একাদশী তিথি হইতে অর্থাৎ ২৮শে শ্রাবণ হইতে ১লা ভাদ্র পর্য্যন্ত ঝুলনযাত্রা গোস্বামিমতে নিরূপিত হইয়াছে। অন্যমত ভ্রান্ত ও অগ্রাহ্য।

বর্ত্তমান বর্ষে ঝুলনযাত্রার আরম্ভ লইয়াই শ্রীমদ্ ভক্তি * * * মহারাজের সহিত আমাদের বিশেষ মতভেদ হইয়া পড়িয়াছে। অবশ্য অন্যান্য বর্ষে তিনি কি রীতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাও পরে আলোচনা করিব। বাংলাদেশে বর্ত্তমানে যতগুলি পঞ্জিকা প্রচলিত তাঁহাদের সকলের সঙ্গেই * * মহারাজের মতভেদ হইয়াছে—স্মার্ত্তমতই ইহার

কারণ নহে। স্মার্ত্তমতের সহিত গোস্বামিমতের পার্থক্য হইলে সকলেই তাহা উল্লেখ করেন। যেস্থলে কোন পার্থক্য নাই, সেস্থলে উল্লেখ থাকে না; কিন্তু মায়াপুরের পঞ্জিকায় এবার অভিনব মত প্রকাশিত হইয়াছে। পূর্ব্বাহ্ণ হইতে রাত্র পর্য্যন্ত ঝুলনযাত্রা-সম্বন্ধে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য-বর্গের ঝুলনযাত্রা উৎসবের উল্লেখ থাকায় স্মার্ত্তগণের পঞ্জিকানুসারে রাত্রিকালে 'ইন্দ্রাদি-দেববিহিত'ই হউক বা পূর্ব্বাহ্ণে 'গন্ধর্ব্বচারিত'ই হউক, বৈষ্ণবগণের তাহাতে বিশেষ কিছু আপত্তি নাই। কারণ আব্রহ্ম-স্তম্ব, বদ্ধ-মুক্ত সকলেরই শ্রীরাধা-কৃষ্ণের প্রীতিবিধান করা কর্ত্তব্য।

ঝুলন-উৎসব শ্রীল সনাতন গোস্বামীর বিচার-অনুসারে সূর্য্যোদয়-বিদ্ধা একাদশীতেই হইবে—ইহা আমরা প্রদর্শন করিতেছি। তবে ইহার পূর্ব্বে আর একটী কথা * * মহারাজকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে। **শ্রীএকাদশীর ব্রত-উপবাস এবং একাদশী-তিথিতে কোন যাত্রা, পর্ব্ব, উৎসবাদি কি এক বলিয়া গণ্য হইবে? কিন্তু শ্রীহরিভক্তিবিলাস বলেন—একাদশীতে হরিবাসর উপলক্ষেই অর্থাৎ উপবাসের বেলায়ই অরুণোদয়-বিদ্ধা মানিতে হইবে। কোন বৈষ্ণবের আবির্ভাব-তিরোভাব বা ঝুলনযাত্রা-পর্ব্বাদি নির্ণয়কালে অরুণোদয়-বিদ্ধা মানিতে হইবে না,—সূর্য্যোদয়-বিদ্ধাই মানিতে হইবে।**

গোস্বামিগণের মত,—একাদশীর উপবাস ব্যতীত অন্য সমস্ত তিথিতেই বৈষ্ণবগণ সূর্য্যোদয়-বিদ্ধা পরিত্যাগ করিয়া যাত্রা-মহোৎসবাদি করিবেন। এমন কি, একাদশী-ব্রত ব্যতীত অন্য তিথিতে কোন ব্রতের আবির্ভাব হইলেও তাহাতে সূর্য্যোদয়-বিদ্ধা মানিতে হইবে। (অবশ্য কেবলমাত্র শ্রীজন্মাষ্টমী-সম্বন্ধে মতভেদ পরিলক্ষিত হইলেও) সমস্ত তিথিতেই সূর্য্যোদয়বিদ্ধা ব্যতীত কপালবেধ বা অরুণোদয়-বেধ মানিতে হইবে না। শ্রীহরিভক্তিবিলাস ও শ্রীল সনাতন গোস্বামী বহুক্ষেত্রে ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। **সুতরাং একাদশীর ব্রত-উপবাস কালেই অরুণোদয়-বিদ্ধা মানিতে হইবে। কিন্তু ঐ তিথিতে কোন যাত্রা-মহোৎসবাদির উদ্ভব হইলে সেস্থলে সূর্য্যোদয়-বিদ্ধাই একমাত্র গ্রহণীয়।** * * মহারাজ এই সূক্ষ্ম বিচারটী গ্রহণ করিতে না পারিয়াই, একাদশী-তিথি হইলেই অরুণোদয়বেধ গ্রহণ করিতে হইবে, তাহাতে উপবাস না হইয়া যাত্রা-মহোৎসবাদি যাহাই হউক না কেন, সমস্ত ক্ষেত্রেই একই রূপ গ্রহণ করিতে হইবে —এইরূপ নিতান্ত ভুল বিচার করিয়াছেন। হরিভক্তিবিলাস স্কন্দপুরাণের শ্লোক উদ্ধার করিয়া বলেন—

প্রতিপৎ-প্রভৃতয়ঃ সর্ব্বা উদয়াদোদয়াদ্রবেঃ।
সম্পূর্ণা ইতি বিখ্যাতা **হরিবাসর-বর্জ্জিতা**॥ (হঃ ভঃ বিঃ ১২।১২০)

উক্ত শ্লোকের টীকায় শ্রীল সনাতন গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"এবং সর্ব্বথা বিদ্ধা পরিত্যাজ্যেতি নিশ্চিতং। * * * রবেরুদয়াৎ একমুদয়মারভ্য আ-উদয়াৎ অন্যোদয়াবিধি যদি স্যাস্তদা **সম্পূর্ণা** ইত্যর্থঃ। **হরিবাসরং একাদশী তৎ বর্জ্জিতাঃ।** স চ নৈতাদৃশঃ কিন্তু উদয়াৎ পূর্ব্বং মুহূর্ত্তদ্বয়ং যত্যসৌ ভবতি তদৈব সম্পূর্ণঃ স্যাদিত্যর্থঃ।"

অর্থাৎ সম্পূর্ণা-লক্ষণে বিদ্ধা-লক্ষণ বলিতেছেন—প্রতিপৎ প্রভৃতি তিথিসকল সূর্য্যের এক উদয় হইতে আরম্ভ করিয়া অন্য উদয় পর্য্যন্ত (যদি ষষ্টিদণ্ড) ভোগ করে, তাহা হইলে সেইসকল তিথিকে সম্পূর্ণা বলা যায়; কিন্তু হরিবাসর সম্বন্ধে সে নিয়ম নহে অর্থাৎ হরিবাসর যদি সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে দুই মুহূর্ত্ত (৯৬ মিনিট) থাকে, তাহা হইলে ইহাকে সম্পূর্ণা বলা যায়। তিথি সম্পূর্ণা হইলেই সাধারণতঃ গ্রহণীয়।

অর্থাৎ **সর্ব্বথা বিদ্ধা নিশ্চয়ই পরিত্যাগ করিতে হইবে।** তবে কোন্ ক্ষেত্রে কোন্ বিদ্ধা গ্রহণীয়া তাহাই বিচার্য্য। সর্ব্বত্র একই প্রকার বিদ্ধা গ্রহণীয় নহে। উভয় পক্ষের প্রতিপদাদি যাবতীয় তিথিসমূহেই বৈষ্ণব-ব্রত, উপবাস, পর্ব্ব, যাত্রা, মহোৎসবাদিতে সূর্য্যোদয়বিদ্ধা মানিতে হইবে—অরুণোদয়-বিদ্ধা মানিতে হইবে না। কেবলমাত্র একাদশী-তিথিতে হরিবাসর উপস্থিত হইলে অর্থাৎ **উপবাস**-সময়ে সেইদিন অরুণোদয়-বিদ্ধা মানিতে হইবে,—নচেৎ সূর্য্যোদয়বিদ্ধা মানিতে হইবে। সনাতন গোস্বামী এই হরিবাসর কেবলমাত্র একাদশীকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। অর্থাৎ যে একাদশীতে হরিবাসর বা ব্রতোপবাস হইবে সেই একাদশীতেই অরুণোদয়বিদ্ধা মানিতে হইবে। এস্থলে **একাদশী-অর্থে উপবাসযোগ্য ব্রতই লক্ষিত হইয়াছে; যাত্রা, পর্ব্ব বা মহোৎসবাদি লক্ষিত হয় নাই।**

অতএব পরিত্যাজ্যা সময়ে চারুণোদয়ে।
দশম্যৈকাদশী বিদ্ধা বৈষ্ণবেন বিশেষতঃ॥ (হঃ ভঃ বিঃ ১২।১২৩)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল সনাতন গোস্বামী লিখিয়াছেন—**"তদ্ধি চৈকাদশীব্রতমিতি"**। অর্থাৎ সেই একাদশী বলিতে **'একাদশী ব্রতই' নিশ্চিতরূপে জানিতে হইবে।** এবং এই ব্রতোপলক্ষেই বৈষ্ণবগণের পক্ষে অরুণোদয়-বিদ্ধা গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু ব্রত না হইলে পর্ব্ব-উৎসবাদির জন্য অরুণোদয়-বিদ্ধার পরিবর্ত্তে সূর্য্যোদয়-বিদ্ধাই গ্রহণীয়। **"প্রসঙ্গাদ্বৈষ্ণব-ব্রতেষু সর্ব্বেষ্বপি সবেধ-দিনানি ইত্থং পরিত্যাজ্যানি।"** অর্থাৎ প্রসঙ্গক্রমে বৈষ্ণবগণের যাবতীয় ব্রতেই বেধ দিন অর্থাৎ বিদ্ধা তিথি সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। এই বাক্যের দ্বারা ইহা কখনই বুঝাইবে না যে, সব ব্রতেই অরুণোদয়-বিদ্ধা মানিতে হইবে। বিদ্ধা তিন প্রকার, যথা—সূর্য্যোদয়, অরুণোদয় ও কপাল বেধ। যেস্থলে যে-বেধ প্রযুক্ত, সেইস্থলে সেই বেধ গ্রহণীয়। সর্ব্বত্রই একরূপ নহে। এ-সম্বন্ধে * *

মহারাজও স্বয়ং তাঁহার পঞ্জিকার "সম্পাদকের নিবেদন"-শীর্ষক ভূমিকায় লিখিয়াছেন— **'হরিবাসর' বলিতে একাদশীর 'উপবাস'-বাসরই লক্ষিত। * * হরিবাসর ব্যতীত অন্যান্য তিথিতে, ভগবদাবির্ভাবাদিতে অরুণোদয়-বিদ্ধার পরিবর্ত্তে সূর্য্যোদয়-বিদ্ধা মাত্র পরিত্যাজ্য।** তিনি শ্রীবেদান্ত সমিতির সিদ্ধান্তসমূহের অনুকরণ করিয়াই উল্লিখিত বিচার লিখিয়াছেন, কিন্তু অনুসরণ করিতে পারেন নাই। তাহার কারণ ঝুলন-যাত্রার তিথি-নিরূপণে তিনি ধরা পড়িয়াছেন। উল্লিখিত ভূমিকায় 'ভগবদাবির্ভাবাদিতে' যে-পদটী উল্লেখ করিয়াছেন তাহার মধ্যে **'আদি'**-শব্দ দেখিতে পাইতেছি। এই 'আদি'-শব্দের দ্বারা তিনি কি কি পর্ব্ব-উৎসবাদি লক্ষ্য করিয়া থাকেন? ভগবানের আবির্ভাবের কথা স্পষ্টই বুঝা গেল, কিন্তু 'আদি'-শব্দের দ্বারা তিনি 'ভগবানের তিরোভাব' নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেন নাই। যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে ভগবানের প্রকটকালীন লীলা-বিলাসাদিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। সুতরাং আমরা বর্ত্তমান ক্ষেত্রে ঝুলনযাত্রাকে ঐ 'আদি'-শব্দের উদ্দিষ্ট পর্ব্ব বলিয়া লক্ষ্য করিতে পারি। এবং ইহাও ঠিক যে, পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে **'হরিবাসর-বর্জ্জিত'** শব্দের দ্বারা একাদশীর উপবাসই লক্ষিত হইয়াছে—ইহা তাঁহারও মত। সুতরাং **একাদশীতে হরিবাসর ব্রত বা উপবাস হইলেই অরুণোদয়-বিদ্ধা মানিতে হইবে, কিন্তু ঐ একাদশী তিথিতে ঝুলন বা অন্য কোন পর্ব্ব-উৎসবাদির আবির্ভাব হইলে অরুণোদয়-বিদ্ধার পরিবর্ত্তে সূর্য্যোদয় বিদ্ধা মাত্র পরিত্যাজ্য।** এই বৎসরের ২৮শে শ্রাবণ শুক্রবার সূর্য্যোদয়-বিদ্ধা একাদশী না হওয়ায় ঐ দিনই ঝুলন হইবে, পরদিবস দ্বাদশী-তিথিতে নহে।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী জন্মাষ্টমী-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—"বৈষ্ণবানাং **সর্ব্বথা সর্ব্বত্র** বিদ্ধাত্যাগং দৃষ্টান্তেন স্মারয়তি"। ইহার পরবর্ত্তী "পূর্ব্ববিদ্ধা যথা নন্দা" শ্লোকের টীকায় আরও লিখিয়াছেন—**একাদশীতরাশেষ**-তিথিনাং রব্যুদয়তঃ প্রবৃত্তানামেব সম্পূর্ণত্বেন **অরুণোদয়-বেধ অসিদ্ধেঃ।"** ইহার তাৎপর্য্য এই যে, উক্ত টীকায় 'একাদশীতরা' অর্থাৎ একাদশী ব্যতীত সমুদয় তিথিতে অরুণোদয়-বেধ অসিদ্ধ। এস্থলে একাদশী বলিতে হরি-বাসর অর্থাৎ ব্রত, উপবাসকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। **উপবাসযোগ্য একাদশী ব্যতীত একাদশীতে অন্য যাত্রা-উৎসবাদি হইলে রবির উদয় কাল হইতেই তিথির প্রবৃত্তি হইলে সম্পূর্ণত্ব হইল,** বুঝিতে হইবে এবং তাহাই স্বীকার্য্য। বৈষ্ণবগণ যে-কোন যাত্রা, পর্ব্ব, উৎসব যাহাই কিছু করুন না কেন, হরিবাসর ব্যতীত সর্ব্বত্রই সূর্য্যোদয়-বিদ্ধা পরিত্যাগ করিবেন। * * মহারাজ তাঁহার ভূমিকায় এ-বিষয় স্বীকার করিয়াও এ-বৎসর দিন-পঞ্জিকা-সঙ্কলনে সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং এই বৎসর ২৮শে শ্রাবন শুক্রবার দিবসেই গোস্বামি-মতে ঝুলনযাত্রা আরম্ভ হইবে। কারণ, এই দিন যে একাদশী তিথি হইয়াছে, সূর্য্যোদয়-বিদ্ধা না হওয়ায় উক্ত শুক্রবারেই

ঝুলনযাত্রা বা হিন্দোল-যাত্রা হইবে। আমাদের শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকায় শ্রীযুত ত্রিবিক্রম মহারাজ-কর্ত্তৃক ইহা নিখুঁত লেখা হইয়াছে। শ্রীপাদ * * মহারাজ তাঁহাদের পঞ্জিকায় পরদিন ২৯শে শ্রাবণ শনিবার "শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রারম্ভ" লিখিয়া নিতান্ত ভুল করিয়াছেন,—নিখুঁত ত' দূরের কথা।

ঝুলনযাত্রা সম্বন্ধে পূর্ব্ব পূর্ব্ব পঞ্জিকার সমালোচনা

* * পত্র হইতে জানা যায়, 'নদীয়া-প্রকাশ'-পত্রিকায় ১৩৩৪ সালে ৪ দিনের জন্য ঝুলনযাত্রা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ৪ দিনে ঝুলন শেষ করিতে হইলে অর্থাৎ পূর্ণিমায় শেষ ধরিলে অরুণোদয় বিদ্ধা একাদশী অথবা কপালবিদ্ধা একাদশীতে ঝুলন আরম্ভ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে ঝুলন ৪ দিনে হইবে, কি ৫ দিনে অথবা ৬ দিনে হইবে, তৎসম্বন্ধে কোন বিধি-নিষেধ নাই—ইহা ধ্রুব সত্যকথা। **তবে একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত ঝুলন হইবে—ইহাই বঙ্গদেশে প্রচলিত বা আচরিত বিধি।** একাদশী হইতে পূর্ণিমা কোন কোন বৎসর ৪ দিনে, কোন বৎসর ৫ দিনে, আবার কোন বৎসর ৬ দিনেও হইয়া থাকে। ঝুলনযাত্রা তদনুসারেই হইবে। সুতরাং ৪ দিনেই ঝুলনযাত্রা শেষ, ৫ দিন বা ৬ দিনে হইবে না—এইরূপ বিধি কোথাও নাই। পি, এম্, বাক্‌চির যে শ্লোকটী * * পত্রে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার অর্থও আমার এই বিচারের অনুকূল, অর্থাৎ—

শ্রাবণে শুক্লপক্ষে তু **একাদশ্যাদি-পঞ্চকে।**
হিন্দোলোৎসবনং কার্য্যং চতুর্ব্বর্গমভীপ্সুনা॥

উক্ত শ্লোকে 'একাদশ্যাদি-পঞ্চকে' বাক্যের অর্থ একাদশ্যাদি-**তিথি-পঞ্চকে,—দিন-পঞ্চকে নহে।** 'তিথি-পঞ্চক' বলিলে (১) একাদশী, (২) দ্বাদশী, (৩) ত্রয়োদশী, (৪) চতুর্দ্দশী, (৫) পূর্ণিমা—এই পাঁচটী তিথিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। কোন বৎসরে তিথিক্ষয়-হেতু ৪ দিন এবং কোন বৎসর তিথির বৃদ্ধিহেতু ৬ দিন এবং কোন বৎসর তিথির স্বাভাবিক গতি হইলে ৫ দিন হইয়া থাকে। তবে তিথির সাধারণ গতি অনুসারে পাঁচ দিনই অধিকাংশ বৎসরে উক্ত তিথিপঞ্চকের অবস্থিতি লক্ষিত হয়। সুতরাং তিথি-পঞ্চকই ঐ শ্লোকের তাৎপর্য্য, দিনপঞ্চক নহে। পি, এম্, বাক্‌চির পঞ্জিকায় উদ্ধৃত ঐ শ্লোকটীর প্রামাণিকতা সম্বন্ধে জানিতে চাহিয়া আমি আমার গ্রন্থাগারের মধ্যে কোন গ্রন্থেই বহু অনুসন্ধান করিয়াও উক্ত শ্লোকটী পাইলাম না। পি, এম্, বাক্‌চির অফিসে এই শ্লোকটী সম্বন্ধে লোক মারফতে ও লেখনী মারফতে সংবাদ জানিতে চাহিয়াও বিফল মনোরথ হইয়াছি। তাঁহাদের প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ ঐ শ্লোকটীর প্রামাণিকতা বুঝাইয়া দিতে অপারক। সে যাহাই হউক, শ্লোকটীর সিদ্ধান্ত বিচার করিলে কোন ভ্রান্তি পাওয়া যাইতেছে না এবং উহা সর্ব্ববাদি-সম্মতরূপে গ্রহণ করিলে বিচার-ভ্রান্তি হইবে না।

৪ দিনেই ঝুলনযাত্রা শেষ করিতে হইবে—ইহা বিচার বা সিদ্ধান্ত নহে। আমাদের পঞ্জিকাতেও ৪৬৭ গৌরাব্দে ৪ঠা ভাদ্র হইতে ৭ই ভাদ্র ৪ দিন ঝুলনযাত্রা বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। তৎপর বৎসর ৪৬৮ গৌরাব্দে ২৫শে শ্রাবণ হইতে ২৯শে শ্রাবণ পর্য্যন্ত ৫ দিনেই এবং তৎপরে বর্ত্তমান ৪৭৩ গৌরাব্দ পর্য্যন্ত ৫ দিনেই ঝুলনযাত্রা হইতেছে। সুতরাং তিথিগুলির স্বাভাবিক অবস্থিতি হইলে ৫ দিনই ঝুলনযাত্রা হইয়া থাকে। এবং এই **ঝুলনযাত্রা একাদশী হইতেই আরম্ভ** হইয়া থাকে, **দ্বাদশী হইতে কখনই আরম্ভ হয় না।** আমাদের সুসিদ্ধান্ত বিচার এই, **সূর্য্যোদয়ের দশমীবিদ্ধা একাদশী পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ একাদশী হইতেই পূর্ণিমার শেষভাগ পর্য্যন্ত গোস্বামি-মতে ঝুলনের বিশুদ্ধ দিন নিরূপিত হইবে।**

পবিত্রারোপণী তিথি

শ্রীহরিভক্তিবিলাস ঝুলনযাত্রা সম্বন্ধে কোন কথা লিপিবদ্ধ করেন নাই সত্য, কিন্তু 'পবিত্রারোপণ'-সম্বন্ধে বহু কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থের ১৫শ বিলাসে এপ্রসঙ্গে দেখা যায়—

শ্রাবণস্য সিতে পক্ষে **দ্বাদশ্যাং** বৈষ্ণবৈর্মুদা।
কর্ত্তব্যঃ কৃষ্ণদেবস্য **পবিত্রারোপণোৎসবঃ**॥ (হঃ ভঃ বিঃ ১৫।৭৭)

অর্থাৎ **শ্রাবণা শুক্লা দ্বাদশী-তিথিতে** বৈষ্ণবগণ শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে আনন্দ-সহকারে পবিত্রারোপণ উৎসব করিবেন। সুতরাং পবিত্রারোপণী তিথি বলিতে দ্বাদশীকেই লক্ষ্য করা হয়—একাদশী নহে। তবে উক্ত দিবসের পূর্ব্বদিন একাদশী উদ্ভূত হওয়ায় ঐ একাদশীর **নামকরণের জন্য** উহাকে **'পবিত্রারোপণী একাদশী'** বলা হইয়া থাকে। 'পবিত্রারোপণী একাদশী' বলিলে ঝুলনযাত্রা বুঝাইবে না। কেহ যদি ভ্রমক্রমে 'পবিত্র আরোপণকে' 'পবিত্র আরোহণ' বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে বড়ই হাস্যোদ্দীপক ব্যাপার হইয়া পড়ে। 'পবিত্রারোপণ'-শব্দের অর্থ সহজ বাংলায় 'পৈতা পরাণো'। 'পবিত্র'-শব্দের অর্থ সেস্থলে ব্রহ্মসূত্র, যজ্ঞসূত্র, বা বিশুদ্ধ সূত্র। 'আরোপন'-শব্দের অর্থ পরিধান করানো। এপ্রসঙ্গে আর অধিক আলোচনার ইচ্ছা নাই। এ বিষয়ে হরিভক্তি-বিলাসের ১৫শ বিলাসের ৭৬ শ্লোক হইতে ১৩১ শ্লোক পর্য্যন্ত আলোচনা করিতে অনুরোধ করি।

—শ্রীগৌঃ পত্রিকা ১১শ বর্ষ, ৬-৭ সংখ্যা।

অভিধেয়-বিচারাত্মক প্রবন্ধ—

শিক্ষাষ্টক

(শিক্ষাষ্টক-বঙ্গভাষা)

পরমতত্ত্ব এক ও অদ্বিতীয়। সেই তত্ত্ব সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় স্বাভাবিক অচিন্ত্যশক্তি-সম্পন্ন। সেই অচিন্ত্যশক্তিক্রমে ঐ তত্ত্ব যুগপৎ সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষভাবে প্রতীত হয়। সবিশেষতা ও নির্ব্বিশেষতা যুগপৎ সিদ্ধ হইলেও সবিশেষ প্রতীতিই বলবতী। নির্ব্বিশেষ প্রতীতি উপলব্ধ হয় না, কেবল স্বীকার্য্য হয়, এই মাত্র।

সেই সবিশেষ প্রতীতিময় পরমতত্ত্ব স্বীয় অচিন্ত্যশক্তিবলে সর্ব্বদা স্বরূপ, তদ্রূপ-বৈভব, জীব ও প্রধান এই চারিরূপে অবস্থিত। সূর্য্যমণ্ডলান্তঃস্থিত তেজ, তন্মণ্ডল, মণ্ডল-বহির্গত তেজ-রশ্মি এবং তেজ-প্রতিচ্ছবি যেরূপ এক সূর্য্য-তত্ত্বে সর্ব্বদা চতুর্দ্ধা অবস্থিত, তদ্রূপ পরমতত্ত্বের চারি প্রকার রূপ নিত্যসিদ্ধ। শক্তিমান্ তত্ত্ব স্বরূপতঃ এক হইলেও চারি প্রকার ভেদময়। অতএব ভেদ ও অভেদ যুগপৎ নিত্য-সত্যাত্মক। পরমতত্ত্বের অচিন্ত্যশক্তি বিচিত্র-বিক্রমময়ী। তাহার অনন্ত প্রভাবের মধ্যে তিনটী প্রভাব আমরা জানিতে পারি। সেই তিন প্রভাবের এক একটী প্রভাবযুক্ত হইয়া তত্ত্বের পরাশক্তি স্বভাবতঃ অন্তরঙ্গা বা চিচ্ছক্তি, তটস্থা বা জীবশক্তি ও বহিরঙ্গা বা মায়াশক্তিরূপে নিত্য দেদীপ্যমানা। অন্তরঙ্গা শক্তিসহকারে অনন্তসংখ্যক রশ্মিপরমাণু-স্থানীয় সেই তত্ত্বের জীবস্বরূপ নিত্যসিদ্ধ। বহিরঙ্গা শক্তিসহকারে সেই তত্ত্বের প্রতিচ্ছবিগত বর্ণশাবল্যস্থানীয় মায়াবৈভব; নিত্যসিদ্ধ স্বরূপাদির যাথার্থ্য এই। স্বরূপ অনন্ত হইলেও বিশেষ পরিচিত ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য ও ঔদার্য্য এই তিন নিত্যভাব-ভেদে ভগবৎস্বরূপ ত্রিবিধ অর্থাৎ নারায়ণস্বরূপ, কৃষ্ণস্বরূপ ও কৃষ্ণচৈতন্য-স্বরূপ। রূপবৈভব অনন্ত হইলেও পরব্যোম, গোলোক-বৃন্দাবন ও নবদ্বীপ এই তিন ধাম-বিশিষ্ট বৈকুণ্ঠরূপ চিজ্জগৎ এবং ঐ ঐ স্বরূপের যথাযোগ্য তত্রস্থিত সমস্ত লীলোপকরণই স্বরূপবৈভব। ভগবৎ-সূর্য্যের বহিশ্চর চিৎপরমাণুরূপ জীবের সংখ্যা অনন্ত। জীব স্বভাবতঃ স্বরূপ ও বহিরঙ্গ এই দুই বৈভবের মধ্যবর্ত্তী; তটস্থশক্তি-দ্বারা উভয় বৈভবের যোগ্যতাবিশিষ্ট; অনাদি স্বরূপ-বৈমুখ্যবশতঃ মায়াবৈভব-মধ্যস্থিত; মায়াবৃত্তিরূপা অবিদ্যাবন্ধন-নিবন্ধন স্ব-স্বরূপভ্রমজনিত জড়াভিমানদ্বারা জড়ধর্ম্মরূপ কর্ম্মমার্গে ভ্রমণশীল। অতএব তিনি সর্ব্বদা সংসার-দুঃখাচ্ছন্ন। অনন্ত জড়াত্মক ব্রহ্মাণ্ডনিচয় তথা বদ্ধজীবগণের স্থূললিঙ্গ-শরীরদ্বয়বিশিষ্ট মায়াবৈভবই পরমতত্ত্বের প্রতিচ্ছবিগত বর্ণ-বৈচিত্র্যরূপ তদ্বিভূতির অতি হেয় চতুর্থপাদ মাত্র।

ঐশ্বর্য্যপ্রচুর ভগবৎস্বরূপ বৈকুণ্ঠস্থ পরমব্যোমে চতুর্ভুজ-মূর্ত্তিতে দাস্যরসাশ্রিত নিত্য-সিদ্ধজীবগণ-কর্ত্তৃক পরিসেবিত।

মাধুর্য্যপ্রচুর ভগবৎস্বরূপ দ্বিভুজ-মূর্ত্তিতে বৈকুণ্ঠের অন্তঃপ্রকোষ্ঠে নিত্য দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসে অনন্ত লীলার বিস্তারক। সেই অন্তঃপুরের দুইটী প্রকোষ্ঠ। এক প্রকোষ্ঠে গোলোক, যেখানে মধুর রস নিত্য স্বকীয়-ভাবাত্মক। দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠ বৃন্দাবন; যেখানে মধুর রস নিত্য পারকীয়-ভাবাত্মক।

ঔদার্য্যপ্রচুর ভগবৎস্বরূপ দ্বিভুজ, কদাচ ষড়্ভুজ মূর্ত্তিতে বৈকুণ্ঠ-মধ্যে নবদ্বীপ-প্রকোষ্ঠে ভক্তভাবাত্মক ঔদার্য্যরসবিশেষে স্বীয় রসযোগ্য পরিকর-সহিত জীবাচার্য্য-স্বরূপে নিত্য বিরাজমান।

১৪০৭ শকাব্দায় ফাল্গুনী পূর্ণিমায় সন্ধ্যার পর ঔদার্য্য-প্রচুর ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব গৌড়দেশে গঙ্গাতীরে প্রপঞ্চগত স্বীয় ধাম নবদ্বীপে শ্রীজগন্নাথমিশ্র-পত্নী শ্রীশচীগর্ভে অবতীর্ণ হন। শিশুকালে বয়সোচিত বালচাপল্য, পৌগণ্ড-বয়সে বিদ্যাভ্যাসাদি, কৈশোর-বয়সে বিবাহ, মাধ্ব-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব শ্রীঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষাগ্রহণ ও কীর্ত্তন-প্রচারদ্বারা সমস্ত গৌড়ভূমির আনন্দ বিধান করেন। চব্বিশ বৎসর বয়সে কেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া প্রথম ছয় বৎসরে পাশ্চাত্য, ওড্র, দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি দেশে পবিত্র হরিভক্তি প্রচার ও শুদ্ধহরিভক্তি-বিরুদ্ধ সমস্ত মত খণ্ডন করেন। শেষ অষ্টাদশ বৎসর শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে স্বীয় পার্ষদগণ-সহিত অবস্থিত হইয়া শ্রীরূপ-সনাতন প্রভৃতি প্রচারক-দ্বারা বহু দেশে স্বীয় অচিন্ত্য-ভেদাভেদ মত প্রচার করেন এবং নিজকৃত শিক্ষাষ্টকের পরমরস আস্বাদন করত জীবের কর্ত্তব্য বিধান করেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলা বিংশতি পরিচ্ছেদে লিখিয়াছেন,—

পূর্ব্বে অষ্ট শ্লোক করি' লোক শিক্ষা দিল।
সেই অষ্ট শ্লোক আপনে আস্বাদিল॥
প্রভুশিক্ষা অষ্ট শ্লোক যেই পড়ে শুনে।
কৃষ্ণে প্রেম ভক্তি তার বাড়ে দিনে দিনে॥

প্রভু যে অষ্ট শ্লোক প্রচার করিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতেছি,—যে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনদ্বারা জীবের চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত হয়, ভবরূপ মহাদাবাগ্নি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়, শ্রেয়োরূপ কুমুদবিকাশক ভাবচন্দ্রিকা বিতরিত হয় এবং যাহা বিদ্যাবধূর জীবনস্বরূপ আনন্দসমুদ্র-বর্দ্ধনকারক, পদে পদে পূর্ণামৃতের আস্বাদনদায়ক এবং শুদ্ধ জীবের সমস্ত স্বরূপ স্নিগ্ধকারী সেই শ্রীকৃষ্ণ-নাম-রূপ-গুণ-লীলা-সংকীর্ত্তন সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হউন।

এই শ্লোকদ্বারা পরম ঔদার্য্যবিগ্রহ নিখিলজীবাচার্য্য শ্রীমন্মহাপ্রভু সমস্ত তত্ত্ব নির্দ্দেশপূর্ব্বক জীবগণকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত পরমতত্ত্বের অন্তর্ভূত তটস্থশক্তি-প্রসূত জীবের সম্বন্ধজ্ঞান-সিদ্ধির নিমিত্ত "চেতোদর্পণ-মার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণম্"

এই চরণের উক্তি হইয়াছে। জীব স্বভাবতঃ তটস্থ অর্থাৎ স্বরূপানন্দরূপ বৈকুণ্ঠ ও বিরূপানন্দরূপ মায়াবৈভব উভয় অবস্থার যোগ্য। পরেশবৈমুখ্যবশতঃ তাহার মায়া-প্রবেশ ও বিশুদ্ধ চিদভিমানরূপ বিশুদ্ধ অহঙ্কার বিকৃত হইয়া জড়াভিমানরূপ বিকার-দ্বারা শুদ্ধ চিৎতত্ত্বের জড়মল-কর্তৃক আচ্ছন্নতা হয়। কৃষ্ণানুশীলন-দ্বারা চিত্তের অবিদ্যামল দূরীভূত হইলে চিত্তদর্পণে স্বরূপতত্ত্বের বিশুদ্ধ-দর্শন হয়। ইহারই নাম স্বরূপসিদ্ধি। সেই সিদ্ধির অবান্তর ফলস্বরূপ সংসারদুঃখ নাশ হয়। জীব তাহাতে মায়াসঙ্গরূপ বৈধর্ম্ম্য পরিত্যাগ ও স্বরূপশক্তির আশ্রয় লাভ করেন। ভগবৎস্বরূপ, জীবস্বরূপ, মায়াস্বরূপ ও মায়ান্তর্গত ভূতভবিষ্যতাত্মক কাল ও কর্ম্মস্বরূপ-জ্ঞানের নাম 'সম্বন্ধজ্ঞান'। "শ্রেয়ঃকৈরব-চন্দ্রিকা-বিতরণম্" এই অর্দ্ধপদ-দ্বারা অভিধেয়তত্ত্বরূপ সাধনভক্তির উল্লেখ। কর্ম্ম-জ্ঞানাদির দ্বারা জীবের নিত্যমঙ্গল সাধিত হইতে পারে না, কেবল হরিভক্তি-দ্বারাই সাধিত হয়, —এইরূপ শাস্ত্রার্থ-অবধারণরূপা শ্রদ্ধা সৎসঙ্গ হইতে উদিত হইলে জীব সাধুগুরুপদাশ্রয়-পূর্ব্বক শ্রবণ, কীর্ত্তন, বিষ্ণুস্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন এই প্রকার নববিধা ভক্তি অবলম্বন করত শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন করিতে থাকেন। এই কীর্ত্তন হইতে পরবিদ্যার পরমজ্যোতিঃ প্রকাশিত হইয়া জীবের শ্রেয়ঃ সাধন করে। সাধনাঙ্গে পূর্ব্বজাত-শ্রদ্ধা বা ভগবন্মাধুর্য্য-লোভ যখন পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি প্রভৃতি অবস্থা অতিক্রম করত ভাবদশাতে পরিণত হয়, তখন স্বরূপতঃ জড়োদ্ভূত স্থূললিঙ্গরূপ ঔপাধিক দেহদ্বয়ে আত্মাভিমান-শূন্য হইয়া স্বকীয় পূর্ব্বসিদ্ধ চিৎস্বরূপ এবং রসাধিকার-বিশেষ রসযোগ্য চিদ্দেহ লাভ করেন। মধুররসাবিষ্ট জীবগণ স্বীয় রসযোগ্য গোপীদেহ লাভ করত মাধুর্য্যময় শ্রীবৃন্দাবনধামে কৃষ্ণলীলার উপকরণ হইয়া থাকেন। এস্থলে স্বরূপ-শক্তির বিদ্যাপ্রভাবে জীবের গোপীভাব-প্রাপ্তিই স্বরূপতঃ বিদ্যাবধূত্ব লাভ। তখন জীব বিদ্যাবধূ হইয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনকে জীবনস্বরূপ বরণ করেন। ভাবদশা ক্রমশঃ চিদ্ধামের বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারিরূপ চিৎসামগ্রী-দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া চিদেকরসতা লাভ করে। তৎকালে জীবের আনন্দাম্বুধি স্বভাবতঃ পরিবর্দ্ধিত হয়। চিদ্রসের নিত্যতা-ধর্ম্মবশতঃ তখন ভূতভবিষ্যদ্রূপ জড়মল-দূষিত কাল থাকে না। সর্ব্বকালই বর্ত্তমান ও নূতন। অতএব অনুরাগলব্ধ জীবের পদে পদে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন তখন পূর্ণামৃতাস্বাদন-স্বরূপ হয়। তদবস্থায় গুণগুণীভেদাভাবজনিত বিশুদ্ধচিন্ময়-তত্ত্বাত্মক জীব বিশুদ্ধ অহঙ্কার, চিত্ত, মন, বুদ্ধি, দেহ, ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট অণুচৈতন্য-স্বরূপে অবস্থিত। এবম্ভূত অবস্থায় যে কৃষ্ণকীর্ত্তন, তাহা সর্ব্বাত্ম-স্নপনরূপ অবস্থা অর্থাৎ স্বরূপসাক্ষাৎকার সময়ে ব্রহ্মলয় বা স্বীয় সম্ভোগসুখরহিত সচ্চিদানন্দ-যুগল-সেবাই জীবের সিদ্ধসত্তার অভিন্ন সহচর। ইহাই প্রয়োজনতত্ত্ব। এইরূপ সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-জ্ঞান-মার্জ্জিত শুদ্ধভক্তি-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনই সর্ব্বত্র প্রয়োজন। এস্থলে শ্লোকের চতুর্থপাদে 'পরং' শব্দদ্বারা ভুক্তি ও মুক্তিসাধক ধর্ম্মজ্ঞানান্তর্গত হরি-কীর্ত্তন অনাদৃত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন চারি প্রকার। নাম-সংকীর্ত্তন, রূপ-সংকীর্ত্তন, গুণ-সংকীর্ত্তন ও লীলা-সংকীর্ত্তন। পরমার্থরূপ বস্তুর নামই তদনুভবের মূল। নাম পূর্ণরূপে উদিত হইলে রূপের উদয় হয়। রূপ পূর্ণরূপে উদিত হইলে গুণসমূহের উদয় হয়। গুণ সম্পূর্ণরূপে উদিত হইলে লীলা বোধ হয়। অতএব নামই সর্ব্বমূল এবং সমস্ত সিদ্ধির একমাত্র কারণ। নামই ক্রমশঃ রূপ-গুণ-লীলারূপে পরিণত হয়। অতএব নাম-ব্যতীত বদ্ধ ও মুক্ত উভয়প্রকার জীবের গত্যন্তর নাই। প্রভুর উপদেশ সমস্তই নামকে লক্ষ্য করে। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিতেছেন—"হে ভগবন্! আপনি জীবের প্রতি অপার করুণা প্রকাশ করিয়া অনেক নাম প্রকাশ করিয়াছেন। কৃষ্ণ, গোবিন্দ, অচ্যুত প্রভৃতি মুখ্য-নামসমূহে যাহাদের অধিকার হয় নাই, তাহাদের পক্ষে পরমাত্মা, পাতা, নিয়ন্তা, ব্রহ্ম প্রভৃতি অনেক গৌণ-নামও প্রকাশ করিয়াছ। সেই সমস্ত নামের মধ্যে মুখ্য-নামে সমস্ত শক্তি এবং গৌণ-নামসমূহে বহুবিধ পাপনাশক, ভুক্তি-মুক্তিফল-প্রাপক শক্তি অর্পণ করিয়াছ। জীবের অযোগ্যতা দৃষ্টিপূর্ব্বক স্বীয় নামগ্রহণে দেশ-কালাদির কোন নিয়ম কর নাই। এসমস্তই তোমার কৃপা। কিন্তু আমার দুর্দ্দৈবের কথা কি বলিব? তোমার মধুমাখা নামেও আমার অনুরাগ জন্মিল না!" নামে সমস্ত শক্তি আছে বটে, কিন্তু দশবিধ নামাপরাধ-রূপ দুর্দ্দৈব দূর না হইলে, জীবের নামে রুচি হয় না। সাধুনিন্দা, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও তদ্বিভূতি শিবাদি দেবতাতে ভেদবুদ্ধি, গুরুর প্রতি অবজ্ঞা, বেদ ও তদনুগত-শাস্ত্রনিন্দা, হরিনামে অর্থবাদ, নামবলে অসৎপ্রবৃত্তি, অন্য শুভকর্ম্মের সহিত হরিনামকে সমান-জ্ঞান, বহির্ম্মুখ ও অনধিকারীকে নামোপদেশ, নাম-মাহাত্ম্য শুনিয়া তাহাতে প্রীতির অভাব—এই কয়েকটী অপরাধ মার্জ্জনপূর্ব্বক নাম গ্রহণ করিলে নামের স্বরূপ উদিত হয়। অতএব জাতশ্রদ্ধ ব্যক্তি শ্রীগুরু হইতে নামতত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়া নিরপরাধে তাহার অনুশীলন করিবেন। নামগ্রহীতার পক্ষে কর্ম্মান্তর্গত পাপক্ষয়-চেষ্টা বা পুণ্যসঞ্চয়-চেষ্টার প্রয়োজন নাই, যেহেতু শ্রদ্ধা উদিত হইবার সময়েই কর্ম্মাধিকার দূর হইয়া থাকে। ভগদ্বিষয়িণী শ্রদ্ধার উদয়-কালেই তদিতর-বিষয়িণী অশ্রদ্ধা সহজেই উদিত হয়। তাহা হইলে পাপ-পুণ্যমতি আর থাকে না। শ্রদ্ধাবান্ পুরুষ স্বভাবতঃ যাহা যাহা করিয়া থাকেন এবং যে যে বিরক্তি প্রদর্শন করেন, সে সমুদয়ই বিধি-নির্দ্দিষ্ট পুণ্য অপেক্ষা সার্থক ও নির্ম্মল। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত নামাপরাধ থাকিলে শ্রদ্ধা ক্রমশঃ নিষ্ঠা দূরে থাকুক অবনত হইয়া পড়ে। চিরজীবন সাধন করিয়াও নামাভাস অবস্থা উন্নতি লাভ করে না। অতএব শাস্ত্রে (পদ্মপুরাণে) এরূপ উক্ত হইয়াছে,—**"নামাপরাধ-যুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্। অবিশ্রান্তি-প্রযুক্তানি তান্যেবার্থ করাণি চ॥"** নামাপরাধ পরিত্যাগের জন্য ব্যাকুল চিত্তে কিছুদিন অনবরত নাম করিলে ঐ ঐ অপরাধের অবসর-অভাবে তদপরাধ-শূন্য হইয়া পড়ে। তখন নামবলে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাব ও প্রেম পর্য্যন্ত অবস্থা অনায়াসে উদিত হয়।

নিরপরাধে শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি যখন মুখ্যনাম আলোচনা করেন, তখন তাঁহার স্বভাবতঃ চারিটী লক্ষণ অনুভূত হয়। অতএব শ্রীমহাপ্রভু কহিলেন,—'হে জীবসকল! যিনি আপনাকে তৃণাপেক্ষা ক্ষুদ্র বলিয়া জানেন, যিনি তরু অপেক্ষা সহগুণকে অবলম্বন করেন, স্বয়ং অমানী হইয়াও সমস্ত লোককে যথাযোগ্য সম্মান করেন, তিনিই হরিকীর্ত্তনের অধিকারী। এই জড়জগতে তৃণ অতি তুচ্ছ বস্তু হইলেও তাহারও এই বিশ্বের একটী বস্তু বলিয়া অভিমান অসুন্দর হয় না, কিন্তু চিৎপরমাণু-রূপ জীবের এই জড়-জগতে কিছুমাত্র অভিমান করা উচিত নয়, যেহেতু জীবের চিদভিমানই ন্যায়পরা, জড়াভিমান নিতান্ত আরোপিত ও মিথ্যা। সংছেত্তৃ-কর্ত্তৃক ছিন্ন হইলেও বৃক্ষ সকলকে ছায়া ও ফলদানে পরাঙ্মুখ নয়। কিন্তু জড়বস্তু হইতে শ্রেষ্ঠধর্ম্ম-বিশিষ্ট জীবের উপকর্ত্তা ও অপকর্ত্তা উভয়ের প্রতি সর্ব্বদা দয়াযুক্ত থাকা স্বাভাবিক, যেহেতু জীবের দয়াই জীবে স্বধর্ম্মরূপ ভক্তির অন্তর্গত ধর্ম্মবিশেষ। নামগ্রহীতা স্বয়ং জড়াভিমান-জনিত ব্রাহ্মণাদি বর্ণ, সন্ন্যাসাদি আশ্রম, ধন, রূপ, বল, বীর্য্য, অধিকার, পদ ইত্যাদি সম্বন্ধে নিরর্থক-অভিমান-শূন্য হইয়া শুদ্ধবৈষ্ণব-মাত্রের প্রতি পরমাদররূপ মান দান করিবেন। ভগবৎকৃপায় যে-সকল আধিকারিক সত্ত্বগণ ব্রহ্ম-শিবাদি পদ লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য সম্মান করেন। এই কয়েকটী লক্ষণ না দেখিলে পূর্ব্বোক্ত অপরাধ এখনও দূর হয় নাই, এরূপ মনে করিতে হইবে।

উক্ত লক্ষণ-চতুষ্টয়-যুক্ত হইয়া নিরপরাধে নামগ্রহণ করিলে অহৈতুকী, উত্তমা, কেবলা, শুদ্ধা, অমিশ্রা, অকিঞ্চনা, নির্গুণা ইত্যাদি বিশেষণযুক্তা ভক্তির অন্বয়গত লক্ষণ হয়। কিন্তু জীবের বদ্ধাবস্থায় দুইটী ব্যতিরেক লক্ষণ আছে। সেই লক্ষণযুক্তা হইলে ভক্তি শুদ্ধা হয়। অন্যাভিলাষ-শূন্যতা ও জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃততাই ভক্তির ব্যতিরেক লক্ষণ। সেই তত্ত্ব পরিষ্কাররূপে শিখাইবার জন্য শ্রীশ্রীমহাপ্রভু কহিয়াছেন,—'হে জগদীশ! আমি ধন, জন, বা সুন্দরী কবিতা প্রার্থনা করি না, কিন্তু জন্মে জন্মে যেন প্রাণেশ্বর তোমাতে আমার অহৈতুকী ভক্তি থাকে। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মপ্রদত্ত ধর্ম্ম, অর্থ, কাম-ধনই—ধন, তাহা আমি চাই না। দেহ ও দেহানুগত স্ত্রী, পুত্র, কলত্র, প্রজাদিরূপ জনও আমি চাই না। কৃষ্ণভক্তি-পোষিকা বিদ্যা ব্যতীত সামান্য ব্যাকরণ ও অলঙ্কার-প্রতিষ্ঠিত কাব্য-নাটকাদি-রচনা-শক্তি (উপলক্ষে কোন বহির্ম্মুখ বিদ্যা) আমি চাই না। কেবল ফলানুসন্ধান-রহিতা শুদ্ধা ভক্তিই আমার প্রার্থনা। সংসার-দুঃখনাশ এবং চিৎস্বরূপ-লাভরূপ মোক্ষ ভক্তের পক্ষে অনায়াস-লভ্য অবান্তর ফল। তজ্জন্য প্রয়াস বা প্রার্থনাদ্বারা ভক্তির স্বরূপকে দূষিত করা উচিত নয়। যে সময়ে জীবের জড়মোচনের যোগ্যতা উপস্থিত হইবে, তখন কৃষ্ণকৃপাক্রমে তাহা অবশ্যই ঘটিবে। অতএব ভক্তগণ 'জন্মে জন্মে যেন অহৈতুকী ভক্তি লাভ করি'—এইমাত্র বাসনা করিবেন। অন্য বাসনা করিবেন না।

সংসারদুঃখ-বিষয়ক আলোচনা কি নিতান্ত অকর্ত্তব্য ? না। ভক্তিভাবকে বিশুদ্ধরূপে রাখিয়া যতদূর সংসারমোচন-সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতে পারে, সাধক ততদূর তদ্বিষয় আলোচনা করিতে পারেন। সিদ্ধান্ত এই যে, শ্রীকৃষ্ণের নিকট সংসারদুঃখ-মোচন-প্রার্থনা কদাচ করিবেন না, কেবল এই প্রকার প্রার্থনা করিলে কোন দোষ হইতে পারে না,—'হে মাধুর্য্যরসবিষয় শ্রীনন্দনন্দন! আমি তোমার নিত্যদাস। তোমাকে বিস্মৃত হইয়া মায়াবৈভবে প্রবেশপূর্ব্বক কর্ম্মজালময় বিষম ভবসমুদ্রে পতিত হইয়াছি। এই অবস্থায় আমি যতই চেষ্টা করি ততই তোমার চরণাশ্রয় সুদূরবর্ত্তী হইয়া পড়ে। তুমি কৃপা না করিলে আর তোমার অকৃত্রিম দাস্যরূপ আমার স্বধর্ম্ম আমার পক্ষে সুলভ হয় না। হে করুণাময়! আমাকে তোমার পাদপদ্মস্থিত ধূলিসদৃশ করিয়া রাখ। তাহা হইলে আমি আর তোমার বহির্ম্মুখতারূপ মায়াভিনিবেশে আবদ্ধ হইব না।' এইরূপ প্রার্থনা করিতে করিতে সেই করুণাময় যখন আমাদিগকে তাঁহার চরণাশ্রয় দান করেন, তখন আর জীবের ক্লেশ থাকে না।

পূর্ব্ব পঞ্চ শ্লোকে সৎসঙ্গক্রমে কৃষ্ণানুশীলনকারী শ্রদ্ধা, তাহার পর সাধুগুরুচরণাশ্রয়, তৎপরে শ্রবণকীর্ত্তনাদিময় ভজন, তাহা হইতে স্বরূপোপলব্ধিজনিত অবিদ্যারূপ অনর্থ-নাশ, তদনন্তর নিষ্ঠা, তাহা হইতে রুচি, তাহা হইতে আসক্তি এবং আসক্তির পরিপাকে ভাব বা রতি হ্লাদিনীসারবৃত্তিকে আশ্রয় করত উদিত হয়; এই ক্রমটী প্রদর্শিত হইয়াছে। ভাবদশায় ভক্তির অখণ্ড একস্বরূপত্ব সিদ্ধ হয়। নাম-কীর্ত্তন তখন অত্যন্ত প্রবল হয়। ক্ষান্তি, অব্যর্থকালত্ব, বিরক্তি, মানশূন্যতা, আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা, নামগানে রুচি, কৃষ্ণ-গুণাখ্যানে আসক্তি ও কৃষ্ণবসতিস্থলে প্রীতি ইত্যাদি রতির লক্ষণস্বরূপ হইয়া পড়ে। ভাব বা রতি শুদ্ধসত্ত্ব-বিশেষস্বরূপ প্রেমরূপ সূর্য্যের কিরণপরমাণু অর্থাৎ প্রেমের প্রথমাবস্থা। তদুদয়ে নৃত্য, গড়াগড়ি, গীত, চীৎকার, শরীর-মোটন, হুঙ্কার, হাই, প্রভূতশ্বাস, লোকাপেক্ষাশূন্যতা, লালাস্রাব, অট্টহাস, ঘূর্ণা ও হিক্কা এই সকল অনুভাব এবং স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয়রূপ অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার কিয়ৎপরিমাণে লক্ষিত হয়। তন্মধ্যে নৃত্য, গীত, অশ্রু, পুলক, স্বরভঙ্গ এই কয়টী বিশেষরূপে লক্ষিত হয়। অতএব তদ্দশা-প্রার্থনাস্থলে সাধক এইরূপ লালসা করিয়া থাকেন,—"হে গোপীজনবল্লভ! তোমার অমৃতময় নাম উচ্চারণ করিতে করিতে কতদিনে আমার নয়নদ্বয়ে অশ্রুধারা বিগলিত হইবে, আমার বদন গদ্গদভাবে স্বরভঙ্গরূপ বিকার লাভ করিবে এবং আমার সমস্ত বপু পুলকিত হইতে থাকিবে? হে নাম! আমি ভোগমোক্ষ প্রার্থনা করি না, সেই সর্ব্বানন্দবিস্তারিণী ভাবদশা প্রার্থনা করি।"

রতিরূপা ভাবাত্মিকা ভক্তি প্রেমদশায় বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারিরূপ ভাবচতুষ্টয়ের দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া ভক্তিরসরূপে পরিণতা হয়। তখন পূর্ব্বোক্ত অনুভাব ও সাত্ত্বিক বিকারসকল সম্পূর্ণ লক্ষিত হয়। মমতাতিশয়-দ্বারা ভক্তের অন্তঃকরণ সম্যক্ মসৃণ

ও ঘনীভূত ভাবময় হইয়া প্রেমের পীঠস্থান হয়। তখন ভক্তিরসের আশ্রয় যে ভক্ত এবং বিষয় যে কৃষ্ণ তদুভয়ের মুখ্য-সম্বন্ধ-বুদ্ধিভেদে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চপ্রকার মুখ্যরস এবং তদুভয়ের গৌণ-সম্বন্ধভেদে হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক, বীভৎস এই প্রকার সপ্ত গৌণরস দেদীপ্যমান হয়। যে জীবের যে রসে রুচি তাহার পক্ষে সেই রসই আশ্রয়ণীয়, কিন্তু মধুর রসই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তাহাতে প্রেম, প্রণয় মান, স্নেহ, রাগ, অনুরাগ ও মহাভাব সম্পূর্ণরূপে অবস্থিত। শান্তরসে উল্লাসময়ী প্রীতি রতি-অবস্থায় লক্ষিত। তদবস্থায় তদ্বিষয়-ব্যতিরিক্ত অন্যত্র তুচ্ছ-বুদ্ধি। রতি মমতাতিশয়যুক্তা হইলে প্রেমরূপে দাস্যরসে লক্ষিত হয়। সে-অবস্থায় প্রীতিভঙ্গকারী হেতুসকল কার্য্য করিতে পারে না। নিতান্ত বিশ্বাসময় প্রেম প্রণয়রূপে সখ্যে লক্ষিত হয়। সে-অবস্থায় বিষয়ের সম্ভ্রম-যোগ্যতা থাকিলেও সম্ভ্রম থাকে না। প্রিয়ত্বের আতিশয্যপ্রযুক্ত কৌটিল্যাভাসময় ভাববৈচিত্র্যের নাম 'মান'। তদবস্থায় ভগবান্‌ও প্রেমময় ভয়কে স্বীকার করেন। চিত্তের অতিশয় দ্রবভাবময় প্রেমকে 'স্নেহ' বলে। তদবস্থায় মহাবাষ্পাদি বিকার, দর্শনে অতৃপ্তি, বিষয়ে ঐশ্বর্য্যসত্ত্বেও অনিষ্টাশঙ্কা হইয়া থাকে। মান ও স্নেহ বাৎসল্য হইতে লক্ষিত, অর্থাৎ শান্ত, দাস্য, সখ্যে লক্ষিত হয় না। অভিলাষাত্মক স্নেহের নাম 'রাগ'। তদবস্থায় ক্ষণিক বিরহও অসহ্য। সংযোগপর দুঃখও সুখ। সেই রাগ অনুক্ষণ নিজ বিষয়ীভূত তত্ত্বকে নূতন নূতনরূপে অনুভব করাইয়া স্বয়ং নবনবভাবে অনুভূত হইয়া 'অনুরাগ' বলিয়া পরিচিত হয়। সেই অবস্থায় আশ্রয় ও বিষয়ের পরস্পর অত্যন্ত বশভাব। বিষয়-সম্বন্ধে অন্য প্রাণীতে জন্মগ্রহণ লালসা হয়। বিপ্রলম্ভে অত্যন্ত বিস্ফূর্ত্তি হয়। অসমোর্দ্ধ চমৎকার উন্মত্ততাময় অনুরাগকেই 'মহাভাব' বলে। তদবস্থায় সংযোগসময়ে নিমেষের অসহ্যতা ও কল্পের ক্ষণত্ব উপলব্ধ হয়। বিয়োগে ক্ষণকে কল্পপ্রায় মনে হয়। যোগে ও বিয়োগে উদ্দীপ্ত অশেষ সাত্ত্বিক বিকারাদি উদিত হয়। এই সমস্ত লক্ষণের দিগ্‌দর্শন মাত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুবাক্যে দৃষ্ট হয়। "অহো! গোবিন্দবিরহে আমার নিমেষকে যুগ পরিমাণ বোধ হইতেছে, চক্ষু হইতে বর্ষাকালের ধারা নির্গত হইতেছে এবং সমস্ত জগৎ শূন্যবৎ বোধ হইতেছে।" জড়বদ্ধ জীবের পক্ষে পূর্ব্বরাগময় বিপ্রলম্ভ অত্যন্ত উপযোগী, ইহাই কথিত হইল।

প্রেমদশাপ্রাপ্ত জীবের এইরূপ ভাব,—আমি শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম ব্যতীত আর কিছুই জানি না। তিনি কৃপা করিয়া আমাকে আলিঙ্গন করুন বা পদতলে আমাকে মর্দ্দন করিয়া সুখী হউন অথবা অদর্শন দ্বারা আমাকে মর্ম্মাহত করুন। তিনি প্রেমলম্পট। আমাকে যেরূপ বিধান করিয়া তিনি সুখলাভ করেন আমার সেই অবস্থাই স্বীকার, যেহেতু তিনি আমার প্রাণনাথ বই অপর কেহ ন'ন। প্রেমদশায় ভক্তগণ কৃষ্ণৈকজীবন হইয়া পড়েন। তখন ভক্ত ও কৃষ্ণ উভয়ের মধ্যে আকর্ষণরূপ একটী উভয়সম্বন্ধনিষ্ঠ পরমধর্ম্ম দীপ্ত হয়। আকর্ষ

ও লৌহ যেমত পরস্পর যথাবিহিত অবস্থিত হইলে লৌহ আকর্ষের প্রতি ধাবিত হয়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ-প্রতি মার্জ্জিত-চিত্ত বিহিত হইয়া থাকেন। ইহাই জীব ও কৃষ্ণের মধ্যে পূর্ব্বসিদ্ধ ধর্ম্ম। জীবের বৈমুখ্যবশতঃ ঐ ধর্ম্ম লুপ্তপ্রায় বিষয় ও আশ্রয়ে অবস্থিত হয়। সাম্মুখ্য উদিত হইলেই সেই ধর্ম্মের ক্রিয়া-পরিচয় লক্ষিত হয়। সেই ধর্ম্মসাধন-কার্য্যে জীবের ঐ ধর্ম্মের উদয় ব্যতীত অন্য ফল নাই। শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে বলিয়াছেন, যথা—

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জ্জয়-গেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতুঃ সাধুনা॥

(ভাঃ ১০।৩২।২২)

["হে গোপীগণ, আমার সহিত তোমাদের সংযোগ নির্ম্মল, বহুজীবনেও আমি নিজ-সৎকার দ্বারা তোমাদের প্রতি কর্ত্তব্যানুষ্ঠান করিতে পারিব না ; যেহেতু, তোমরা অতি কঠিন সংসার-শৃঙ্খল সম্পূর্ণরূপে ছেদন করিয়া আমাকে অন্বেষণ করিয়াছ। আমি তোমাদের ঋণ পরিশোধ করিতে অক্ষম। অতএব তোমরা নিজ কার্যদ্বারাই পরিতুষ্ট হও।" (অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য)]

এই শিক্ষাষ্টকে শ্রীমন্মহাপ্রভু সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-স্বরূপ জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাহায্যে সাধনভাবপ্রেম-অনুসন্ধানরূপ পরমতত্ত্ব আলোচনার উপদেশ করিয়াছেন,—হে জীব! যদি তোমার ভাগ্যোদয় হইয়া থাকে, তবে সমস্ত কর্ম্মচেষ্টা, জ্ঞানচেষ্টা পরিত্যাগপূর্ব্বক তুমি বিশেষ যত্নসহকারে এই শিক্ষাষ্টক অনুভব কর।

—শ্রীগৌঃ পত্রিকা ১১শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা।

উত্তমা ভক্তি

কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীশ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর মনোভীষ্ট-সংস্থাপক-বর তদীয় প্রিয়স্বরূপ শ্রীশ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভু উত্তমা ভক্তির লক্ষণ বলিতে গিয়া শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥"

এই শ্লোকটী শ্রীরূপানুগগণের আনুগত্যে পর্য্যালোচনা করিলে সাধকের 'ভক্তি'-সম্বন্ধে সুস্পষ্ট জ্ঞান ও বিজ্ঞান অর্থাৎ অনুভূতি নিশ্চয়ই লাভ হইবে। 'সম্বন্ধ'-তত্ত্ববিচারে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" বাক্যটী যেরূপ 'পরিভাষা' বাক্যরূপে গৃহীত হইয়াছে সেইরূপ অভিধেয়তত্ত্ব বিচারে এই শ্লোকটীও পরিভাষারূপে গ্রহণীয়। "সা চানিয়মে

নিয়ম-কারিণী"—ইহাই পরিভাষা অর্থাৎ বহুপ্রকার বিধিবাক্যের মধ্যে অন্যান্য সমস্ত বাক্যকে উপমর্দ্দন করিয়া যে-বাক্যকে সর্ব্বপ্রাধান্য দেওয়া হয়, তাহাই পরিভাষা। ভক্তির সম্বন্ধে কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, কর্ম্মার্পণকারী, বিষয়ী, বিভিন্নমতাবলম্বী, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অনুগামী—সকলের সকল প্রকার ধারণা, জ্ঞান ও অনুভূতিকে উপমর্দ্দন করিয়া অর্থাৎ তত্তদনুভূতিকে খণ্ডিত, দোষদুষ্ট অথবা ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত করিয়া ভক্তির নিষ্কৃষ্ট লক্ষণরূপে এই শ্লোকটী উক্ত হইয়াছে।

জ্ঞান ও কর্ম্মদ্বারা অনাবৃত, অন্যাভিলাষিতাশূন্য অনুকূলভাবে যে কৃষ্ণানুশীলন, তাহাই উত্তমা ভক্তি। "আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনম্"—ইহাতে ভক্তির স্বরূপলক্ষণ, "অন্যাভিলাষিতা-শূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্"—ইহাতে ভক্তির তটস্থ লক্ষণ উক্ত হইয়াছে। উক্ত শ্লোকে ক্রিয়াপদের ব্যবহার না থাকিলেও 'অনুশীলন' এই পদের দ্বারা ধাত্বর্থ উক্ত হইয়াছে। 'অনু'-পূর্ব্বক 'শীল্' ধাতু হইতে অনুশীলন শব্দ উৎপন্ন। চুরাদিগণীয় 'শীল্' ধাতুর অর্থ অভ্যাস, ইহা প্রবৃত্ত্যাত্মক ; আর ভ্বাদিগণীয় 'শীল্' ধাতুর অর্থ সমাধি, ইহা নিবৃত্ত্যাত্মক। ভক্তি চেষ্টারূপা ও ভাবনারূপা। 'শীল্' ধাতু প্রয়োগে উভয়বিধা ভক্তির সূচনাই করা হইয়াছে। কৃষ্ণার্থে কায়িক, বাচিক ও মানসিক চেষ্টারূপা ভক্তি আবার প্রবৃত্তিরূপা ও নিবৃত্তিরূপা-ভেদে প্রত্যেকটী দ্বিবিধা। ভক্তির স্বরূপাকার যে প্রধান নয়টী অঙ্গ, তাহার কায়িক-বাচিক-মানসিকানুশীলনই প্রবৃত্ত্যাত্মক-চেষ্টারূপা আর সেবা-নামাপরাধাদি বর্জ্জন প্রভৃতি নিবৃত্ত্যাত্মক-চেষ্টারূপা।

'অনু'-উপসর্গ পশ্চাৎ, সহ, পুনঃ পুনঃ, নৈরন্তর্য্য প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শ্রীল জীব গোস্বামিপ্রভু শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণে কৃষ্ণপ্রবচনীয় (কর্ম্মপ্রবচনীয়) লক্ষণে 'অনু'-উপসর্গের প্রয়োগ-সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

লক্ষণবীপ্সেত্থম্ভূতেষ্বভির্ভাগে পরিপ্রতী।
'অনু'রেষু সহার্থে চ হীনে তূপশ্চ কথ্যতে ॥

এখানে 'শীল্' ধাতুর পূর্ব্বে 'অনু'-উপসর্গটী 'নৈরন্তর্য্য'-অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ সেই অনুশীলন অন্তর রহিত—বাধা রহিত। এই অনুশীলন কৃষ্ণার্থে-ই করিতে হইবে। কৃষ্ণার্থে চেষ্টারূপা ও ভাবনারূপা উভয়বিধ অনুশীলনই ভক্তি। শ্রীকৃষ্ণে রোচ-মানা প্রবৃত্তিই ভক্তি। যাঁহার উদ্দেশ্যে অনুশীলন করিতে হইবে, তাঁহার সেই অনুশীলন রুচিকর বা সুখকর হওয়া চাই। সুতরাং কৃষ্ণানুশীলনই ভক্তি—এই পর্যন্ত ভক্তির লক্ষন পাওয়া গেল। কিন্তু তাহাতেও অব্যাপ্তি ও অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটে। যে-লক্ষণে অব্যাপ্তি, অতিব্যাপ্তি ও অসম্ভব দোষ থাকিবে না, তাহাই নিষ্কৃষ্ট লক্ষণ। কৃষ্ণানুশীলন বা কৃষ্ণকে সুখ দেওয়ার নামই ভক্তি—ইহা বলিলে চানুর-মুষ্টিক প্রভৃতি কৃষ্ণবিরোধী অসুরগণও ভক্ত, ইহা প্রমাণিত হইয়া যায়। তাহাতে লক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটে। কারণ কৃষ্ণ যখন কংসের

রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিতেছিলেন, তখন চানূর-মুষ্টিকের মল্ল-ক্রীড়ার জন্য আহ্বান শ্রবণ করিয়া তাঁহার বীররসের উদয় হইয়াছিল। কোন বীরের অঙ্গে অন্য বীর আঘাত দিলে তাহাতে আহত বীরের সুখ হয়। চানূর-মুষ্টিক যখন কৃষ্ণের অঙ্গে মুষ্টিপ্রহার করিয়াছিল তখন কৃষ্ণের বীররসানুভব-জনিত সুখ হইয়াছিল। সুতরাং চানূর-মুষ্টিক কৃষ্ণভক্ত। কিন্তু তাহা বলা যায় না। কারণ তাহারা কৃষ্ণকে মারিবার জন্যই তাঁহার অঙ্গে আঘাত করিয়াছিল, কৃষ্ণকে সুখ দেওয়ার উদ্দেশ্যে করে নাই। আবার, কৃষ্ণকে সুখী করার নামই ভক্তি—এই কথা বলিলে কোনও প্রকারে কৃষ্ণকে দুঃখ দেওয়া অভক্তি এবং তদ্রূপ দুখপ্রদানকারী কৃষ্ণের অভক্ত, ইহা প্রমাণিত হয়। কারণ, একদা মা যশোদা স্তন্যপানরত কৃষ্ণকে তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ক্রোড় হইতে নামাইয়া চুল্লীর উপর স্থাপিত দুগ্ধ রক্ষা করিবার জন্য দৌড়াইয়া গেলেন। কৃষ্ণ ক্রোধান্বিত হইয়া কম্পমান অধর দংশন করিতে করিতে দধিভাণ্ডটী ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন এবং স্তন্যপানে অতৃপ্ততাহেতু কাঁদিতে লাগিলেন। মা যশোদার স্তন্যপান না করাইয়া দুগ্ধরক্ষার জন্য গমনরূপ অনুশীলন বা কার্য্যটী কৃষ্ণের আদৌ রুচিকর—সুখজনক হয় নাই। সুতরাং এখানে ভক্তির 'কৃষ্ণানুশীলনম্' এই লক্ষণের অব্যাপ্তি ঘটে। কারণ যিনি বিশুদ্ধ বাৎসল্য জাতীয় প্রেমভক্তির সাক্ষাৎ অধিষ্ঠাত্রী দেবী, যাঁহার সমগ্র চেষ্টাই কৃষ্ণের জন্য হইয়া থাকে, সেই মা যশোদার—"আমার স্তন্য পান করিয়া কৃষ্ণ রক্ষা পাইবে না, চুল্লীর উপর ঐ দুগ্ধ কৃষ্ণের জীবনস্বরূপ (মা যশোদা রাজরাণী হইয়াও—বহু দাসদাসী-পরিবেষ্টিতা হইয়াও কৃষ্ণের জন্য সুলক্ষণ-যুক্তা গাভীর দুগ্ধ স্বয়ং দোহন করিতেন এবং ঐ দুগ্ধ নিজে জ্বাল দিয়া কৃষ্ণের জন্য প্রস্তুত করিতেন, তাহা হইতে নিজেই মাখন প্রস্তুত করিতেন), সুতরাং সাময়িকভাবে কৃষ্ণকে দুঃখ দিয়াও তাহারই জন্য দুগ্ধ রক্ষা করিতে হইবে"—ইত্যাদি চিন্তাজনিত যে প্রেমভক্তি-বিশেষময় অনুশীলন, তাহা কখনও 'অভক্তি' হইতে পারে না। লক্ষণে এই উভয়বিধ দোষ পরিহারের জন্য 'আনুকূল্যেন' এই বিশেষণটী দেওয়া হইয়াছে। 'আনুকূল্যেন'—এখানে বিশেষণে তৃতীয়া বিভক্তি। যিনি কৃষ্ণানুশীলন করিবেন, তিনি প্রথমেই অনুকূল হইবেন অর্থাৎ 'কৃষ্ণকেই সুখ দিব'—এইরূপ ইচ্ছাবিশিষ্ট হইবেন। তাঁহার চিত্ত সম্পূর্ণ প্রতিকূলতাশূন্য হইবে। আপাততঃ অনুকূল বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও সেরূপ অনুশীলন যদি বাস্তবিকপক্ষে প্রতিকূলতাশূন্য না হয়—নিজসুখবাঞ্ছারহিত না হয়, তবে তাহা ভক্তি হইবে না। অনুশীলনের মধ্যে অভীষ্টদেবের সুখবাঞ্ছা ব্যতীত যদি নিজের কোন সুখানুসন্ধান থাকে, সেরূপ অনুশীলন অভীষ্টদেবের সাময়িক সুখকর হইলেও তদ্রূপ অনুশীলনকারী ভক্তির ফল যে প্রেম, তাহা লাভ করিতে পারিবেন না। তিনি নিজের বাসনানুরূপ ফলই লাভ করিবেন। জগদ্গুরু পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে বহুব্যক্তি কায়মনোবাক্য ও অর্থাদির দ্বারা তাঁহার মনোঽভীষ্ট পূরণের সহায়তা করিয়াছেন, শ্রীল গুরুদেবও তাহাদের সেই অনুশীলন দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন, কিন্তু বহুবর্ষ ঐরূপ সেবা

করিয়াও অধুনা কাহারও গুরুত্যাগ করা প্রবৃত্তি, কাহারও বা গুরুভোগ করার প্রবৃত্তি অর্থাৎ গুরুপাদপদ্মের নিরন্তর ভজনময় ব্যক্তিত্বকে অনুসরণ না করিয়া কেবল তাঁহার বাহ্য ক্রিয়ার অনুকরণ করিয়া গুরু সাজিবার ধৃষ্টতা দেখা যাইতেছে—ভক্তির আবির্ভাবের প্রথম স্তরটীও তাহাদের মধ্যে প্রকাশ পাইতেছে না। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, তাহারা "শ্রীল গুরুদেব আমার সেবা অঙ্গীকার করিয়া সুখী হইবেন, তাঁহার সুখ সম্পাদনই আমার একমাত্র জীবাতু"—এইরূপ ইচ্ছা লইয়া শ্রীগুরুদেবের সেবা করে নাই, কিন্তু তাঁহার একমাত্র সুখকামনা ব্যতীত অন্য কামনা লইয়া তাঁহার সেবা করিয়াছেন। ফলে সাধুসেবার মুখ্যফল হইতে বঞ্চিত হইয়া নিজ নিজ অভীষ্ট বস্তু লাভ করিয়াছে। কারণ উদ্দেশ্য সাধু হইলে ভক্তির আবির্ভাবের ফলে চিত্তে শাস্ত্রোক্ত লক্ষণ-সমূহ নিশ্চয়ই প্রকাশ পাইবে, ভক্তিবিরোধী কামনাবাসনা ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে।

এখন 'আনুকূল্য' এই বিশেষণকেই ভক্তি বলা যাইতে পারে না, কারণ অনুশীলনম্' এই বিশেষ্য পদপ্রয়োগ যে নিরর্থক নহে, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের রুচিকর প্রবৃত্তিও যদি প্রতিকূলতাশূন্য না হয়, তবে তাহাকে ভক্তি বলা যাইবে না, আবার অরুচিকর প্রবৃত্তিও যদি প্রতিকূলতাশূন্য হয়, তবে তাহাকে ভক্তি বলা যাইবে। সুতরাং কেবল রুচিকর অনুশীলনই ভক্তি নহে, পরন্তু প্রতিকূলতাশূন্য কৃষ্ণানুশীলনই ভক্তি। আবার অনুশীলন-শব্দের চেষ্টারূপ বা ভাবরূপ অর্থকে প্রকাশ না করিয়া কেবল প্রতিকূলতার অভাবও ভক্তি হইবে না। কারণ ঘটাদি জড় অচেতন বস্তুতেও প্রতিকূলশূন্যতা আছে, কিন্তু তাহা অচেতন হওয়াতে তাহাতে চেষ্টারূপ বা ভাবরূপ অনুশীলন নাই। সুতরাং **"আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনম্"—ইহাই ভক্তির চরম স্বরূপলক্ষণ।"** তদভিন্নত্বে সতি তদ্বোধকত্বং স্বরূপলক্ষণম্"। অর্থাৎ যাহা বস্তু হইতে অভিন্ন থাকিয়া বস্তুকে বুঝাইয়া দেয়, তাহা স্বরূপলক্ষণ; যেমন "আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনম্"—এখানে আনুকূল্যবিশিষ্ট কৃষ্ণানুশীলনরূপ অসাধারণ ধর্ম্ম কৃষ্ণভক্তি হইতে অভিন্ন থাকিয়া কৃষ্ণভক্তিকে বুঝাইতেছে, এজন্য ইহা "স্বরূপ-লক্ষণ"।

এখন তটস্থ-লক্ষণ দুইটীর বিচার হইতেছে। "তদ্‌ভিন্নত্বে সতি তদ্বোধকত্বং তটস্থ-লক্ষণম্॥" অর্থাৎ যাহা বস্তু হইতে ভিন্ন থাকিয়া বস্তুকে বুঝায়, তাহাই তটস্থ-লক্ষণ। **"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্"**—এই অংশে অন্যাভিলাষিতা ও জ্ঞান-কর্ম্মাদি উত্তমা ভক্তি হইতে ভিন্ন বস্তু হইয়া উত্তমা ভক্তিকে লক্ষ্য করাইতেছে। এজন্য ইহা তটস্থ-লক্ষণ। অন্যাভিলাষিতাশূন্য অর্থাৎ ভক্তিভিন্ন স্বর্গসুখ বা দেহসুখ প্রভৃতি অন্য কোনও অভিলাষ না রাখিয়া নিরন্তর কৃষ্ণসুখানুসন্ধান-তৎপর হইতে হইবে। অন্যাভিলাষশূন্য না বলিয়া অন্যাভিলাষিতাশূন্য বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, কোনও কোনও ভক্তের প্রার্থনার মধ্যে অন্যাভিলাষের আকার দেখা যায়, কিন্তু তাহাদের মধ্যে অন্যাভিলাষ

পোষণ করার চিত্তবৃত্তি নাই অর্থাৎ অন্যাভিলাষিতা নাই। যেমন, শ্রীযুধিষ্ঠির মহারাজ রাজচক্রবর্ত্তী হইয়া কৃষ্ণের সেবা করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের নিকট রাজসূয় যজ্ঞ করিবার প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। তাঁহার রাজচক্রবর্ত্তী হওয়ার অভিলাষটী অন্যাভিলাষের আকারমাত্র, বস্তুতঃ ঐ অভিলাষের মধ্যে অন্যাভিলাষিতা নাই। কারণ, তিনি কৃষ্ণের মত ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া কৃষ্ণের সেবা করিতে চাহিয়াছিলেন। নিজে বড় হওয়ার জন্য রাজচক্রবর্ত্তিত্ব আকাঙ্ক্ষা করেন নাই। অন্যাভিলাষ-শব্দের উত্তর শীলার্থে ণিন্ প্রত্যয় করিয়া অন্যাভিলাষিতা। অন্যাভিলাষ পোষণ করার স্বভাব বা প্রবৃত্তিই অন্যাভিলাষিতা। আরও কোনও শুদ্ধভক্ত অকস্মাৎ কোনও বিপদ্ হইতে মুক্তিলাভের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন, তাহাও বাহিরে অন্যাভিলাষের মত দেখা গেলেও তাহাতে তাঁহার ভক্তির কোন ব্যাঘাত হয় না।

জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্—জ্ঞান ও কর্ম্ম আবৃত করে না এরূপ যে আনুকূল্যবিশিষ্ট কৃষ্ণানুশীলন, তাহাই উত্তমা ভক্তি। 'জ্ঞান' বলিতে নির্ব্বেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান, 'কর্ম্ম' বলিতে স্মৃতি-শাস্ত্রোক্ত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম এবং 'আদি'-পদে ফল্গুবৈরাগ্য, অষ্টাঙ্গযোগ ও সাংখ্য-শাস্ত্রোক্ত অভ্যাসযোগাদি নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। কারণ, এগুলি সাধকের ভক্তিকে আবরণ করে, কারণ ইহাতে ভগবৎসুখ-তাৎপর্য্য আদৌ নাই। ঐ সকল অনুষ্ঠানে সাধকের কিছু বিভূতি প্রভৃতি লাভ হয় এবং সেই বিভূতি ভগবৎসুখানুসন্ধান-স্পৃহার একান্ত পরিপন্থী। এই সব কারণে ভক্তিকে আবৃত করে এমন জ্ঞান বা কর্ম্মানুষ্ঠান নিষেধ করিয়াছেন, তজ্জন্য 'জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃতম্' বলিয়াছেন, 'জ্ঞান-কর্ম্মাদিশূন্য'-শব্দ প্রয়োগ করেন নাই। কারণ, ভক্তিতে ভজনীয়রূপে অনুসন্ধানাত্মক জ্ঞান ও ভগবৎতত্ত্বজ্ঞান প্রভৃতি ভক্তির অন্তর্গত বিশুদ্ধজ্ঞান, এবং শ্রীমন্দিরমার্জ্জন-ভোগ-রন্ধনাদি ভগবৎপরিচর্য্যা কর্ম্মের আকার নবধা ভক্তির অন্তর্ভুক্ত কিন্তু কর্ম্ম নহে। জ্ঞান-কর্ম্মাদিশূন্য বলিলে বিশুদ্ধ ভক্তিতত্ত্ব-জ্ঞান ও ভগবৎপরিচর্য্যাদিও নিষিদ্ধ হইয়া যাইত। এই জ্ঞান ও কর্ম্ম ভক্তির আবরণ নহে বরং ভক্তির একান্ত অপরিহার্য্য পরিপোষক।

কৃষ্ণানুশীলন বলিতে কৃষ্ণ ও রাম-নৃসিংহাদি তদীয় অবতার সকলের অনুশীলন বুঝিতে হইবে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, কৃষ্ণানুশীলন বলিতে যদি সকল অবতারের অনুশীলন বুঝায়, তাহা হইলে গৌড়ীয়গণের মূলগুরুপাদপদ্ম শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুকৃত উত্তমা ভক্তির এই চরম নিষ্কৃষ্ট লক্ষণে গৌড়ীয়গণের চরম ভজনের উত্তমা ভক্তির পরাকাষ্ঠার ইঙ্গিত থাকা অবশ্য বাঞ্ছনীয়। তাই শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভুর একান্ত মর্ম্মী অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল কবিরাজগোস্বামিপ্রভু উক্ত শ্লোকের নিজকৃত অনুবাদ **"আনুকুল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন"**—এই বাক্যে 'সর্ব্বেন্দ্রিয়ে' পদটীর দ্বারা ভক্তির সর্ব্বোত্তম অবস্থার ইঙ্গিত করিয়াছেন। সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন একমাত্র মধুররসে ব্রজগোপীগণের পক্ষেই সম্ভব। বাৎসল্য-রসেও সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলনের সর্ব্বোত্তমতা সম্ভব নয়।

শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি এই উত্তমা ভক্তির আকার। এই সাধনভক্তি একমাত্র ভগবৎ সুখানুসন্ধান-তৎপর হইয়া যাজন করিলে সাধক অনায়াসে শীঘ্র সাধনের ফল কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিতে পারেন এবং প্রেমপ্রাপ্তির পর উত্তরোত্তর প্রেমের পরবর্ত্তী অবস্থা লাভ করিতে পারেন। এজন্য শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ

এখানে 'ভক্তিযোগঃ' বলিলেই হয়। **'ভগবতি'** বলিবার তাৎপর্য্য এই যে নামগ্রহণ-স্মরণাদি-ভক্তির যে-সব আকার, সেইগুলি যখন একমাত্র ভগবৎসুখের জন্য হয়, তখনই তাহা **'ভক্তিযোগ'** আখ্যাপ্রাপ্ত হয় এবং এই ভক্তিযোগই প্রেম দিতে সমর্থ হয়। ভগবৎসুখ বিধান ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে নাম-গ্রহণাদি ভক্ত্যঙ্গ যাজিত হইলেও তাহাকে ভক্তিযোগ বলা যাইবে না এবং তাহার ফলে প্রেম লাভ হইবে না।

—শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা।

শ্রীগীতোপনিষদে আত্মনিবেদন

আর্য্য-ঋষিগণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকে উপনিষৎ-চূড়ামণি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। কারণ অন্যান্য উপনিষৎ অপেক্ষা শ্রীগীতায় লীলাময়ের লীলাময়ত্ব বিশেষভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে। গীতার মাহাত্ম্যশ্লোকে ইহা উপনিষদের সার বলিয়া কথিত হইয়াছে।

"সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥"

সমস্ত উপনিষদ্গণ গাভীতুল্য, গোপরাজ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণই ইহাদের দোহনকারী, অর্জ্জুন বৎস, সুধিগণ ভোক্তা, গীতারূপ অমৃতই দুগ্ধ।

মহাভারতের অন্তর্গত গীতার বক্তা দেবকীনন্দন শ্রীবাসুদেব। কিন্তু উক্ত শ্লোকে "দোগ্ধা গোপালনন্দন" ইহাই উক্ত হইয়াছে। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায়—ব্রজেন্দ্রনন্দন বৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণই গীতার বক্তা। তিনি বাসুদেব-বিগ্রহে শ্রীগীতা কীর্ত্তন করিলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁহার উক্তিই তাঁহার প্রকৃত রসময় স্বরূপ প্রকট করিয়াছে। গোস্বামিপাদগণ বিভিন্নস্থানে মা যশোদার অপর নাম দেবকী, দেবকীপুত্র যশোদাপুত্রেরই নামান্তর, ইহা দেখাইয়াছেন। অতএব শ্রীগীতার বক্তা বাহিরে দেবকীপুত্র বাসুদেব হইলেও অন্তরবক্তা শ্রীনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণই। শ্রীগীতার উপক্রম-উপসংহারাদি আলোচনা করিলে বুঝা যায়—শ্রীকৃষ্ণই পরমদেব, চরম উপাস্য, ভক্তিই তাঁহার উপাসনা, প্রেমভক্তিই সেই উপাসনার চরম কাষ্ঠা।

এখন শ্রীগীতার আত্মনিবেদন কি ধরণের—তাহা কি পর্য্যায়ভুক্ত, ইহা আলোচিত হইতেছে। বাহ্যতঃ শ্রীগীতার উপদেশ সার্ব্বভৌমিক। ইহাতে কর্ম্মার্পণ হইতে আরম্ভ করিয়া শরণাগতি ও আত্মনিবেদন পর্য্যন্ত ভক্তির যাবতীয় কথা সূত্রাকারে গীত হইয়াছে। শ্রীগীতায় কথিত আত্মনিবেদন ব্যাপারটীও সার্ব্বভৌমিক। ইহাতে কর্ম্মার্পণকারী হইতে আরম্ভ করিয়া আত্মনিবেদনের চরম কাষ্ঠা-প্রাপ্তগণের প্রতি উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

গীতায় কথিত আত্মনিবেদন সাধারণ ও অসাধারণ-ভেদে দ্বিবিধ। শ্রীল জীবপাদ শ্রীভক্তিসন্দর্ভে সাধারণ আত্মনিবেদনকে "ভাবং বিনা" এবং অসাধারণ আত্মনিবেদনকে "ভাববৈশিষ্ট্যেন চ" এইভাবে দ্বিধা বিভক্ত করিয়াছেন। **"তদেতদাত্মনিবেদনং ভাবং বিনা ভাববৈশিষ্ট্যেন চ দৃশ্যতে"** (ভক্তিসন্দর্ভ ৩০৯ অনু)। শ্রীল জীবপাদ 'ভাবং বিনা'-আত্মনিবেদনের দৃষ্টান্ত-স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতের "মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা নিবেদিতাত্মা"(১) এই শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন ; আর 'ভাববিশিষ্ট' আত্মনিবেদনের দৃষ্টান্ত-স্বরূপ "তন্মে ভবান্ খলু বৃতঃ পতিরঙ্গ জায়ামাত্মার্পিতশ্চ ভবতোঽত্র"(২) শ্রীরুক্মিণীদেবীর এই শ্লোকটী উদ্ধার করিয়াছেন। "পূর্ব্বং যথা—'মর্ত্ত্যো যদা' ইত্যাদি উত্তরং যথৈকাদশ এব (ভাঃ ১১।১১।৩৫)—'দাস্যেনাত্মনিবেদনম্' ইতি। যথা চ রুক্মিণীবাক্যে (ভাঃ ১০।৫২।৩৯) 'আত্মার্পিতশ্চ ভবতঃ' ইতি" (শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৩০৯ অনুচ্ছেদ)।

ভাব-অর্থে সম্বন্ধ—রাগানুগ দাস্য-সখ্যাদিময়। দাস্যভাব, সখ্যভাব, বাৎসল্যভাব ও মধুরভাব—এই চারটিই 'ভাববৈশিষ্ট্যেন' এই পদে উদ্দিষ্ট। ভগবৎপাদপদ্মে এই চারিটির যে-কোন একটী ভাবে সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া যে-আত্মনিবেদন, তাহাই ভাবযুক্ত আত্মনিবেদন ; আর এই চারিটির কোন ভাবেরই উদয়ের পূর্ব্বে ভগবৎপাদপদ্মে যে-আত্মসমর্পণ, তাহাই ভাবহীন আত্মনিবেদন। ভাবহীন আত্মনিবেদন শ্রীবলি-মহারাজের চরিত্রে পরিস্ফুট হইয়াছে—ইহা শ্রীল জীবপাদ সন্দর্ভে অন্যত্র দেখাইয়াছেন। শ্রীবলি-মহারাজের দাস্য—ভাবহীন দাস্য, উহা রাগানুগ-দাস্য নহে। গীতার সর্ব্বগুহ্যতম অর্থাৎ চরম উপদেশ—

১। মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্ত-সমস্ত-কর্ম্মা, নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো, ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ॥ (ভাঃ ১১।২৯।৩৪)

"মর্ত্ত্য ব্যক্তি যখন সমস্ত কর্ম্ম-ত্যাগ করিয়া আমার নিকট হইতে বিশিষ্টক্রিয়াপ্রাপ্তি-বাসনাক্রমে আত্মনিবেদন করেন, তখন তিনি অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়া আমার অত্যন্ত প্রিয়-জন হইয়া পড়েন।" (শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতার্ক-মরীচিমালা)

২। তন্মে ভবান্ খলু বৃতঃ পতিরঙ্গ জায়ামাত্মার্পিতাশ্চ ভবতোঽত্র বিভো বিধেহি। (ভাঃ ১০।৫২।৩৯)

"হে বিভো, হে কমললোচন, আমি আপনাকে পতিরূপে বরণ এবং আত্মসমর্পণ করিয়াছি, অতএব আপনি এখানে আসিয়া আমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিবেন।

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"—ইহা ভাবহীন আত্মনিবেদনেরই দৃষ্টান্ত। শ্রীল জীবগোস্বামী-কর্ত্তৃক ভাবহীন আত্মনিবেদনের উদাহরণ-স্বরূপ ধৃত শ্রীমদ্ভাগবতের (ভা ১১।২৯।৩৪) "মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা, নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে" শ্লোকটী ও গীতার চরম উপদেশ-স্বরূপ "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"—শ্লোকটী একার্থবাচক। আবার "অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি" শ্লোকাংশ "বিচিকীর্ষিতো মে" কথারই ব্যাখ্যাবিশেষ। গীতার এই "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" শ্লোকটী সর্ব্ব-সাধারণের প্রতি স্পষ্ট উপদেশ—ভাবহীন আত্মনিবেদনের কথা।

এখন বিচার্য্য, ভাবযুক্ত আত্মনিবেদনের ইঙ্গিত গীতায় প্রদত্ত হইয়াছে কি না। কোন বিদগ্ধ প্রেমিক ব্যক্তি যখন সাধারণকে নিজের স্নেহসেবার উপদেশ দেন, তখন তাহা একরূপ ভাষায় বলেন। সাধারণের মধ্যে নিজের প্রিয়তম ব্যক্তিগণ উপস্থিত থাকিলে সেই সাধারণ কথার মধ্যেও ইঙ্গিতে তিনি প্রিয়তম ব্যক্তিগণের প্রতি নিজের বিশেষ সুখবিধানের কথা গূঢ়ভাবে অথচ প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া যান। তাহা সাধারণ ব্যক্তি ধরিতে না পারিলেও যাঁহারা তাঁহার অসাধারণ প্রিয়, তাঁহারা নিশ্চয়ই সেই ইঙ্গিত বুঝিয়া থাকেন। সেইরূপ বিদগ্ধ-চূড়ামনি "গোপাল-নন্দন" শ্রীকৃষ্ণ সাধারণকে লক্ষ্য করিয়াই তাঁহার অসাধারণ সেবাভিলাষিগণের জন্য অসাধারণ সেবা বা অসাধারণ আত্মনিবেদন অর্থাৎ ভাবযুক্ত আত্মনিবেদনের কথা ইঙ্গিতে কীর্ত্তন করিয়াছেন। সেই ইঙ্গিত কর্ম্মী, জ্ঞানী, কর্ম্মার্পনকারী, কর্ম্মজ্ঞানমিশ্র, এমন কি জ্ঞানমিশ্র ভক্তগণ ধরিতে না পারিলেও, তাঁহার অত্যন্ত মর্ম্মী রাগানুগ ভাবাভিলাষী ভক্তগণ গীতায় শ্রীকৃষ্ণের ভাবযুক্ত আত্মনিবেদনের শুধু ইঙ্গিত কেন, স্পষ্ট উপদেশও অনুভব করিয়া থাকেন।

দশম-স্কন্ধে শ্রীরুক্মিণীদেবী পত্রে শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন—"তন্মে ভবান্ খলু বৃতঃ পতিঃ", অর্থাৎ আমি আপনাকে পতিরূপে বরণ করিয়া আপনার শ্রীচরণ-কমলে আত্মনিবেদন করিতেছি। এখানে কান্তাভাব বা সম্বন্ধ হৃদয়ে ধারণপূর্ব্বক আত্মনিবেদন হইয়াছে। গীতায় ভাবযুক্ত আত্মনিবেদনের দৃষ্টান্ত ১০ম অধ্যায়ে ৯-১০ শ্লোকে এবং ১১শ অধ্যায়ের ৪৪শ শ্লোকে পরিস্ফুট হইয়াছে। ১০ম অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—

"মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং **তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ।**
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥ (গীঃ ১০।৯-১০)

অর্থাৎ যাহাদের চিত্ত ও প্রাণ আমাতে সমর্পিত এবং আমার বিষয়ে মননশীল, আমার কথা কথনশীল, আমাতেই যাহারা তুষ্ট এবং আমাকে চিন্তা করিয়াই যাহাদের চিত্তের

সাচ্ছন্দ্য, সেইসকল সততযুক্ত বা সতত সংযোগাকাঙ্ক্ষী ভক্তদিগকে আমি এমন বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যাহাতে তাহারা আমায় লাভ করিতে পারেন।

শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ পর্য্যন্ত অন্যান্য সমস্ত টীকাকারগণ এই শ্লোকদ্বয়ের সর্ব্ব-সাধারণ-উপযোগী অর্থ-ই করিয়াছেন। বিদগ্ধ-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ যেখানে-যেখানে তাঁহার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, সেখানে-সেখানেই তাঁহার সাধারণ উপদেশের মধ্যেও তাঁহার মর্ম্মকথা—বিশ্রম্ভ-সেবার কথা না বলিয়া পারেন নাই। **"তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ"** এই কথায় "তুষ্যন্তি চ" এইটুকুতেই সাধারন অর্থের পরিসমাপ্তি হয়। "রমন্তি চ"-এর যে-ব্যাখ্যা অন্যান্য টীকাকারগণ করিয়াছেন, তাহা 'তুষ্যন্তি চ' কথায়ই পাওয়া যায়, 'রমন্তি'-কথার কোন বিশেষ অর্থ থাকে না; বিশেষ অর্থ অনুসন্ধান না করিলে উক্ত শব্দ প্রয়োগেরও সার্থকতা থাকে না। এইজন্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু ও শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর 'রমন্তি'-কথার সাধারণ অর্থ বাদ দিয়া প্রকৃতি-প্রত্যয়গত বিশেষ অর্থ-ই গ্রহণ করিয়াছেন। 'রম্'-ধাতুর অর্থ ক্রীড়া, রতি প্রভৃতি বুঝায়। 'রম্'-ধাতু প্রয়োগদ্বারা কেবল ভাবযুক্ত আত্মনিবেদন সূচিত হয় নাই, ভাবের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মধুর-ভাবযুক্ত আত্মনিবেদনও সূচিত হইয়াছে। শ্রীল বিদ্যাভূষণ প্রভু টীকায় বলিয়াছেন—"রমন্তি চ যুবতি-স্মিত-কটাক্ষাদিষু এব যুবানঃ।" অর্থাৎ স্মিত-কটাক্ষাদি-লক্ষণ কান্তাভাবোচিত মধুর প্রীতির বিষয়রূপে ভগবানকে বরণপূর্ব্বক আত্মনিবেদনই এখানে উদ্দিষ্ট। শ্রীল জীবপাদ-কর্ত্তৃক ভাবযুক্ত আত্মনিবেদনের দৃষ্টান্তরূপে প্রদত্ত শ্রীরুক্মিণীদেবীর "তন্মে ভবান্ খলু বৃতঃ পতিঃ" পত্রাংশ ও গীতার "রমন্তি চ" শ্লোকাংশের ভাবার্থ এক-তাৎপর্য্যপর। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরও "রমন্তি চ" কথায় ঐরূপ অর্থ-ই(৩) করিয়াছেন। শ্রীঅর্জ্জুনের ভাষায়—"পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্॥ (গীঃ ১১।৪৪)(৪)—এইস্থলে দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুরাদি ভাবযুক্ত আত্মনিবেদনের কথা পরিস্ফুট হইয়াছে।

৩। "তুষ্যন্তি চ রমন্তি চেতি ভক্ত্যৈব সন্তোষশ্চ রমণঞ্চেতি রহস্যম্; যদ্বা সাধনদশায়ামপি ভাগ্যবশাৎ ভজনে নির্ব্বিঘ্নে সম্পদ্যমানে সতি তুষ্যন্তি, তদৈব ভাবি স্বীয়সাধ্যদশামনুস্মৃত্য রমন্তি চ মনসা স্বপ্রভুণা সহ রমন্তি চেতি রাগানুগা ভক্তির্দ্যোতিতা।"—শ্রীবিশ্বনাথ

অর্থাৎ ভক্তিদ্বারাই সন্তোষ এবং রমণ, এই রহস্য। অথবা সাধন-দশায়ও ভাগ্যবশে ভজন নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হওয়ায় সন্তুষ্ট, সেইকালেই ভবিষ্যতে নিজের সাধ্যদশা স্মরণ করিয়া রমণ করে—মনে মনে নিজ প্রভুসহ রমণ করে—ইহাতে রাগানুগা ভক্তি প্রকাশিত হইল।

৪। হে দেব! পুত্রের পিতা যেরূপ, সখার সখা যেরূপ, প্রিয়ার প্রিয় যেরূপ অপরাধ ক্ষমা করিয়া থাকেন, তুমিও সেইরূপ আমার অপরাধ ক্ষমা করিতে সমর্থ।

"**দদামি বুদ্ধিযোগং** তং যেন মামুপযান্তি তে।" (গীঃ ১০।১০)

এখানে শ্রীল বিদ্যাভূষণ প্রভু, চক্রবর্ত্তীপাদ প্রমুখ মহাজনগণ 'বুদ্ধিযোগ'-শব্দের অর্থ ভাবযুক্ত সাধনের ইঙ্গিতই(৫) প্রকাশ করিয়াছেন।

—শ্রীগৌঃ পত্রিকা ২য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা।

পরিক্রমা-বিষয়ক প্রবন্ধ—

শ্রীবদরিকাশ্রম পরিক্রমা

এবৎসর শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি শ্রীবদ্রীনাথ ও কেদারনাথ পরিক্রমার বিরাট আয়োজন করিয়াছিলেন। আনন্দবাজার ও যুগান্তর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পত্রিকাগুলিতেও উক্ত পরিক্রমার সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। পূর্ব্বে-নির্দ্দিষ্ট বিজ্ঞাপন ও আহ্বান-অনুসারে বিগত ১৯শে ভাদ্র, ১৩৫৯ (বঙ্গাব্দ) ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৫২ (ইং) বৃহস্পতিবার রাত্র ৮॥টার সময় ডুন্ এক্স্‌প্রেসে সমিতির সংরক্ষিত (**Reserved**) গাড়ীতে প্রায় একশত যাত্রী শ্রীশ্রীবদ্রীনারায়ণ-পথে হরিদ্বার অভিমুখে মহাসমারোহের সহিত যাত্রা করেন। অন্যান্য পরিক্রমার ন্যায় এবৎসরও বদরিকাশ্রমে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর বিজয়-বিগ্রহকে অগ্রণী করিয়া পরিক্রমাকারী সকলেই অগ্রসর হইয়াছিলেন। পরিক্রমাকারী ভক্তগণ বাষ্পীয়যানের সংরক্ষিত কক্ষাভ্যন্তরে স্ব-স্ব-স্থানে উপবিষ্ট হইলে যথাসময়ে ট্রেন ছাড়িয়া

৫। "তং বুদ্ধিযোগমহং স্বভক্তিসুখরসিকো দদাম্যর্পয়ামি, যেন তে মামুপযান্তি তদ্বুদ্ধিং তথাহমুদ্ভাবয়ামি যথানন্তগুণবিভূতিং মাং গৃহীতোপাস্য চ প্রাপ্নুবন্তীতি।—শ্রীবলদেব-টীকা।

সেই বুদ্ধিযোগ **স্বভক্তি**-সুখরসিক আমি তাঁহাদের দান করিয়া থাকি। যাহার দ্বারা তাঁহারা আমাকে লাভ করেন। তাঁহাদের বুদ্ধিকে আমি সেইভাবেই উদ্ভাবন করিয়া থাকি, যাহাতে অনন্তগুণ-বিভূতিপূর্ণ আমাকে গ্রহণ করিয়া এবং আমার উপাসনা করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হন।

"তং বুদ্ধিযোগং দদামি, তেষাং হৃদ্‌বৃত্তিষ্বহমেব উদ্ভাবয়ামীতি; স বুদ্ধিযোগঃ স্বতঃ অন্যস্মাচ্চ কুতশ্চিদপ্যধিগন্তুমশক্যঃ কিন্তু মদেক-দেয়স্তদেকগ্রাহ্যঃ ইতি ভাবঃ।-শ্রীবিশ্বনাথ-টীকা

তাহাদিগকে বুদ্ধিযোগ প্রদান করি—তাঁহাদিগের হৃদয়ের বৃত্তিসমূহে আমি তাহা উদ্ভাবনা করি; সেই বুদ্ধিযোগ নিজ হইতে এবং অন্য কাহারও নিকট হইতে লাভ করিতে অসমর্থ, কিন্তু কেবলমাত্র আমা-দ্বারাই দেয় এবং তাহাদিগের দ্বারাই কেবল গ্রহণীয়, এই ভাব।

দেয়। তখনই শ্রীশ্রীমন্ মহাপ্রভুর ও গুরুপাদপদ্ম শ্রীল প্রভুপাদের আরাত্রিক সমাপনান্তে নৈশভোগ প্রদত্ত হয়। তৎপরে সমস্ত যাত্রীবৃন্দকে পুরী, তরকারী, মিষ্টান্ন প্রভৃতি বিবিধ মহাপ্রসাদ অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে পরিবেশন করা হয়। ইতোমধ্যে এক্সপ্রেস্ গাড়ী বর্দ্ধমান ষ্টেশনে পৌঁছিলে তথা হইতে কয়েকজন মহিলা-ভক্ত বদ্রীনারায়ণ-যাত্রীস্বরূপে পূর্ব্বনির্দ্দেশ-অনুসারে আমাদের সংরক্ষিত কক্ষে আরোহণ করিলেন। কয়েকজন ব্রহ্মচারী ব্যতীত অধিকাংশ যাত্রীই প্রসাদ-সেবান্তে ক্রমশঃ নৈশ-নিদ্রায় নিমগ্ন হইলেন। ব্রহ্মচারীবৃন্দ যাত্রিগণের সুবিধার জন্য ও তাঁহাদের সঙ্গের দ্রব্যাদি সংরক্ষণ-কল্পে সারারাত্র প্রহরী-স্বরূপে জাগ্রত ছিলেন। বাষ্পীয় যান হু-হু শব্দে চলিতে লাগিল।

যাত্রিগণের মধ্যে অনেকেই বদ্রীনারায়ণ-পথের ইতিহাস তাঁহাদের স্বদেশবাসী বন্ধু-বান্ধবগণের নিকট শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ভীত ও ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এবং তাঁহারা সুশৃঙ্খলে ও নিরাপদে পরিক্রমা করিবার প্রার্থনা জানাইয়া কৃপা-আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিলে সকলকেই অভয় ও আশ্বস্ত করিয়া জানান হয় যে, "আপনারা যাঁহাদের নিকট বদরিকাশ্রমের দুর্গমতার কথা শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়-মাসে হিমালয়-পর্ব্বতের তীর্থস্থানসমূহে ভ্রমণ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের সকলকেই কষ্টভোগ করিতে হইয়াছে। কিন্তু আমরা যে-সময়ে যাইতেছি, ইহা শ্রীবদরীনাথ, তুঙ্গনাথ, কেদারনাথ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান-সমূহ পরিক্রমার সর্ব্বোত্তম সময়। ভাদ্র-মাসেই অর্থাৎ আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসেই বদরিকাশ্রম যাতায়তের নিরাপদ স্বর্ণ সুযোগ। অধিকাংশ লোকই ঐ অঞ্চলের বর্ত্তমান আবহাওয়ার সহিত পরিচিত না থাকায় তাঁহারা যৎপরোনাস্তি কষ্টভোগ করিয়া থাকেন। আপনারা কোনপ্রকার ভীত হইবেন না। নির্ব্বিঘ্নে অনায়াসে আপনাদের পরিক্রমা সুসম্পন্ন হইবে।"

যাত্রিগণের একজন প্রশ্ন করিলেন,—"বদরিকাশ্রমের পাহাড়-পর্ব্বতের মধ্য দিয়া এত ক্লেশ স্বীকার করিয়া তথায় যাইবার সার্থকতা কি? শ্রীমন্মহাপ্রভু বা তাঁহার সম্প্রদায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ কেহই তথায় যান নাই, আমাদের যাইবার সার্থকতা কি?" এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে সকলকে জানাইয়া দেওয়া হয় যে—বিষ্ণুতীর্থ-মাত্রেই বৈষ্ণবগণের যাওয়া কর্ত্তব্য। তীর্থভ্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য সাধুসঙ্গ। হরিকথা শ্রবণ ও তীর্থাদির মাহাত্ম্য আলোচনামুখে কর্ণের দ্বারা শ্রীধাম ও তীর্থ-দর্শনই প্রকৃত দর্শন। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি তজ্জন্যই প্রতিবৎসর আপনাদিগকে ভারতের সমুদয় তীর্থস্থান পরিভ্রমণ উপলক্ষ্য করিয়া আহ্বান করিয়া থাকেন। সমিতির এইরূপ সেবানুষ্ঠানের প্রতি কটাক্ষ করিয়া আধুনিক বহু বৈষ্ণব ও সন্ন্যাসীই বলিয়াছিলেন,—

তীর্থযাত্রা পরিশ্রম, কেবল মনের ভ্রম,
সর্ব্বসিদ্ধি গোবিন্দ-চরণ। (শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম)

মহাজনের বাক্য সর্ব্বদাই শিরোধার্য্য। তবে উক্ত উপদেশটী কর্ম্মী, জ্ঞানী, অন্যাভিলাষী প্রভৃতিদের পক্ষেই প্রযুক্ত। যাঁহারা হরিকথা-প্রচার, সাধুসঙ্গ-লাভ ও জগন্মঙ্গল-কামনায় রত, তাঁহাদের পক্ষে ইহার যাথার্থ প্রযুক্ত নহে। উক্ত উপদেশের অন্তর্নিহিত সত্যই—ভগবান্ ও তন্নাম-মহিমা কীর্ত্তনমুখে সেবাই সর্ব্বতোভাবে সকল সাধকের কর্ত্তব্য। আনন্দের বিষয় এই যে, যাঁহারা শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির এইরূপ প্রচারের প্রতি কটাক্ষ করিতেন, তাঁহারা সকলেই এইরূপ প্রচার-ধারার সারবত্তা উপলব্ধি করিয়া তাহাই অনুসরণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবের পক্ষে বদ্রীনারায়ণ-তীর্থ দর্শন-প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য এই যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর একনিষ্ঠ পার্ষদসেবক শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের রচিত শ্রীচৈতন্যভাগবতের নিম্নলিখিত পয়ার বিশেষভাবে আলোচ্য—

(তা'সবার অতিথি হইলা নিত্যানন্দ।)
বদরিকাশ্রমে গেলা পরম-আনন্দ ॥
কতদিন নর-নারায়ণের আশ্রমে।
আছিলেন নিত্যানন্দ পরম নির্জ্জনে ॥
তবে নিত্যানন্দ গেলা ব্যাসের আলয়ে।
ব্যাস চিনিলেন বলরাম মহাশয়ে ॥
সাক্ষাৎ হইয়া ব্যাস আতিথ্য করিলা।
প্রভুও ব্যাসেরে দণ্ড-প্রণত হইলা ॥

(চৈঃ ভাঃ আঃ ৯।১৪০-১৪৩)

শ্রীচৈতন্যভাগবতের উক্ত বাক্য হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, শ্রীশ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীবদ্রীনারায়ণ-ক্ষেত্রে গিয়াছিলেন এবং তথাকার যাবতীয় তীর্থাদি পরিদর্শন করিয়াছিলেন। বৃদ্ধ ব্যাস তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার আতিথ্য করেন।

শ্রীগুরুপাদপদ্মই নিত্যানন্দ। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়-ভুক্ত। শ্রীমন্ মহাপ্রভু মাধ্ব-সম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীঈশ্বরপুরীপাদকেই দীক্ষা-গুরুরূপে গ্রহণ করিবার লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। তদবধি শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত রূপানুগ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় মাধ্ব-গৌড়ীয় নামে অভিহিত। সুতরাং মধ্বমুনিই আমাদের পূর্ব্বাচার্য্য। সেই আনন্দতীর্থ মধ্বমুনি বদরিকাশ্রমে আসিয়া শ্রীব্যাসের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের সাক্ষাৎ-শিষ্য বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন এবং সেইভাবেই তিনি সর্ব্বত্র পরিচিত। মধ্বমুনি শ্রীব্যাসদেবকে বিষয়জাতীয় ভগবান্ সাক্ষাৎ নারায়ণ বলিয়া জানেন এবং ব্যাসের অর্চ্চাবিগ্রহ পূজাকল্পে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবী ব্যাসের শক্তিরূপে স্থাপিতা হইয়া থাকেন। ইহাই মধ্বাচার্য্যের ব্যাসপূজার বৈশিষ্ট্য। অন্যত্র সর্ব্বসম্প্রদায়েই শ্রীব্যাসদেব ভগবানের শক্ত্যাবিষ্ট অবতাররূপে পূজিত হইয়া থাকেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, মাধ্বগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের আদিগুরু শ্রীমধ্বাচার্য্য এবং ঐকান্তিক গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের আদিগুরু ও মূলপুরুষ শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভু উভয়েই বদরিকাশ্রম তীর্থ-ভ্রমণের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর** বহুবার বদরীক্ষেত্রে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। নানা-প্রকার বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হওয়ায় শ্রীল প্রভুপাদের উক্ত অভিলাষ কার্য্যে পরিণত হয় নাই। সুদীর্ঘকাল পরে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির চেষ্টায় শ্রীল প্রভুপাদের উক্ত ইচ্ছা ফলবতী হইয়াছে। অত্যন্ত আনন্দের সহিত বলিতেছি, শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীমন্মহাপ্রভু সাক্ষাৎ প্রকট-বিগ্রহে বদরীনাথে না গেলেও তাঁহাদের অর্চ্চা এই বৎসর তথায় যাইতে উদ্যত হইয়াছেন। ভক্তগণের স্কন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর অর্চ্চা অত্যুচ্চ হিমালয়ে পথসমূহের দুর্গমতা অগ্রাহ্য করিয়া ভক্তবাঞ্ছা পূরণের জন্য শিবিকাযোগে বিশালাক্ষেত্রের তীর্থসমূহ তীর্থীভূত করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। আপনাদের সংকল্প সাধু এবং পূর্ব্ব আচার্য্যবর্গের অনুষ্ঠিত; সুতরাং ভীত হইবার কোন কারণ নাই। আমরা নির্ব্বিঘ্নে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় তাঁহাদের আনুগত্যে পরিক্রমা সেবা সুসম্পন্ন করিব।

৯ নং আপ্ ডুন্ এক্সপ্রেস্ ভোর ৬ টার সময় গয়া ষ্টেশনে পৌঁছিলে আমাদের যাত্রিগণ সকলেই বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতে থাকেন। অনেকেই বলিতে থাকেন যে, গত বৎসর আমরা এই গয়াক্ষেত্রে এক দিবস থাকিয়া গয়ার যাবতীয় স্থানসমূহ দর্শন করিয়াছি। এস্থলে পাঠকবর্গকে বলিয়া রাখি, গত বৎসর বৃন্দাবন-পরিক্রমা উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি রিজার্ভড্ বগীযোগে গয়া, কাশী, প্রয়াগ ইত্যাদি হইয়া মথুরা-বৃন্দাবন পরিক্রমা করিয়াছিলেন। তাহার আনন্দ উপলব্ধি-করিয়া যাত্রিগন বিশেষ উল্লাস প্রকাশ করেন। আর একটী অভিনব ব্যাপার এই যে, শ্রীশ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রাতঃকালীন আরতি-সময় উপস্থিত হইলে শ্রীমান্ ধীরকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী সেবাসুহৃদ্ শ্রীবিগ্রহের আরতি করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামি শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ন মহারাজ তাঁহার স্বভাব-সুলভ সুললিত কণ্ঠে আরতি-কালীন কীর্ত্তন করেন। আমাদের বহু ব্রহ্মচারী ও যাত্রী তাহাতে যোগদান করেন। শ্রীগৌরবিহিত সঙ্কীর্ত্তনে তখন গয়া ষ্টেশন মুখরিত হইতেছিল। ষ্টেশনের যাবতীয় কর্ম্মচারী, কুলি, অন্যান্য যাত্রী সকলেই শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কক্ষের সম্মুখে করযোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া 'আরতি দর্শন' ও কীর্ত্তন শ্রবণ করিতেছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু যে স্বয়ং ভগবান্ অবতারী পুরুষ, তাঁহার অর্চ্চা কি-ভাবে সেবিত হইয়া থাকে, গয়া ষ্টেশনের দর্শক-মণ্ডলী তাহা সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। যথাসময়ে গাড়ীর বিদায় ঘণ্টা বাজিলে গাড়ী ছাড়িয়া দিল। দর্শকমণ্ডলী একটী অভূতপূর্ব্ব আকস্মিক শুভ মুহূর্ত্ত হারাইয়া বিষন্ন-বদনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি যথাযোগ্য একাঙ্গ, পঞ্চাঙ্গ প্রণতি-পূর্ব্বক অত্যন্ত মনোবেদনা লইয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। আমাদের যাত্রিসকল এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শন করিয়া পরমানন্দে

বহু কথা আলোচনা করিতেছিলেন। এইরূপে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীল প্রভুপাদের অর্চ্চা-বিগ্রহের যথারীতি যাবতীয় সেবাই ট্রেনের মধ্যে পালিত হইয়াছিল। তৎপর ট্রেন চলিতে থাকিলে প্রাতঃকালীন গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব, "উদিল অরুণ" প্রভৃতি কীর্ত্তনসমূহ কীর্ত্তিত হয়।

গাড়ী ক্রমশঃ কাশী অতিক্রম করিয়া বারাণসী ষ্টেশনে পৌঁছিয়াছে; বেলা তখন ১১টা। এই বারাণসী ষ্টেশনের বর্ত্তমান নাম বেনারস্ ক্যান্টনমেন্ট। আমরা গত বৎসর বৃন্দাবন-পরিক্রমার যাত্রামুখে কাশীতে একদিবসের জন্য আমাদের সংরক্ষিত গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া কাশী-ধাম দর্শন করিয়াছি। আজ পুনরায় সেই স্থানে উপস্থিত হওয়ায় সকলেই আনন্দের সহিত ইহার মাহাত্ম্য স্মরন করিয়া বিশেষ উল্লাস প্রকাশ করিতে থাকেন।

বরুণা ও অসী নদীর মধ্যবর্ত্তী পুণ্য-ভূমির নামই বারাণসী। সাধারণতঃ ইহা শৈব ও জ্ঞানিগণের নিকট বিশ্বেশ্বরের স্থান বলিয়া কাশী-নামে আখ্যাত হইয়াছে। প্রকৃত-প্রস্তাবে এই কাশী-বারাণসী বিষ্ণু-বৈষ্ণবের অর্চ্চা-লীলার অফুরন্ত বিকাশ-ক্ষেত্র, বদরী-নারায়ণের পাদপদ্ম হইতে উদ্ভূতা শ্রীগঙ্গাদেবী এই ক্ষেত্রের পূর্ব্বদিকে প্রবাহিতা হইয়া কাশী-ধামের মাহাত্ম্য সর্ব্বতোভাবে সমুজ্জ্বল করিয়াছেন। বিষ্ণু-পাদোদ্ভূতা গঙ্গাদেবীকে বিষ্ণুভক্ত জানিয়া শিব তাঁহাকে মস্তকে ধারন করিয়া বিশ্ববাসী ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জনগণের নিকট বিষ্ণু-মহিমা প্রচার করেন। এই কাশী-ধাম প্রকৃত-প্রস্তাবে বিষ্ণুক্ষেত্র বলিয়াই স্বয়ং শম্ভু অর্চ্চামূর্ত্তিতে জ্যোতির্লিঙ্গ-স্বরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন; স্বয়ং ভগবান্ বিষ্ণু এই পুণ্য-ভূমির সর্ব্বত্র অষ্টাদশ শত (আঠারশত) অর্চ্চা-মূর্ত্তিতে বিরাজিত থাকিয়া ভগবদ্ভক্তের মহিমা জগতে প্রচার করিতেছেন। শ্রীকাশী-ধামে শিবলিঙ্গ অপেক্ষা বিষ্ণু-মূর্ত্তির সংখ্যা অনেক গুণে অধিক। ইহা স্কন্দপুরাণের কাশী-খণ্ডে শিব-মাহাত্ম্য-বর্ণনে প্রকাশিত হইয়াছে।

সর্ব্ব-অবতারের অবতারী পুরুষ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌর-সুন্দর তাঁহার শ্রেষ্ঠ ভক্ত শিবকে দর্শন দিবার জন্য শ্রীশ্রীকাশীধামে অনেক দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। তখন কাশী-ধাম সাক্ষাৎ নবদ্বীপ-ধামে পরিণত হইয়াছিল। বৈষ্ণব-আচার্য্য-কুল-মুকুট-চূড়ামণি শ্রীল সনাতন গোস্বামী হুসেনশাহ বাদশাহের প্রধানমন্ত্রিত্ব পদ পরিত্যাগ করিয়া এই বারাণসী-ক্ষেত্রেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। গয়ার কর্ম্মক্ষেত্র উত্তীর্ণ হইয়া বারাণসী-জ্ঞান-ভূমিকায় পশ্চিম-দেশীয় একদণ্ডী সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ সরস্বতী তাঁহার সহস্র সহস্র শিষ্য লইয়া জ্ঞানমার্গের অস্বাভাবিক বিচার পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহন করিয়াছিলেন। তদবধি ইহা জ্ঞান-ক্ষেত্রের পরিবর্ত্তে জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তির ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। অদ্বৈত-সিদ্ধিকার মধুসূদন সরস্বতীও জীব গোস্বামীর বিচার ও যুক্তি-প্রাবল্যে অদ্বৈত-চিন্তাস্রোত পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাঁহার অন্তিমকালে 'ভক্তি-রসায়ন' গ্রন্থ রচনা করেন। আমরা বারাণসী ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেই বারাণসীর উক্ত মাহাত্ম্য-সকল আলোচনা ও স্মরণের বিষয় হইয়াছিল।

ইতোমধ্যে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের অর্চ্চনকারী শ্রীমান্ ধীরকৃষ্ণ ঘণ্টাধ্বনি করিল ; ঠাকুরের ভোগারতি আরম্ভ হইল ; সঙ্গে সঙ্গে খোল-করতাল বাজিয়া উঠিল ; নারায়ণ মহারাজ ভোগারতি কীর্ত্তন ধরিলেন—"ভজ ভকত-বৎসল শ্রীগৌর-হরি" (ঠাকুর ভক্তি বিনোদ)। দেখিতে দেখিতে ষ্টেশনের বহু যাত্রী, কুলি, রেল-কর্ম্মচারী, পুলিস প্রভৃতি বহু-লোক আমাদের গাড়ীখানি ঘিরিয়া ফেলিল। শ্রীমন্-মহাপ্রভুর অপূর্ব্ব চিত্তাকর্ষিণী মূর্ত্তি দর্শন করিয়া সকলে করযোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া শ্রীআরতি-কীর্ত্তনাদি দর্শন ও শ্রবণ করিতে লাগিলেন। আমাদের বদ্রীনারায়ণ যাত্রি-গণ উল্লাস-ভরে অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইয়া এই ভোগারতি-কীর্ত্তনে যোগদান করেন।

এমন সময় বারাকপুরের শ্রীযুত * * পাল মহাশয় পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থানুসারে তাঁহার বাক্স ও বিছানাপত্রসহ আমাদের গাড়ীতে উপস্থিত হইলেন ; ইনিও আমাদের সহিত শ্রীবদ্রীনারায়ণ দর্শনার্থী হইয়া আমাদের সহযাত্রী হইলেন ; তাঁহাকে আমাদের গাড়ীতে তুলিয়া দিবার জন্য আরও কয়েকজন ভক্ত ষ্টেশনে আসিয়া ট্রেনের মধ্যেই সেবা-পূজা, ভোগরাগ, আরতি-কীর্ত্তন প্রভৃতি অভিনব ব্যাপার দেখিয়া স্তম্ভিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলেন। আমরা তাঁহাদের নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহিমা ও বারাণসী-মহিমা কীর্ত্তন করিলাম এবং তাঁহারা প্রকৃত সৌভাগ্যবান্ ও সৌভাগ্যবতী বলিয়া তাঁহাদের শুভাগমনের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলাম। তখনই গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল ; আমাদের সেবকগণ বিশেষ তৎপর হইয়া পাল-বাবুর আত্মীয়বর্গকে মহাপ্রভুর প্রসাদ পুরি, আলুর তরকারী ও কিছু মিষ্টি দিলেন। মঠের ব্রহ্মচারী সেবকগণ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আরতি কীর্ত্তনান্তে বিভিন্ন বাল্‌তি বোঝাই করিয়া বিভিন্ন প্রসাদ যাত্রিগণকে প্রচুর পরিমাণে বিতরণ করিলেন। গাড়ী নির্দ্দিষ্ট সময় হইতে একটু বিলম্ব করিয়াই ছাড়িল। কে জানে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই প্রকার আকস্মিক অভাবনীয় সেবা-বিলাস বিকাশের ফলেই স্তম্ভীভূত হওয়ায় গাড়ী ছাড়িতে বিলম্ব হইয়াছিল কিনা। ষ্টেশনের বিমুগ্ধ যাত্রিগণ করযোড়ে আমাদিগকে অভিবাদন করিয়া বিদায় দিলেন।

আমরা ক্রমশঃ অনেকগুলি ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া বেলা অনুমান ৩॥০ টার সময় **অযোধ্যা** ষ্টেশনে পৌঁছিয়াছি। গাড়ী এখানে অনুমান ৩।৪ মিনিট অপেক্ষা করে, যদিও রেল-কোম্পানির সময়-তালিকায় এই ক্ষুদ্র সময়ের অবস্থিতির কোন উল্লেখ নাই। আমরা বিগত ১৩৫৬ সালে আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসে উর্জ্জব্রত উপলক্ষে ন্যূনাধিক বিংশতি দিবস এখানে অবস্থান করিয়া উর্জ্জব্রত পালন করিয়াছি। আমাদের যাত্রিগণের মধ্যে কেহ কেহ ইহা স্মরণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির কয়েকজন সেবক সেই বৎসর অযোধ্যা-ধামে আসিতে না পারায় আন্তরিক ক্ষোভ প্রকাশ করিতে থাকেন। আমি তখন তাহাদের অন্তরের ভাব বুঝিতে পারিয়া তাহাদিগকে গাড়ী হইতে নামিয়া শ্রীঅযোধ্যা-ধামের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিতে ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলাম।

তৎক্ষণাৎ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ, শ্রীমান্ গদাধর-দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমান্ সত্যধ্যান ব্রহ্মচারী, শ্রীমান্ মধ্ব-বিজয় ব্রহ্মচারী প্রভৃতি কয়েকজন সেবক অত্যন্ত তাড়াতাড়ি করিয়া প্ল্যাট্‌ফর্ম হইতে নীচে নামিয়া ষ্টেশন অতিক্রম করত শ্রীশ্রীঅযোধ্যা-ধামের প্রতি পঞ্চাঙ্গে দণ্ডবৎ-প্রণতি জ্ঞাপন-পূর্ব্বক ধামের ধূলি মস্তকে লইয়া অত্যন্ত দ্রুত-গতিতে গাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া স্ব-স্ব স্থান অধিকার করে। ইতিমধ্যে শ্রীমান্ সুদাম-সখা ব্রহ্মচারী অযোধ্যার বিখ্যাত ছোট ছোট পেয়ারা প্ল্যাট্‌ফর্ম হইতে খরিদ করিয়া সমস্ত যাত্রীদের বিলি করিতে লাগিল। সুদামের সকলকে ভাল করিয়া খাওয়ানই স্বভাব। সে আগাগোড়া সমস্ত রাস্তাই যাত্রীদের খাওয়া-দাওয়ার ভার লইয়া যত্ন করিয়াছে। তাহার মধুর ব্যবহারে সকলেই খুব মুগ্ধ।

অযোধ্যা-ষ্টেশনে বহু বানরকে বিচরণ করিতে দেখা যায়। এত বানর আর অন্য কোন ষ্টেশনে দেখা যায় না। আমাদের মহিলা-যাত্রিগণের মধ্যে কেহ কেহ ছোট ছোট পেয়ারা ক্রয় করিয়া বানরগুলিকে খাওয়াইতেছিলেন। উহারা মানুষকে তত ভয় করে না; তাহাদের হাত হইতেই কাড়িয়া কাড়িয়া পেয়ারা খাইতে লাগিল। এই বানর-জাতি রাম-চন্দ্রের সেবক-স্বরূপে অসুর-ধ্বংসের সহায়তা করিয়াছিল। তজ্জন্যই রামচন্দ্রের লীলাক্ষেত্রে অযোধ্যা-ধামে যাত্রীদের নিকট হইতে কিছু আদায় লওয়া তাহাদের যেন একটা দাবী। নর ও পশুর মধ্যবর্ত্তী জীব বলিয়াই তাহাদের স্বভাবে পশু-বৃত্তি ও মানব-প্রবৃত্তি কিয়ৎ-পরিমাণে প্রতিফলিত দেখা যায়। আমরা ভগবত্তার বিকাশ-ক্ষেত্রে শ্রীরামচন্দ্রের আপামর সকলের প্রতিই করুণা-কটাক্ষপাতের মাধুর্য্য লক্ষ্য করিয়া থাকি। শ্রীরামচন্দ্র পশু-পক্ষী, নর-বানর, দেব-দানব সকলকেই কৃপা করিয়া তাঁহার নিজ সেবায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সর্ব্বজীবে তাঁহার করুণ-করুণাই ভগবত্তার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছে। আমরা তজ্জন্য অবতার-সমূহের মধ্যে বলরাম ও রামচন্দ্রকে শ্রেষ্ঠ অবতার বলিয়া গণ্য করি। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্যদেব অবতার নহেন—অবতারী। তাঁহারা উভয়েই একই তত্ত্ব, সুতরাং যাবতীয় অবতারসকলই কৃষ্ণ-চৈতন্যের অবতার বা কলা। শ্রীকূর্ম্ম-পুরাণের বিচার-অনুসারে রামচন্দ্র পরতত্ত্ব-কৃষ্ণের এক তৃতীয়াংশ; ইহা নাম-মহিমা-বর্ণনে প্রকাশিত হইয়াছে। ভগবানের কারুণ্যামৃত লীলাম্বুধি-মূর্ত্তি শ্রীরামচন্দ্রের লীলা-ক্ষেত্র এই অযোধ্যা-ধাম। ভক্তির পরতমতা ভারতীয় ভৌগলিক ক্ষেত্রের অবস্থিতির প্রতি লক্ষ্য করিলেও ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। আমরা ইহলোকের সংসারাচ্ছন্ন অন্যাভিলাষাদি বাসনাময় অন্ধকার রাত্রি অতিক্রম করিয়া প্রত্যুষে কর্ম্মের পারলৌকিক অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র গয়া পরিত্যাগ করিয়াছি—ইহা পূর্ব্বেই নিবেদন করিয়াছি। তৎপরে জ্ঞানের অত্যন্ত জ্বালাময় প্রখর আতপ-তাপিত কাশীক্ষেত্র দ্বিপ্রহরে অতিক্রম করিয়া, তাপ-বিদূরিত শান্ত শীতলোন্মুখ অপরাহ্ন বেলায় অযোধ্যা-ধামের কথা স্মরণ করিতে করিতে ক্রমশঃ অগ্রসর হইলাম। ক্রমশঃ আরও কতকগুলি ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া আমরা লক্ষ্মণাবতী-ষ্টেশনে পৌঁছিয়াছি।

তখন প্রায় সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা (৬৷৷০)। গাড়ী যেন দ্রুত-গতিতে নির্দ্দিষ্ট সময়ের একটু পূর্ব্বেই এখানে পৌঁছিল। এই মহানগরী 'লক্ষ্মণাবতী'র বর্ত্তমান নাম লক্ষ্ণৌ। এই ষ্টেশনে গাড়ী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সময় অপেক্ষা করে, তাহার উপর গাড়ী নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই লক্ষ্ণৌ জংসন ষ্টেশনে পৌঁছিলে আমাদের যাত্রিগণ প্রায় অধিকাংশই গাড়ী হইতে নামিয়া ষ্টেশনের বিরাট্ প্রশস্ত প্লাটফর্মে পায়চারী করিতে লাগিলেন। সুদীর্ঘ ২২৷২৩ ঘন্টা গাড়ীতে অবস্থান করিয়া যাত্রিগণ যে অস্বস্তি অনুভব করিতেছিলেন, গাড়ীর বহির্দ্দেশে আসিয়া মুক্ত আকাশ বাতাস পাইয়া সকলেই আনন্দিত হইলেন। পূর্ব্বভারতের রেল কোম্পানির (E. I. R) এই ষ্টেশনটী অতীব সুন্দর। দূর হইতে ইহার সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া আগ্রার-তাজমহলের সুদৃশ্য গম্বুজগুলির কথা স্মরণ করিতেছিলেন।

ইতোমধ্যে পূজারী ঘন্টা বাজাইয়া দিল। সন্ধ্যারতির আয়োজন হইয়াছে, সকলেই আরতি দর্শনের জন্য একত্রিত হইয়া আমাদের কক্ষের সম্মুখে ভীড় করিয়া দাঁড়াইল। দেখিতে দেখিতে ষ্টেশনের সমস্ত লোক আমাদের গাড়ীখানি ঘিরিয়া ফেলিল। লক্ষ্ণৌ যুক্ত-প্রদেশের (বর্ত্তমান উত্তর-প্রদেশ) প্রধান নগর ; সুতরাং বহু উচ্চশিক্ষিত গণ্য-মান্য বিশিষ্ট লোকের স্থান। তজ্জন্য রেল-ষ্টেশনেও ঐ শ্রেণীর লোকের ভীড়ও প্রচুর পরিমাণে হইয়াছিল। তাঁহারা সকলেই ঘন্টা-ধ্বনি শ্রবণ করিয়াই সমবেত হন। আরতি আরম্ভ হইল, সঙ্গে সঙ্গে নারায়ণ মহারাজ কীর্ত্তন ধরিলেন—"জয় জয় গোরাচাঁদের আরতিকো শোভা" ইত্যাদি (ঠাকুর ভক্তিবিনোদ)। সত্যবিগ্রহ ও পূর্ণানন্দ মৃদঙ্গ বাজাইতেছিলেন। এই সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপূর্ব্ব দর্শন সকলকে আকর্ষণ করিয়াছিল। কারণ পূজারী মহাপ্রভুর রজত-অলঙ্কার মুক্ত করিয়া স্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিত করেন। মস্তকে শিখিপুচ্ছ-সমন্বিত মুকুট, হস্তে অনন্ত, বালা, গলদেশে বিবিধ রত্নমণ্ডিত সুবর্ণ হার, পাদদেশে নূপুর, অঙ্গেতে অভিনব বস্ত্রাভরণ প্রভৃতি দর্শক-মণ্ডলীর চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অঙ্গকান্তি সুবর্ণ জ্যোতির সহিত মিলিত হইয়া অতীব চমৎকার উজ্জ্বল ব্রহ্মজ্যোতি প্রকাশিত হইতেছিল। সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি দিব্য-দৃষ্টিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর এইরূপ বৈভব দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর অর্চ্চা-অবতারের করুণা-বৈশিষ্ট্য। "যমেবৈষ বৃণুতে তেনঃ লভ্যঃ।" গাড়ীর অধিক সময় স্থিতি লক্ষ্য করিয়া ধীরকৃষ্ণ বেশ ভাব-ভরে দীর্ঘ সময় ধরিয়া আরতি করিল।

সেই সময়ে ষ্টেশনে সমাগত সকলেই তাহাদের নিজ নিজকে ধন্য জ্ঞান করিয়া পরম সৌভাগ্যবান্ মনে করিল। সকলেই করযোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া শ্রীবিগ্রহের শোভা অনিমেষ-নেত্রে দেখিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে কেহ কেহ কিছু কিছু প্রণামিও আমাদের কক্ষাভ্যন্তরে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। আমাদের কক্ষের বহির্দ্দেশে হিন্দিতে "শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি, নবদ্বীপ (পশ্চিম বঙ্গাল)" ৬ হাত দীর্ঘ এবং ২ হাত প্রস্থ লাল "সালু"

কাপড়ে সাদা অক্ষরে লিখা, বড় নিশানটী ভাল করিয়া বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল। উহার দিকে সকলেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আমাদের পরিচয় জানিতে পারিয়াছিলেন; কেহবা আরতি সমাপ্ত হইবার পর সাক্ষাদ্‌ভাবে আমাদের নিকট সমিতির সম্বন্ধে অনেক কথা অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। আরতি সমাপ্তির পর "সংসার-দাবানল-লীঢ়-লোক" ইত্যাদি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের রচিত সংস্কৃত গুর্ব্বষ্টক কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। তৎপরেই গাড়ীর ঘণ্টাধ্বনি হইল এবং গার্ড গাড়ী ছাড়িবার ইঙ্গিত করিলে আমাদের যাত্রীসকল অত্যন্ত তৎপর হইয়া স্ব-স্ব স্থান অধিকার করিল। গাড়ী ছাড়িয়া দিল; আমরা সন্ধ্যা-কীর্ত্তনাদি সমাপন করিয়া লক্ষ্মণাবতীর ইতিবৃত্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

এই লক্ষ্মণাবতী নগর রামানুজ শ্রীশ্রীলক্ষ্মণের প্রতিষ্ঠিত। ত্রেতাযুগ হইতে এই মহানগরী লক্ষ্মণাবতী নামে সুপ্রসিদ্ধ। ভারতের হিন্দু-রাজত্বের সময় হইতে মোগল ও বৃটিশ রাজত্বের অন্ত পর্য্যন্ত ভারতীয় পর্য্যটক-মণ্ডলীর নিকট ইহা মনোরম সৌন্দর্য্যের জন্য বিখ্যাত।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য-মুগ্ধ জীবের পক্ষে অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্য-তত্ত্বের বিকাশ চিরদিনই অবগুণ্ঠিত। প্রাকৃত সৌন্দর্য্য অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্যের ছায়া। ছায়াতে মূল-কায়ার পূর্ণ ছবি নির্ব্বিশেষ-ভাবে প্রতিফলিত হয়। প্রাকৃত কবিসকল তাহাতেই মুগ্ধ হইয়া প্রকৃতির অন্তর্গত জগতের ধ্বংস ও পরিবর্ত্তনশীলতার মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া ক্লেশ অনুভব করেন। তজ্জন্য আমরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যকে উপেক্ষা করিয়া লক্ষ্মণাবতীতে শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি লক্ষ্মণের সেবা-সৌন্দর্য্যের কথা আলোচনা করিতেছিলাম। ভগবদুপাসনার ক্রম-বিকাশ আমাদের বিশেষ লক্ষ্যের বিষয় হইয়াছিল। সেব্য অপেক্ষা সেবক-তত্ত্বের প্রাধান্যই বৈষ্ণব-তত্ত্বে পরিস্ফুট হইয়াছে। ভগবদ্ভক্তির রসময় তত্ত্বে যতই অগ্রসর হওয়া যায়, ততই ইহার ক্রম-বিকাশ হৃদয়কে আনন্দে আপ্লুত করে। তাই আমরা সেব্য-তত্ত্বের আবির্ভাব-ভূমি অযোধ্যা অতিক্রম করিয়া সেবা-বিলাসের ক্ষেত্র লক্ষ্মণাবতীতে পৌঁছিয়া আনন্দ অনুভব করিতেছি। আমরা আরও অগ্রসর হইলে সেবার আরও উন্নততম স্থান-সমূহ আমাদের লক্ষ্যের বিষয় হইবে।

রামানুজ লক্ষ্মণ ও কৃষ্ণাগ্রজ বলদেব তত্ত্বতঃ এক হইলেও সেবা-বিলাসের মধ্যে তারতম্য আছে। আমরা ইহার উৎকর্ষ-মূলক পার্থক্য মথুরা-বৃন্দাবনে লক্ষ্য করিয়াছি। সেবানন্দে উৎকর্ষতা লইয়াই সেব্য-সেবক-তত্ত্বের তারতম্য বিচারিত হয়। এস্থলে রাম-চন্দ্রের প্রতি লক্ষ্মণের সেবা অপেক্ষা কৃষ্ণের প্রতি বলদেবের সেবার উৎকর্ষ দৃষ্ট হয়। বলা-বাহুল্য, এ সম্বন্ধে শ্রবণেচ্ছু হইয়া অনেকে প্রশ্ন করাতে আমি আলোচনা করিতে বাধ্য হই। ভগবানের প্রীতি-বিধান লক্ষ্মণের দ্বারা অধিক হইয়াছিল বা বলদেবের দ্বারা

অধিক হইয়াছিল, ইহাই বিচার্য্য। রাম-লীলায় লক্ষ্মন রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ, কৃষ্ণ-লীলায় বলদেব কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ। জ্যেষ্ঠ ব্যক্তির কনিষ্ঠের প্রতি ব্যবহার আমরা সাধারণতঃ যাহা দেখিতে পাই, তাহাতে বুঝি, কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠের নিকট হইতে সেবা-স্বরূপ কিছু গ্রহণ করিয়া সুখানুভব করে। এ স্থলে কনিষ্ঠ সেবা-সুখের ভোক্তা এবং জ্যেষ্ঠই ভোগ্য। এতদ্ব্যতীত কনিষ্ঠ সেবা-সঙ্কল্পে জ্যেষ্ঠের আদেশের অপেক্ষা রাখিয়া থাকে। কিন্তু জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের অপেক্ষা না করিয়াই তাহার সেবাতৎপরতা প্রকাশ করিয়া থাকে। সুতরাং শ্রীলক্ষ্মণ শ্রীরামচন্দ্রের সেবা করিতে গিয়া তাঁহার আদেশ-নির্দ্দেশের অপেক্ষা রাখিয়া বিশেষ গৌরবের সহিত সেবা করিতেন। শুধু তাহা নহে, ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি স্নেহাধিক্য-বশতঃ লক্ষ্মণের কোন অসুবিধা না হয়, সেজন্য তাঁহাকে বিশেষ তৎপর থাকিতে হইত। বিশেষতঃ স্নেহ নিম্নগামী, সুতরাং লক্ষ্মন রামচন্দ্রের স্নেহে পুষ্ট হইয়া আনন্দ অনুভব করিতেন। রামের বাৎসল্য লক্ষ্মণের প্রতি প্রচুর, কিন্তু ভ্রাতৃ-বন্ধনের সখ্য অপেক্ষা বাৎসল্যের শ্রেষ্ঠত্ব সর্ব্বত্র বিদিত।

শ্রীশ্রীবলদেব-তত্ত্বে কৃষ্ণ-লীলায় আমরা দেখিতে পাই, বলদেব কৃষ্ণ অপেক্ষা জ্যেষ্ঠ হইয়া বাৎসল্য-মিশ্রিত সখ্যের দ্বারা কৃষ্ণের প্রীতিবিধান করিয়াছেন। কৃষ্ণের প্রতি লাল্য-ভাব তাঁহাকে সর্ব্বদা কৃষ্ণ-চিন্তায় নিমগ্ন রাখিত। কৃষ্ণের আদেশের অপেক্ষা না করিয়াই তিনি সর্ব্বদা কৃষ্ণ-প্রীতি-তৎপর ছিলেন। কৃষ্ণকে সর্ব্বদা কিছু দেওয়াই তাঁহার স্বভাবে পরিস্ফুট। তাঁহার নিকট হইতে লওয়া, তাঁহার সেবা-বৃত্তিতে প্রকাশিত হয় নাই। ইহা হইতেই লক্ষ্মন অপেক্ষা বলদেবের সেবা-বৈশিষ্ট্যের প্রাধান্য লক্ষিত হইয়া থাকে।

রসগত নানা কারণে রাম-লীলা অপেক্ষা কৃষ্ণ-লীলার অধিক মাধুর্য্য অনুভব করা যায়। রামচন্দ্রের পিতা দশরথের সহিত বাসুদেব-কৃষ্ণের পিতা বসুদেবের তুলনা করিলেও আমরা ইহার সত্যতা অনুভব করিতে পারিবে। দশরথ তাঁহার পত্নীর নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া বরদান উপলক্ষে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রকে বনবাস দিতে বাধ্য হইয়া-ছিলেন। এস্থলে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধতার সত্যতা সংরক্ষণ করিতে গিয়া দশরথ রামচন্দ্রের প্রতি যেরূপ ব্যবহার প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে ভগবান্ রামচন্দ্রকে বহু ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছিল। অপর পক্ষে, বসুদেব কংসের নিকট সমস্ত পুত্র সমর্পণ করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া, কৃষ্ণাবির্ভাবের সময়ে তিনি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া, ভগবান্‌কে কংসের হস্তে লাঞ্ছিত হইতে দেন নাই। বসুদেব বিচার করিলেন, আমি সত্য ভঙ্গ করিয়া যদি ভগবানের বিন্দুমাত্রও প্রীতিবিধান করিতে পারি, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা মঙ্গলজনক। এক-জনের সেবা-বৃত্তিতে ভগবানকে ক্লেশে পতিত করিয়া নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষার প্রাধান্য দেখা যায়। অপর ক্ষেত্রে নিজের প্রতিজ্ঞা নষ্ট করিয়াও ভগবানের প্রীতি-বিধানের চেষ্টা লক্ষিত হয়। এই প্রকার নানা কারণে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ রামলীলা অপেক্ষা কৃষ্ণলীলার অধিক মাধুর্য্য উপলব্ধি করিয়া তাঁহাতেই আকৃষ্ট হইয়াছেন।

এইরূপ নানা কথা আলোচনা করিতে করিতে অধিক রাত্র হইয়া পড়ে। তৎপর শ্রীমন্মহাপ্রভুর নৈশ-ভোগ প্রদানের পর ভগবৎ-প্রসাদ সমস্ত যাত্রিগণকে প্রচুর-পরিমাণে বিতরণ করা হইল। তাঁহারা পরমানন্দে প্রসাদ সেবা করিয়া নিদ্রামগ্ন হইলেন। তখন রাত্র অনুমান দশটা। (অসম্পূর্ণ)

—শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা ৪র্থ বর্ষ, ৯-১০-১২শ সংখ্যা।

কাল বিচারাত্মক-প্রবন্ধ —

গৌড়ীয়ের অষ্টাদশ বর্ষ

আমরা অষ্টাদশ-বর্ষে উপনীত হইয়াছি। 'বর্ষ' বলিতে কালের একটী অঙ্গকে বুঝায় ; কিন্তু 'কাল' বলিতে মায়িক কালকে লক্ষ্য করিলে অনেক প্রকার কালের কথা আমরা জানিতে পারি। একই কালকে (সময়) বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার নানা প্রকার সংজ্ঞা নিরূপিত হইয়াছে। তন্মধ্যে বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ—এই তিনটী কালই প্রধান। এই তিনটী কালের মধ্যে বর্ত্তমান কাল সর্ব্বপ্রধান। বর্ত্তমান কালকে বাদ দিলে কোন কালেরই অবস্থিতি স্বীকৃত হয় না। কোন দার্শনিক বর্ত্তমানকে মিথ্যা-জ্ঞান করিয়া উহাকে বিশ্ব-মিথ্যায় পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা এই প্রকার মিথ্যাজ্ঞানের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। মিথ্যাজ্ঞানই অজ্ঞান, কুজ্ঞান বা ভ্রম-জ্ঞান।

বর্ত্তমান ভারতীয় ন্যায়-বিচারক্ষেত্রে কোন মানব অষ্টাদশ-বর্ষে উপনীত না হইলে বা তাহাতে পরিপূর্ণতা লাভ না করিলে তাহার আত্মবোধ সিদ্ধ নহে বলিয়া আইন-পরিষদ স্থির করিয়াছেন। সুতরাং কেহ যদি মনে করেন, গৌড়ীয়ের বর্ত্তমান বর্ষ হইতে আত্ম-বোধের পূর্ণবিকাশ লক্ষিত হইবে, কারণ মানুষ অষ্টাদশ বর্ষে সাবালক হইবার পূর্ব্বে নাবালক-কালে তাহার আত্মবোধ না থাকায় পূর্ব্ব-অনুষ্ঠিত ক্রিয়াসকল ন্যায়-বিজ্ঞান-রাজ্যে বা সাধারণের নিকট অস্বীকৃত অর্থাৎ নাবালকের কোন ক্রিয়া আইনসঙ্গত শুদ্ধ নহে, অভিভাবকের দ্বারাই অর্থাৎ হিতকামী ব্যক্তিবিশেষের দ্বারাই তাহার শুদ্ধিতা লাভ করে। এইরূপ যুক্তি উত্থাপন করিলে শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা সপ্তদশ বর্ষ-পর্য্যন্ত যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অস্বীকৃত হইবে কি-প্রকারে ? তজ্জন্যই 'কাল'-সম্বন্ধে বিচার বর্ত্তমান প্রবন্ধের জীবন-স্বরূপ।

—উত্তরে জানাইতেছি যে, পরমহংসকুল-চূড়ামণি জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর স্বয়ং শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র "শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা"র

নিত্য স্থায়ী অভিভাবকসূত্রে শ্রীপত্রিকা পরিচালন করিয়া আসিতেছেন। সুতরাং পূর্ব্বোল্লিখিত প্রশ্নের অবকাশ কোথায়? আমরা প্রতি বর্ষের প্রতি সংখ্যায়ই উক্ত মহাপুরুষকুল-চূড়ামণি শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধ মঙ্গলাচরণমুখে প্রথম হইতে প্রকাশ করিয়া আসিতেছি। সুতরাং বর্ত্তমান যুগের কালগত বৈষম্যের মধ্য দিয়া বিচার করিলেও কাল-বৈষম্য-দোষ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকায় প্রবেশ করে না বা করিতে পারে না।

বিশেষতঃ বক্তব্য এই যে, মায়িক কালের মধ্যে প্রধানতঃ তিনটী কালের অবস্থিতি পরিলক্ষিত হইলেও বৈয়াকরণিকগণ দশবিধ কালের বিচার করিয়া থাকেন। কিন্তু বৈয়াকরণিক কাল আমাদের বৈকুণ্ঠ-কালের একটী ক্ষুদ্রতম অংশকেও স্পর্শ করিতে সক্ষম নহে। বৈকুণ্ঠ-কালগত সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নতম পল, বিপল, অনুপলাদি ক্ষুদ্রতম বা সূক্ষ্মতম অবস্থিতির কথা গ্রহণ করিলেও, উহা পার্থিব যুগ-যুগান্তর-মন্বন্তরাদির অনন্তগুণে গুণিত শ্রেষ্ঠ কালকে বুঝাইয়া থাকে। সুতরাং বৈকুণ্ঠ-কালের তুলনায় সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলির চতুর্যুগীয় ব্যবধানকে মন্বন্তরে পরিণত করিয়াও শাস্ত্রকারগণ কালের অন্ত না পাইয়া অনন্ত-কালের কথা জানাইয়াছেন। আমরা তাঁহাদের নির্দ্দেশ-অনুসারে বর্ত্তমান কলিযুগকে অষ্টাবিংশতি-চতুর্য্গীয় শেষ কালকে লক্ষ্য করিয়াই অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের চিন্তা করিতেছি। ইহা নিত্যকালের কত নিম্নতম অংশের অংশ, তাহা আজ পর্য্যন্ত সসীম ভাষায় নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। তথাপি কাল-বৈষম্যের চিন্তা মনুষ্য বা প্রাণি-মাত্রেরই মস্তিষ্কে আলোড়িত বিলোড়িত হইতেছে।

'বর্ত্তমান কালে'র অস্তিত্ব-অঙ্গীকারকারী দার্শনিকগণের অবিচার ও অজ্ঞতার পরিণতি-স্বরূপ বিবিধ নাস্তিকতার লেলিহান্ জিহ্বা বিশ্বের সর্ব্বত্র পরিদৃষ্ট হইতেছে। তাহারা ঈশ্বর-চিন্তাকে কালের করাল গ্রাসে নিপতিত করিয়া শূন্যমার্গে নিক্ষিপ্ত করিতেছে। আমরা শ্রীল গুরুপাদপদ্মের কৃপাদৃষ্টিতে কালাতীত তত্ত্বের অনুসন্ধান করিবার শিক্ষা লাভ করিয়াছি এবং তাহাই সমগ্র বিশ্ববাসীকে দান করিবার জন্য "শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা"র লেখনী-মাধ্যমে সরব ও নীরব ভাষায় **সংকীর্ত্তন-বিজ্ঞান** প্রকাশ করিতেছি।

'নিত্যকাল' বলিতে নিত্য বর্ত্তমানকে লক্ষ্য করা হয়। যাহারা বর্ত্তমান স্বীকার করেন না, তাহাদের পক্ষে নিত্যকাল বা নিত্য-বর্ত্তমানকাল রুদ্র ও বিভীষিকা স্বরূপ। এস্থলে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ শ্রীশ্রীভগবানের নিত্যলীলার কথা জগজ্জীবকে শিক্ষা দিতে গিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্যলীলার কথা যাহা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, তৎসম্বন্ধে পার্থিব কালের লেশমাত্রেরও স্পর্শ নাই। গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণ-কর্ত্তৃক ভগবৎ-তত্ত্বের অষ্টকালীয় লীলাস্মরণাদি-কাল পার্থিব কালের সহিত উপমিত, এরূপ লক্ষিত হইলেও তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে উপমান-স্বরূপ নহে। নিত্যকাল' বলিলে উহা কখনও পার্থিব-'কাল'কে বুঝায় না। পরিভাষার মাধ্যমে 'কাল'-শব্দ ব্যবহৃত হইলেও ইহা প্রকৃত কালাতীত তত্ত্ব এবং নিত্য-বর্ত্তমান তত্ত্ব; সুতরাং নিত্যকাল-সংজ্ঞক কালের ছায়া-স্বরূপ বর্ত্তমানযুগীয় কাল।

ছায়া বস্তুতঃ কায়া নহে। কায়া সাক্ষাৎ বস্তু, উহার ছায়া বাস্তব নহে। তথাপি মিথ্যা—সত্যাশ্রিত মিথ্যাবস্তু। উদাহরণ-স্বরূপে কোন একটী পুরুষের ছায়াকে বিভিন্ন অস্ত্রের দ্বারা আঘাত করিলেও কায়ার তাহাতে ক্ষতি-বৃদ্ধি কিছুই হয় না, নিরঙ্কুশ বিশুদ্ধ-ভাবে তাঁহার অবস্থিতি উপলব্ধ হয়। এমন কি, সেই পুরুষটী সূর্য্য-রশ্মিপাতের মধ্যে স্থানান্তরে গতানুগতিক ভাব প্রদর্শন করিলেও তাহার ছায়া সেই পুরুষের সঙ্গে সঙ্গেই যাতায়াত করিয়া থাকে। ছায়া কায়া হইতে কখনও বিচ্ছিন্ন হয় না বা হইতে পারে না। ঠিক সেই প্রকার মায়িক কাল অপ্রাকৃত নিত্য-কালের সহিত সংপৃক্ত থাকিয়া অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ জ্ঞাপন করিয়া থাকে মাত্র। অতএব মায়িক কাল অবাস্তব, উহা বাস্তব নিত্য-কালের ছায়ামাত্র।

ঈশ্বরেই নিত্যলীলা নিত্যকালই বর্ত্তমান রহিয়াছে; ইহার কখনও শেষ নাই। শুধু শেষ নাই বলিলেই চলিবে না, ইহার কোন আদিও নাই। আদি ও অন্ত—মায়িক কালেই অবস্থিত, মায়াতীত-কালে আদি ও অন্ত নাই; নিত্যকালই ইহার অবস্থিতি। ভগবানের জন্ম-লীলা, বাল্য-লীলা, কৈশোর-লীলা, যৌবন-লীলা, প্রভৃতি সকলই নিত্য-বর্ত্তমান। এমন কি, ভগবানের বাল্যলীলায়ও যৌবন-লীলার প্রকাশ স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত ও অনুভূত হয় এবং যৌবনেও বাল্যলীলা পরিস্ফুট থাকে। নিত্যলীলায় মায়িক কালগত বৈষম্য এইরূপভাবে ধ্বংসীভূত হইয়াছে। ভগবানের নিত্য-লীলাগত বৈষম্যই মায়িক-লীলায় বিকৃতভাবে যাহা প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহাই বৈয়াকরণিককুল-চূড়ামণি শ্রীশ্রীল জীব গোস্বামিপাদ "শ্রীহরিনামামৃত" ব্যাকরণের 'আখ্যাত-প্রকরণে' নিরূপণ করিয়াছেন। নিম্নে তাহা পাঠকবর্গের অবগতির জন্য উদ্ধৃত হইল—

প্রবর্ত্তন্তে ক্রিয়াঃ সর্ব্বা যতোঽর্ব্বাচীন-বস্তুষু।
হরেস্তস্যৈব লীলাস্তা নিরূপ্যন্তে যথামতি॥

যে পরমেশ্বর হইতে "অর্ব্বাচীন" অর্থাৎ আধুনিক বস্তুসমূহে (ছায়াস্বরূপে) 'ক্রিয়া'-সকল অবস্থান করিতেছে, সেই শ্রীহরির লীলাস্বরূপ ক্রিয়াসকল যথাজ্ঞান সাধিত হইতেছে।

শ্রীল জীবপাদের উক্ত শ্লোকের অনুবাদ করিতে গিয়া বন্ধনী-মধ্যে ছায়াস্বরূপে বাক্যটী সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। মূল শ্লোকে ঐ শব্দটী না থাকিলেও উহার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই—

বিশ্ব বৈকুণ্ঠের বিকৃত প্রতিফলন, ইহা দার্শনিক-সমাজে সর্ব্বত্রই সুবিদিত। 'বিকৃত প্রতিফলন' বলিলে বিপরীত ছায়াকেই লক্ষ্য করা হয়। সুতরাং ভগবানের লীলাসমূহই অর্ব্বাচীন বা আধুনিক জগতে বিকৃত 'ক্রিয়া'-রূপে পরিদৃষ্ট হইতেছে এবং ক্রিয়ামাত্রেই বৈয়াকরণিকের মতে দশবিধ কালের যে কোন একটি কাল অবস্থিতি করে। এই কাল ধর্ম্মের অবস্থিতি বৈকুণ্ঠ-জগতে ভগবল্লীলার প্রতিচ্ছবি। ভগবল্লীলায় দশবিধ

কালীয় অথবা তদতিরিক্ত বিভিন্নকালীয় ক্রিয়া বা লীলা অবস্থিত না থাকিলে বর্ত্তমান অর্ব্বাচীন বিশ্বে তাহার অবস্থিতি সম্ভবপর নহে। কেবল বৈকুণ্ঠ-জগতের বিকৃতভাবই ইহ জগতে প্রতিফলিত। বিশ্বের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে এই বিকৃতভাব বিলুপ্ত হইয়া ঈশ্বরে সুপ্ত বা অচেতন অবস্থায় (Latent formএ) অবস্থান করিলেও ছায়ার কোন প্রতিক্রিয়া ঈশ্বরে পরিলক্ষিত হয় না। মানুষের ছায়ায় আঘাত করিলেও যে-প্রকার কায়া-স্বরূপ মানুষে কোনরূপ প্রতিক্রিয়া নাই, সেই প্রকার ছায়া-স্বরূপ বিশ্বের কোন প্রতিক্রিয়া ঈশ্বরে নাই। 'বর্ত্তমান বিশ্বের ক্রিয়া' বলিতে ভগবানের বিকৃত-লীলাই বুঝায়। সুতরাং এই বিশ্ব হইতে মুক্তি লাভ করিলে জীব নিত্য-লীলায় প্রবেশাধিকার লাভ করে।

সুতরাং গৌড়ীয়ের নাবালকত্ব ও সাবালকত্ব উভয়ই সমান। শিশু গোপাল-কৃষ্ণ বৃদ্ধ-বৈষ্ণবগণেরও উপাস্য। পরতত্ত্বে যে বালত্ব অর্থাৎ নাবালকত্ব, তাহাতে পার্থিব কালতত্ত্বের বিন্দুমাত্রও স্পর্শ নাই। সুতরাং শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর বাণী-বিকাশ-বিগ্রহ "শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা"র অষ্টাদশ বর্ষ বা প্রথম বর্ষ হইতে সপ্তদশ বর্ষ তত্ত্বতঃ একই এবং একই সিদ্ধান্ত ধারা-বাহিকরূপে গ্রথিত হইয়া শৃঙ্খলিতভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে।

—শ্রীগৌঃ পত্রিকা ১৮শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা।
৩০শে ফাল্গুন, ১৩৭২ বঙ্গাব্দ, ১৪।৩।১৯৬৬।

দ্বাদশ-বর্ষ

প্রাগৈতিহাসিক যুগে যে-সাহিত্য প্রচলিত ছিল, সে-সাহিত্যের প্রচলন আমাদের দেশে আজও প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হয়। সেই সাহিত্যের কিঞ্চিৎ সংস্কার করা হয় বলিয়া তাহাকে সংস্কৃত-সাহিত্য বলিয়া প্রচার করা হইয়াছে। তাহাই শ্রৌত-সাহিত্যের আনুগত্য লাভ করিয়া নিজ ধারা সম্পাদন করিয়াছে। পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী মাহেশ আদি মহাপুরুষগণ যে ধারা প্রচলন করিয়াছেন, বর্ত্তমান সংস্কৃত-সাহিত্য-জগৎ তাহা অনুসরণ করিতেছেন। এই অনুসরণ-পদ্ধতির মধ্যেও বিভিন্ন মতভেদ পরিলক্ষিত হইতেছে। মতভেদী সাহিত্য বা চিন্তা জগতের উন্নতির মূল কারণ।

ক্রমোন্নতিশীল-চিন্তা-জগতের দিকে লক্ষ্য করিলে যেমন হৃদয়ে একটা আনন্দের উৎস উদ্বেলিত হয়, তেমনই ক্রমাধোগতি-চিন্তা দৌর্ব্বল্যের বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষিপ্র প্রসরণশীল হৃদয়ে ঔদাসীন্যের সূচিভেদ অন্ধতমের আবাহন করিতেছে। এই উভয় প্রগতির মধ্যে পরস্পর বৈশিষ্ট্য থাকিলেও একের অভাবে অন্যের অধিষ্ঠান দার্শনিক-জগতে স্বীকৃত হয় না। কারণ উভয়ই গতি; নিম্নগতির সংজ্ঞা নিরূপণ করিতে হইলে উর্দ্ধগতির স্থিতি

নিতান্ত আবশ্যক। আবার উর্দ্ধগতির সংজ্ঞা নিরূপণ করিতে হইলে নিম্নগতির অধিষ্ঠান অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। আমরা প্রাচীন প্রাগ্-ঐতিহাসিক যুগের ঐতিহ্য হইতে জানিতে পারি, অসুরকুলেও সুরপতির আবির্ভাব হইয়াছে। হিরণ্যকশিপুর গৃহে প্রহ্লাদ মহারাজই তাহার দৃষ্টান্ত। কলিযুগের প্রারম্ভে বা দ্বাপরের অন্তিম-দশায় যে শ্রীমদ্ভাগবত বেদব্যাস-কর্তৃক রচিত হইয়াছিল, সেই গ্রন্থ-সম্রাট্ বা শাস্ত্রকুল-চূড়ামণি উপনিষদ্-উপজীব্য গ্রন্থের সপ্তম স্কন্ধে দেখিতে পাই অনাহ্লাদ-স্বরূপ হিরণ্যকশিপুর আত্মজরূপে প্রহ্লাদ-মহারাজের আবির্ভাব হইয়াছে। সুতরাং বিরুদ্ধ-ধর্ম্মের সমাবেশ অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্বের নিগূঢ় রহস্য। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার অতিমর্ত্ত্য দার্শনিক চিন্তা-প্রসূত কল্যাণকল্পতরুর সুপক্ব ফলের বৃন্ত-স্বরূপ লিখিয়াছেন—

চিজ্জড়ের দ্বৈত যিনি করেন স্থাপন, জড়ীয় কুতর্ক-বলে হায়!
ভ্রমজাল তা'র বুদ্ধি করে আচ্ছাদন, বিজ্ঞান-আলোক নাহি তায় ॥১॥
চিৎতত্ত্বে আদর্শ বলি' জানে যেই জনে, জড়ে অনুকৃতি বলি' মানি।
তাহার বিজ্ঞান শুদ্ধ-রহস্য-সাধনে, সমর্থ বলিয়া আমি জানি ॥২॥

সুতরাং উর্দ্ধাধঃ উভয় প্রগতিই এক বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষিপ্রগতি। গ্রন্থসম্রাট্ শ্রীমদ্-ভাগবত প্রহ্লাদ-মহারাজের উপাখ্যানে অর্থাৎ সপ্তম স্কন্ধে আমাদিগকে যে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন, তাহাই অপার্থিব জগতের অতিমর্ত্ত্য সম্রাট্-সরণী। কতকগুলি ধূর্ত্ত লোক ভাগবতের মর্য্যাদায় হতশ্রী হইয়া ঈর্ষাবশে অকালে মনিষী সজ্জায় সজ্জিত হইতে চাহে। আমরা এই শ্রেণীর ভণ্ড-তপস্বী বা বৈড়ালব্রতী অকাল-মনিষীকে ন্যায়-কোবিদের অন্ধকার-গর্ত্তে চিরতরে প্রোথিত করিয়া যবন সমাধি প্রদান করিতে প্রস্তুত হইয়াছি।

শ্রীল বেদব্যাস শ্রীমদ্ভাগবত-রচনাকালে ষষ্ঠ স্কন্ধে দ্বাদশ-বৈষ্ণবের স্মরন করিয়া তন্মধ্যে প্রহ্লাদ মহারাজের বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা ব্যাসানুগত্যে ভাগবতের উল্লিখিত দ্বাদশ বৈষ্ণবের অর্চ্চনে সদা নিযুক্ত। এই দ্বাদশ বৈষ্ণবের মতানু-সরণই গৌড়ীয়ের পারমার্থিক জীবনের আচার ও প্রচার। দ্বাদশ-বৈষ্ণব, যথা—

স্বয়ম্ভূর্নারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ।
প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলির্বৈয়াসকির্বয়ম্ ॥
(ভাঃ ৬।৩।২০)

উক্ত দ্বাদশ বৈষ্ণবের অন্যতম প্রহ্লাদ-মহারাজ সপ্তম স্কন্ধে যে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নবধা ভক্তির কথা তাঁহার পিতাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, ভগবন্নাম সেই দ্বাদশ বৈষ্ণবগণের দ্বারা নবধা ভক্তির নবগুণান্বিত হইয়া অষ্টোত্তর-শত সংখ্যায় শম্ভু প্রভৃতি বৈষ্ণবগণের দ্বারা কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

গৌর-লীলার শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের উচ্চস্বরে কীর্ত্তিত অষ্টোত্তর-শত সংখ্যায় ও অসংখ্যায় মহামন্ত্র-কীর্ত্তনই সর্ব্ব জীবের একমাত্র জীবাতু। এই হরিদাস ঠাকুরকে কেহ কেহ সেই প্রহ্লাদ-মহারাজের অবতার বলিয়া থাকেন। যাঁহারা এইরূপ বলেন, তাহারা বোধ হয় মায়িক কালের উপর নির্ভর করিয়াই অর্থাৎ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই কাল-পর্য্যায়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই সাধারণ কালক্ষোভ্য মর্ত্ত্য-জীবগণকে শিক্ষা দিয়াছেন বা দিতেছেন। কিন্তু লীলার নিত্যত্ব স্বীকার করিলে তাহাতে কালক্ষোভ্য ধর্ম্ম প্রবেশ করিতে পারে না। নিত্য বলিলে বর্ত্তমান বুঝায়। অতীত ও ভবিষ্যৎ নিত্যত্বের ব্যাঘাত-কারক। সুতরাং নিত্য গৌরলীলা কলির কালক্ষোভ্য ধর্ম্মে আবৃত বা প্রকাশ-যোগ্য নহে। প্রহ্লাদ-মহারাজ যে-প্রকার নিত্যতত্ত্ব, শ্রীল হরিদাস ঠাকুরও তদ্রূপ। সুতরাং হরিদাস ঠাকুর পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছেন, কিম্বা প্রহ্লাদ মহারাজ পরে আবির্ভূত হইয়াছেন, এইরূপ সংশয় বা পূর্ব্বপক্ষের স্থান নাই। দার্শনিক চিন্তারাজ্যে এবং পর-তত্ত্বের পারতম্য লক্ষ্য করিলে আংশিক বিকাশ হইতে পারতম্যের আদিত্ব অঙ্গীকৃত হইয়া থাকে। সুতরাং গৌরসুন্দর পরতত্ত্ব বলিয়া সর্ব্বত্র স্বীকৃত আছেন। তাঁহার লীলা-বিলাস-সহায়ক পারিষদবর্গকেও আদি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তাই হরিদাস ঠাকুরের অবতার-স্বরূপ প্রহ্লাদ-মহারাজের শিক্ষাই আমাদের বর্ত্তমান বর্ষের আদর্শ।

আমরা শ্রীপত্রিকার পাঠক-পাঠিকাবর্গের পাদসরোজ-যুগলের বন্দনান্তে জয় গান করিতেছি এবং গললগ্নী-কৃতবাসে সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা জানাইতেছি, তাঁহারা অনুকূলভাবে শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা পাঠ, কীর্ত্তন ও অনুশীলন করুন্। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা পাঠের ফল শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠের ফল-স্বরূপ। সুতরাং—

"শ্রুতোঽনুপঠিতো ধ্যাত আদৃতো বানুমোদিতঃ।
সদ্যঃ পুনাতি সদ্ধর্ম্মো দেব-বিশ্বদ্রুহোঽপি হি॥"

(ভাঃ ১১।২।১২)

[এই ভাগবত-ধর্ম্মের শ্রবণে, পঠনে, ধ্যানে, সমাদরে বা অনুমোদনে তাঁহা দেবদ্রোহী এবং বিশ্বদ্রোহিগণকে পর্য্যন্ত সদ্যঃ পবিত্র করিয়া থাকেন।]

—শ্রীগৌঃ পত্রিকা ১২শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা।

সাময়িক প্রসঙ্গাত্মক প্রবন্ধ—

সংস্কৃত ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব

ভাষা ভাবের অভিব্যক্তি

'ভাষা' ভাবের অভিব্যক্তি। নানাপ্রকার লেখ-প্রণালীর দ্বারা ইহা প্রকাশ পাইয়া থাকে। মূক ব্যক্তির নিকট 'বৈখরী'-স্বর প্রভৃতির বিকাশ না থাকিলেও অঙ্গভঙ্গিই সে-স্থলে ভাবের যানবাহন। পৃথিবীর অধিকাংশ স্থলে কতকগুলি ভাবের বিকাশ, লেখ-প্রণালী ব্যতীত অন্য প্রকারে প্রকাশিত হওয়ার ক্ষেত্রসাম্য লক্ষ্য করা যায়। হাস্যের প্রক্রিয়া, রোদন, উল্লাস, ভীতি প্রভৃতির অভিব্যক্তি সর্ব্বত্রই একইরূপ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। যে-কোন প্রক্রিয়ার দ্বারাই ভাবের অভিব্যক্তি হউন না কেন, ব্রাহ্মী ইত্যাদি লেখ-প্রণালীর দ্বারা যে-অক্ষরাত্মক অভিব্যক্তি প্রকাশ পাইতেছে, তাহাই 'ভাষা'-নামে কথিত হয়।

ভাষার পার্থক্য

দেশ, কাল, পাত্রভেদে ভাষার পার্থক্য প্রচারিত আছে। কীট-পতঙ্গ, পশু-পক্ষী, বৃক্ষলতাদিরও ভাষা আমাদের অনুসন্ধানের বিষয়। ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ, পশুতত্ত্ব-আলোচক-মণ্ডলী ও বৈজ্ঞানিকগণ সকলেই ইহাদের ভাষাতত্ত্ব আলোচনা করিতে গিয়া তাঁহাদের স্ব-স্ব চিত্তবৃত্তিকেই কেন্দ্র করিয়া উহা বিচার করিয়াছেন। সার্ব্বজনীন ও সর্ব্বজীব-তত্ত্বের ভাষার জীবনীশক্তির পর্য্যালোচনা করিতে হইলে কি-প্রকার মানদণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে, এস্থলে তাহাই বিচার্য্য বিষয়। কীটপতঙ্গাদি, আব্রহ্ম দেব, দানব, মনুষ্য, স্তম্ব পর্য্যন্ত সকলেরই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চেতনের বিকাশ-স্বরূপ ভাব-ভাষাদি বর্ত্তমান। এবং তাহাদের মধ্যে পরস্পরের বাহ্যতঃ যেরূপ পার্থক্য লক্ষিত হয়, তদ্রূপ ভাব ও ভাষার পার্থক্য বর্ত্তমান।

বিভিন্নাংশ অণুচৈতন্যের ভাব ও ভাষা

সমগ্র ভারত বা ভারতেতর যাবতীয় দেশ-প্রদেশেই চেতনধর্ম্মের বৈশিষ্ট্যের কথা স্বীকৃত হইয়াছে। প্রত্যেক চেতনই এক ধর্ম্মে অবস্থিত হইলেও তাহারা বিভিন্নাংশ। এক অণুচেতন, অন্য অণুচেতনের সহিত ভাবের আদান-প্রদান করিয়া থাকে। এই আদান-প্রদানের প্রণালীই 'ভাষা' বলিয়া কথিত হয়। কীটাণুকীটের অন্তর্নিহিত অণুচেতন, বৃক্ষলতা ও পশু-পক্ষী প্রভৃতির অন্তর্নিহিত অণুচেতন পরস্পরের সহিত ভাব বিনিময় করিয়া থাকে। কিন্তু এক জাতি অন্য জাতির ভাব বিনিময়ের প্রণালীর সহিত ভেদ

স্থাপন করিয়াছে। এই ভেদ প্রত্যেক জীবের অন্তর্নিহিত অণুচেতনের নহে। কারণ ইহা পৃথিবীর সর্ব্বত্রই সর্ব্ববাদিসম্মত যে, চেতনতায় কাহারও কোন পার্থক্য নাই। অর্থাৎ জীবাত্মা স্বরূপতঃ বিভিন্নাংশরূপে একই—ইহাই যাবতীয় আস্তিকগণের বিচার। বিভিন্নাংশ অণুচৈতন্য জীবাত্মা, অণুত্বে ও ধর্ম্মে এক হইলে তাহার ভাব ও ভাষা পৃথক্ হইবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। আমরা সমাজগত বা দেশগত সসীম সমষ্টির মধ্যে ভাষাগত সাম্য লক্ষ্য করিয়া থাকি। সুতরাং ভাষার পার্থক্য, বিভিন্নাংশ অণুচৈতন্য জীবের স্বভাবগত নহে। ভগবানের মায়াশক্তি-বিরচিত দেশ-কাল-পাত্রাদি আবরণ হইতে উদ্ভূত ভাষারই পার্থক্য বর্ত্তমান।

বিভিন্নাংশ জীবের ভাষা বৈশিষ্ট্য

এক জাতীয় বিভিন্ন আত্মার ভাব-বৈভিন্ন্য অস্বীকৃত নহে; অথচ ভাষার বৈভিন্ন না থাকিলেও বৈশিষ্ট্য আছে। একই ভাষার গুরুত্ব-লঘুত্ব, লালিত্য-কাঠিন্য প্রভৃতি ভেদে পার্থক্য লক্ষিত হইলেও ভাষাগত ভেদ নাই। তথাপি তাহাকে 'বৈশিষ্ট্য' বলিতে কোন-প্রকার আপত্তি থাকিতে পারে না। পরন্তু বৈশিষ্ট্যই ভেদের কারণ। অণুচেতনের ভাষার বৈশিষ্ট্য থাকিলেও তদ্দ্বারা ইহা বুঝাইবে না যে, প্রত্যেক জীবাত্মার স্বরূপ গঠনের আত্মগত বৈশিষ্ট্য ব্যতীত অন্য কোনপ্রকার ভেদ আছে। যাহারা জীবাত্মার বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করিতে চেষ্টা করেন, তাহাদের ভাব ও ভাষা সমস্তই মিথ্যা হইয়া পড়ে। আমরা ভাষা-তত্ত্ব আলোচনা করিতে গিয়া ঐরূপ 'ব্যবহারিকতা' ও 'মিথ্যা'র প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত নহি।

দিব্য বা দৈব-ভাষা

আত্মা দিব্য বস্তু, প্রকৃতির কোন বস্তু নহেন। সুতরাং আত্মার ভাব ও ভাষা দিব্য বস্তু অর্থাৎ দৈবভাব-সম্পন্ন। তজ্জন্যই আত্মার ভাষা দিব্য ও দৈব। আত্মতত্ত্ব অনুশীলনে যাঁহারা যত উন্নত, তাঁহাদের ভাব ও ভাষাও তত উন্নত। যে দেশ যত নিম্নগতিতে চলিতে থাকে, সেই দেশের ভাব ও ভাষা তত নিম্নগামী হইয়া থাকে। চিন্তাস্রোতের অসম্পূর্ণতাই ভাষার অসম্পূর্ণতা আনয়ন করে। দিব্য বস্তু বা ভাব যাহার দ্বারা অভিব্যক্ত হয়, তাহাও দিব্য এবং সম্পূর্ণ। তাহা যতই বিস্তৃত হউক বা ক্রমশঃ সংক্ষিপ্ত হইতে সংক্ষিপ্ততর বা সংক্ষিপ্ততম হউক না কেন, উহা দিব্য এবং পূর্ণ। আমরা বেদচতুষ্টয়কে অতি বিস্তৃত দেখিলেও উপনিষদাদি তাহা অপেক্ষা অনেক সংক্ষিপ্ত। উপনিষদ্, পুরাণ, ইতিহাসাদি বিরাট্‌ভাবে দৃষ্ট হইলেও সূত্রাকারে 'ব্রহ্মসূত্র' আরও সংক্ষিপ্ত হইয়াছে। ইহাও মন্ত্রে এবং ক্রমশঃ বীজে আরও সংক্ষিপ্ত আকারে লক্ষিত হয়। 'বীজ' অতিক্ষুদ্র হইলেও ইহাতে সমগ্রতা ও বিরাটের সত্ত্বা লক্ষিত হওয়ায় ইহা সম্পূর্ণ। বটের বীজ অতিশয় ক্ষুদ্র হইলেও তাহাতে বিরাট্ মহীরুহের সত্ত্বা থাকায় উহা পূর্ণ। নৃসিংহতাপনী বলেন—"বাগ্বা ওঙ্কারো বাগেবেদং সর্ব্বং ন হ্যশব্দমিবেহাস্তি।" (নৃঃ তাঃ ৮।২)

উক্ত উপনিষদের শঙ্করভাষ্য-রহস্যার্থ-দীপিকায় লিখিত হইয়াছে—"বাঙ্মাত্রত্বাচ্চো-ঙ্কারস্যোতত্বং সিদ্ধমিত্যাহ বাগ্বা ইতি। **সর্ব্ব-বর্ণন-কবলনরূপত্বাদ্** বৈখর্য্যাদিরূপত্বাচ্চ বাঙ্মাত্রমবগন্তব্যম্।"

অর্থাৎ ওঙ্কারের বাঙ্মাত্রতাহেতু তাহার 'ওতত্ব' অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপকত্ব সিদ্ধ আছে। ওঙ্কারদ্বারা সকল পদার্থ বর্ণিত হয়। সকল পদার্থ-ই ওঙ্কারের কবলীকৃত বা অন্তর্গত এবং বৈখরী প্রভৃতি স্বরও ওঙ্কারের স্বরূপ মাত্র। এই নিমিত্ত ওঙ্কারকে বাঙ্মাত্র বলিয়া জানিবে।

এস্থলে অপৌরুষেয় বৈদিক বাণী হইতে জানিতে পারি, বীজ-স্বরূপ ওঙ্কারে (ওঁ) যাবতীয় বর্ণ, শব্দ, বাক্য ও ভাষা কবলীকৃত হইয়াছে। বেদ-পুরাণ-ইতিহাসাদি এই ওঙ্কারেরই বিস্তার এবং আরও কথিত হইয়াছে যে, শব্দরূপ ওঙ্কার হইতেই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়াদি হইয়া থাকে। সুতরাং 'ওঁ' এই দিব্য শব্দটী ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইলেও ইহা পূর্ণ এবং ইহাতেই বস্তু ও তত্ত্ব নিহিত আছে—ইহা বৈজ্ঞানিক-রূপে সিদ্ধ।

'সংস্কৃত' ভাষার বৈশিষ্ট্য

ইংলণ্ড, গ্রীস, জার্ম্মান, চীন ও জাপান প্রভৃতি দেশের ভাষার সহিত আমাদের ভারতীয় ভাষার তুলনা করিলে ইহার পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে অনুভব করিতে পারি। এই পার্থক্যের মূল কারণ প্রকৃতি এবং প্রকৃতি-জাত দেশ, কাল ও পাত্র। ভারত-বর্ষ এই প্রকৃতিজাত দেশ, কাল, পাত্র হইতে বহির্ভূত না হইলেও, সে এই প্রকৃতি ও প্রকৃতিজাত চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব হইতে অতীত রাজ্যের অনুশীলন করিয়াছে। পার্থিব পরমাণুর সংযোগে যে চেতনতার আভাস লক্ষ্য করা যায়, তাহা হইতেও ভারতীয় মনীষিগণ আপনাদের বৈশিষ্ট্য স্থাপন করিয়াছেন। অপ্রাকৃত চেতন প্রাকৃত চেতন (?) হইতে প্রচুর পৃথক্। সুতরাং অপ্রাকৃত অণুচেতনের ভাব ও ভাষা প্রাকৃত চেতন হইতে সর্ব্বতোভাবে বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে। এই বৈশিষ্ট্যময় ভাষার নামই 'সংস্কৃত ভাষা'।

ভাষার 'সংস্কৃত' আখ্যা দিবার উদ্দেশ্য

'সংস্কৃত'-শব্দের দ্বারা ইহাই বুঝায়, যে-ভাষা সর্ব্বপ্রকার সংস্কার লাভ করিয়াছে। দশসংস্কারে মানব যে-প্রকার শুদ্ধি লাভ করে, সেইপ্রকার 'সংস্কৃত ভাষা'টীও সর্ব্বতোভাবে শুদ্ধতা লাভ করিয়াছে। বিষ সদ্বৈদ্যের দ্বারা জারিত হইলে উহা প্রাণনাশক না হইয়া প্রাণরক্ষক হইয়া থাকে। সেইপ্রকার ভাষাগত প্রাকৃত মল দেব-ঋষিগণের দ্বারা জারিত হইয়াছে বলিয়া দেবভাষার নাম—'সংস্কৃত ভাষা'। এই ভাষা অক্ষর ব্রহ্ম-বস্তুর নির্দ্দেশ-কারিণী।

'অক্ষর'-পরিচয়,

দেবভাষা কিছু ক্ষর-বস্তু নহে। ইহা অক্ষরাত্মক নিত্য সনাতন বস্তু। এই অক্ষরাত্মক বস্তুর অনুসন্ধান না করিলেই আমরা 'কৃপণ' হইয়া পড়ি। তজ্জন্য বৃহদারণ্যক (৩।৯।১০) বলিয়াছেন—"এতদ্ 'অক্ষরং' গার্গি অবিদিত্বা অস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি স এব 'কৃপণঃ'।"

ভারত যদি অক্ষর ও ব্রহ্ম-বস্তুর অনুশীলন না করিয়া কৃপণতার আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহা হইলে ভারত অন্যান্য দেশের ন্যায় দুর্ভাগ্য বরণ করিবে। ভারতীয় লেখ-প্রণালী যাহাই হউক না কেন, দিব্য ভাষা বা দৈব ভাষাই অণুচৈতন্য জীবমাত্রের ভাবজ্ঞাপক যান-বাহন। বাল্যজীবনে পঞ্চম-বর্ষীয় শিশুকে অক্ষর পরিচয় করাইয়া দিবার পদ্ধতি আজও রহিয়াছে। তজ্জন্যই তাহাকে শিক্ষাগুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। আমরা অক্ষর পরিচয়ের পদ্ধতির সারাংশ পরিত্যাগ করিয়া গতানুগতিক ধারা-অনুসারে শিক্ষা আরম্ভের সময় যে আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া অবলম্বন করি, তাহাতে ক্ষরবস্তু ব্যতীত অক্ষর-বস্তুর পরিচয় হইতেছে না। আমরা আমাদের ত্রিকালজ্ঞ হিতকামী ঋষিবর্গের শিক্ষা হইতে সম্পূর্ণ বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছি। অক্ষর-পরিচয়ের নামে ক্ষর-পরিচয় লইয়াই আমরা বর্ত্তমানে ব্যস্ত হইয়াছি। ভারতীয় বিবিধ লেখ-প্রণালী যাহাই হউক না কেন, অক্ষর-বস্তুর সহিত সম্বন্ধ না থাকিলে তাহা সর্ব্বতোভাবে আমাদিগকে অমঙ্গলের পথে চালিত করিবে।

শব্দ বা ধ্বনির উৎপত্তি

লেখ-প্রণালীর সহিত স্বর বা ধ্বনির অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ না থাকিলে উহা নিষ্ফল হইয়া পড়ে। ধ্বনি মূলতঃ বায়ু-বিলোড়নে উৎপন্ন হয়। স্ফোটবাদী বৈয়াকরণিকগণ ভাষাগত ধ্বনির উৎপত্তি-স্থান অনেক প্রকার নিরূপণ করিয়াছেন—প্রধানতঃ কণ্ঠ, জিহ্বা, তালু, মূর্দ্ধা, দন্ত ইত্যাদি। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, 'স' তিন প্রকারে তিন স্থান হইতে উচ্চারিত হয়। তালু হইতে উচ্চারিত হইলে তালব্য স—'শ', মূর্দ্ধা হইতে উচ্চারিত বলিয়া মূর্দ্ধন্য স—'ষ' এবং দন্ত হইতে যে স-এর উচ্চারণ হয়, তাহা দন্ত্য স —'স'। এইপ্রকার উচ্চারণ ভেদে 'ন'ও দুইপ্রকার। যথা, দন্ত হইতে উচ্চারিত বলিয়া ন-এর নাম—দন্ত্য 'ন' এবং মূর্দ্ধা হইতে উচ্চারিত হয় বলিয়া উহার নাম—মূর্দ্ধন্য 'ণ'। সুতরাং বৈয়াকরণিকের শব্দ বা ধ্বনি বায়ু-বিলোড়িত শব্দের ন্যায় প্রাকৃতই বুঝিতে হইবে। ইহাকে আমরা 'অক্ষর'-শব্দের উদ্দিষ্ট বস্তু বলিয়া মনে করিতে পারি না। অথচ অক্ষর-পরিচয় করিতে গিয়া শিশুগণকে ঐপ্রকার বর্ণ-পরিচয়ই করাইয়া দেওয়া হয়।

বর্ণ অক্ষরের সাদৃশ্য

লেখ-প্রণালীর বর্ণমালার সহিত অক্ষর বস্তুর কোনরূপ সম্বন্ধ স্থাপিত না হইলে উহার দ্বারা আমাদের পারমার্থিক মঙ্গলের কোন সম্ভাবনা নাই। সুতরাং শাস্ত্রকারগণ বলেন—

বর্ণমালাকে সর্ব্বতোভাবে 'সংস্কৃত' করিয়া অর্থাৎ তাহার যাবতীয় মল বিদূরিত করিয়া অথবা সদ্‌বৈদ্যের ন্যায় জারিত করিয়া গ্রহণ করিলে আমরা অপ্রাকৃত অক্ষর-বস্তুর সন্ধান পাইব। 'বর্ণ' এবং 'অক্ষর' এক বস্তু নহে, অথচ সাদৃশ্যযুক্ত। সদৃশবস্তুর উপমানের সহিত ভেদ থাকিলেও উপমান-জ্ঞানে প্রচুর সাহায্য করিয়া থাকে।

অপ্রাকৃত পণ্ডিতকুল-বরেণ্য জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল জীব-গোস্বামিপাদ তাঁহার স্বরচিত 'শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণে'র প্রথমে লিখিয়াছেন—"নারায়ণাৎ উদ্ভূতোঽয়ং বর্ণক্রমঃ"—অর্থাৎ নারায়ণ হইতেই বর্ণসমূহের উদ্ভব হইয়াছে। শ্রীনারায়ণই অক্ষর ব্রহ্ম বস্তু। যে বর্ণ অপ্রাকৃত বিশুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপ নারায়ণ হইতে উদ্ভূত, তাহা প্রাকৃত জিহ্বায় বা কণ্ঠ, তালু প্রভৃতিতে উচ্চারিত হয় না। তথাপি যে বর্ণসমূহ অক্ষরের উদ্দীপক, তাহাই আমাদের একমাত্র গ্রহণীয়। অর্থবোধক বর্ণসমূহের সমষ্টিতে শব্দ, এবং এক বা একাধিক শব্দসমূহের অর্থ প্রকাশক সমাবেশে বাক্য এবং বাক্য-সমষ্টিতে ভাষার উৎপত্তি হইয়া থাকে। আমরা নারায়ণ হইতে উদ্ভূত যে বর্ণসমূহ, শব্দ, বাক্য ও ভাষা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাকেই 'সংস্কৃত ভাষা' বলিয়া জানি।

—শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা ৩য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা।

গ্রন্থ-বিষয়ক প্রবন্ধ—

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা সম্বন্ধে বক্তব্য

শ্রীপত্রিকার স্বরূপ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত নবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভা ও শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার একনিষ্ঠা ঐকান্তিকী প্রেষ্ঠা সেবিকা। সর্ব্ব-প্রধানা ও প্রিয়তমা সেবিকাসূত্রে উক্ত সমিতি উভয় সভারই অভিন্না প্রতিমূর্ত্তি। সুতরাং 'গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র' বলিলে ইহাকে উক্ত সভাদ্বয়েরও মুখপত্র বলিয়া বুঝিতে হইবে। নবদ্বীপধাম-প্রচারিণী-সভার মুখপত্র 'শ্রীসজ্জনতোষণী' ও শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্র 'সাপ্তাহিক গৌড়ীয়ের' অভিন্ন কলেবর এই 'শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা'। সুতরাং শ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভাব, ভাষা ও ধারার সহিত শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার ভাব, ভাষা ও ধারা অভিন্ন। সংক্ষেপতঃ **শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা শ্রীল রূপ ও রঘুনাথের কথার একমাত্র প্রচারিকা।**

সজ্জনতোষণী ও গৌড়ীয়ের অবস্থিতি কাল

শ্রীসজ্জনতোষণী পত্রিকা বর্ত্তমান কাল হইতে অনুমান ৬৭ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিতা হইয়াছিলেন এবং ক্রমে ক্রমে সপ্তদশ বর্ষকাল শ্রীল ঠাকুর-কর্তৃক পরিচালিতা হন। তৎপরে শ্রীল প্রভুপাদ ঐ পত্রিকার সপ্তবর্ষকাল সম্পাদনা করেন। মোটের উপর চতুর্ব্বিংশ বর্ষকাল সজ্জনতোষণী প্রকাশিতা হইয়াছিলেন। এই চতুর্ব্বিংশ বর্ষের চতুর্ব্বিংশ খণ্ড প্রকাশিত হইতে অনুমান ৪৫ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল। তৎপরে ১৯২২ খৃষ্টাব্দে 'শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা'র নিয়ামক-মহারাজের সহায়তায় মাসিক সজ্জনতোষণী পত্রিকার অভিন্ন কলেবরস্বরূপে 'গৌড়ীয়' নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতে থাকেন। ইহাও চতুর্ব্বিংশ বর্ষ অবধি অবস্থিত থাকিয়া অনুমান ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে অন্তর্হিত হয়েন।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার আবির্ভাবের কারণ

শ্রীল প্রভুপাদের অন্তর্দ্ধানের পর তাঁহার মনোভাব-অনুযায়ী শুদ্ধ-হরিকথা কিয়ৎকাল যাবৎ তাঁহার একনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ সেবকগণ প্রচার করিতে বিশেষ প্রয়াস পাইলেও নানা-প্রকার দৈব ও আসুর দুর্ঘটনায় উক্ত সাপ্তাহিক গৌড়ীয়ের প্রকৃত সেবা করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহারা শ্রীগুরুপরতন্ত্র-স্বতন্ত্র হইয়া পড়েন। তখন হইতে 'গৌড়ীয়' অবাধে আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া 'ঘোম্‌টার-মধ্যে খেম্‌টা' নীতির পরিপোষক হইয়া পড়িল। কতকগুলি অন্তঃসারশূন্য ব্যক্তি প্রাণহীন গৌড়ীয়ের কঙ্কাল বিষাক্ত দুর্গন্ধ তৈলের দ্বারা রক্ষা করিতে চেষ্টা করিলেও ক্রমশঃ তাহা ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে লাগিল। শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-সেবাপর শ্রীরূপানুগ সিদ্ধান্তসমূহই গৌড়ীয়ের প্রকৃত আহার। তাহার অভাব হইলে গৌড়ীয়ের প্রাণধারণ একান্ত অসম্ভব। কতকগুলি গুরুদ্রোহিতামূলক অপসিদ্ধান্তপর অপদার্থ অখাদ্য কুখাদ্য গৌড়ীয়কে সঞ্জীবিত রাখিতে পারে না। এইরূপে গৌড়ীয়ের চতুর্ব্বিংশতি বর্ষ অতিক্রান্ত হইতে না হইতেই তথাকথিত পরিচালকবর্গের অপরাধফলে গৌড়ীয় অন্তর্হিত হন। সুতরাং গৌড়ীয়-বৈষ্ণবজগৎ শ্রীল প্রভুপাদের আচরিত-প্রচারিত শুদ্ধ-রূপানুগ-ভক্তিবিনোদ-ধারায় অবগাহন করিবার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হওয়ায় শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার আবির্ভাব হইয়াছে।

শ্রীপত্রিকার উদ্দেশ্য

বর্ত্তমান সময়ে ধর্ম্মজগতে বিভিন্ন সংবাদপত্রের প্রকাশ থাকিলেও শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা তাহাদের হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। এই পত্রিকা নির্ভীকচিত্তে নিরপেক্ষভাবে সত্য কথা প্রচার করিতে পশ্চাৎপদ হইবেন না। শুদ্ধ-ভক্তিধর্ম্মের অনুকরণে কতকগুলি অপসিদ্ধান্তপর

সংবাদপত্রের ও গ্রন্থের সন্ধান আমরা পাইয়াছি। ক্রমশঃ তাহাদের বিচারধারা যে শ্রীরূপানুগ-শুদ্ধ-বৈষ্ণবের অপ্রাকৃত ধারণার প্রতিকূল, তাহা আমরা প্রদর্শন করিব। কেহ বা অপ্রাকৃত স্মৃতির সহিত প্রাকৃত স্মৃতির মিল রাখিয়া পর্ব্বাদি পালনের সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। তাঁহারা জানেন না যে, 'অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর'। আরও কতক-গুলি সংবাদপত্র দেখিতে পাওয়া যায়, সেগুলির দ্বারা গৌরজনগণের চিত্তোল্লাসের সম্ভাবনা নাই। ঐ সাময়িক পত্রগুলি সময় সময় কেবল বিষয়-কথা লইয়া, হরিকথার ছলে কেবল মায়ার কথা লইয়া, ভক্তি-বিরুদ্ধ কথা লইয়া পরস্পর কলহ ও প্রণয় উপস্থিত করিয়া কোথাও বা আত্ম-প্রশংসায় ভরপূর হইয়া হরিকথা হইতে দূরে চলিয়া যান। তাহাতে ভক্তগণের হৃদয়ে সুখোদয় হয় না। কেহ বা বিষয়িগণের মতানুগমনে শুদ্ধভক্তির বিলোপ সাধন করিয়া ভক্তিমার্গের উন্নতি হইল মনে করেন, কেহ বা প্রাকৃত সম্প্রদায়-বিশেষের সুবিধা করিতে গিয়া শুদ্ধভক্তির সৌন্দর্য্য খর্ব্ব করিয়া ফেলেন। শ্রীপত্রিকা এই প্রকার সংবাদপত্র-সমূহের সঙ্গ হইতে দূরে থাকিবেন। তবে শুদ্ধভক্তির বিরুদ্ধ ভাবসমূহ ভক্তি-কথার সহিত অজ্ঞাতভাবে স্থান পাইলে ভাগবতগণের হৃদয়ে সেবাবিরোধ ঘটাইতে পারে, এই আশঙ্কায় মায়িক-প্রসঙ্গ হইতে সর্ব্বদা সাবধান করিবার জন্য অনুরোধ জানাইতে পত্রিকা সর্ব্বদাই সচেষ্ট থাকিবেন। ভক্তির প্রতিকূল মতবাদ-সমূহে যাহাদের চিত্ত দৃঢ়ভাবাপন্ন তাহারা নিসর্গক্রমে ভক্তিসুখ সন্দর্শনে অসমর্থ। শ্রীপত্রিকা এই শ্রেণীর পাঠকবর্গের চিত্তবিনোদন করিতে পারিবেন না।

শ্রীগৌড়ীয়ের সহিত বিভিন্ন নীতির সম্বন্ধ

বর্ত্তমান সময়ে ভারতীয় চিন্তাস্রোত যে-ভাবে প্রধাবিত হইতেছে, তাহা ধর্ম্মজগতের সহিত কতদূর সম্বন্ধযুক্ত শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা তাহা সর্ব্বদাই সমালোচনা-মুখে বিশ্লেষণ করিবেন। রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষানৈতিক আচার-ব্যবহার ও ক্রিয়া-কলাপের সহিত এই পত্রিকার প্রত্যক্ষ-ভাবে কোন সম্বন্ধ না থাকিলেও যেস্থলে উক্ত নীতিসমূহ নিত্য সনাতন ধর্ম্মনৈতিক চিন্তাস্রোতের ও আচার-ব্যবহারের ব্যাঘাত জন্মাইবে, সেস্থলে ইহা নির্ব্বাক থাকিয়া জগতের অমঙ্গল আনয়ন করিবেন না। স্বাধীন ভারতের পূর্ব্ব ঐতিহ্য আলোচনা করিলে আমরা জানিতে পারি, ধর্ম্মনীতিই যাবতীয় নীতিসমূহের মূল ও ভিত্তিস্বরূপ। সুতরাং যাঁহার উপর দণ্ডায়মান থাকিয়া বিশ্বের যাবতীয় সত্তা উপলব্ধি হইয়া থাকে সেই বস্তুর প্রতি ঔদাসীন্যই আমাদের অধঃপতনের প্রধান কারণ। শ্রীপত্রিকা তাহা প্রতি পদে পদে প্রদর্শন করিয়া সমগ্র ভারতবাসীকে সচেতন রাখিবেন। ধর্ম্মই ভারতের বৈশিষ্ট্য, ধর্ম্মই ভারতের প্রতিষ্ঠা, ধর্ম্মই ভারতের জীবন। ধর্ম্মের জন্যই ভারত সমগ্র পৃথিবীর শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন।

স্বাধীন ভারতের বিজয়পতাকা সমগ্র বিশ্বের শীর্ষোপরি স্থাপন করিবার মূল-মন্ত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'শিক্ষাষ্টকের' অন্যতম "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"—শ্লোকের তাৎপর্য্য জগদ্বাসীকে শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীপত্রিকা সর্ব্বদাই মুক্তকণ্ঠে কীর্ত্তন করিবেন।

ধর্ম্মই ভারতের গৌরব ও শান্তিদাতা

ধর্ম্মাধীন রাষ্ট্রই ভারতের গৌরব এবং ধর্ম্মই ভারতকে চিরদিন পরিচালনা করিয়াছেন। ধর্ম্ম বলিতে কোন সঙ্কীর্ণতা, হীনতা বা কোনপ্রকার অনুপাদেয়তাকে লক্ষ্য করে না। ধর্ম্ম ও ধর্ম্মের ভাণ এক নহে। ধর্ম্মধ্বজীর সঙ্কীর্ণ অসৎ ক্রিয়াকে লক্ষ্য করিয়া ধর্ম্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হওয়া কর্ত্তব্য নহে। পার্থিব চিন্তাস্রোত মানুষকে অধঃপতিত করিয়া দুঃখসাগরে নিমজ্জিত করে। খাদ্য, বস্ত্র, বাসগৃহ প্রভৃতির সুব্যবস্থা করাই আমাদের পরাশান্তি লাভের উপায় নহে। যাহারা ঐগুলি পূর্ণমাত্রায় ভোগ করিয়া ইন্দ্রিয়তর্পণের চরম সীমায় উঠিয়াছেন, তাহারাও যে অশান্তির গভীরতম জলধিগর্ভে নিমজ্জিত আছেন, ইহা কাহাকেও বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। শান্তি একটী পৃথক্ তত্ত্ব। পার্থিব বস্তু তাহা কখনই সম্পাদন করিতে পারে না।

শ্রীপত্রিকার ভাষা

এই পত্রিকা সমগ্র ভারতে যাহাতে সমাদৃত হইতে পারে তজ্জন্য প্রত্যেক প্রাদেশিক ভাষায় প্রবন্ধাদি ইহাতে প্রকাশিত হইবে। প্রধানতঃ বাংলা, সংস্কৃত, হিন্দী, আসামী, উৎকল, ইংরাজী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষার প্রবন্ধাদি ইহাতে স্থান পাইবে।

গভীর গুরুদায়িত্ব লইয়া এই পত্রিকা বিশ্ববাসীর সমক্ষে উপস্থিত হইতেছেন। ভারতবাসীর আন্তরিক সহানুভূতি ও শুভেচ্ছার উপর ইহার সাফল্য নির্ভর করে।

—শ্রীগৌঃ পত্রিকা ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা।

'শ্রীভক্তিবিনোদ-প্রবন্ধাবলী'-গ্রন্থের ভূমিকা

নিবেদন

প্রবন্ধের আদি ও কাল

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রবন্ধাবলী গ্রন্থাকারে এই প্রথম প্রকাশিত হইল। অর্দ্ধশতাব্দীর অধিককাল পূর্ব্বে এই প্রবন্ধগুলি শ্রীল ঠাকুরের নিজ-সম্পাদিত 'শ্রীসজ্জনতোষণী' নামক পারমার্থিক মাসিক পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল। সাময়িক পত্রিকায় বা গ্রাম্য-বার্ত্তাবহে প্রকাশিত সংবাদ বা প্রবন্ধ-নিবন্ধগুলির প্রয়োজনীয়তা যেরূপ তাৎকালিক, ঠাকুরের লেখনী-নিঃসৃত প্রবন্ধগুলি সেরূপ নহে। ইহা ত্রিকাল-দর্শী পরম মুক্ত শাস্ত্রকারগণের বাক্যের ন্যায় চিরসত্য এবং সর্ব্বকাল প্রয়োজনীয়। প্রবন্ধগুলি পাঠ করিলেই ইহার সত্যতা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধ হইবে—ইহা কখনও পুরাতন হইবার নহে।

উদ্দেশ্য

মায়া-কবলিত জীবের অবস্থা দিন দিন যেরূপ ব্যাপকভাবে নিম্ন-গামী হইতেছে, ঠাকুরের ন্যায় নিত্যসিদ্ধ মহাজন তাহা পূর্ব্ব হইতেই দর্শন করিয়া তাহার গতিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে এবং আমাদের নিত্য মঙ্গলের জন্য নানাপ্রকার উপদেশ-নির্দ্দেশ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে এই প্রবন্ধগুলিই তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। ইহা পাঠ করিলে মনে হইবে, সদ্য-সদ্য কোন ঘটনাসমূহের বা মানবের মনোবৃত্তিগুলিকে লক্ষ্য করিয়া তাহার শোধন করিবার জন্যই ইহা রচিত হইয়াছে।

ভাষার তুলনা ও বৈশিষ্ট্য

প্রবন্ধের ভাষার বৈশিষ্ট্য অতীব চমৎকার। অত্যন্ত গভীর হইতেও সুগভীর তত্ত্বসমূহ এত সরল ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে যে, অল্প শিক্ষিত ব্যক্তিও ইহা বুঝিতে পারেন। সাধারণতঃ বিষয়ের গুরুত্ব অনুসারে ভাষার গুরুত্ব ও জটিলতা স্বভাবতঃই হইয়া থাকে। কিন্তু ঠাকুরের ভাষা সে স্বভাব অতিক্রম করিয়াছে। আমরা সুধী পাঠক-বর্গকে এস্থলে আমাদের পরমারাধ্য শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম পরমহংসকুল-মুকুটমণি **ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি প্রভুপাদের** লিখিত প্রবন্ধাবলীর ভাষার সহিত তুলনা করিতে অনুরোধ করি। শ্রীল প্রভুপাদের ও শ্রীল ঠাকুরের ভাষার কাঠিন্যে ও সরলতায় বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হইলেও তাহার বিচার-আচার, সিদ্ধান্ত-সঙ্গতি ও তাৎপর্য্য-মাধুর্য্যে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। শ্রীল প্রভুপাদের ভাষা দূর হইতে দৃষ্টি করিলে

মনে হয়, সুদৃঢ় প্রস্তর-নির্ম্মিত প্রাকার-বেষ্টিত দুর্ভেদ্য দুর্গ। তাহার আবার লৌহ-নির্ম্মিত প্রচণ্ড প্রবেশ দ্বার। কোনও প্রকারে যেন তাহাতে প্রবেশ করিবার শক্তি নাই। কিন্তু যতই নিকটস্থ হইয়া সে-বাণীর প্রকৃত একনিষ্ঠ প্রহরীর নিকট গমন করা যায়, ততই তাঁহার কৃপায় প্রকৃত মাধুর্য্যাদি দৃঢ়রূপে উপলব্ধ হইয়া থাকে। তাঁহার ভাষা অত্যন্ত কঠিন হইলেও একটি অভাবনীয় ও অভিনব গুণ এই যে, সে-ভাষার বক্তব্য ভাব ও বিষয় খুব সুস্পষ্ট এবং তাহার দ্বারা পাঠক অন্যপ্রকার ধারণা করিতে কোন প্রকারেই সক্ষম হইবে না। কিন্তু শ্রীল ভক্তিবিনোদের ভাষা অত্যন্ত সরল ও সহজ হইলেও পাঠক অনেক সময়েই লেখকের হৃদ্গত ভাব ধরিতে না পারিয়া ভুল বুঝিয়া থাকেন। এরূপ ক্ষেত্রে সাধক ও পাঠকের পক্ষে শ্রীল ভক্তিবিনোদ-ধারা চিনিয়া লওয়া অতি সুকঠিন ব্যাপার। আমরা তজ্জন্য ঠাকুরের প্রবন্ধাবলীর প্রত্যেকটী প্রবন্ধের অন্তর-নিহিত সূক্ষ্ম বিষয়গুলি অপেক্ষাকৃত সুস্পষ্ট অক্ষরে ক্ষুদ্র 'শিরোনামা'য় প্রকাশ করিয়াছি। পাঠক আবশ্যক বোধ না করিলে ইহা বাদ দিয়াও পাঠ করিতে পারেন।

প্রবন্ধের ক্রম ও পর্য্যায়

পারমার্থিক তত্ত্ববিচারে, সাধারণ মূর্খ-ব্যক্তির অবিদ্যা-বিদূরিত মোক্ষ অপেক্ষা মায়া-গন্ধহীন ভগবৎসেবা বা প্রীতিরই অনন্ত-গুণ শ্রেষ্ঠত্ব আছে—ইহা পারমার্থিক নিত্যসত্য—পণ্ডিত-জীবমাত্রই স্বীকার করেন। সুতরাং ভগবৎসেবা বা ভগবৎ-প্রেম-লাভের ক্রম-বিচারপূর্ব্বক ঠাকুরের প্রবন্ধগুলি যথাসম্ভব পর্য্যায়ানুসারে সজ্জিত করা হইয়াছে। শাস্ত্র-কর্ত্তা শ্রীল রূপপাদ উক্ত ক্রম-সম্বন্ধে শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থের পূর্ব্ব-বিলাস ৪র্থ লহরীর ১০ম শ্লোকে জানাইয়াছেন—

আদৌ **শ্রদ্ধা** ততঃ **সাধুসঙ্গো**ঽথ **ভজনক্রিয়া**।
ততো**ঽনর্থনিবৃত্তিঃ** স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ **প্রেমা**ভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥

প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ প্রবন্ধে **শ্রদ্ধা ;** পঞ্চম ও ষষ্ঠ প্রবন্ধে **সাধুসঙ্গ ;** সপ্তম, অষ্টম ও নবম প্রবন্ধে **সাধুসঙ্গ**-প্রভাবে সম্বন্ধ-জ্ঞান ; দশম, একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ প্রবন্ধে অভিধেয়-রূপ **ভজনক্রিয়া** ও তৎপ্রভাবে **অনর্থ-নিবৃত্তি** ; পঞ্চদশ-ষোড়শ প্রবন্ধে প্রয়োজন-স্বরূপ ক্রমপথে নিষ্ঠা-রুচি-আসক্তি-ভাবোদয়ে **প্রেমভক্তি**-সম্বন্ধে আলোচিত হইয়াছে। সমুদায় শাস্ত্রই সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন-তত্ত্ব-বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং আমরা ইহা বজায় রাখিয়া প্রবন্ধগুলি পর পর সাজাইতে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, সুধী পাঠকবর্গ তাহা বিচার করিবেন।

লেখনী ও জীবনী একই

প্রবন্ধ-লেখকের একটী বৈশিষ্ট্যের কথা আমরা এখানে পাঠকগণকে জানাইতে চাই। তিনি পাশ্চাত্য-শিক্ষায় সুশিক্ষিত হইলেও তাহার প্রভাবে তিনি কখনই প্রভাবান্বিত হন নাই। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন—"আমি যাহা করি, তাহা তোমরা করিও না, যাহা বলি তাহাই করিবে"। ঠাকুর তাঁহার বিবিধ গ্রন্থে ও প্রবন্ধে ইহার ঘোর প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং তিনি নিজে যাহা আচরণ করিতে পারিতেন না, তাহা কখনই লিখিতেন না। সুতরাং তাঁহার লেখনী ও জীবনী একই।

লেখকের আবির্ভাব ও তিরোর্ভাব

যাঁহার প্রবন্ধের এত মহিমা, তাঁহার সম্বন্ধে কিছু জানিতে পাঠকবর্গ সকলেরই কৌতূহল হইতে পারে। বিশেষতঃ লেখকের পরিচয় না পাইলে তাঁহার প্রবন্ধের প্রতি সেরূপ শ্রদ্ধা ও রুচি হওয়া স্বাভাবিক নহে। তজ্জন্য তাঁহার অতিমর্ত্ত্য জীবনের কিছু পরিচয় দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য মনে করি।

অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষগণের সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে সাধারণ মনুষ্যের জন্ম, মৃত্যু ও স্থিতি-কালের ন্যায় বিচার করিলে চলিবে না। কারণ মহাপুরুষগণ জন্ম-মৃত্যুর অতীত। তাঁহারা নিত্যকাল অবস্থিত থাকিলেও তাঁহাদের আবির্ভাব-তিরোভাবই কেবল লক্ষ্য করা যায়। বিগত **১২৪৫ বঙ্গাব্দের** ১৮ই চৈত্র, ইংরাজী ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর, রবিবার, নদীয়া জেলার অন্তর্গত শ্রীগৌরাবির্ভাবস্থলী শ্রীধাম মায়াপুরের অনতিদূরে **বীরনগর গ্রামে আবির্ভূত** হইয়া গৌড়ীয়-গগন প্রোদ্ভাসিত করেন এবং বিগত **১৩২১ সালের** ৯ই আষাঢ়, ইংরাজী ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুন **কলিকাতা মহানগরীতে তিরোহিত** হইয়া শ্রীগৌড়ীয়ের পরমোপাস্য শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের মাধ্যাহ্নিকী লীলায় প্রবেশ করেন।

ঠাকুরের গুণাবলী

জগতের সৌভাগ্যে ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের করুণাময়ী ঔদার্য্যলীলা প্রায় ৭৬ বৎসর কাল লোকলোচনের সমক্ষে প্রকটিত ছিল। এই অল্পকাল মধ্যে তাঁহার ক্রিয়া-কলাপের ভিতর দিয়া যে-সমস্ত গুণাবলী প্রকাশিত হইয়াছে, এস্থলে তাহাদেরই কিঞ্চিৎ আলোচিত হইবে। মাদৃশ ভবান্ধ-কূপ-পতিত জীবের একমাত্র উদ্ধার-কর্ত্তা পরমহংস-কুল-চূড়ামণি জগদ্গুরু **ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর** শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারা প্রকাশ-উদ্দেশ্যে তাঁহার গুণাবলী যেরূপ প্রকাশ করিয়াছেন, আমি

তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণের অভিনয় করিয়া সেই ধারায় ঠাকুরের গুণাবলীর কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া আত্মশোধনের প্রয়াস পাইতেছি। ঠাকুরের ন্যায় হরিভক্তে যাবতীয় গুণই পূর্ণরূপে প্রবেশ করিয়াছিল। শাস্ত্র বলেন—

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা, **সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে** সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা, মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥

(ভাঃ ৫।১৮।১২)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-লেখক শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী উক্ত শ্লোক অবলম্বন করিয়া লিখিয়াছেন—

সর্ব্ব মহা-গুণগণ বৈষ্ণব-শরীরে।
কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ, সকলি সঞ্চারে॥
সেই সব গুণ হয় বৈষ্ণব-লক্ষণ।
সব কহা না যায়, করি দিগ্‌দরশন—
১ কৃপালু, ২ অকৃতদ্রোহ, ৩ সত্যসার, ৪ সম।
৫ নির্দ্দোষ, ৬ বদান্য, ৬ মৃদু, ৮ শুচি, ৯ অকিঞ্চন॥
১০ সর্ব্বোপকারক, ১১ শান্ত, ১২ কৃষ্ণৈকশরণ।
১৩ অকাম, ১৪ নিরীহ, ১৫ স্থির, ১৬ বিজিত-ষড়্‌গুণ॥
১৭ মিতভুক্, ১৮ অপ্রমত্ত, ১৯ মানদ, ২০ অমানী।
২১ গম্ভীর, ২২ করুণ, ২৩ মৈত্র, ২৪ কবি, ২৫ দক্ষ, ২৬ মৌনী॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২২।৭২, ৭৪-৭৭)

ঠাকুর—উক্ত গুণসমূহে গুণী মহাজন। আমরা উহার প্রত্যেকটী গুণ আলোচনা করিয়া ঠাকুরের কিরূপ জীবন, তাহা সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করিব।

ঠাকুরের গুণাবলীর বিশ্লেষণ

(১) **কৃপালু**—শ্রীমন্মহাপ্রভু-গৌরসুন্দরের নিজ-জন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জীব-মাত্রেরই প্রতি পরম কৃপা-পরবশ হইয়া তাহাদের নিত্য কল্যাণ সাধনোদ্দেশ্যে **জৈবধর্ম্ম,** শরণাগতি, কল্যাণ-কল্পতরু, প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তিনি জীব-সাধারণের জন্য অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগাদির প্রশ্রয় না দিয়া সকলকে অসৎ ও অনিত্য কল্যাণ-লাভের পথ হইতে রক্ষা করিতেন। ঐহিক ও পারমার্থিক চেষ্টা পরস্পর পৃথক্। পরমার্থই জীবের প্রয়োজন—উহা ভক্তি ব্যতীত লাভ হইতে পারে না। স্থূল ও সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়গুলির তৃপ্তিসাধন করার জন্য ধর্ম্মের নাম করিয়া **দেব-দেবীর পূজা অবৈধ** ও নিত্য মঙ্গললাভের পরিপন্থী। ইহাই ছিল ঠাকুরের সুদৃঢ় শিক্ষা—

বাসুদেবে ছাড়ি' যেই **অন্য-দেবে** ভজে।
ঈশ্বর ছাড়িয়া সেই সংসারেতে মজে॥
'অতএব পূজি বিষ্ণু, অন্য-দেব ত্যাজি'॥
মায়াবাদি-মতে পিতৃ-শ্রাদ্ধ যেই করে।
যেবা **অন্য-দেব পূজে অপরাধে মরে**॥

(শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি)

বহু **দেবদেবী-পূজা করিবে বর্জ্জন**।
নিষ্ঠা করি' ভজ ভাই গৌরাঙ্গ-চরণ॥
অন্য-দেবদেবী কভু না কর ভজন॥

(শ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—৪)

অন্য-বাঞ্ছা, **অন্য-পূজা**, ছাড়ি' 'জ্ঞান', 'কর্ম্ম'।
আনুকূল্যে সর্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৬৮)

অন্য অভিলাষ ছাড়ি', জ্ঞান, কর্ম্ম পরিহরি', কায়-মনে করিব ভজন।
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণসেবা, **না পূজিব দেবী-দেবা**, এই ভক্তি পরম কারণ॥

(শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—২)

(২) **অকৃতদ্রোহ**—ঠাকুর ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষুর ন্যায় কায়, মন ও বাক্যকে দণ্ডিত করিয়া, তাঁহার ভজন-পথের অত্যন্ত বিরোধী পাষণ্ড ব্যক্তির প্রতিও কোনপ্রকার দ্রোহাচরণ না করিয়া তাহার কল্যাণ কামনা করিতেন। পুরী-সহরে পরলোকগত জনৈক ঘোষ মহাশয় ঠাকুরের প্রতি বিদ্বেষ করিয়া অপরাধফলে অত্যন্ত কঠিন রোগগ্রস্ত হইয়া পড়েন। ঠাকুর মহাশয় অপ্রত্যাশিতভাবে স্বীয় ভজনস্থলী "ভক্তিকুটী" হইতে বহু দূরবর্ত্তী উক্ত ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতে গিয়া তৎকৃত হিংসাদ্বেষাদি সমস্ত ভুলিয়া গিয়া তাহাকে কৃপা করিবার জন্য তাহার শয্যা-পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলে, সেই অপরাধী সজল-নয়নে ঠাকুরের চরণে স্বকৃত অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করেন। ঠাকুর তৎক্ষণাৎ তাহাকে ক্ষমা করা মাত্রই তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। এইরূপে ঠাকুর অকৃতদ্রোহ-আচরণের আদর্শ প্রদর্শন করেন।

(৩) **সত্যসার**—পুরী-সহর-স্থিত অন্য আর একটী ঘটনায় আমরা তাঁহার সত্য-প্রিয়তার, সত্যসংরক্ষণে নির্ভীকতার ও দৃঢ়তার পরিচয় পাইতেছি। একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরিত্যক্ত পুরী-সহরের 'উড়িয়া-মঠের' একজন মহান্ত তাহার স্বভাবের পরিবর্ত্তন না করিয়াই তথাকার কতিপয় প্রধান ব্যক্তিকে কিছু অর্থাদি উৎকোচে বশীভূত করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইতে চেষ্টা করেন। তখন একমাত্র ঠাকুরই তাহার ঘোর প্রতিবাদ করিয়া হরি-গুরু-বৈষ্ণব-বিরোধ-মূলা অত্যন্ত ঘৃণিত কার্য্যের প্রশমন করেন।

(৪) **সম**—অধিক উচ্চে উঠিলে নিম্নতলস্থ উঁচু-নীচু দ্রব্যগুলি করণাপাটব-হেতু যেমন সম দৃষ্ট হয় অর্থাৎ পর্ব্বতের উচ্চ-শিখরে উঠিলে তাহার পাদদেশস্থ উন্নত ও অনুন্নত বিষম বিটপশ্রেণী, চক্ষু-ইন্দ্রিয়ের অপটুতাহেতু যেমন সম বলিয়া মনে হয়, ঠাকুরের দ্বিতীয়াভিনিবেশ-রহিত অদ্বয়-জ্ঞান-জনিত অপ্রাকৃত দৃষ্টিতে সেরূপ **বিষম সমদর্শন স্থান পায় নাই।** তিনি অন্তর্দৃষ্টিতে বিরাট হস্তী ও ক্ষুদ্র পিপীলিকার হৃদয়স্থ শুদ্ধ সনাতন জীবাত্মার একই স্বভাবে অবস্থিতি অবলোকন করায় বৈষম্য-দর্শনের প্রতিদ্বন্দ্বি-স্বরূপ শুদ্ধ **সমজ্ঞান-**সম্পন্ন। তিনি আশ্ব-গোখর-চণ্ডাল-ব্রাহ্মণাদি সকলেরই বাহ্য পোষাক পরিহিত, স্থূল-সূক্ষ্ম দেহ দেখিবার পরিবর্ত্তে, জীবমাত্রই স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস—এই জ্ঞান করিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেন। হরিসম্বন্ধী বস্তু ও মায়াসম্বন্ধী বস্তুকে কখনই সমন্বয় করিতে গিয়া তিনি এক করিয়া ফেলেন নাই।

(৫) **নির্দ্দোষ**—ঠাকুর—প্রাতঃস্মরণীয় আদর্শ মহাপুরুষ। কলিপঙ্কের দুর্গন্ধ কোনও দিনই তাঁহার পবিত্র চরিত্রে প্রবেশ করিতে পারে নাই। তিনি বেঙ্গল-সিভিল-সার্ভিসের উচ্চ-পদস্থ শাসক ও বিচারক-পদে অধিষ্ঠিত থাকিলেও তাঁহাকে কেহ কোনও প্রকার প্রলোভনে মুগ্ধ করিয়া কোন পাপ-কার্য্যের বা দুর্নীতির অনুমোদন করাইয়া লইতে পারে নাই। এমন কি, পরলোকগত নাট্যবিশারদ—ঘোষ মহাশয় তাহার নিজ-রচিত 'চৈতন্য-লীলা' নাটকখানি প্রথম অভিনয় করিবার সময়, তাঁহাকে সভাপতি-স্বরূপ সেখানে উপস্থিত থাকিবার জন্য সসম্মানে আহ্বান করিলে, তিনি তাহাতে বাহ্যতঃ প্রচুর সম্মান-লাভের প্রলোভন থাকিলেও, তাহা হেলায় উপেক্ষা করিয়া জগৎকে প্রাকৃত-সহজিয়া-ধর্ম্ম ও শুদ্ধ আচার-সম্বলিত শুদ্ধা ভক্তির অশেষ পার্থক্য প্রদর্শন করিয়া নির্দ্দোষ জীবনের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। "বৈষ্ণব চরিত্র সর্ব্বদা পবিত্র।"

(৬) **বদান্য**—ঠাকুর—কৃষ্ণপ্রেম প্রদাতা মহাবদান্য শ্রীগৌরহরির প্রেম-প্রদান লীলার প্রধান সহায়ক। তজ্জন্য তিনিও মহাবদান্য। সাধারণ মিশন ও সঙ্ঘগুলির ন্যায় অস্থায়ী, অনিত্য দৈহিক ও মানসিক ক্লেশ-বিনাশ উদ্দেশ্যে তিনি কোনও প্রকারেই সময় নষ্ট করিতেন না; পরন্তু আত্মার বদ্ধদশা-প্রাপ্তিই উক্ত ক্লেশসমূহের মূল কারণ জানিয়া তাহারই মোচনের জন্য সর্ব্বদা চেষ্টিত থাকিতেন।

(৭) **মৃদু**—ঠাকুর—ভক্তিবিরোধ-দলনে যেরূপ বজ্রের ন্যায় কঠোর, অপরদিকে ভক্তির অনুকূল কার্য্যের লেশমাত্র দর্শনে কুসুম অপেক্ষাও মৃদু। তিনি কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগিগণের কঠোর, নীরস, শুষ্ক ও কৃচ্ছ্র সাধনের দ্বারা বদ্ধ জীবগণকে অযথা কষ্ট দিতে সর্ব্বদাই পরাঙ্মুখ। ক্ষণান্তরে তিনি শুদ্ধা ভক্তির কোমল, সরল, আর্দ্র ও সরল সাধনের কথা সকলকে জানাইয়া মৃদু স্বভাবের পূর্ণ আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন।

(৮) **শুচি**—ঠাকুর মহাশয় নিত্যকাল হরিভজনে রত থাকায় নিত্য শুচি। জন্ম-মরণের অশৌচ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। "মুচি হ'য়ে শুচি হয় যদি হরি

ভজে।" কৃষ্ণভজনই শুচি হইবার প্রধান লক্ষণ। মায়া বা প্রাকৃতাভিনিবেশই অশুচি। কর্ম্মের দ্বারা ও জ্ঞানের দ্বারা ইহা দূর হয় না। "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি"— এই গীতার ও "আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ"—ভাগবতের এই বাক্যই তাহার প্রমাণ। ঠাকুর এ'জন্য অশৌচ পথ হইতে চিরদিনই পৃথক্ থাকায় নিত্য শুচি।

(৯) **অকিঞ্চন** ও (১২) **কৃষ্ণৈকশরণ**—ঠাকুর "শরণাগতের অকিঞ্চনের একই লক্ষণ" (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৯৬)—এই শাস্ত্রবাক্যের মূর্ত্ত বিগ্রহ। যিনি 'আমার কিছু আছে' —এইরূপ মনে করিবেন, তিনি কৃষ্ণৈকশরণ হইতে পারেন না। তিনি জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত, শ্রী—যাবতীয় কিছুর অধিকারী হইয়াও কৃষ্ণে একান্তভাবে শরণাগত থাকায় সর্ব্বদাই অকিঞ্চনভাবে জীবন যাপন করিতেন। একদিন 'বিশ্বক্‌সেন নামক একজন প্রভূত বিভূতি-সম্পন্ন হঠযোগীকে বিচারাদালতে উপস্থাপিত করিলে, সে ক্রুদ্ধ হইয়া ঠাকুরের সন্তান-ত্রয়কে অভিসম্পাত করিয়া কঠিন রোগগ্রস্ত করিয়াছিল। তথাপি তিনি কৃষ্ণেচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া, তাহাতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত না হইয়া নির্ভীকভাবে দুষ্টের দমন করিয়া-ছিলেন। ঠাকুরের "শরণাগতি" নামক ভজন-গীতি গ্রন্থখানি পড়িলেই মনে হইবে যে, তিনি শরণাগতের যাবতীয় ছয়টী লক্ষণের আদর্শ মহাপুরুষ।

(১০) **সর্ব্বোপকারক**—ঠাকুর যাবতীয় প্রাণীরই উপকারক। মনুষ্যের আর কথা কি? কোনও প্রকার হিংসা তাঁহার হৃদয়কে কখনও স্পর্শ করিতে না পারায় তিনি প্রকৃত অহিংস। মৎস্য-মাংস-আমিষাদি অমেধ্য আহার না করিয়া পরম সাত্ত্বিক নির্গুণ ভগবৎপ্রসাদ-দ্বারা জীবন-ধারণ করায় তিনি পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, বৃক্ষ-লতা, জল-জীব প্রভৃতি সকলের প্রতিই অহিংস-আচরণের দ্বারা সদয় ব্যবহার করিয়াছেন। সর্ব্বোপরি, প্রাণীমাত্রেরই কৃষ্ণ-বিস্মৃতি-হেতু নানা ক্লেশ-ভোগ হওয়ায়, তাহাদের আত্মার সদ্‌গতি বিধানকল্পে ঠাকুরের যে চেষ্টা—তাহাই তাঁহাকে সর্ব্বোপকারক বলিয়া জগদ্বিখ্যাত করিয়াছে।

(১১) **শান্ত** ও (১৩) **অকাম**—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুদুর্লভ বৈষ্ণবের লক্ষণ বর্ণন করিতে গিয়া বলিয়াছেন—

> কৃষ্ণভক্ত—**নিষ্কাম,** অতএব **শান্ত**।
> ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধি-কামী সকলি অশান্ত॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৪৯)

ঠাকুরের জীবনীতে এই বাক্যের পূর্ণ সার্থকতা দেখা যায়। খৃষ্টিয়ানী, ব্রাহ্মণ, পাঁচমিশালী, খেয়ালী, স্মার্ত্ত প্রভৃতি পার্থিব ধর্ম্ম ও বিপ্লববাদি তাঁহার চিত্তের প্রশান্ত-ভাব নষ্ট করিতে পারে নাই। এমন কি, ঠাকুরের যৌবনে প্রচণ্ড সিপাহী-বিদ্রোহ যখন সমগ্র রাষ্ট্রকে বিচলিত করিয়াছিল, তখনও তিনি অশান্ত-ভাব প্রদর্শন করিয়া নিজ-কার্য্য ও ধর্ম্ম

হইতে মুহূর্ত্তের জন্যও বিচলিত হন নাই। তাঁহার নিষ্কাম হৃদয় কখনও কর্ম্মীর ন্যায় ভোগ, জ্ঞানীর ন্যায় মোক্ষ ও যোগীর ন্যায় ত্যাগ-কামনায় প্রলুব্ধ হয় নাই। কর্ম্মী, জ্ঞানী প্রভৃতির প্রাপ্য-বস্তু অস্থায়ী; সুতরাং তাহারা অশান্ত।

(১৪) **নিরীহ**—ঈহা যস্য হরের্দ্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥
(হঃ ভঃ বিঃ ১৷২৷৮৩-ধৃত নারদীয়-বচন)

ঠাকুর-মহাশয় কায়মনোবাক্যের দ্বারা সর্ব্বাবস্থায় সকল সময় শ্রীহরির সেবায় ঈহাযুক্ত থাকায় তিনি নিরীহ অর্থাৎ ঈহাশূন্য বা চেষ্টাশূন্য। নিরীহ বলিতে—তিনি কখনই ভগবৎ-সেবা চেষ্টা-রহিত হইয়া নির্জ্জনে বসিয়া ভজনের নাম করিয়া আলস্যের প্রশ্রয় দিতেন না। তিনি নিরীহ হইয়া সাধুসঙ্গের প্রণালী শিক্ষা দিবার যে চেষ্টা বা আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদের ভাষায় নিম্নে উদ্ধৃত হইল—"সাধুকে অসাধু-জ্ঞানে বা উপেক্ষামূলে সাধুজন-সঙ্গ-ত্যাগরূপ নির্জ্জন-ভজন বা দুঃসঙ্গ-স্পৃহা পরিত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গে কৃষ্ণানুশীলনই 'জনসঙ্গ'-ত্যাগ; তাদৃশ দুর্জ্জন-সঙ্গ-বিহীন নিরপরাধ ভজনেই অপ্রাকৃত রসের উদয় হয়,—ইহাই ঠাকুরের শিক্ষা"।

(১৫) **স্থির**—ঠাকুর মহাশয় স্বীয় আরাধ্য দেবতা শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবায় ও তাঁহার প্রতিকূল-বর্জ্জনে স্থির-নিশ্চয় ছিলেন। একমাত্র নিরন্তর শ্রীনাম-গ্রহণ ব্যতীত কপিলের সিদ্ধি-লালসায়, পতঞ্জলির যোগ-সাধনে, বৌদ্ধের শূন্য-মার্গে, অদ্বৈত-বাদীর স্বকপোল-কল্পিত 'সো'হহং-চিন্তায়, জৈমিনির বৈদিক কর্ম্ম-কুশলতা প্রভৃতি বঞ্চনাময়ী অনিত্যা চেষ্টায় চিত্ত কখনও স্থির হইতে পারে না—ইহা শ্রীল ঠাকুর নিরন্তর নিরপরাধে হরিনাম কীর্ত্তন করিয়া জগজ্জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন। ঠাকুর স্বয়ং শরণাগতি-গ্রন্থে গাহিয়াছেন—

তুয়া পদবিস্মৃতি, আ-মর যন্ত্রণা, ক্লেশ-দহনে দহি' যাই।
কপিল-পতঞ্জলি, গৌতম-কণভোজী, জৈমিনি-বৌদ্ধ আওয়ে ধাই'॥
তব্ কোই নিজমতে, ভুক্তি-মুক্তি যাচত, পাতই নানাবিধ ফাঁদ।
সো-সবু—বঞ্চক, তুয়া ভক্তি-বহির্ম্মুখ, ঘটাওয়ে বিষম পরমাদ॥

(১৬) **বিজিত-ষড়্গুণ,** (১৭) **মিতভুক্** ও (১৮) **অপ্রমত্ত**—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য অথবা ক্ষুধা-তৃষ্ণা, ভয়-দম্ভ, জরা-মৃত্যু—এই ছয়টী রিপু ঠাকুরকে কখনও আক্রমণ করিতে না পারায় তিনি **বিজিত-ষড়্গুণ।** ঠাকুর কৃষ্ণভক্ত—অতএব নিষ্কাম; নিত্যানন্দময়—অতএব অক্রোধ; লব্ধ-কৃষ্ণ ও প্রসাদসেবী—অতএব নির্লোভ ও **মিতভুক্** অর্থাৎ—"জিহ্বার লালসে যেই ইতি-উতি ধায়। শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥"—ইহাই ঠাকুরের শিক্ষা। ঠাকুর সম্বন্ধ-জ্ঞানের আচার্য্য—অতএব মোহশূন্য; কৃষ্ণপ্রেমে সমাধিস্থ—অতএব মদহীন, **অপ্রমত্ত**; তৃণাদপি সুনীচ—অতএব মাৎসর্য্য-

রহিত। তিনি তারকব্রহ্ম ষোল-নাম সংখ্যাত অসংখ্যাত অহর্নিশ উচ্চকীর্ত্তন-রত বলিয়া ক্ষুধা-তৃষ্ণা-রহিত ; দ্বিতীয়াভিনিবেশ-শূন্য-হেতু ভয়হীন ; মানদ-হেতু দম্ভশূন্য ; আত্ম-শরীরে ও অপ্রাকৃত দেহে নিত্য অবস্থিত থাকায় জরা-মৃত্যুর অতীত। তিনি বিশ্ববাসীকে আত্ম-ধর্ম্মে আনয়ন করিবার জন্য ঠাকুর নরোত্তমের উপদেশ নিজে আচরণ করিয়া শিক্ষা দিয়াছেন—

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, দম্ভসহ,
স্থানে স্থানে নিযুক্ত করিব।
আনন্দ করি' হৃদয়, রিপু করি' পরাজয়,
অনায়াসে গোবিন্দ ভজিব॥
কাম কৃষ্ণ-কর্ম্মার্পণে, **ক্রোধ** ভক্ত-দ্বেষি-জনে,
লোভ সাধুসঙ্গে হরিকথা।
মোহ ইষ্ট-লাভ বিনে, **মদ** কৃষ্ণ-গুণ-গানে,
নিযুক্ত করিব যথা তথা॥
অন্যথা স্বতন্ত্র কাম, অনর্থাদি যার ধাম,
ভক্তি-পথে সদা দেয় ভঙ্গ।
কিবা সে করিতে পারে, কাম-ক্রোধ সাধকেরে,
যদি হয় সাধুজনার সঙ্গ॥
ক্রোধ বা না করে কিবা, ক্রোধ-ত্যাগ সদা দিবা,
লোভ মোহ এইত কথন।
ছয় রিপু সদা হীন, করিব মনের অধীন,
কৃষ্ণচন্দ্র করিয়া স্মরণ॥ (প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা—২)

(১৯) **মানদ** ও (২০) **অমানী**—"অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"—শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই বাক্য তিনি নিজ-জীবনে অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া সকলকে শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি সামাজিক বা লৌকিক সম্মান রক্ষা করিতে গিয়া পারমার্থিক সম্মানের মর্য্যাদা হানি করেন নাই। একদিকে যেমন বাহ্যতঃ যজ্ঞসূত্র বা মালা-তিলকধারী জাতি-গোঁসাই বা শৌক্র-ব্রাহ্মণব্রুবকেও যথাযোগ্য সম্মান দিতে কুণ্ঠিত হন নাই, অপরদিকে জগতে পরমার্থের সর্ব্বোত্তম মর্য্যাদা সংরক্ষণ করিতে গিয়া বৈষ্ণবগুরুর অবজ্ঞা-কারী ও বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিকারী পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষাগুরুকেও পরিত্যাগ করিতে কোনও দ্বিধা বোধ করেন নাই। ইহাই ঠাকুরের "তৃণাদপি সুনীচেন" শ্লোকের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত-স্বরূপ ঠাকুর বৃন্দাবনের "এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে। তবে লাথি মারোঁ তার শিরের উপরে॥" (চৈঃ ভাঃ ৯।২২৪)—বাক্যের মূল আদর্শ শিক্ষার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন।

(২১) **গম্ভীর**—স্বীয় আরাধ্যের প্রতি অচলা সেবা-প্রবৃত্তি থাকায় শ্রীল ঠাকুরকে কোনও মতবাদই স্বস্থান হইতে বিচলিত করিতে পারে নাই। এতদ্ব্যতীত তাঁহার স্ব-ভজন-প্রণালীর উন্নততম ভাবসমূহ এত গভীর যে, তাহা সাধারণ লোক দূরে থাকুক, তাঁহার নিজ অনুগত জনও ভাল করিয়া বুঝিতে পারিত না। এরূপ গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ভজনানন্দী মহাপুরুষ অতি অল্পই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

(২২) **করুণ**—ঠাকুর-মহাশয় ভগীরথের ন্যায় বর্ত্তমান জগতে শুদ্ধভক্তি-মন্দাকিনী-স্রোত পুনঃ প্রবাহিত করিয়া অনর্থযুক্ত ও নরকগামী অসংখ্য জীবকে পবিত্র ও উদ্ধার করিয়া মহা-কারুণ্যামৃত-সাগরের উত্তাল তরঙ্গ-স্বরূপ।

(২৩) **মৈত্র**—"ভগবদ্ভক্তের সহিত তাঁহার সখ্য অতুলনীয় ছিল। ভগদ্ভক্তের সহিত কৃষ্ণকথালাপে ও তাঁহার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানে ঠাকুরের গেহ, দেহ, অর্থাদি সর্ব্বস্ব উন্মুক্ত ছিল। নিষ্কপট হরিভজন-প্রয়াসীর পক্ষে তাঁহার নিজস্ব সমস্তই অবারিত-দ্বার ছিল। তিনি শুদ্ধভক্তকে আহার, বসন, বাসস্থান-প্রদানে কখনই কুণ্ঠিত ছিলেন না। বর্দ্ধমান-জিলান্তর্গত আমলাযোড়া গ্রাম-নিবাসী নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ সরকার ও শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সরকার মহাশয়দ্বয়ের সহিত তাঁহার স্নেহ-মৈত্রী অতুল ও আদর্শ-স্থল ছিল—তাঁহাদের বিয়োগে তিনি **গভীর স্বজন-বিচ্ছেদ-দুঃখ** অনুভব করিয়াছিলেন। নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট শ্রীগৌরজন **ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের** সহিত তিনি চিরজীবন অচ্ছেদ্য প্রণয়-বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন—বাবাজী মহারাজের সেবার স্বষ্ঠুতা-সম্পাদনে তিনি পরম আনন্দ লাভ করিতেন।"

(২৪) **কবি**—ঠাকুর-মহাশয়ের কবিত্ব-সম্বন্ধে তাঁহার স্বরচিত শরণাগতি, গীতাবলী প্রভৃতি গীতি-কাব্য-গ্রন্থরাশিই প্রকৃষ্ট পরিচয়। প্রাকৃত জড়রসের কবিগণ জীবনিচয়কে ক্রমশঃ ইন্দ্রিয়তর্পণের দিকে প্রধাবিত করে, কিন্তু ঠাকুরের কাব্য—জীবমাত্রকেই ভোগ-মোক্ষের হাত হইতে "রসো বৈ সঃ" ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে নিত্য-সেবানন্দ-সমুদ্রে নিক্ষেপ করে; বিবেকহীন মতিচ্ছন্নের বাক্যামৃতের ন্যায় কখনও অসৎ ফল প্রসব করে না।

(২৫) **দক্ষ**—"শ্রীগৌরসুন্দর যেমন অপ্রাকৃত কাব্যরসে শ্রীরূপকে, বৈধ-ভক্তির আচার্য্যরূপে শ্রীজীবগোস্বামীকে, সম্বন্ধজ্ঞানের আচার্য্যরূপে শ্রীল সনাতন প্রভুকে, রাগানুগা ভক্তির আচার্য্যরূপে শ্রীদাসগোস্বামীকে, গৌরমহিমা-প্রচারকার্য্যে শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীকে, বৈষ্ণবস্মৃতি-সঙ্কলন-কার্য্যে শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীকে, শ্রীভাগবতের পঠন-পাঠন-কার্য্যে শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীকে, শ্রীনামহট্ট-প্রচারকার্য্যে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীহরিদাসকে দক্ষতা দিয়াছিলেন, তদ্রূপ ঠাকুরমহাশয়কেও শ্রদ্ধাভক্তি-প্রকাশ-কার্য্যে **সর্ব্ববিধ দক্ষতা** দিয়া পাঠাইয়াছিলেন।" তাঁহার **১৮৮০ খৃষ্টাব্দের রচিত শ্রীকৃষ্ণ-সংহিতা** প্রভৃতি বিপুল গ্রন্থরাজির বহু সংস্করণ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-সংরক্ষণ-কার্য্যে অদ্ভুত দক্ষতার পরিচয় দিতেছে।

(২৬) **মৌনী**—সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তন করাই মৌনের প্রধান লক্ষণ। গ্রাম্য-কথা বা বিষয়-প্রজল্প বন্ধ করাই, মৌনবৃত্তির উদ্দেশ্য—হরিকথা বন্ধ করা, তাহার লক্ষ্যের বিষয় নহে। যিনি হরিকথা কীর্ত্তন ও আলোচনা বন্ধ করিয়া 'মৌনী-বাবা' সাজিতে চা'ন, তিনি ভণ্ড। ঠাকুর মহাশয় নিজ আদর্শে তাহা সকলকে শিক্ষা দিয়াছেন। কোনও বিষয়ী কৃষ্ণেতর বিষয়-কথা লইয়া অথবা কোনও বিশ্ব-নিন্দুক বৈষ্ণবের নিন্দাবাদ লইয়া জিহ্বা-লাম্পট্য প্রদর্শন করিতে আসিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে অসম্ভাষ্য-জ্ঞানে মৌন অবলম্বন করিতেন। ঠাকুরের স্বরচিত 'কল্যাণকল্পতরু' গ্রন্থখানি তাঁহার আদর্শের পরিচয় প্রদান করিতেছে—

"বৈষ্ণব-চরিত্র, সর্ব্বদা পবিত্র, যেই নিন্দে হিংসা করি'।
ভকতিবিনোদ, না সম্ভাষে তারে, থাকে সদা মৌন ধরি'॥"

আমরা অদ্য ঠাকুরের **বিরহ দিবসে** তাঁহার বহু গুণাবলীর মধ্যে চরিতামৃতকারের উল্লিখিত কয়েকটী গুণের আলোচনা করিয়া ক্ষান্ত হইলাম। সমস্ত গুণগুলি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ঠাকুরের হৃদয়ে অবস্থান করতঃ যেন পরা শান্তিতে বিশ্রাম লাভ করিতেছে। গুণ-গুলির সৌভাগ্য যে, তাহারা ঠাকুরের ন্যায় মহাভাগবতোত্তম মহাপুরুষের আশ্রয় পাইয়া জীবন সার্থক করিয়াছে।

শ্রীল ঠাকুর নরহরি ও বাবা অনঙ্গমোহনের স্মৃতি

অদ্য শ্রীল ঠাকুরের বিরহ-তিথি-দিবসে তাঁহার প্রবন্ধাবলী প্রকাশ করিতে গিয়া শ্রীল ভক্তিবিনোদ-ধারায় নিত্যস্নাত শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত সমিতির উজ্জ্বল নক্ষত্রদ্বয় পরম সুহৃদ্ **শ্রীল ঠাকুর নরহরি** ও পরম স্নেহাস্পদ **বাবা অনঙ্গমোহনের** কথা স্মরণ হইতেছে। তাঁহারা ইহলোকে প্রকট থাকিলে এই গ্রন্থ সঙ্কলন-কার্য্যে প্রচুর আনন্দ প্রকাশ করিয়া আমাকে উৎসাহ প্রদান করিতেন। এই গ্রন্থ তাঁহাদের স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য সহৃদয় সজ্জন-গণের করকমলে সমর্পণ করিলাম।

—৩২ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭ (ইং ১৫।৬।১৯৫০)।

'শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ'-গ্রন্থের ভূমিকা

নম্র নিবেদন

গ্রন্থের বিভিন্ন সংস্করণ

"শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ" গ্রন্থখানি ভজনানন্দী গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের জীবন-স্বরূপ। ইহার অভাব ভজনানন্দী বৈষ্ণববর্গ বহুদিন হইতে অনুভব করিতেছিলেন। শ্রীল গুরুপাদ-পদ্মের প্রেরণাক্রমে এই গ্রন্থ পুনরায় মুদ্রিত হইল। অনুমান পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ব্বে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী' নামক একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকায় ক্রমশঃ ইহা প্রকাশ করিয়াছিলেন। মদীয় গুরুদেব জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর ৩০ বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রন্থখানি সম্পাদন করিয়াছিলেন। আমি তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ইহা পুনরায় সম্পাদন করিলাম।

বর্ত্তমান সংস্করণ 'প্রথম সংস্করণ'রূপে উল্লিখিত হইবার কারণ

যদিও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদানুগ পরিচয় দিয়া কোন অপসম্প্রদায় "শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা"-নামক গ্রন্থে ইহা প্রকাশ করিয়াছেন, তথাপি তাহাকে কোন সংস্করণ বলিয়া গণ্য করা হইল না। কারণ তাঁহারা গুরু-পাদপদ্মের প্রকাশের বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য করেন নাই, এতদ্ব্যতীত তাহাতে কোনরূপ সংস্করণ-বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় নাই। উহাকে কেবলমাত্র পুনর্মুদ্রণই বলা যাইতে পারে।

যদিও ইহা তৃতীয় সংস্করণ, তথাপি **শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি** হইতে এই গ্রন্থখানি সর্ব্বপ্রথম অভিনব আকারে ও সংস্করণে প্রকাশিত হওয়ায় ইহার সর্ব্বসত্ত্ব-সংরক্ষিত হইয়া **প্রথম সংস্করণ**রূপে প্রকাশিত হইল। * *

শ্রীনবদ্বীপ-ধাম সম্বন্ধে অন্যান্য গ্রন্থের পরিচয়

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ নবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমা সম্বন্ধে "শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য" গ্রন্থে বিস্তারিত সকল কথা বর্ণন করিয়াছেন। তাহাও বাংলা-ভাষায় পয়ারছন্দে রচিত। এতদ্ব্যতীত তিনি "শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যম্—প্রমাণখণ্ডঃ" নামক সংস্কৃত-ভাষায় মহাজন-গণের প্রমাণাদি উদ্ধার করিয়া পৃথক্ আর একখানি গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছেন। শ্রীল রূপ-গোস্বামিপাদ-কৃত "শ্রীনবদ্বীপ-স্তোত্রম্," শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ-কৃত "শ্রীনবদ্বীপ-শতকম্," শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-কৃত "শ্রীভক্তিরত্নাকর" ও অন্যান্য বহু গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপ-মহিমা বর্ণিত হইয়াছে।

দেশকালাতীত নিত্যধামের পরিচয়

উক্ত গ্রন্থাদি আলোচনা করিলে জানিতে পারা যায়, শ্রীনবদ্বীপ-ধামের ন্যায় মথুরা, বৃন্দাবনাদিও নিত্য বৈকুণ্ঠধাম। সাধারণতঃ নবদ্বীপ-ধামকে গুপ্ত-বৃন্দাবন-ধাম বলিয়া থাকে। প্রকৃত-প্রস্তাবে নবদ্বীপ গুপ্ত-বৃন্দাবন কিংবা বৃন্দাবনই গুপ্ত-নবদ্বীপ—ইহা বলা কঠিন। শ্রীল রূপ, শ্রীল সনাতন, শ্রীপ্রবোধানন্দ, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি পরম মুক্ত মহাজনগণ বৃন্দাবনে থাকিয়া গৌরলীলা আস্বাদন করিয়াছেন। আবার শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ, শ্রীল গৌরকিশোর দাস, শ্রীল জগন্নাথ দাস, শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল বংশীদাস বাবাজী প্রভৃতি শ্রীনবদ্বীপ-ধামে থাকিয়া কৃষ্ণলীলা আস্বাদন করিয়াছেন।

অপ্রাকৃত নবদ্বীপ-ধামের প্রতি-বালু-কণাই বৈকুণ্ঠ, অর্থাৎ সঙ্কোচ-বিকোচরূপ সীমা-বদ্ধ প্রাদেশিকতার ময়লা তাহাতে নাই। সুতরাং তাহাতে রাম, কৃষ্ণ ও গৌরলীলা যুগপৎ একই বিগ্রহে একই স্থানে অবস্থিত।

গ্রন্থখানি যুগপৎ গৌর ও কৃষ্ণলীলা-প্রকাশক

'শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ' গ্রন্থখানি একাধারে যুগপৎ গৌর ও কৃষ্ণলীলা-প্রকাশক। ইহাই গ্রন্থকর্ত্তার পরম উন্নততম ভজন-বৈশিষ্ট্য। গ্রন্থকার নবদ্বীপ-ধাম-বাসের প্রকৃত ফল, 'গ্রন্থপাঠের ফল'-শিরোনামা অধ্যায়ে বর্ণন করিয়াছেন। পাঠকবর্গ যত্ন-সহকারে এই গ্রন্থ পাঠ করিলে ভজনের সর্ব্বোত্তমতা লাভ করিবেন সন্দেহ নাই।

ধামাপরাধ পরিত্যাজ্য

ধামাপরাধ না করিয়া ধামে অবস্থান করাই ধামবাসীর কর্ত্তব্য। ধামের প্রতি অপরাধ হইলে আমাদের সর্ব্বতোভাবে ভজনে বিঘ্ন ঘটিবে। তজ্জন্য দশবিধ ধামাপরাধ পাঠকবর্গের সাবধানের জন্য নিম্নে উল্লিখিত হইল।—

(১) ধাম-প্রদর্শক শ্রীগুরুর অবজ্ঞা, (২) ধামকে অনিত্যবোধ, (৩) ধামবাসী ও ভ্রমণকারীর প্রতি হিংসা ও জাতিবুদ্ধি, (৪) ধামে বসিয়া বিষয়-কার্য্যাদির অনুষ্ঠান, (৫) শ্রীধাম-সেবাচ্ছলে শ্রীনাম-বিগ্রহের ব্যবসায় ও অর্থোপার্জ্জন, (৬) জড়বুদ্ধিতে ধামের সহিত জড়দেশের অথবা অন্য দেব-তীর্থের সমজ্ঞান ও পরিমাণ-চেষ্টা, (৭) ধাম-বাসচ্ছলে পাপাচরণ, (৮) নবদ্বীপ ও বৃন্দাবনে ভেদজ্ঞান, (৯) শ্রীধাম-মাহাত্ম্যমূলক শাস্ত্রের নিন্দা এবং (১০) ধাম-মাহাত্ম্যে অবিশ্বাস-মূলে অর্থবাদ ও কল্পনা-জ্ঞান।

—শ্রীব্যাসপূজা-বাসর, মাঘী কৃষ্ণা-পঞ্চমী
৫ই গোবিন্দ, ৪৬৪ গৌরাব্দ (ইং ২৬।২।১৯৫১)

'প্রেম-প্রদীপ'-গ্রন্থের ভূমিকা

প্রদীপ-শিখা

'প্রেম-প্রদীপ'-গ্রন্থ প্রকাশের উদ্দেশ্য

ভারত স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে, কি দুর্দ্দশা লাভ করিয়াছে, সাধারণ লোক তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। মানুষকে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে দৈনন্দিন জীবনে যে কয়েকটী দ্রব্যের একান্ত আবশ্যক, তাহার প্রত্যেকটীরই অত্যন্ত অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। প্রধানতঃ আহারের অভাব, দ্বিতীয়তঃ পরিধেয় বস্ত্রের অভাব, তৃতীয়তঃ স্বচ্ছন্দ-বাসগৃহের অভাব—সর্ব্বত্রই এইরূপ অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। দেশ স্বাধীন হইলে এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত থাকিতে হইবে জানিতে পারিলে, লোকে এইরূপ স্বাধীনতা চাহিত কি না সন্দেহের বিষয় হইয়াছে। এইরূপ দুর্দ্দিনে কেহই শান্তি খুজিয়া পাইতেছে না,—এমন সময়ে শান্তির সন্ধান দিবে কে?

আমরা 'প্রেম-প্রদীপ'-গ্রন্থের লেখক শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের জীবনী হইতে জানিতে পারি, তিনি সিপাহী-বিদ্রোহের সময় ও উড়িষ্যার সদ্য পরাধীনতার পর, দেশের দুর্দ্দিনের মধ্যে যে দেশ-শান্তির বাণী প্রচার করিয়াছিলেন, তাহারই প্রতিধ্বনি-স্বরূপ তাঁহার রচিত গ্রন্থ **'প্রেম-প্রদীপ'** ৬৫ বৎসর পরে পুনঃ প্রজ্জ্বালিত হইল। তৎকালে ব্রাহ্মগণ আরব্য ও পারস্য-শিক্ষা-প্রভাবে হিন্দু-হিংসা, বিগ্রহ-বিদ্বেষ, শুভকর্ম্ম-কদন, সমাজ-সংহার প্রভৃতি কার্য্যে লিপ্ত থাকায় দেশে ভয়ানক দুর্দ্দিন উপস্থিত করিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে যোগিগণের শারীরিক 'কসরৎ' ও নিরীশ্বর চিন্তাস্রোত জগৎ-ধ্বংসের সহায়তা করে। এই 'প্রেম-প্রদীপ'-গ্রন্থখানি তদানীন্তনকালে উহাদের প্রতিবন্ধক-স্বরূপে সুদিন আনয়ন করিয়াছিল। সৌভাগ্যের বিষয়, বলিতে কি, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অক্লান্ত চেষ্টায় ব্রাহ্ম সমাজ ও নিরীশ্বর যোগী-সম্প্রদায়ের হস্ত হইতে ভারত রক্ষা পাইয়াছে; এমন কি, তাঁহারই অনুগ্রহে আজ ভারত হইতে ব্রাহ্ম ও যোগিগণ বিলুপ্তপ্রায়। তথাপি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে তত্তদ্ধর্ম্মযাজী স্বল্প সংখ্যক দুই চারিজন ব্যক্তি বর্ত্তমানেও দৃষ্ট হওয়ায় তাহাদের বুদ্ধি সংশোধনের জন্য ও বর্ত্তমান দুর্দ্দশায় বিশ্বের পরাশান্তি কামনায় এই গ্রন্থখানি পুনঃ প্রকাশিত হইল। জীব-হৃদয়ে 'প্রেম-প্রদীপের' শিখা প্রদীপ্ত হইলেই যাবতীয় ক্লেশের নিবৃত্তি হইবে।

এতৎপ্রসঙ্গে গ্রন্থকর্ত্তা এই গ্রন্থের অন্তঃপ্রচ্ছদে (Inner title) শ্রীমদ্ভাগবতের যে আদর্শ শিক্ষা-শ্লোকটী উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিয়া গ্রন্থ-প্রকাশের উদ্দেশ্য সমাপন করিতেছি।

"তদেব রম্যং রুচিরং নবং নবং, তদেব শশ্বন্মনসো মহোৎসবম্।
তদেব শোকার্ণবশোষণং নৃণাং, যদুত্তমশ্লোকযশোঽনুগীয়তে ॥"

(ভাঃ ১২।১২।৫০)

শ্রীল প্রভুপাদের ভাষায় উক্ত শ্লোকের ভাবার্থ এই যে, "ভগবৎ-কথাই জীবের নিত্যমঙ্গল উৎপন্ন করে। ভগবদ্-যশঃকীর্ত্তন মানবগণের অভাবজনিত দুঃখ-সমুদ্রের অগাধ জল শুষ্ক করিতে সমর্থ। ভগবানের কথাই জীবের মনোবৃত্তির নিত্য-মহোৎসব-সাধনে সমর্থ, ঐ কথা নব-নবায়মান হইয়া পরম-রুচিপ্রদ ও রমণীয়। কৃষ্ণেতর কথা জীবের চিত্তবৃত্তিকে শোক-সমুদ্রে ডুবাইয়া দেয়। ভগবৎ-কীর্ত্তি-কথা অভাবের পরিবর্ত্তে স্বাভাবিক বৈচিত্র্যে জীবের স্বাস্থ্য প্রদান করে।"

গ্রন্থ-পরিচয়

চারিশত চৈতন্যাব্দ, ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ, ১২৯৩ বঙ্গাব্দে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই গ্রন্থখানি গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ করিয়া তাহার এইরূপ পরিচয় দিয়াছিলেন,— "(ইহা) পবিত্র হরিভক্তির উৎকর্ষ, যুক্তির অকর্ম্মণ্যতা, শুষ্ক যোগ-চেষ্টার নৈষ্ফল্য ও ব্রাহ্মাদি-ধর্ম্মের অপকর্ষ-প্রদর্শক **উপন্যাস**।" তাঁহার উক্ত সংস্করণে কোন ভূমিকা লিপিবদ্ধ না থাকিলেও, তিনি স্বাধীন ত্রিপুরাধীশ মহামান্য বীরচন্দ্র মাণিক্য মহারাজ বাহাদুরের উদ্দেশ্যে যে উৎসর্গ-পত্র লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা হইতেও আমরা এই গ্রন্থের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়া থাকি। যথা—

"পবিত্র বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিবার মানসে আমি এই **'প্রেম-প্রদীপ'** গ্রন্থ রচনা করিয়া আমার **"সজ্জনতোষণীতে"** খণ্ড খণ্ড করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলাম। ইহার দ্বারা অনেক কৃতবিদ্য যুবকের কৃষ্ণভক্তি লাভ হইয়াছে। অধুনা তাঁহাদের ইচ্ছামতে এই গ্রন্থখানি পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিলাম। মহারাজের বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ও তৎপ্রচারার্থে অসীম ব্যয়শীলতা দৃষ্টি করিয়া কৃতজ্ঞতা-সহকারে ইহাকে মহারাজের নিরন্তর হরিসেবা-রত কর-কমলে অর্পণ করিলাম। এই গ্রন্থের বিষয়টী কোন সময় আপনকার বিদ্বৎসভায় আলোচিত হইলে আমার পরিশ্রম সার্থক হইবে।" ইত্যাদি।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সংস্কৃত, বাংলা, ইংরাজি, হিন্দি, উর্দ্দু প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁহার প্রত্যেকখানি গ্রন্থই যাবতীয় শাস্ত্রের সার-সঙ্কলন। 'প্রেম-প্রদীপ' গ্রন্থখানিও তাহা হইতে ভিন্ন নহে।

উপন্যাসিকতা

সাধারণ উপন্যাস যে-প্রকার ভোগপর চিন্তাস্রোত লইয়া গ্রথিত হইয়া থাকে, 'প্রেম-প্রদীপ' তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। উপন্যাসে স্ত্রী-চরিত্র যেরূপভাবে বর্ণিত হয়,

তাহাতে পাঠকবর্গের চিত্ত স্বভাবতঃই ভোগপর ধারণার ইন্ধন যোগায়। এই গ্রন্থে কিঞ্চিৎ স্ত্রী-চরিত্রের বর্ণন থাকিলেও তাহাতে পূজ্য ও গৌরব-ভাব-বর্জ্জিত কোন অসৎ-চিন্তার প্রশ্রয় দেওয়া হয় নাই। তজ্জন্যই ইহাকে কেবল উপন্যাস না বলিয়া ইহাকে 'পারমার্থিক' শব্দের দ্বারা বিশেষিত করত **'পারমার্থিক উপন্যাস'** আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। আজকাল অনেকেরই উপন্যাস-পাঠে রুচি দৃষ্ট হইতেছে। তজ্জন্য তাঁহাদের রুচির অনুকূলে পারমার্থিক শিক্ষার সুযোগ প্রদানের জন্য এই উপন্যাস-গ্রন্থখানি বিশেষ আবশ্যক-বোধে পুনঃ প্রকাশিত হইল।

বর্ত্তমান সংস্করণের বৈশিষ্ট্য

পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা বর্ত্তমান সংস্করণের অনেক বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হইবে। * * বিশেষতঃ জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস-স্বামী **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী** প্রভুপাদ-প্রবর্ত্তিত সম্ভোগবাদ-নিরসনপর বিপ্রলম্ভ-ভজনানুকূল-ধারা অবলম্বন-পূর্ব্বক ইহা প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। ইহাও এই গ্রন্থ সম্পাদনের একটী বিশেষ বৈশিষ্ট্য। * * নিম্নে যোগ ও ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম সম্বন্ধে দুই একটী বক্তব্য নিবেদন করিয়া 'প্রদীপ-শিখা' নির্ব্বাপিত করিব।

যোগ-ধিক্কার

গ্রন্থকার এই গ্রন্থে নিরীশ্বর সাংখ্য-দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা না করিয়া কেবলমাত্র পাতঞ্জল-যোগ-দর্শনেরই হেয়তা প্রদর্শন করিয়াছেন। নিরীশ্বর সাংখ্য সর্ব্বতোভাবে উপেক্ষিত বলিয়া উহার কথা আলোচিত হয় নাই। সাংখ্যকার প্রকৃতিতে সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব আরোপ করিতে গিয়া পুরুষকে 'নিষ্ক্রিয়', শব্দমাত্র ও সংখ্যা-পূরণ-জন্য স্বীকার করিয়াছেন। তজ্জন্যই সাংখ্যকার চতুর্ব্বিংশতি প্রাকৃত তত্ত্বস্থলে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব-সংখ্যা বিচারাভিনয় করিয়াছেন। সাংখ্যকার বলেন—প্রকৃতির অন্তর্গত তত্ত্বসমূহের বিচারের দ্বারা জ্ঞানোৎপত্তি হইলে সমুদয় দুঃখের নিবৃত্তি হইয়া থাকে এবং তাহাই মোক্ষ। বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, ইতিহাসাদি সমস্ত শাস্ত্রই ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন—প্রাকৃত জ্ঞানে অপ্রাকৃত মোক্ষলাভের সম্ভাবনা অসম্ভব। সুতরাং সাংখ্য-যোগকে বেদান্ত-দর্শন ধিক্কার করিয়াছেন। পতঞ্জলির অষ্টাঙ্গ-যোগেও পরমব্রহ্ম-জ্ঞান হওয়া অসম্ভব, অধিকন্তু অষ্টাঙ্গ-যোগ ঈশ্বর মানিলেও সাংখ্য-যোগেরই প্রতীক। সুতরাং তাহাও ঐরূপ বুঝিতে হইবে।

ব্রাহ্মের নির্ব্বাণ

নবীন ধর্ম্মপ্রচারক ব্রাহ্মাচার্য্য রাজা রামমোহন রায় বৈষ্ণব-বিদ্বেষ করিতে গিয়া তাঁহার আদরের ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্ম-সমাজের নির্ব্বাণ-সাধন করিয়াছেন। তিনি বৈষ্ণব-গণকে আক্রমণ করিতে গিয়া, শ্রীমদ্ভাগবত-সম্বন্ধে গরুড়-পুরাণের 'ভাষ্যোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রানাম্'

এই শ্রীব্যাসবাণীর প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি শ্রীমদ্ ভাগবতকে 'ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য' বলিয়া গ্রহণ করিবার মত শিক্ষালাভ করেন নাই। তাঁহার ন্যায় পণ্ডিত ব্যক্তি মুসলমানী আরবী ও পার্সী পড়িতে গিয়া মুসলমানের চিন্তাধারায় প্রবুদ্ধ হইয়াছিলেন। বৈষ্ণব-সমাজ ও ব্রাহ্ম-সমাজ, বিদ্যা ও অবিদ্যার ন্যায় পৃথক্, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। ঈশ্বরের সেবা-কর্ম্ম আর অবিদ্যোৎপন্ন জ্ঞান কখনই এক নহে। ব্রাহ্মাচার্য্য আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলিয়াছেন—শ্রীমদ্ভাগবত কৃষ্ণ-লীলার গ্রন্থ, উহা যদি বেদান্তের ভাষ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে বেদান্তের সার্দ্ধপঞ্চশত সূত্রে কোন না কোন ক্ষেত্রে কৃষ্ণনামের উল্লেখ থাকিত। এরূপস্থলে বিশেষ বক্তব্য এই যে, কৃষ্ণনামের উল্লেখ নাই বলিয়া 'শ্রীমদ্ভাগবত বেদান্তের ভাষ্য নহে'—এরূপ বিচার অত্যন্ত অসমীচীন। কোন তত্ত্ব-বিষয় উপাখ্যানের দ্বারা বুঝান হইলে সেই উপাখ্যানের সহিত তত্ত্বের কোন সম্বন্ধ নাই—এরূপ বিচার করা অনভিজ্ঞতা ব্যতীত অন্য কিছু নহে। আধুনিক শিক্ষা-জগতে ইহাই রীতি—উপাখ্যান হইতে উপদেশ এবং উপদেশ হইতে উপাখ্যান সংগ্রহ করা। আরও লক্ষ্য করিবার বিষয়, বেদান্ত-দর্শন প্রত্যক্ষভাবে 'কৃষ্ণ'-শব্দ উচ্চারণ করেন নাই বলিয়া বেদান্তের সহিত কৃষ্ণলীলার কোন সম্বন্ধ নাই—ইহা ভ্রান্ত বিচার। সতী-সাধ্বী স্ত্রীর নিকট তাহার স্বামীর নাম জিজ্ঞাসা করিলে সে কখনই তাহা বলে না। এখন, প্রশ্নকর্ত্তা স্বামীর নাম পাইলেন না বলিয়া তাহার স্বামী নাই অথবা স্বামীর সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই, এরূপ বিচার করিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে। অত্যন্ত প্রিয় ও প্রচুর গৌরবের সহিত সম্বন্ধযুক্ত ব্যক্তির নাম অনেকেই উল্লেখ করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন। এমন কি, ব্রাহ্মাচার্য্য রাজা রামমোহন রায়ের আচরণ ও লেখনী হইতেও ইহা স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। তাঁহার পরম প্রিয় ও গৌরবের পাত্র আচার্য্য শ্রীল শঙ্করের নাম উল্লেখ করিতে সঙ্কোচ বোধ করিয়া তিনি সর্ব্বত্রই 'ভগবান্ ভাষ্যকার', 'ভগবান্ ভাষ্যকার'—এরূপ উক্তি করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং গৌরব-হেতু আচার্য্য শঙ্করের নাম উচ্চারণে যদি দ্বিধা বোধ করেন, বেদান্ত-দর্শনকার শ্রীব্যাসদেব সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম ও গৌরবময় পুরুষের নাম উল্লেখে কুণ্ঠাবোধ করিয়াছেন—এইরূপ বিচার করিলেও অসঙ্গত হইবে কি? এতদ্ব্যতীত আচার্য্য শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করিতে গিয়া **জ্ঞানই** শ্রেষ্ঠ এবং ব্রহ্মই **জ্ঞান-স্বরূপ** বিচার করিয়াছেন এবং ব্রাহ্মাচার্য্যও উহা ধ্রুবসত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। কিন্তু এস্থলে জিজ্ঞাস্য, এই 'জ্ঞান'-শব্দটী ব্রহ্মসূত্রের কোন্ সূত্রে উল্লিখিত হইয়াছে? বেদান্তদর্শনের সার্দ্ধপঞ্চশত সূত্রের মধ্যে কুত্রাপি 'জ্ঞান'-শব্দের উল্লেখ নাই। সুতরাং ব্রাহ্মাচার্য্যের উক্ত তর্ক স্বীকার করিয়া লইলে, ব্রহ্মসূত্রের জ্ঞানপর ভাষ্যও তাহার প্রকৃত ভাষ্য বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না।

—শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসর
৭ই চৈত্র ১৩৫৭ (ইং ২১।৩।১৯৫১)

জৈবধর্ম্মের প্রথম প্রস্তাবনা

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজে **'জৈবধর্ম্ম'**-গ্রন্থখানি সকলেরই সুপরিচিত। এই গ্রন্থের বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া নিতান্ত অনাবশ্যক মনে করি। বাংলা-সাহিত্যে পদ্য-ভাগের আদি-সংস্কারকগণের মধ্যে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরই প্রধান। বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, অক্ষয় দত্ত গুপ্ত, কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রভৃতি লেখকগণ এক-দিকে প্রাকৃত সাহিত্যের বিকাশ ও সম্প্রসারণ করিয়া বাংলাভাষা-রাজ্যে চির-স্মরণীয় হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের চিন্তাধারা ও 'জৈবধর্ম্ম'-গ্রন্থের লেখক শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের চিন্তাধারা অত্যন্ত পৃথক্ ও সর্ব্বতোভাবে উন্নততম। প্রাকৃত চিন্তা হইতে অপ্রাকৃত চিন্তার গাম্ভীর্য্য স্বতঃসিদ্ধ। প্রাকৃত সাহিত্যিকগণ অপ্রাকৃত চিন্তাস্রোতে অপারক হইয়া নাস্তিকী লেখনী সম্প্রসারিত করিয়া অপ্রাকৃত তত্ত্বের আচ্ছাদন করেন। যে-সকল উত্তম পুরুষ প্রাকৃত সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ না হইয়া অথবা তাহার কিঞ্চিৎকরতার প্রতি তাচ্ছিল্য করিয়া প্রকৃতির অতীত তত্ত্বের অনুসন্ধান করেন, তাঁহারাই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের লেখনী-প্রসূত পরবিদ্যা-সাহিত্য-সমুদ্রের রত্ন আহরণ করিয়া থাকেন। সেই রত্নসমূহের সর্ব্বোত্তম রত্নই শ্রী**'জৈবধর্ম্ম'**।

ভাষা ভাবের অভিব্যক্তি। শ্রীল ঠাকুর জীবমাত্রেরই আত্মস্থ ভাবসমূহের যানবাহন-স্বরূপ 'জৈবধর্ম্ম'-গ্রন্থখানিকে বঙ্গভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। এই গ্রন্থে তাঁহার চিন্তাধারা সম্পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। তিনি কোন ভাষার প্রতি বিদ্বেষ-ভাব পোষণ না করিয়া জীবের হৃদ্গত ভাবের উচ্ছ্বাসময়ী বৃত্তিকেই বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এই বৃত্তি যে-কোন-প্রকার যানবাহন অবলম্বন করিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে পারে।

'জৈবধর্ম্ম-গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে মুসলমান মৌলবীগণের সহিত বিচারপ্রসঙ্গে 'যে-কোন ব্যক্তিরই বৈষ্ণব হইবার অধিকার আছে'—ইহা তিনি বেশ স্পষ্টভাবে জানাইয়াছেন। উর্দ্দূ, পারসী, ইংরাজী প্রভৃতি যেকোন ভাষাভাষী বৈষ্ণব হইতে পারেন। কেবলমাত্র সংস্কৃত ও বাংলা ভাষাভাষীই বৈষ্ণব হইবেন,—এরূপ নহে। উড়িয়া, অসমীয়া, হিন্দী-ভাষাভাষী অথবা তামিল, তেলেগু ভাষাভাষী বহু ব্যক্তিও প্রচুর প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন বৈষ্ণব-পদবী লাভ করিয়াছেন, দেখা যায়। সুতরাং মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ান্, বৌদ্ধ, জৈন সকলেই বৈষ্ণব হইবার অধিকারী। ভাষার বৈষম্যে বৈষ্ণবতার বৈষম্য হয় না। ইহা ১ম খণ্ড 'জৈবধর্ম্মের' পাঠক সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিবেন।

ভাষা-বিদ্বেষী ব্যক্তিগণের আচরণকে উপেক্ষা করিয়া শ্রীল ঠাকুর বিভিন্ন ভাষার যান-বাহনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রাকৃত ভাবময়ী শিক্ষা প্রকাশ করিয়াছেন। অপ্রাকৃত দৈব-সংস্কৃত-ভাষায় এবং তদনুগত বাংলা ভাষায় বহু-গ্রন্থ তিনি রচনা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত

উড়িয়া, হিন্দী, উর্দ্দু, ইংরাজী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় তাঁহার লিখিত প্রায় শতাধিক গ্রন্থের পরিচয় পাই। তন্মধ্যে রচনাকাল সমেত কয়েকখানি বিশেষ গ্রন্থের পরিচয় 'জৈবধর্ম্ম'-পাঠকগণের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি :—

১। **সংস্কৃত**—(১) বেদান্তাধিকরণমালা—বাং সন ১২৭৯, (২) দত্তকৌস্তুভম্ ১২৮১, (৩) দত্তবংশমালা ১২৮৩, (৪) বৌদ্ধবিজয়-কাব্যম্ ১২৮৫, (৫) শ্রীকৃষ্ণসংহিতা ১২৮৭, (৬) 'সন্মোদন ভাষ্য' (শিক্ষাষ্টকের) ১২৯৩, (৭) দশোপনিষদ্-চূর্ণিকা ১২৯৩, (৮) ভাবাবলী (শ্লোক ও ভাষ্য) ১২৯৩, (৯) 'শ্রীচৈতন্যচরণামৃত'-ভাষ্য (শ্রীচৈতন্যোপনিষদের) ১২৯৭, (১০) শ্রীমদাম্নায়সূত্রম্ ১২৯৭, (১১) তত্ত্ববিবেকঃ বা শ্রীসচ্চিদানন্দানুভূতিঃ ১৩০০, (১২) তত্ত্বসূত্রম্ ১৩০১, (২৩) 'বেদার্ক-দীধিতিঃ'-ব্যাখ্যা (ঈশোপনিষদের) ১৩০২, (১৪) শ্রীগৌরাঙ্গস্মরণমঙ্গল-স্তোত্রম্ ১৩০৩, (১৫) শ্রীসনাতন গোস্বামীর 'শ্রীভগবদ্ধামামৃতম্'-গ্রন্থের ভাষ্য ১৩০৫, (১৬) শ্রীভাগবতার্ক-মরীচিমালা ১৩০৮, (১৭) শ্রীভজনরহস্যম্ ১৩০৯, (১৮) স্বনিয়ম-দ্বাদশকম্ ১৩০৪, (১৯) ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত-দর্শনের ভাষ্য, (২০) শিক্ষা দশমূলম্ ইত্যাদি।

২। **বাংলা (গদ্য)**—(১) গর্ভস্তোত্র-ব্যাখ্যা বা 'সম্বন্ধতত্ত্ব-চন্দ্রিকা' বাং সন ১২৭৭, (২) শ্রীসজ্জনতোষণী (মাসিক-পত্রিকা, ১ম-১৭শ খণ্ড) আরম্ভ ১২৮৮, (৩) 'রসিকরঞ্জন ভাষাভাষ্য (শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী টীকাসহ শ্রীগীতার) ১২৯৩, (৪) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ১২৯৩, (৫) প্রেম-প্রদীপ (পারমার্থিক উপন্যাস) ১২৯৩, (৬) 'শ্রীবিষ্ণুসহস্র নামে'র বঙ্গানুবাদ (বলদেব-ভাষ্য) ১২৯৩, (৭) বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তমালা ১২৯৫, (৮) সিদ্ধান্ত-দর্পণানুবাদ ১২৯৭, (৯) 'বিদ্বদ্রঞ্জন' ভাষাভাষ্য (শ্রীবলদেব-ভাষ্যসহ শ্রীগীতার) ১২৯৮, (১০) শ্রীহরিনাম, শ্রীনাম, শ্রীনামতত্ত্ব, শ্রীনাম-মহিমা, শ্রীনাম-প্রচার বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তমালার গুটীসমূহ, ১২৯৯, (১১) শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ১২৯৯, (১২) তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদ-শতদূষণী ১৩০১, (১৩) 'অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্য' (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের) ১৩০২, (১৪) শ্রীরামানুজ-উপদেশ ১৩০৩, (১৫) জৈবধর্ম্ম ১৩০৩, (১৬) 'প্রকাশিনী'-বৃত্তিসহ ব্রহ্মসংহিতার বঙ্গানুবাদ ১৩০৪, (১৭) শ্রীকৃষ্ণ-কর্ণামৃতম্'-গ্রন্থের ব্যাখ্যা ১৩০৫, (১৮) 'পীযূষবর্ষিণী'-বৃত্তি (শ্রীউপদেশামৃতম্-গ্রন্থের) ১৩০৫, (১৯) শ্রীনরহরি ঠাকুরকৃত 'শ্রীভজনামৃতম্' গ্রন্থের ভাষ্য ১৩০৬, (২০) 'শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুমঃ'-গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ ১৩০৮ প্রভৃতি।

৩। **বাংলা (পদ্য)**—(১) হরিকথা—বাং সন ১২৫৭, (২) শুম্ভ-নিশুম্ভ যুদ্ধ ১২৫৮, (৩) বিজন গ্রাম ১২৭০, (৪) সন্ন্যাসী ১২৭০, (৫) কল্যাণ-কল্পতরু ১২৮৮, (৬) মনঃশিক্ষা ১২৯৩, (৭) শ্রীকৃষ্ণবিজয় ১২৯৪, (৮) শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-মাহাত্ম্য ১২৯৭, (৯) শরণাগতি ১৩০০, (১০) শোকশাতন ১৩০০, (১১) শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ ১৩০৬, (১২) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ১৩০৭, (১৩) গীতাবলী, (১৪) গীতমালা, (১৫) শ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত (সম্পাদন) ১৩১৩ ইত্যাদি।

৪। **উর্দ্দু**—১) বালিদে রেজিষ্ট্রী—ইং সন ১৮৬৬ প্রভৃতি।

৫। **ইংরাজী**—(*1*) *Period* (*1st & 2nd volume*) *1857-58*, (*2*) *Maths of Orissa 1860*, (*3*) *Our wants 1863*, (*4*) *Speech on Goutam 1866*, (*5*) *Speech on Bhagabatam 1869*, (*6*) *Reflection 1871*, (*7*) *Thakur Haridas 1871*, (*8*) *Temple of Jagannath 1871*, (*9*) *Monasteries of Puri 1871*, (*10*) *Review* (*Personality of Godhead*) *1883*, (*11*) *Shri Chaitanya Mahaprabhu: His Life and Precepts 1896*, (*12*) *A Beacon Light etc.*

শ্রীল ঠাকুরের উক্ত গ্রন্থসমূহ পর্য্যালোচনা করিলে তাহার অতিমর্ত্ত্য জীবনের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার প্রত্যেকখানি গ্রন্থের মধ্যেই অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠ-আচরণের রীতিমত পরিলক্ষিত হয়। তন্মধ্যে **'জৈবধর্ম্ম'**-গ্রন্থখানি সাধারণ জীবের পক্ষে এত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে, তাহা ভাষায় বর্ণনা করিয়া সীমা নির্দ্দেশ করা যায় না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাসী—এই চারি বর্ণ ও আশ্রমস্থ জীবের মঙ্গল-কামনায় উদ্বুদ্ধ হইয়াই গ্রন্থখানি তিনি রচনা করিয়াছেন। বর্ত্তমান সংস্করণের পূর্ব্বে এই গ্রন্থখানির আরও পাঁচটী সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এতদ্ব্যতীত ইহার বিচার্য্য বিষয় অন্যান্য বহু গ্রন্থে গৃহীত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে। ইহা হইতেই উক্ত গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা ও গৌরব পরিলক্ষিত হয়। আমরা সর্ব্বত্র শ্রীমন্-মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিতে গিয়া গ্রন্থখানির প্রচুর 'চাহিদা' লক্ষ্য করিয়া থাকি। এই 'চাহিদাই আমাকে এই গ্রন্থ-সঙ্কলনের প্রবৃত্তি দান করে।

দুঃখের বিষয়, গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে ধর্ম্মের বিপ্লব উপস্থিত হওয়ায়, গ্রন্থরাজ লোক-লোচনের অন্তরালে থাকিয়া আত্ম-গোপন করিতেছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের ঐকান্তিক প্রেরণাক্রমে ও গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদান্বয় সেবকগণের উৎসাহে ষষ্ঠ সংস্করণ-স্বরূপ এই গ্রন্থ অভিনব আকারে সঙ্কলিত হইল।

এই গ্রন্থখানিতে তিনটী ধারা পরিলক্ষিত হয়। পাঠকবর্গের সুবিধার্থ উক্ত তিনটী ধারা পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে তিন খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। প্রথম খণ্ড—**'নিত্য ও নৈমিত্তিক ধর্ম্মাত্মক'**, দ্বিতীয় খণ্ড—**'সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনাত্মক'** এবং তৃতীয় খণ্ড—**'রস-বিচারাত্মক'**। ঠাকুরের এমন সুকৌশল রচনা যে, তিনটী খণ্ডই সমভাবে বিভক্ত হইয়াছে। যদিও প্রথম খণ্ডে দ্বাদশটী অধ্যায়, দ্বিতীয় খণ্ডে ত্রয়োদশটী অধ্যায়, তৃতীয় খণ্ডে পঞ্চদশটী অধ্যায় বর্ণিত হইয়াছে, তথাপি উহার পত্রাঙ্কের পরিমাণ একই রূপ।

শ্রীল প্রভুপাদের বিচারধারা অনুসারে, ভজনে কিঞ্চিৎ উন্নত-অধিকার লাভ না করা পর্য্যন্ত 'রসবিচারে' কাহারও প্রবেশ করা উচিত নহে। শ্রীল প্রভুপাদ 'ভাই সহজিয়া', 'প্রাকৃতরস-শতদূষণী' ও অন্যান্য বহু প্রবন্ধাদির মধ্যে ইহা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন।

অথচ এতদিন যাবৎ অনাধিকারী ব্যক্তির নিকটেও রসবিচার-সম্বলিত এই **'জৈবধর্ম্ম'** গ্রন্থখানি সমর্পণ করিতে হইয়াছে। ইহা শ্রীল প্রভুপাদের বিচারধারার অনুকূল নহে। দৈবাৎ তাঁহার ঐকান্তিক প্রেরণাক্রমে তাঁহারই মনোভীষ্ট পূরণকল্পে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কৃপা-কটাক্ষ-লাভাশায়, তাঁহার নিজজনের প্রেরণায় ইহা তিনভাগে বিভক্ত হইয়াছে। 'রস-বিচারমূলক' তৃতীয় খণ্ড আমরা অনধিকারী সাধারণের নিকট অর্পন করিতে ইচ্ছা করি না।

সাধারণ মনুষ্যসকলের জীবন-যাত্রা কিরূপ হওয়া আবশ্যক, প্রথম খণ্ডে তৎসম্বন্ধে বিচার প্রদর্শিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে অন্যান্য ধর্ম্মের সহিত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের তুলনাত্মক বিচার অতীব অভিনব পদ্ধতি-অবলম্বনে উপন্যাস-আকারে প্রশ্নোত্তরমালায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই ১ম খণ্ড পাঠ করিলে যে-কোন ব্যক্তিই বৈষ্ণব-ধর্ম্মে আকৃষ্ট হইবেন—ইহাতে সন্দেহ নাই। মহাপুরুষের লেখনীতে, বিশেষতঃ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভাষায় এমনই আকর্ষণী শক্তি রহিয়াছে, যাহার দ্বারা দেব-বিশ্বদ্রোহী ব্যক্তিগণও ধর্ম্ম-জীবন গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে। সাধারণতঃ 'ধর্ম্ম' বলিতে লোকের যেরূপ বিশ্বাস, তাহা যে প্রকৃত ধর্ম্ম নহে, পরন্তু তাহা হইতে কি প্রকারে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া জৈবধর্ম্ম বা বৈষ্ণব-ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারা যায়, ইহাতে তাহা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

চারিশত দশ (৪১০) চৈতন্যাব্দের মাঘী পূর্ণিমায় 'জৈবধর্ম্ম' গ্রন্থখানির রচনা সমাপ্ত হয়। গ্রন্থ-সমাপ্তিতে ঠাকুর স্বয়ং ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।—

"বিরচিল **'জৈবধর্ম্ম'** গৌড়ীয় ভাষায়। সম্পূর্ণ হইল গ্রন্থ **মাঘী-পূর্ণিমায়॥** চৈতন্যাব্দ চারিশত দশে নবদ্বীপে। গোদ্রুমে স্বরভিকুঞ্জে জাহ্নবী-সমীপে॥" বিশেষ আনন্দের সহিত জানাইতেছি, এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডও মাঘী পূর্ণিমায় বর্ত্তমান ৪৬৬ গৌরাব্দে সমাপ্ত হইল। ইহাতে শ্রীল ঠাকুরের আশীর্ব্বাদস্বরূপ ইঙ্গিত হৃদয়ে উপলব্ধি করিতেছি। * *

—মাঘী-পূর্ণিমা

১৫ মাঘ, ১৩৫৯ (ইং ২৯।১।১৯৫৩)

জৈবধর্ম্মের দ্বিতীয় প্রস্তাবনা

আমি 'প্রথম প্রস্তাবনায়' জানাইয়াছি যে, **'জৈবধর্ম্ম'** গ্রন্থখানি শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ চল্লিশটী অধ্যায়ে সমাপ্ত করিলেও, ইহা তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে 'নিত্য-নৈমিত্তিক-ধর্ম্মমূলক' বিচার গ্রথিত হইয়াছে। এই ২য় খণ্ডে 'নিত্যধর্ম্ম ও সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাত্মক' বিশুদ্ধ তত্ত্বসমূহ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমরা দ্বিতীয় খণ্ডের নাম,—"সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনমূলক দ্বিতীয় খণ্ড" আখ্যা প্রদান করিয়াছি। ঠাকুরের বিচার-গাম্ভীর্য্য অভিনব আকার ধারণ করিয়া দ্বিতীয় খণ্ডে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। শ্রীল জীব-গোস্বামিপাদের 'ষট্সন্দর্ভ' ও শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-চরণের 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' এবং শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদের 'শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধু' যে প্রকার বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ্, ব্রহ্মসূত্র, ভারত, ইতিহাস, পুরাণাদি যাবতীয় শাস্ত্রের সারস্বরূপ, তদ্রূপ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের জৈবধর্ম্মের দ্বিতীয় খণ্ড ষট্সন্দর্ভ, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থের সার-স্বরূপ। অতি অল্প কথায় সাধারণ অল্পশিক্ষিত ব্যক্তিরও বোধগম্য করিয়া ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জৈবধর্ম্মের দ্বিতীয় খণ্ড যেরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন, এইরূপ প্রশ্নোত্তর-মালায় বিশুদ্ধ জীবগণের যাবতীয় জ্ঞাতব্য গভীরতম তত্ত্বসমূহ আর কোনও গ্রন্থে অদ্যাবধি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাই শ্রীল ঠাকুরের অতিমর্ত্ত্য জীবনের অতিমর্ত্ত্য অভিব্যক্তি।

যাবতীয় শাস্ত্রই সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন—এই তিনটী তত্ত্ববিচারের উপরই প্রতিষ্ঠিত। শ্রীল ঠাকুর বেদ-উপনিষদাদি শাস্ত্র হইতে প্রমাণসমূহ উদ্ধার করিয়া উক্ত তত্ত্বত্রয়ের নিত্যত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। ইহাই সনাতন বৈষ্ণবগণের নিগূঢ়তম সিদ্ধান্ত। কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, মিছা ভক্ত প্রভৃতি কৃচ্ছ্র সাধক তপস্বিগণের বিচারনৈপুণ্যের অভাব প্রদর্শন করাইয়া তিনি সর্ব্বত্র বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়াছেন। এই দ্বিতীয় খণ্ডের সামান্য আড়াইশত পৃষ্ঠার মধ্যে তিনি মায়াবাদের সংজ্ঞা ও কুকৌশলের সহিত তাহার যেরূপ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা দার্শনিক শিক্ষিত সমাজ চিরদিন স্মরণ করিয়া অপার আনন্দ অনুভব করিবেন। ভক্তি ব্যতীত অপর যাবতীয় ক্রিয়াসকল বা অনুষ্ঠানাদি যাহা কিছু মতবাদিগণ প্রকাশ করিয়া থাকেন, তৎসমুদায়ই ভক্তির তুলনায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রমাণিত হয়। 'শ্রীনামভজনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ'—ইহা তিনি সর্ব্বতোভাবে শাস্ত্রযুক্তির দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন।

এই গ্রন্থ সম্পাদনের বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি 'প্রথম প্রস্তাবনায়' ব্যক্ত করিয়াছি। এতদ্ব্যতীত দ্বিতীয় খণ্ডে শ্রীল ঠাকুরের 'দশমূল-শিক্ষা'র অভিনব পদ্ধতি দেখা যাইতেছে। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শিক্ষা সম্বন্ধে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের একটী সংক্ষিপ্ত শ্লোক দেখিতে পাই,—

"আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমার্থো মহান্
শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

ইহাতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার পরম-নিগূঢ়তম তত্ত্বের ইঙ্গিত বুঝিতে পারিলেও, আমরা সাধারণ-দৃষ্টিতে উক্ত শ্লোক হইতে মহাপ্রভুর যাবতীয় শিক্ষার পূর্ণ অভিব্যক্তি ধারণায় আনিতে পারি না তজ্জন্যই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আমাদের ন্যায় অল্পবুদ্ধি মূর্খ জীবের জন্য "শিক্ষাদশমূলম্"-নামক গ্রন্থে ত্রয়োদশটী শ্লোক রচনা করেন। আচার্য্য-কুলমুকুটমণি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত-ধুরন্ধর শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর নির্দ্দেশ-অনুসারে মধ্ব-সম্প্রদায়ের সহিত গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের সাম্য বুঝাইবার জন্য প্রমেয়-রত্নাবলীতে (১।৮) যে শ্লোকটী রচনা করিয়াছেন, তাহা এস্থলে আমাদের বিশেষভাবে আলোচ্য।—

"শ্রীমধ্বঃ প্রাহ বিষ্ণুং পরতমমখিলাম্নায়বেদ্যঞ্চ বিশ্বং
সত্যং ভেদঞ্চ জীবান্ হরিচরণজুষস্তারতম্যঞ্চ তেষাম্।
মোক্ষং বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রিলাভং তদমলভজনং তস্য হেতুং প্রমাণং
প্রত্যক্ষাদিত্রয়ঞ্চেত্যুপদিশতি হরিঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রঃ॥"

শ্রীল ঠাকুর এই শ্লোকটীর অন্তর্গত নয়টী তত্ত্বের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ও চক্রবর্ত্তিপাদের "আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়ঃ" শ্লোকটীকে হৃদয়ে রাখিয়া তেরটী শ্লোকের দ্বারা সংস্কৃত ভাষায় দশমূল রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত 'নিম্বার্ক-দশমূল' ঠাকুরের দশমূলের সহায়তা করে। এই দশমূল অবলম্বন করিয়া ঠাকুর তাঁহার অধিকাংশ গ্রন্থ বিভিন্নভাবে ও ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত, শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা, জৈবধর্ম্মের এই দ্বিতীয় খণ্ড, শ্রীমদ্গৌরাঙ্গস্মরণ-মঙ্গল-স্তোত্র, Shri Chaitanya Mahaprabhu : His Life & Precepts, শ্রীহরিনামচিন্তামণি প্রভৃতি বহু গ্রন্থই এই 'শিক্ষাদশমূল'কে অবলম্বন করিয়াই রচিত হইয়াছে। ঠাকুরের স্ব-রচিত এই ত্রয়োদশটী শ্লোক সরলতা, লালিত্য, দার্শনিকতা ও ভাবের গাম্ভীর্য্যে পরিপূর্ণ। জৈবধর্ম্মের বর্ত্তমান দ্বিতীয় খণ্ডই গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তমালার মধ্যমণি-স্বরূপ। আম্নায়-দশমূল, গীতা-দশমূল, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত দশমূল, শ্রীমদ্ভাগবত-দশমূল প্রভৃতি যাবতীয় শাস্ত্রের সার সঙ্কলন-স্বরূপ সমস্ত দশমূল-তত্ত্বই 'শিক্ষাদশমূলে'র মৌলিক গ্রন্থ। উহা সমুদায়ই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের নিজস্ব কৃতি।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত অবগত হইতে ইচ্ছা করিলে 'জৈবধর্ম্ম'-গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড সর্ব্বতোভাবে আলোচিত হওয়া আবশ্যক। এই খণ্ডই বৈষ্ণবগণের কণ্ঠহার। এইজন্য এই **সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-মূলক দ্বিতীয় খণ্ড**কে পৃথক্ করিয়া মুদ্রিত করা হইয়াছে। সহৃদয় সজ্জন পাঠকবর্গ কোনস্থলে যাতায়াতের পথে কেবলমাত্র দ্বিতীয় খণ্ড

সঙ্গে রাখিলেই যাবতীয় বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের বিচার আলোচনা করিবার সুযোগ পাইবেন। পাঠক, বক্তৃ-মহোদয়গণের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে ইহা সহায়তা করিবে। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইবার পর শ্রীশ্রীগৌর-জন্মবাসরে ফাল্গুনী পূর্ণিমার এই দ্বিতীয় খণ্ড মুদ্রিত হইল। ইহার অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় আমার 'প্রথম প্রস্তাবনায়' লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

—ফাল্গুনী-পূর্ণিমা, ১৬ই ফাল্গুন, ১৩৫৯ (ইং ২৮।২।৫৩)

শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকার আদর্শ

'শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা' বিশুদ্ধ সারস্বত-ধারায় সঙ্কলিত হইয়াছে ও হইবে। পরমহংস-কুল-চূড়ামণি জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী** গোস্বামী ঠাকুর **শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকার** আদি প্রবর্ত্তক। ইহাতে শ্রীল ভক্তিবিনোদ-ধারাই সর্ব্বতোভাবে সংরক্ষিত হইয়াছে। তাঁহারই প্রবর্ত্তিত-ধারার নাম 'সারস্বত-ধারা'। এই ধারা বিশুদ্ধ না হইলে অশুদ্ধ ধারা-প্রবাহে তীর্থসমূহ অতীর্থ হইয়া পড়ে। বিশুদ্ধ বৈদিকধারা অশুদ্ধ বৌদ্ধ-চিন্তা-স্রোতে মলিনতা প্রাপ্ত হয়। বৈদিক মন্ত্র-সমূহের পুনঃ প্রবর্ত্তন-কারীর বিশুদ্ধ-ধারা অশুদ্ধ হওয়ায় বিশ্বকে মায়াবাদ-মহাবাক্যের দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়াছে। তজ্জন্য বিশুদ্ধ আম্নায়-ধারা সংরক্ষণ করাই বৈদান্তিক আচার্য্যবর্গের একমাত্র কর্ত্তব্য। ইহারই নাম গুরুসেবা।

শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারা সারস্বত-ধারায় পূর্ণরূপে প্রবাহিতা। জগদ্গুরু শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ বৈষ্ণবগণের পক্ষে যে-দিন পঞ্জিকার ধারা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, সেই ধারাই আমাদের 'বিশুদ্ধ সারস্বত শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা'র আদর্শ। এই পঞ্জিকা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের একান্ত অনুগত রূপানুগ বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্তের আচার-প্রচারক বলিয়া আমরা সংক্ষেপতঃ ইহাকে **'শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা'** বলিয়া উল্লেখ করিব। শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকারই নামান্তর **'শ্রীমায়াপুর-পঞ্জিকা'**—যেহেতু শ্রীমায়াপুরই শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব-ক্ষেত্র। **গুরু-ভোগী ও গুরু-ত্যাগী সম্প্রদায়ের মধ্যে বিনোদ-বাণী-ধারা রুদ্ধা।** তজ্জন্য বিশুদ্ধ বৈষ্ণবগণের সেবা-সহায়তাকল্পে বহু যত্নের সহিত এই পঞ্জিকা অভিনব আকারে প্রকাশিত হইল।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—শ্রীল প্রভুপাদের বিচার-ধারা লইয়াই এই পঞ্জিকা সঙ্কলিত হইয়াছে। এক্ষণে সেই বিচার-ধারা কিরূপ, তৎসম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলা আবশ্যক। আমরা নিজস্ব কোন কথা না বলিয়া এই প্রসঙ্গে জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের 'শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা'-সম্বন্ধে একটি মৌলিক

প্রবন্ধ নিম্নে উদ্ধার করিলাম। ইহা হইতে সমুদয় বিচার-ধারা ও সংজ্ঞাদি অবগত হওয়া যাইবে। দুঃখের বিষয় শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অনুগত বলিয়া পরিচয় দিয়া কতকগুলি প্রাকৃত সহজিয়া ঠাকুরের নির্দ্দেশমত প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকার বিচারধারা গ্রহণের অযোগ্য হইয়া স্মার্ত্ত-পথানুসরণ করিতেছেন। ইহাই সহজিয়াদের নরক-গমনের প্রশস্ত সরণি।

শ্রীশ্রীপ্রভুপাদের প্রবন্ধ

"যাহারা হরিভজন করেন, তাঁহাদের কৃষ্ণেতর ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞাদ্বারা কৃষ্ণ-সংসার নির্ব্বাহ করিতে হয় না। **কৃষ্ণের বিভিন্ন নামাবলী পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণেতর শব্দদ্বারা বৃথা বাক্যব্যয় করিয়া যে-সকল সংজ্ঞা জগতে প্রচলিত আছে, উহা কখনই বিষ্ণুভক্তের যোগ্য নহে।** সাধারণ মানব ও বিষ্ণুভক্তে পার্থক্য এই যে, সাধারণ মানব বিষ্ণু ব্যতীত মায়ার সেবা করেন, আর বিষ্ণুভক্ত কৃষ্ণার্থে অখিল-চেষ্টা বিশিষ্ট। একজন ত্যাগী, অপরটি শ্রীকৃষ্ণপ্রীতে ত্যক্তভোগ। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে অবস্থান করিয়াও বিষ্ণুভক্ত সাধারণ মানব হইতে ভিন্ন। বিষ্ণুভক্তি-রহিত-বর্ণাশ্রমী পতিত এবং সাধারণ হিন্দু বা মানব বলিয়া পরিচিত। সাধারণ হিন্দু আপনাকে 'স্মার্ত্ত' বলিয়া অভিহিত করেন এবং ঐকান্তিক-বিষ্ণুভক্তিকে সাধারণী জানিয়া নিজে অধঃপতিত হন। তাঁহারা দৈব ও অসুরভেদে দ্বিবিধ।

"বিষ্ণুভক্তের জন্য বেদে ভক্তিশাখা, পুরাণের মধ্যে সাত্ত্বিক ছয়টি পুরাণ, দর্শনের মধ্যে বেদান্ত-দর্শন ও তন্ত্রের মধ্যে সাত্বত-পঞ্চরাত্রসমূহ অন্যান্য সাধারণ গ্রন্থ হইতে স্বতন্ত্র। পূর্ব্বকাল হইতে বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণবের মধ্যে ব্যবহারগত ভেদ চিরদিন চলিয়া আসিতেছে। বিষ্ণু-ভক্তি শিথিল হওয়ায় ভারতের নানাস্থানে পঞ্চোপাসনার প্রাবল্য ও ভক্তাভক্ত উভয় সমাজে একপ্রকার বর্ণাশ্রম চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। মধ্যযুগে শ্রীরামানুজ-স্বামী ও শ্রীমন্মধ্বস্বামী সাধারণ বর্ণাশ্রম হইতে পৃথক-শুদ্ধ-বর্ণাশ্রম-পন্থা স্বতন্ত্রভাবে পৃথক্ করিয়া লইয়াছেন। আর্য্যাবর্ত্তে পঞ্চোপাসনা প্রবল থাকায় পারমার্থিক বৈষ্ণব-সমাজ ব্যবহারিক সমাজের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া চলিতেছেন। তথাপি ঐকান্তিক ও মিশ্র-বিচার সর্ব্বদাই তাঁহাদের মধ্যেও পার্থক্য স্থাপন করিতেছে।

অবৈষ্ণব-রচিত গ্রন্থাদির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য অসংখ্য বৈষ্ণব-গ্রন্থ রচিত ও পঠিত হইয়াছে। বৈষ্ণব-বিশ্বাস সর্ব্বতোভাব সংরক্ষণজন্য সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক ও সংরক্ষক আচার্য্যগণ সামাজিক হিতচিন্তায় সতত রত। আবার বিষ্ণুভক্তি-রহিত পণ্ডিত ও সামাজিকগণ উদারতা ও নির্ব্বিশিষ্টতার নামে সমন্বয়বাদ প্রবর্ত্তন করিয়া নানাপ্রকার জঞ্জাল আনয়ন-পূর্ব্বক অবিমিশ্র বিষ্ণুভক্তগণের সদাচারকে আক্রমণ করিতেছেন। শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবের আচার্য্যগণ বিপুল পরিশ্রম করিয়া নিজ সৎসম্প্রদায়ের প্রভূত উপকার

সাধন করিয়াছেন। কোমলশ্রদ্ধ বৈষ্ণবগণের সদাচার সংরক্ষণ ও ব্যবহারিক অনুষ্ঠান অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর অভিপ্রায়ানুসারে শ্রীমদ্ গোপাল ভট্ট গোস্বামী শ্রীল সনাতন গোস্বামীর পদানুসরণে 'শ্রীহরিভক্তিবিলাস' ও 'সৎক্রিয়াসার-দীপিকা' গ্রন্থদ্বয় রাখিয়া গিয়াছেন। বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামী শ্রীমদ্ গোপাল-ভট্ট গোস্বামীর সহায়তায় 'ষট্সন্দর্ভ'-নামক গ্রন্থ রাখিয়াছেন। ভাষায় অধিকারের জন্য ইতর বৃথা ব্যাকরণাদি অধ্যয়নে জীবন ক্ষয় করিবার পরিবর্ত্তে **শ্রীল জীবগোস্বামীপাদ 'শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ'** রচনা করিয়াছেন। অলঙ্কারশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি-লাভের উদ্দেশ্যে বৈষ্ণবগণকে 'সাহিত্য-দর্পণ', 'কাব্যপ্রকাশাদি' পড়িতে হয় না। 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু', 'উজ্জ্বলনীলমণি', 'নাটক-চন্দ্রিকা', 'অলঙ্কার-কৌস্তভা'দি গ্রন্থপাঠে তদপেক্ষা প্রচুর পরিমাণে জ্ঞানলাভ হয়। ইতর নাটক ও সাহিত্য-কাব্যাদির পরিবর্ত্তে 'ললিত-মাধব', 'বিদগ্ধমাধব', 'দানকেলী-কৌমুদী', 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক', 'আনন্দ-বৃন্দাবনচম্পূ', 'গোপালচম্পূ', 'গোবিন্দ-লীলামৃত,' 'কৃষ্ণভাবনামৃত' প্রভৃতি সংখ্যাতীত গ্রন্থ সেই অভাব পূরণ করিবে। বেদান্ত-গ্রন্থের অভাব 'গোবিন্দ-ভাষ্য পীঠক' প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়া শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু অনেকটা পূরণ করিয়াছেন।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণোক্ত সংজ্ঞাসমূহ সকলগুলিই হরিনামময়, সুতরাং বৃথা সংজ্ঞা উচ্চারণ ও স্মরণাদির পরিবর্ত্তে শ্রীজীব প্রভুপাদের রচিত ও প্রদত্ত সংজ্ঞা নামাশ্রিত বৈষ্ণব-গণের পরমোপাদেয়। কাল-সংজ্ঞায়ও পূর্ব্বাচার্য্যগণ একেবারে অন্যমনস্ক ছিলেন—এরূপ বলা যায় না। শ্রীমাধ্ব-সম্প্রদায়ের কালগণনা 'করন-প্রকাশ' নামক গ্রন্থ-সাহায্যে গণিত হয়। অস্মৎ-সম্প্রদায়ের তাদৃশ-গ্রন্থ নাই, কিন্তু সংজ্ঞা ন্যূনাধিক প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে সেই কথা কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি।

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের নির্ব্ব্যলীক পরম-সুহৃৎ নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট আচার্য্যপ্রবর শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বঙ্গদেশে শ্রীগৌর-জন্মোৎসব প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে শুদ্ধবৈষ্ণবগণের মধ্যে শ্রীগৌর-জন্ম-জয়ন্তী ন্যূনাধিক পালিত হইত বটে, কিন্তু জয়ন্তী-উৎসব বলিয়া বঙ্গদেশে 'শ্রীগৌর-জয়ন্তী-ব্রত-মহোৎসব' সেই মহাত্মার আত্যন্তিক উদ্‌যোগেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছেন—ইহা আর কাহারও জানিতে বাকী নাই। তিনি বঙ্গদেশে বর্ত্তমান কালে শ্রীগৌর-জন্মস্থান, শুদ্ধ-হরিনাম ও নাম-মহিমার আদর্শ-বৈষ্ণব-জীবন ও শুদ্ধ-ভক্তিসিদ্ধান্ত প্রচারের প্রবর্ত্তক। তাঁহারই চেষ্টায় অনেকগুলি বৈষ্ণব-সভা-সমিতি, বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-প্রচারিণী-পত্রিকা, বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে ও হইতেছে। **শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ই 'শ্রীচৈতন্যাব্দ' প্রবর্ত্তন-কার্য্যের মূল মহাপুরুষ। 'শ্রীচৈতন্যপঞ্জিকা' প্রভৃতি প্রকাশের তিনিই সুপ্রধান সহায় ও একমাত্র উৎসাহদাতা ছিলেন।**

বৈষ্ণব-পঞ্জিকা প্রবর্ত্তনের কিশোরাবস্থা এখনও অতিক্রান্ত হয় নাই। যদিও পত্র-পঞ্জিকা ও বৈষ্ণব-ব্যবস্থা-সম্বলিত পঞ্জিকা আজ ৩৫ বৎসর হইতে কয়েকখানি প্রচারিত

হইতেছে, তথাপি সেই পঞ্জীকে পূর্ণাঙ্গ ও পঞ্চাঙ্গ বলা যায় না ; তাহাতে অনেক অভাব আছে। এমন কি, বৈষ্ণবোচিত সংজ্ঞার উন্মেষও অনেকগুলিতে পাওয়া যায় না। শুধু বৈষ্ণব-পঞ্জিকার অভাব কেন, সকল বিষয়েই বৈষ্ণব-উদ্দেশ্যের ব্যাঘাতজনক অনুষ্ঠানই পরিলক্ষিত হয়। অবৈষ্ণব সংখ্যার প্রাচুর্য্য ও অবৈষ্ণবতার বহুল প্রচার-ক্রমে আমরা শুদ্ধ বৈষ্ণবতার প্রবৃত্তি দেখিতে পাইতেছি না। **যেখানে যেটুকু শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদানুসরণের নামে যে কাল্পনিক বৈষ্ণব-অনুষ্ঠান দেখা যায়, তাহা ন্যূনাধিক স্বার্থ বিজৃম্ভিত ও অবান্তর উদ্দেশ্যযুক্ত এবং বৈষ্ণবতার নামে স্ত্রী-পুত্র-প্রতিপালন, উদর-ভরণাদি ও প্রতিষ্ঠা সংগ্রহাদির প্রকার-ভেদ বলিয়াই মনে হয়। সর্ব্বাত্মনাশ্রিত-পদ-বৈষ্ণবের নিষ্কপটতার অভাব থাকিলেই এই-রূপ 'শালগ্রাম দিয়া বাদাম-ভাঙ্গা'-কার্য্য হরিসেবা বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়।**

সাধারণের অবগতির জন্য এখানে কালের সংজ্ঞা উদ্ধৃত হইল। আমরা আশা করি, পঞ্জীকদ্‌গণ ভবিষ্যতে এসকল সংজ্ঞা দিবেন। **'বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে' ও 'হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্রে'** নিম্নলিখিত **কালের সংজ্ঞা** প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রথমটী সাধারণ প্রচলিত শব্দ, **দ্বিতীয়টী বিষ্ণুভক্তের জন্য।**

(ক) সূর্য্যের গতিদ্বয়

১। উত্তরায়ন—**বলভদ্র**, ২। দক্ষিণায়ন—**কৃষ্ণ**।

(খ) ঋতু-ষটক্

১। গ্রীষ্ম—**পুণ্ডরীকাক্ষ,** ২। বর্ষা—**ভোগশায়ী,** ৩। শরৎ—**পদ্মনাভ,** ৪। হেমন্ত—**হৃষীকেশ,** ৫। শীত—**দেবত্রিবিক্রম,** ৬। বসন্ত—**মাধব।**

(গ) পক্ষদ্বয় ও মলমাস

১। ক্ষয় বা মলমাস—**পুরুষোত্তম,** ২। কৃষ্ণপক্ষ—প্রদ্যুম্ন, **কৃষ্ণ,** ৩। শুক্লপক্ষ—অনিরুদ্ধ, **গৌর।**

(ঘ) মাস দ্বাদশক

১। বৈশাখ—**মধুসূদন,** ২। জ্যৈষ্ঠ—**ত্রিবিক্রম,** ৩। আষাঢ়—**বামন,** ৪। শ্রাবণ—**শ্রীধর,** ৫। ভাদ্র—**হৃষীকেশ,** ৬। আশ্বিন—**পদ্মনাভ,** ৭। কার্ত্তিক—**দামোদর,** ৮। অগ্রহায়ণ—**কেশব,** ৯। পৌষ—**নারায়ণ,** ১০। মাঘ—**মাধব,** ১১। ফাল্গুন—**গোবিন্দ,** ১২। চৈত্র—**বিষ্ণু।**

(ঙ) বার সপ্তক

১। রবি—সর্ব্ব-**বাসুদেব**, ২। সোম—সর্ব্বশিব-**সঙ্কর্ষণ**, ৩। মঙ্গল—স্থাণু-**প্রদ্যুম্ন** ৪। বুধ—ভূত-**অনিরুদ্ধ**, ৫। বৃহস্পতি—আদি-**কারণোদশায়ী**, ৬। শুক্র—নিধি-**গর্ভোদশায়ী**, ৭। শনি—অব্যয়-**ক্ষীরোদশায়ী**।

(চ) তিথি ষোড়শী

১। প্রতিপদ—**ব্রহ্মা,** ২। দ্বিতীয়া—**শ্রীপতি,** ৩। তৃতীয়া—**বিষ্ণু,** ৪। চতুর্থী—**কপিল,** ৫। পঞ্চমী—**শ্রীধর,** ৬। ষষ্ঠী—**প্রভু,** ৭। সপ্তমী—**দামোদর,** ৮। অষ্টমী—**হৃষীকেশ,** ৯। নবমী—**গোবিন্দ** ১০। দশমী—**মধুসূদন,** ১১। একাদশী—**ভূধর,** ১২। দ্বাদশী—**গদী,** ১৩। ত্রয়োদশী—**শঙ্খী,** ১৪। চতুর্দ্দশী—**পদ্মী,** ১৫। পূর্ণিমা বা অমাবস্যা—**চক্রী।**

(ছ) নক্ষত্র সপ্তবিংশতি

১। অশ্বিনী—**ধাতা,** ২। ভরণী—**কৃষ্ণ,** ৩। কৃত্তিকা—**বিশ্ব,** ৪। রোহিণী—**বিষ্ণু,** ৫। মৃগশিরা—**বষট্‌কার,** ৬। আর্দ্রা—**ভূতভব্যভবৎপ্রভু,** ৭। পুনর্ব্বসু—**ভূতভৃৎ,** ৮। পুষ্যা—**ভূতকৃৎ,** ৯। অশ্লেষা—**ভাব,** ১০। মঘা—**ভূতাত্মা,** ১১। পূর্ব্বফল্গুনী—**ভূতভাবন,** ১২। উত্তর ফল্গুনী—**অব্যক্ত,** ১৩। হস্তা—**পুণ্ডরীকাক্ষ,** ১৪। চিত্রা—**বিশ্বকর্ম্মা,** ১৫। স্বাতী—**শুচিশ্রবা,** ১৬। বিশাখা—**সদ্ভাব,** ১৭। অনুরাধা—**ভাবন,** ১৮। জ্যেষ্ঠা—**ভর্ত্তা,** ১৯। মূলা—**প্রভব,** ২০। পূর্ব্বাষাঢ়া—**প্রভু,** ২১। উত্তরাষাঢ়া—**ঈশ্বর,** ২২। শ্রবণা—**অপ্রমেয়,** ২৩। ধনিষ্ঠা—**হৃষীকেশ,** ২৪। শতভিষা—**পদ্মনাভ,** ২৫। পূর্ব্বভাদ্রপদ—**অমরপ্রভু,** ২৬। উত্তরভাদ্রপদ—**অগ্রাহ্য,** ২৭। রেবতী—**শাশ্বত।**”

যাঁহারা ব্রতাদি-সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদের বিচার-ধারা জানিতে ইচ্ছা করেন, আমি তাঁহাদের অবগতির জন্য **“গৌড়ীয়ের কৃত্য”**-শীর্ষক তাঁহার স্বহস্ত-লিখিত কয়েকটি উপদেশ নিম্নে মুদ্রিত করিতেছি। যথা—

গৌড়ীয়ের কৃত্য।
(ভাগবতধর্ম্ম)

১। একাদশী হরিবাসর ব্রত পালন

২। বৈষ্ণবচিহ্ন ধারণ

৩। শ্রীভুজে তাপ ও পুণ্ড্র ধারণ নাম ধারণ

৪। মন্ত্রগ্রহণ ও তদনুষ্ঠান

৫। নবেজ্যা-কর্ম্ম (অর্চ্চনাদি)

৬। সংখ্যা-নির্ব্বন্ধে নামগ্রহণ

উক্ত উপদেশের প্রথম সংখ্যাতেই **একাদশ্যাদি হরিবাসর ব্রতপালন**-সম্বন্ধে নির্দ্দেশ প্রদত্ত হইয়াছে। এই পঞ্জিকায় উক্ত নির্দ্দেশ শিরোধার্য্য করিয়া হরিবাসর ব্রতাদি নিরূপিত হইয়াছে। * * শ্রীল প্রভুপাদের বঙ্গে পঞ্জিকা-সংস্কার ব্যাপারে ও পারমার্থিক পঞ্জিকা প্রণয়নে বিশ্ববাসী সকলেই স্তম্ভিত ও মুগ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার উদ্ধৃত উপরিউক্ত প্রবন্ধ হইতে এইরূপ পঞ্জিকার প্রয়োজনীয়তা ভক্তগণ উপলব্ধি করিবেন। সঙ্কেতেও যদি শ্রীহরিনাম উচ্চারিত হয়, তবে জীব নামাভাসে মুক্তিলাভ করিয়া শুদ্ধনামের অধিকারী হইবেন। সুতরাং 'শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা' ভক্তগণের অবশ্য অবলম্বনীয়।

—শ্রীশ্রীগৌর-জয়ন্তী, ১৬ই ফাল্গুন, ১৩৫৯ (ইং ২৮।২।১৯৫৩)

'শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টক'-সম্বন্ধে

দুই একটী কথা

অচিন্ত্যানন্তশক্তিমান্ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মাতা যশোদার দামবন্ধন স্বীকার করিয়া তাঁহার বিশুদ্ধ-বাৎসল্য-প্রেমরস-নির্য্যাস সম্পূর্ণরূপে আস্বাদন করেন এবং জগতে নিজের ভক্তাধীনতার চরম পরিচয় প্রদান করেন। সেই পরম মনোহর শ্রীদাম-বন্ধন-লীলা তিনি কার্ত্তিক শুক্লা প্রতিপদে প্রকটিত করেন। পরম ধন্য কার্ত্তিক মাস **'দামোদর'**-নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিবার ইহাই প্রধান হেতু। বৈষ্ণব-স্মৃতিশাস্ত্র শ্রীহরিভক্তিবিলাস-প্রণেতা আচার্য্য-পাদ শ্রীগোপালভট্ট-গোস্বামী কার্ত্তিক-কৃত্য প্রসঙ্গে কার্ত্তিক মাসে প্রতিদিন শ্রীশ্রীরাধা-দামোদরের পূজা এবং **'শ্রীদামোদরাষ্টক'**-নামক স্তোত্র-পাঠের বিধি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—

রাধিকাং প্রতিমাং বিপ্রাঃ পূজয়েৎ কার্ত্তিকে তু যঃ।
তস্য তুষ্যতি তৎপ্রীতো শ্রীমান্ দামোদরো হরিঃ॥
দামোদরাষ্টকং-নাম স্তোত্রং দামোদরার্চ্চনম্।
নিত্যং দামোদরাকর্ষি পঠেৎ সত্যব্রতোদিতম্॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১৬।৯৫-৯৬)

যিনি কার্ত্তিক-মাসে শ্রীরাধিকার প্রীত্যর্থে তাঁহার পূজা বিধান করেন, শ্রীদামোদর হরি তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন।

শ্রীদামোদরাষ্টক স্তোত্র পদ্মপুরাণে শ্রীনারদ শৌনকাদি সংবাদে শ্রীসত্যব্রত-মুনি-কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে। শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ ইহার টীকায় বলিয়াছেন যে, এই স্তোত্র

নিত্যসিদ্ধ, ইহা শ্রীসত্যব্রত মুনি হইতে প্রকটিত হইয়াছেন এবং ইহা শ্রীদামোদর-কৃষ্ণকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ। তিনি স্বানুভূতিপূর্ণ বিবৃত ব্যাখ্যায় এই স্তোত্রের দামোদরাকর্ষিত্ব প্রকৃষ্টরূপে পরিস্ফুট করিয়াছেন।

দামোদরাষ্টক প্রকাশ করিবার অভিলাষ বহুদিন হইতেই পোষণ করিয়া আসিতেছিলাম। বিশেষতঃ প্রতি কার্ত্তিকমাসে দামোদর-ব্রত উদ্যাপনকালে আমরা সকলে মিলিত হইয়া সমস্বরে যখন এই দামোদরাষ্টক কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইতাম, তখনই ইহা সকল সাধক-হৃদয়ে প্রস্ফুটিত করিয়া দিবার আকাঙ্ক্ষা প্রবলা হইয়া উঠিত। বহু ভক্তসাধক আমাকে এ বিষয়ে বিশেষ করিয়া অনুরোধও করিয়াছেন। এতদিন পরে শ্রীদামোরাষ্টকের সংস্কৃত মূল, সংস্কৃত অন্বয় ও শ্রীল সনাতন গোস্বামী-পাদের 'দিগ্‌দর্শিনী'-নাম্নী সংস্কৃত টীকা প্রকাশিত হইল। সংস্কৃত-ভাষানভিজ্ঞ পাঠকবর্গের জন্য মূলশ্লোকের বঙ্গানুবাদ ও শ্রীল সনাতন গোস্বামীর উক্ত টীকার বঙ্গানুবাদও এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান যুগে সংস্কৃত ভাষার প্রচলনের প্রতি বহু কলিহত মনীষিগণের বিষদৃষ্টি লক্ষ্য করা যায়। আমরা তাহা সত্ত্বেও 'দামোদরাষ্টকম্'-নামক সংস্কৃত গ্রন্থখানি সমগ্র দেশের হিত-কামনায় প্রকাশ করিলাম। বাংলাভাষার সাহিত্যিকগণের ইহা সর্ব্বতোভাবে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, বাংলা ভাষার উন্নতি করিতে হইলে সংস্কৃত ভাষাই আমাদের একমাত্র অবলম্বন। সংস্কৃত সাহিত্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যেরও উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। যাঁহারা সংস্কৃত সাহিত্যকে উলঙ্ঘন করিয়া বাংলা ভাষার উন্নতি কল্পনা করেন, তাঁহারা নিতান্তই ভ্রান্ত। এই শ্রেণীর সাহিত্যিকগণের ভাষার উচ্ছৃঙ্খলতাই আমরা সর্ব্বতোভাবে লক্ষ্য করিয়া থাকি। বাংলা ভাষার স্বতন্ত্রতা সংস্কৃত ভাষার অধীন অর্থাৎ স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র নহে, পরতন্ত্র-স্বতন্ত্র। আমরা এই নীতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া গ্রন্থখানি বিদ্বৎসমাজে উপস্থিত করিতেছি।

ইহার দার্শনিক বিচার, রচনা-কৌশল, লীলা-বিকাশের চমৎকারিতা প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য করিলে ব্যাসদেবের রচিত এই অষ্টকটী সাহিত্যজগতে একটী আদর্শ-স্বরূপ। জগদ্গুরু শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ আটটী শ্লোক-সম্বলিত এই গ্রন্থের 'দিগ্‌দর্শিনী' টীকা বিশদরূপে রচনা করিয়া সাধন-রাজ্যের তারতম্যমূলক বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহাতে বাৎসল্য ও মধুর রসের শ্রেষ্ঠত্ব সর্ব্বতোভাবে প্রতিপন্ন হইয়াছে।

গোস্বামিপাদ প্রাকৃত সহজিয়াগণের যত্র-তত্র এবং যথা-তথা রাসলীলা আলোচনা করার অবৈধত্ব প্রদর্শনকল্পে (অষ্টকটীর) অষ্টম শ্লোকের শেষভাগে লিখিয়াছেন,—"ততশ্চ তয়া সহ রাসক্রীড়াদিকং পরমস্তুতিতেনান্তে বর্ণয়িতুমিচ্ছন্ তচ্চ **পরম-গোপ্য-ত্বেনানভিব্যঞ্জয়ন্**—'মধুরেণ সমাপয়েদিতি' ন্যায়েন কিঞ্চিদেব সঙ্কেতেনোদ্দিশন্

প্রণমতি।" * ইহাতে সহজিয়া-সম্প্রদায়ের অনধিকার-চর্চ্চা সম্বন্ধে বিচার স্পষ্টভাবে প্রদত্ত হইয়াছে।

সহজিয়াগণ অপাত্রবিধায় রাসলীলা-আস্বাদনে কোনওরূপে মহাপাত্র বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। আমরা জানি, ভক্তি ত্রিলোকাতীত। ইহা ত্রৈলোক্যের রায়ের মধ্যে বা বিচারের মধ্যে আসিতে পারে না। তাহারা মনে করে,—জড় 'চিৎ' হইয়া যায় এবং প্রাকৃত চক্ষুদ্বারাই সাধনপ্রভাবে ভগবানকে দেখা যায়—ইহাই প্রাকৃত-সহজিয়াগণের বিচার। তাহারা বলে,—কাঁসা রস-সংযোগে যেরূপ সোনা হয়, প্রাকৃত শরীরও ভজন-প্রভাবে অপ্রাকৃত হয়। তখন সেই প্রাকৃত চক্ষুর দ্বারাই ভগবানকে দর্শন করিতে পারা যায়। প্রাকৃত সহজিয়াদের এই উক্তি শ্রীল সনাতন গোস্বামী 'বৃহদ্ভাগবতামৃত'-গ্রন্থে ও শ্রীদামোদরাষ্টকের 'দিগ্‌দর্শিনী-নামক টীকায় সম্পূর্ণরূপে নিরাস করিয়াছেন।

মানস-দর্শন ও প্রত্যক্ষ-দর্শন

এই প্রসঙ্গে চতুর্থ ও ষষ্ঠ শ্লোকের টীকা বিশেষভাবে আলোচনা করা আবশ্যক। উক্ত শ্লোকদ্বয়ের বিচার হইতেই প্রাকৃত-সহজিয়াগণ মনে করিতে পারেন,—মানস ধ্যান-দর্শন অপেক্ষা চাক্ষুষ দর্শনেরই প্রাধান্য গোস্বামিপাদ বর্ণনা করিয়াছেন। বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, গোস্বামিপাদ ব্রহ্মার ধ্যানজ দর্শন অপেক্ষা গোপকুমারের চাক্ষুষ দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। ইহাতে গোপকুমারের প্রাকৃত চক্ষুর দর্শনকে গোস্বামিপাদ বিচার করেন নাই। গোপকুমারের বৈকুণ্ঠজগতে অর্থাৎ অপ্রাকৃত ভূমিকায় উপস্থিতির পর চাক্ষুষ দর্শনের কথা বর্ণিত হইয়াছে। বৈকুণ্ঠ জগতে বা অপ্রাকৃত ভূমিকায় প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের অবস্থিতি নাই। সুতরাং গোপ-গোপীগণের প্রত্যক্ষীভূত ভগবৎ-সান্নিধ্য সর্ব্বতোভাবে অপ্রাকৃত ও অতীন্দ্রিয়। ইহা প্রাকৃত সহজিয়াগণের ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষীভূত ব্যাপার নহে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টক ঊর্জ্জব্রত, কার্ত্তিক ব্রত বা দামোদরব্রত উপলক্ষে প্রত্যহই কীর্ত্তনীয় বা আলোচনীয়। যাঁহারা দামোদর মাসে শ্রীদামোদরের প্রীতি-কামনা করিবেন, তাঁহারা অবশ্যই এই **'দামোদরাষ্টকম্'** গ্রন্থখানি প্রত্যহ সমুদয় অংশ পাঠ করিবেন। ইহাই শ্রীহরিভক্তিবিলাসের বিশেষ নির্দ্দেশ। এই দামোদরব্রত বিভিন্ন-ভাবে পালিত হইবার নির্দ্দেশ শাস্ত্র হইতে জানিতে পারা যায়। চাতুর্ম্মাস্য ব্রতের মধ্যেই ঊর্জ্জব্রত। ইহা একাদশী, দ্বাদশী ও পূর্ণিমা-পক্ষে আরম্ভ হয় এবং একাদশী, দ্বাদশী ও

---

* তাহার পর স্তুতি-শেষে সেই রাধিকার সহিত রাস-ক্রীড়াদি লীলার পরম উৎকর্ষত্ব বর্ণন করিবার ইচ্ছা করিয়াও তাহা পরম গোপ্য বস্তু বলিয়া স্পষ্টভাবে ব্যক্ত না করিয়াই, 'সমস্ত কার্য্যই মধুরতার সহিত সমাপন করা কর্ত্তব্য'—ন্যায়ানুসারে কিঞ্চিৎমাত্র সঙ্কেতের দ্বারা উদ্দেশ করিয়াই 'নমোঽনন্ত-লীলায়'-বাক্যে প্রণাম করিতেছেন।

পূর্ণিমাতেই উহার সমাপ্তি ঘটিয়া থাকে। তবে এই তিথিসমূহ কোনক্রমেই বিদ্ধা গৃহীত হইবে না। সনাতন গোস্বামী বলেন,—বৈষ্ণব-ব্রত মাত্রেই বিদ্ধা পরিত্যাগ করিতে হইবে। সুতরাং চাতুর্ম্মাস্য এবং উর্জ্জব্রতের আরম্ভ ও সমাপ্তি-কালের তিথিসমূহও বিদ্ধা ত্যাগ করিয়া পালন করিতে হইবে। চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত ও উর্জ্জব্রতে সূর্য্যোদয়বিদ্ধা ত্যাগই হরিভক্তিবিলাসের অভিমত।

আমরা শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কার্ত্তিক-ব্রত সম্বন্ধে একটী ক্ষুদ্র প্রবন্ধ উদ্ধার করিতেছি। এই প্রবন্ধে ব্রত-সমাপ্তির ক্রিয়াসমূহ কোন্‌দিনে করিতে হইবে, তাহা স্পষ্টরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। একাদশী তিথি হইতে যাঁহারা ব্রত আরম্ভ করিবেন তাঁহাদের পক্ষে যেরূপ বিধি, দ্বাদশী ও পূর্ণিমা-পক্ষেও সেইরূপ বিধি বুঝিতে হইবে। প্রবন্ধ, যথা—

"কার্ত্তিকব্রত-পালন বৈষ্ণবদিগের একটি প্রধান কর্ত্তব্য। "আশ্বিনস্য তু মাসস্য শুক্লৈকাদশী ভবেৎ। কার্ত্তিকস্য ব্রতানিহ তস্যাম্ কুর্যাদতন্দ্রিতঃ ॥"—এই বচনানুসারে প্রতিবৎসরে বিজয়া দশমীর পর দিবস যে একাদশী হয়, সেই দিবস হইতে ব্রতারম্ভ। আর উত্থান একাদশীতে ঐ ব্রত সমাপ্ত হইবে। এই এক মাসের মধ্যে যে ব্রত পালন করা হয়, তাহার নাম 'নিয়ম-সেবা'। নিয়ম-সেবার বিধি এই, সেই মাসের প্রতি দিবসে রাত্রির শেষ যামে শুচি হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে মঙ্গলারতি করিবে। প্রাতঃস্নান করিয়া দামোদরার্চ্চন করিবে। রাত্রে ঘৃত-দীপ বা তিল-তৈলের দীপ ভগবন্মন্দিরে, তুলসী-তলে এবং আকাশে প্রজ্জলিত করিবে। কার্ত্তিক মাসে নিরামিষ্য এবং ভগবানের প্রসাদান্ন ভোজন করিবে। পরান্ন, পরশয্যা, তৈল, মধু ও কাংসপাত্র ব্যবহার পরিত্যাগ করিবে। প্রসাদ-সেবান্তে বৈষ্ণব-সঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতাদি শ্রবণ বা পঠন করিবে। নিরন্তর হরিনাম-কীর্ত্তন ও স্মরন করিবে। এই প্রকার বিধি অবলম্বনপূর্ব্বক উক্ত মাস যাপন করত উত্থান একাদশীতে নিরম্বু উপবাস ও কৃষ্ণ-কথায় রাত্রিজাগরন করিবে। পরদিন প্রাতে শুচি হইয়া হরি-কীর্ত্তনান্তে আত্মীয় বৈষ্ণবগণকে সেবা করাইয়া অবশেষে স্বয়ং প্রসাদ-সেবন করিবে। সেই দিবস রাত্রশেষে ব্রত সমাপ্ত করিবে।"

উর্জ্জব্রতে শ্রীরাধাদামোদরের প্রীতিবিধানই প্রধান উদ্দেশ্য। শ্রীমতী রাধারাণীকে উর্জ্জেশ্বরী বলা হয়। তজ্জন্যই শ্রীশ্রীদামোদরের প্রীতি বিধানার্থ সত্যব্রতমুনি "নমো রাধিকায়ৈ ত্বদীয় প্রিয়ায়ৈ" বাক্যটী সংযোজিত করিয়া রাধাদামোদরের পূজা-সম্পাদনই দামোদর-ব্রতে একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞাপন করেন।

আমরা গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পালনীয় ৬৪ প্রকার ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে উর্জ্জদরের উল্লেখ দেখিতে পাই। এই উর্জ্জাদর বলিলে চাতুর্ম্মাস্য ব্রতকেই সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে হইবে। কেহ কেহ বলেন,—৬৪ প্রকার ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে চাতুর্ম্মাস্যের উল্লেখ না থাকায় আমরা উর্জ্জব্রত পালন করিব; চারিমাস ব্রত উদযাপন করিবার ক্লেশ স্বীকার করিব না। এই প্রকার

ভজনপ্রয়াসী ব্যক্তিসকল শাস্ত্রের গূঢ় তাৎপর্য্য অবগত না হইয়া উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় দিয়া থাকেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং বহুক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া চাতুর্ম্মাস্য ব্রত উদ্‌যাপন নিজে আচরণ করিয়া শিক্ষা দিয়াছেন। যাঁহারা মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শিক্ষার অনুসরণ করিতে অসমর্থ, আমরা তাঁহাদিগকে শুদ্ধ-বৈষ্ণব-শ্রেণীভুক্ত করিতে পারি না। আমরা এ স্থলে বলিতে চাহি, ষড়ঙ্গ-শরণাগতিতে * নবধা ভক্তির অন্তর্গত "আত্ম-নিবেদনে"রই উল্লেখ দেখা যায়। ইহাতে কি বুঝিতে হইবে যে, শরণাগতির অন্য পঞ্চাঙ্গ নিষিদ্ধ হইয়াছে? ষড়্‌বিধ শরণাগতির চরম শরণাগতি 'আত্মনিবেদন' উল্লিখিত হইলেই বুঝিতে হইবে, অন্যান্য শরণাগতিগুলিও সাধকের পক্ষে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। উহা অঙ্গাঙ্গীভাবে একই সাধন বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে।

শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টকের নিত্যত্বহেতু ইহা কার্ত্তিক মাস বা দামোদর মাস ব্যতীত চাতুর্ম্মাস্যেও প্রত্যহ আলোচিত হওয়া আবশ্যক। এমন কি, অন্যান্য মাসে ও বৎসরের প্রতিদিনই ইহা আলোচনার যোগ্য। দামোদরাষ্টক বিশুদ্ধভাবে কীর্ত্তিত হইলে স্বয়ং দামোদরদেব প্রীত হইবেন—এই উদ্দেশ্যেই আমরা ইহা বিশেষ যত্ন সহকারে সঙ্কলন করিয়াছি। —১লা কার্ত্তিক, ১৩৬০ (বঙ্গাব্দ)

'শ্রীগৌড়ীয় গীতিগুচ্ছে'র ভূমিকা

নিবেদন

"শ্রীগৌড়ীয়-গীতিগুচ্ছ" প্রথম খণ্ড বর্ত্তমানে প্রকাশিত হইল। ইহাতে কেবলমাত্র মহাজনগণের পদাবলী সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সাহিত্য-জগতে অনেকপ্রকার কাব্যামোদী কবিতা ও গীতি মুদ্রিত দেখিতে পাওয়া যায়। পাঠশালা ও উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রে ইহার প্রচুর প্রচলন আছে। গৌড়ীয়-গীতিগুচ্ছ তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। কাব্যরসের ছড়াছড়ির দ্বারা প্রাকৃত-রসের রসিকগণ আমোদিত হন, কিন্তু বিশুদ্ধ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ ঐ শ্রেণীর কবিতা পাঠ করিয়া হৃদয়ে বেদনা অনুভব করেন। আমাদের এই "গীতিগুচ্ছ" তাঁহাদের হৃদয়ে শান্তি প্রদান করিবে। স্ত্রী-পুরুষের ক্রিয়া-কলাপ, প্রকৃতির নৈসর্গিক নৃত্য, পার্থিব

---

* আনুকূল্যস্য সংকল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বর্জ্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা।
আত্মনিক্ষেপ-কার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ॥ (হঃ ভঃ বিলাস)
"দৈন্য, **আত্মনিবেদন**, গোপ্তৃতে বরণ। অবশ্য রক্ষিবে কৃষ্ণ বিশ্বাস পালন॥
ভক্তি-অনুকূল মাত্র কার্য্যের স্বীকার। ভক্তি-প্রতিকূল-ভাব-বর্জ্জন-অঙ্গীকার॥"

আবহাওয়া প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিয়া যে-সমস্ত কবিতা বা গীতি রচিত হয়, তাহা অপ্রাকৃত বা মায়াতীত ধারণার পরিপন্থী হইয়া থাকে। যাঁহারা প্রকৃত মঙ্গলকামী, তাঁহারা প্রাকৃত কবির কাব্যে কখনও বিমুগ্ধ হইবেন না। কবি ও সাহিত্যিকগণের লেখনী জীবকে মায়ামোহিত করিয়া চিরতরে অধঃপাতিত করে। তাহার দ্বারা মুক্তির সন্ধানও খুঁজিয়া লইবার প্রবৃত্তি পর্য্যন্ত জন্মে না। কিন্তু এই "গীতিগুচ্ছ"খানি সর্ব্ববিষয়ে সুন্দরভাবে গুম্ফিত হইয়াছে। যাঁহারা কবিত্বের পক্ষপাতী, তাঁহারাও ইহা পাঠ ও কীর্ত্তন করিয়া প্রচুর আনন্দলাভ করিবেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"—এই মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে সকলকে উপদেশ করিয়াছেন। শাস্ত্রেও দেখিতে পাই,—"কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ।" অন্যান্য যুগে ধ্যান, যজন, পরিচর্য্যা প্রভৃতির দ্বারা যে অপ্রাকৃত তত্ত্বের সান্নিধ্য ও সেবালাভ ঘটিত, তাহা কলিযুগে কীর্ত্তনের দ্বারাই পাওয়া যাইবে। সেই কীর্ত্তন কি, তাহা আলোচিত হওয়া আবশ্যক। আমরা এই প্রসঙ্গে দৃঢ়তার সহিত বলিতে চাহি,—এই "গীতিগুচ্ছের" গীতিগুলিই পর-জগতের একমাত্র সহায়ক। যে-সমস্ত মহাজনগণের পদ এই 'গীতিগুচ্ছে' গুম্ফিত হইয়াছে, তাঁহারা কেহই প্রাকৃত কবি নহেন। সুতরাং তাঁহাদের কবিতা ও কাব্যের সহিত পৃথিবীর কোন কবিরই তুলনা হইবে না। বর্ত্তমান জগতে রবীন্দ্রনাথের কবিতার বিশেষ প্রচার দেখা যায়। তাঁহার কবিতা অপেক্ষা এই কবিতাগুলি অনেকগুণে শ্রেষ্ঠ। নির্ব্বিশেষ-নিরাকার চিন্তাস্রোতকে অবলম্বন করিয়া কবিতা রচিত হইলে তাহার বিশেষত্ব থাকে কি করিয়া? রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম-চিন্তাস্রোতে ভরপূর। তিনি দুই একটী ক্ষেত্রে বৈষ্ণব-মহাজনগণের কবিতার অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু সে ভাবধারা রবীন্দ্রনাথকে স্পর্শ করে নাই। এমন কি, তিনি সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বিগণের সেবাপূজা প্রভৃতির প্রতি যথেষ্ট কটাক্ষ করিয়াছেন। সাধারণ ভাষায় তাঁহাকে হিন্দুবিরোধী বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। আমাদের এই "গীতিগুচ্ছ" তাঁহার সমস্ত মতবাদকে খণ্ডন করিবে।

গান-বাজনাকে শাস্ত্রে তৌর্য্যত্রিক বলিয়াছেন। ইহা বিলাস-ব্যসনের অন্তর্গত। কিন্তু এই 'গীতিগুচ্ছ' বিলাস-ব্যসনের অন্তর্গত নহে। ইহাতে সুর, তাল, লয়, মান প্রভৃতি সংযুক্ত হইলেও, ইহাতে কোন বিলাস-ব্যসনের প্রসঙ্গ নাই। ইহা সুর-তালাদি ব্যতীত পঠিত হইলেও সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল লাভ করা যাইবে। শ্রীল জীব গোস্বামী বলিয়াছেন,—"ওষ্ঠ-স্পন্দনমাত্রেণ কীর্ত্তনন্তু ততো বরম্।" ওষ্ঠ স্পন্দিত হইলেই কীর্ত্তন হইবে। অর্থাৎ সুর না করিয়া পাঠ করিলেও কীর্ত্তনের যাবতীয় ফল সর্ব্বতোভাবে লাভ হইবে। মহাজন-পদগুলি সর্ব্বসময়েই কীর্ত্তিত হওয়া আবশ্যক। "সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর"—শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই শিক্ষা গীতিগুচ্ছে আরোপিত হইবে। শাস্ত্র বলেন,—

নাম-রূপ-গুণ-লীলা একই বস্তু। 'সর্ব্বদা নামকীর্ত্তন' বলিলে নামের সহিত ভগবানের রূপ, গুণ ও লীলা কীর্ত্তনও বুঝিতে হইবে। সুতরাং সর্ব্বদাই এই "গীতিগুচ্ছ" শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণীয়।

গান-বাজনার ভিতরে একটা বিশেষ ইন্দ্রিয়-তর্পণ আছে। উহা শ্রবণকারীর কর্ণ-রসায়ন হইয়া থাকে। সাধারণ লোকের কর্ণ-রসায়ন করিবার জন্য আমরা "গীতিগুচ্ছ" প্রকাশ করিতেছি না। সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি ভোগোন্মুখ না হইয়া সেবোন্মুখ হইলেই আমাদের প্রকৃত মঙ্গল। এই গ্রন্থ আমাদিগকে নিশ্চয়ই সেবোন্মুখ করিবে। জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদ "গানের অধিকারী কে ?"—শীর্ষক একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র মাসিক "শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা"র ৩য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যায় উহা প্রকাশিত হইয়াছিল। আমি সকলকেই সে প্রবন্ধ পাঠ করিতে অনুরোধ করি। উহা পাঠ করিলে সাধারণ গান ও ভজনগীতির পার্থক্য বুঝিতে পারিবেন। আত্মমঙ্গলেচ্ছু ব্যক্তিগণই কীর্ত্তন করিবেন। পর-মুগ্ধকারী ব্যক্তি গানের অধিকারী নহেন। তবে স্বজাতীয়াশয়স্নিগ্ধ সাধকসকল পরস্পর মঙ্গলেচ্ছু হইয়া ইহার শ্রবণ-কীর্ত্তন করিবেন।

মহাজন কীর্ত্তনের স্তর নিরূপণ করিয়াছেন। ভক্ত-গণের মধ্যে যে-প্রকার কনিষ্ঠ-মধ্যম-উত্তমভেদে তিনটী শ্রেণী লক্ষ্য করা যায়, মহাজনগণের পদাবলীতেও উক্ত প্রকার তিন শ্রেণীর ভক্তগণের জন্যই পদ রচিত হইয়াছে। আমরা সাধারণতঃ কনিষ্ঠ ও মধ্যম-অধিকারী সাধকের জন্যই এই 'গীতিগুচ্ছ' প্রকাশ করিতেছি। উত্তম-অধিকারী মহাজন-গণের কীর্ত্তিত গীতি আমরা সাধারণে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি না। তথাপি তৎসম্বন্ধেও দুই একটী কবিতা ইহাতে যে সন্নিবেশিত হয় নাই, এইরূপ নহে। পাঠক, কীর্ত্তনীয়া-গণ ইহা বিচার করিয়া পাঠ ও কীর্ত্তন করিবেন।

এই গ্রন্থে গীতিসমূহ ক্রম-পর্যায়ে শ্রীগুরু-তত্ত্ব, শ্রীবৈষ্ণব-তত্ত্ব শ্রীবাস-তত্ত্ব, শ্রীগদাধর-তত্ত্ব, শ্রীঅদ্বৈত-তত্ত্ব, শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্ব, শ্রীগৌর-তত্ত্ব, শ্রীরাধা-গোবিন্দ-তত্ত্ব নামে সংগৃহীত হইয়াছে। যখন যিনি যে তত্ত্ব-সম্বন্ধে কীর্ত্তন করিবেন, সেই তত্ত্বের শিরোনামা দেখিয়া অথবা সূচীপত্র আলোচনা করিয়া কীর্ত্তন করিবেন। * * * এই গ্রন্থের আলোচনাকারী ভক্তবৃন্দ ইহা পাঠ ও কীর্ত্তন করিয়া ভোগোন্মুখী বৃত্তি হইতে নিবৃত্তিলাভ করুন এবং ভগবৎসেবায় প্রতিষ্ঠিত হউন, ইহাই প্রার্থনীয়। ইতি—

—শ্রীশ্রীগৌর জয়ন্তী, ৩০ গোবিন্দ, ৪৭১ গৌরাব্দ (ইং ১৬।৩।১৯৫৭)

‘শ্রীরূপানুগ-ভজন-সম্পৎ’-গ্রন্থের ভূমিকা

আমার বক্তব্য

এই গ্রন্থের নাম—“শ্রীরূপানুগ-ভজন-সম্পৎ”। প্রকৃতপ্রস্তাবে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ “শ্রীরূপানুগ-ভজন-দর্পণ”-নামক একখানি পৃথক্ গ্রন্থ শ্রীল রূপপাদের বিরচিত ‘শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু’ ও ‘শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি’ গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া পদ্য-ছন্দে সংক্ষেপে তাহার সারমর্ম্ম লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত উন্নত সেবকগণ রূপানুগ ধারায় স্নাত হইতে ইচ্ছা করেণ। কারণ, শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীধাম পুরীতে অবস্থানকালে শ্রীল রূপপাদের একটী শ্লোক শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন—শ্রীরূপ আমার অন্তর্নিহিত গুপ্তকথা কিপ্রকারে অবগত হইল? নিকটস্থ ভক্তগণ বলিয়াছিলেন যে,—আপনার কৃপাতেই তিনি আপনার গূঢ় ভাবসকল অবগত হইয়াছেন। সুতরাং শ্রীল রূপপাদের ক্রিয়াকলাপ, আচার-বিচার সমস্তই মহাপ্রভুর ইচ্ছানুরূপ হওয়ায় গৌড়ীয়গণ রূপানুগ হইতে গৌরব বোধ করেন। তজ্জন্য আমরা এই গ্রন্থের প্রথমেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর ‘শ্রীশিক্ষাষ্টক’ শ্রীল ঠাকুরের পদ্যানুবাদসহ মুদ্রিত করিয়াছি। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকই মাধ্ব-গৌড়ীয়-বৈষ্ণববর্গের একমাত্র ভজন-সম্পৎ। শ্রীল রূপপাদ ও অন্যান্য গোস্বামিগণ এই ‘শিক্ষাষ্টক’কেই বিস্তৃত করিয়া বিভিন্ন গ্রন্থরাজিতে বিবৃত ও বিস্তার করিয়াছেন। এক কথায় সমস্ত গোস্বামি-গ্রন্থই এই শিক্ষাষ্টকে বিবৃত।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গোস্বামিবর্গের রচিত স্তব-স্তুতিমূলক অষ্টকাদির সুললিত কাব্যছন্দে মর্ম্মানুবাদ করিয়া রূপানুগ সাধক ও সিদ্ধবর্গের পরমমঙ্গল ও আনন্দ বিধান করিয়াছেন। এই ভজন-সম্পদে তাহা সমস্তই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহাতে মোটামুটি ১১টী বিষয় আলোচিত হইয়াছে। বিষয়-সূচী আলোচনা করিলে পাঠকবর্গ এই গ্রন্থের গৌরব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ‘শ্রীনামভজন-প্রণালী’ ও ‘শ্রীনাম-মাহাত্ম্য’ এই গ্রন্থের চরমে প্রদত্ত হইয়াছে। উহা প্রকৃতপ্রস্তাবে রূপানুগ-ভজন-সম্পৎ। ইহার দ্বারা গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীল ঠাকুরের স্থান গৌড়ীয় গোস্বামিগণের তুল্য পর্য্যায়ে স্বীকৃত হইয়াছে।

‘রূপানুগ-ভজন’ বলিতে উন্মার্গগামী ‘ইঁচড়ে পাকা’ সহজিয়াগুলি কেবলমাত্র পারকীয় মাধুর্য্য-রসের ভজনকেই ভজন বলিয়া স্বীকার করেন। অন্যান্য দাস্য-সখ্য-বাৎসল্যাদি রূপানুগ-ভজনের অন্তর্গত কোন রস নহে বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। ইহাই সহজিয়াগণের রস-তত্ত্বানভিজ্ঞতা উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয়। আজকাল সারস্বত-ভক্তিবিনোদ-ধারায় অবস্থিত অনেক ব্যক্তি রূপানুগ-বিচারধারা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ‘ইঁচড়ে পাকা’

সহজিয়াগণের পদাঙ্ঘ্রি লেহন করিয়া বলিয়া থাকেন,—"প্রচার করিয়া কি হইবে—কীর্ত্তন করিয়া কি হইবে—ভজন কর, ভজন কর।" এই শ্রেণীর পাষণ্ডগণ 'ভজন কর' বাক্যের দ্বারা শ্রীনামভজনের পরিবর্ত্তে চুপ্ করিয়া বসিয়া বসিয়া শ্রীমালায় নাম করার অছিলায় 'কাছি-টানা'কেই ভজন বলিয়া মনে করেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, তাহারা বহুলোক-সমক্ষেই ঐরূপ অনুষ্ঠান করিয়াও লজ্জাবোধ করেন না। হরিকীর্ত্তন-সেবাই রূপানুগ-ভজন—অন্য-রীতি রূপানুগ-ভজন-রীতি নহে।

সুতরাং শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা প্রচারই হরিকীর্ত্তন। শ্রীনামকীর্ত্তন বলিলে নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকর-বৈশিষ্ট্যাদি সমস্ত তত্ত্বেরই কীর্ত্তন বুঝাইবে। সুতরাং যাঁহারা প্রচারক, তাঁহারাই একমাত্র হরিনামাশ্রিত—কীর্ত্তনীয়া এবং রূপানুগ-ভজনকারী। যাহারা মহাপ্রভুর কথা প্রচার করেন না বা প্রচারের সহায়তা করেন না, তাহারা রূপানুগ-ভজন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। শ্রীল রূপপাদের জীবনী এবং তাঁহার ক্রিয়াকলাপ আলোচনা করিলেই ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। "আপনি আচরি' ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়"—শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই শিক্ষা শ্রীল রূপপাদের জীবনীতে পূর্ণরূপে প্রতিফলিত।

কতকগুলি 'পাষণ্ডী ব্রাহ্মণ' বা শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের মতে 'রাক্ষস-ব্রাহ্মণ' শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রচার-বৈশিষ্ট্যের বিরোধী ও ধ্বংসকারী ধর্ম্মধ্বজিগণের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান বিশুদ্ধ-বৈষ্ণবগণকে ক্ষত্রিয় বলিয়া জ্ঞান করেন। কারণ মধ্ব-আনুগত্যে শ্রীমন্মহাপ্রভু বিরোধিদলকে স্বমতে আনয়ন করিয়াছিলেন—ইহাও তাঁহার ক্ষাত্র ধর্ম্ম! যথা—"অসিনা তত্ত্বমসিনা পরজীব প্রভেদিনা" ইত্যাদি বাক্যে 'অসি' ধারণে ব্রাহ্মণতা নষ্ট হইয়া গিয়াছে—বীরত্ব আসিয়াছে। দুর্ব্বলতা, অলসতা, সেবা-নিষ্ক্রিয়তাকেই বৈষ্ণবতা মনে করিয়া তাঁহারা 'ভজনানন্দী'-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইতে চাহেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে ইহাকেই বলে—স্ত্রৈণ ধর্ম্ম বা effeminate nature. এই শ্রেণীর সহধর্ম্মিগণের মধ্যে অনেককেই দেখা যায় তাহারা আপনা-আপনি 'মঞ্জরী' সাজিয়া নিজের নাম, রূপ, বয়স, সম্বন্ধ, বেষ-ভূষা প্রভৃতি একাদশ ভাব অঙ্গীকার করিয়া যদিচ্ছাক্রমে স্ত্রী-চিন্তায় মগ্ন হন। তাহাদের মধ্যে দেখা গিয়াছে যে, **তাহারা নিজেরাই পুরুষ হইয়া স্বকল্পিত মানস-মঞ্জরী-মহিলাকে সর্ব্বদাই অবৈধভাবে ভোগ করিয়া থাকে। ইহা একপ্রকার মনোমৈথুন।** তাহাদের এই-রূপ মানসিক কু প্রবৃত্তি ক্রমশঃ বাহ্যজগতে প্রত্যক্ষক্ষেত্রেও প্রকাশিত হইয়া পড়িতে দেখা যায়। ইহাকে মহাপাষণ্ডতা ও উচ্ছৃঙ্খলতাই বলিতে হইবে। এই "শ্রীরূপানুগ-ভজন-সম্পৎ" এই শ্রেণীর লোককেও সৎপথে আনয়ন করিয়া তাহাদের পরমমঙ্গল বিধান করিবে।

—শ্রীবলদেব-আবির্ভাব তিথি

১২ই ভাদ্র ১৩৬৫, (ইং ২৯।৮।১৯৫৮)

'সাংখ্য-বাণী'র ভূমিকা

সংখ্যাদ্বারা দার্শনিক শিক্ষা

জগদ্গুরু পরমহংস-চূড়ামণি প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামিকুল বরেণ্য অনুমান ৩৪ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার প্রবর্ত্তিত সাপ্তাহিক 'গৌড়ীয়'-পত্রিকার ৮ম খণ্ড, ৩০শ সংখ্যায় **"সাংখ্য-বাণী"**-শীর্ষক একটি মৌলিক প্রবন্ধ তত্ত্ববিৎ বৈষ্ণবগণের জন্য প্রকাশ করেন। উক্ত প্রবন্ধ পরে ক্ষুদ্র গ্রন্থাকারেও প্রকাশিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান এই "সাংখ্যবাণী" গ্রন্থখানি তাহারই পুনরাবৃত্তি।

শ্রীল প্রভুপাদের এই প্রকার অভিনব সংখ্যা-গত তত্ত্বের সঙ্কলন বৈষ্ণব জগতে এক নূতন আবিষ্কার। তিনি ভারতীয় গণিত-জ্যোতিষের সর্ব্বোত্তম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধি-নায়ক ছিলেন। গণিতিক বিচার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আমরা '১' বলিয়া একটী সংখ্যা লক্ষ্য করিয়া থাকি। এই সংখ্যাগত '১' এর মৌলিকত্ব অনুসন্ধান করিলে ইহা গণিতশাস্ত্রবিদ্গণের 'কাল্পনিক অর্থ' বলিয়াই প্রতীত হইয়া থাকে, অর্থাৎ যে-বস্তু বা-সংখ্যার উদ্ভবের কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তাহাকেই মানস রাজ্যের 'কাল্পনিক' পদার্থ বলা হয়। পৃথিবীতে '১' বলিয়া কোন বস্তু নাই, তথাপি '১' সংখ্যাই গণিত-শাস্ত্রের আদিসংখ্যা এবং '১' হইতে সমস্ত উন্নত সংখ্যা-সমষ্টির উদ্ভব হইয়াছে—ইহা গণিত-শাস্ত্রের মত। কেহ কেহ '০' শূন্যকেও গণিতশাস্ত্রের আদি সংখ্যা বলিয়া বিচার করিয়া বৌদ্ধ পদাবলেহী হইয়া পড়িয়াছেন। বস্তুতঃ '১'-এর ধারণা কি তাহা অনুসন্ধিৎসার বিষয়।

পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের মধ্যে কেহ কেহ বলেন,—"Diversity in unity" অর্থাৎ একত্বের চিন্তায় বৈশিষ্ট্যের বিকাশ অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং নির্ব্বিশেষ '১' কোন বস্তু নহে। যে-বস্তুর মৌলিকত্ব কাল্পনিক বা শূন্য, তাহা হইতে বাস্তবের আবির্ভাব অলীক ও অসম্ভব। কেহ কেহ মনে করেন, "অসতঃ সদজায়ত" এই বেদবাণী তাহাদিগকে আপাততঃ সমর্থন করে; কিন্তু প্রকৃত-প্রস্তাবে উপনিষদের উক্ত অংশ দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, উহা বেদের পূর্ব্বপক্ষস্বরূপে গৃহীত হইয়া তৎপরক্ষণেই উহা খণ্ডন করিয়া বলিয়াছেন,—"সতঃ সদজায়তঃ।" পূর্ব্বোক্ত বাক্য সিদ্ধান্তপক্ষে গ্রহণ করিলেও অসৎ বস্তু হইতে সত্তার উৎপত্তি কিরূপভাবে সম্ভবপর হয়, বৈজ্ঞানিক জগৎ তাহা সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছেন। বৈদান্তিককুল-চূড়ামণি গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুও বিচারের দ্বারা দেখাইয়া দিয়াছেন যে, 'অসৎ'-শব্দের দ্বারা প্রত্যক্ষ আকার রহিত অনবস্থা বুঝাইলেও বস্তুসত্তা প্রকাশের সত্তা (Potencies)

তাহার অন্তর্নিহিত ব্যাপার। সুতরাং 'অসৎ'-শব্দ ব্যবহার করিলেও প্রকৃত-প্রস্তাবে তাহা অত্যান্তিক অসৎ নহে। বস্তুতঃ বাহ্যদৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ অসৎ বলিয়া প্রতীত হইলেও উহা প্রকৃত বা বাস্তব বা অত্যান্তিক 'সৎ' অর্থাৎ 'অসৎ' নহে।

গণিতশাস্ত্রে '১' হইতে '১০'-এর অঙ্কই সর্ব্বপ্রধান। ইহার Permutation Combination অর্থাৎ আনুলোমিক ও প্রাতিলোমিক ক্রিয়া-প্রভাবে ভারতীয় গণিত-শাস্ত্র যে সর্ব্বোচ্চ সংখ্যা নিরূপণ করিয়াছেন, পৃথিবীর কোন দেশই তাহার নিকটে পৌঁছিতে পারে নাই। এ বিষয়ে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোত্তম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গাণিতিক বিকাশ, আর্য্য-ঋষিগণের মধ্যেই সর্ব্বতোভাবে অধিক বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে।

মদীয় গুরুপাদপদ্ম গণিত-জগতের সর্ব্বোচ্চ শিখরে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। গণিতের সাংখ্য-বিচারের তুলনায় দর্শন-শাস্ত্রের সাংখ্য-তত্ত্বের (২৪) চতুর্ব্বিংশতি পদার্থ, সসীম কলার অন্তর্জগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ অর্থাৎ গাণিতিক মৌলিক ১ হইতে ১০ সংখ্যার আনুলোমিক ও প্রাতিলোমিক ক্রিয়াগত সংখ্যার অত্যন্ত নিম্নতম সংখ্যায় অবস্থিত। কপিলের সাংখ্য, সীমাবদ্ধ প্রাকৃত বিশ্বেই আবদ্ধ।

নিরীশ্বর-সাংখ্য সর্ব্বতোভাবে উপেক্ষিত। তাহারা প্রকৃতিতে সর্ব্বকর্তৃত্ব আরোপ করিতে গিয়া পুরুষকে নিষ্ক্রিয়, কেবল একটী শব্দমাত্ররূপে ও সংখ্যা-পূরণের জন্য স্বীকার করিয়াছেন। তজ্জন্য সাংখ্য-দর্শনে চতুর্ব্বিংশতি প্রাকৃত তত্ত্বস্থলে পঞ্চবিংশতি-তত্ত্বসংখ্যার বিচারাভিনয় করিয়াছেন। বস্তুতঃ এক হইতে চব্বিশ-সংখ্যা গ্রহণ করিয়াও পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব যদি স্বীকার করিতে হয়, তবে ইহা বৌদ্ধযুগীয় '০' শূন্যস্বরূপ পুরুষ-সংখ্যাই গৃহীত হইয়াছে অর্থাৎ পঞ্চবিংশতিতম তত্ত্বটীকে 'পুরুষ' এই আখ্যার দ্বারা নিরূপিত করিলেও তাহা নিষ্ক্রিয়-বিধায় '০' শূন্যেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। সুতরাং নিরীশ্বর কপিলের সংখ্যা '০' শূন্যে বিলীন হইয়াছে। তিনি বলেন,—প্রকৃতির অন্তর্গত তত্ত্বসংখ্যার বিচারের দ্বারা জ্ঞানোৎপত্তি হইলে সমুদয় দুঃখের নিবৃত্তি হইয়া থাকে এবং তাহাই মোক্ষ। প্রকৃত প্রস্তাবে দুঃখনিবৃত্তি ও সুখপ্রাপ্তি এক কথা নহে। এইজন্য বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ, শ্রীমদ্ ভাগবত, পুরাণ, ইতিহাসাদি সকল শাস্ত্রই ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন,—প্রাকৃত-জ্ঞানে অপ্রাকৃত মোক্ষলাভের সম্ভাবনা নাই। পতঞ্জলির অষ্টাঙ্গযোগেও পরব্রহ্ম-জ্ঞান লাভ করা অসম্ভব। কারণ এই যোগদর্শন ঈশ্বর স্বীকার করিলেও নিরীশ্বর সাংখ্যযোগেরই প্রতীক। সুতরাং সাংখ্যের সংখ্যাগত বিচারের হেয়ত্ব ও সদোষত্ব প্রতিপাদনপূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদ এই "সাংখ্য-বাণী"রূপ অপ্রাকৃত দার্শনিকতত্ত্ব প্রকাশ করিয়া জগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন। এই "সাংখ্য-বাণী" আলোচনা করিলে প্রকৃতই মোক্ষলাভ করিয়া ভগবানের সাক্ষাৎসেবা লাভ করিয়া নিত্যসুখপ্রাপ্তি হইবে; ইহারই অপর নাম পরম-মোক্ষ। পাঠকবর্গ ইহা ধীরভাবে আলোচনা করিলে ইহার অতিমর্ত্ত্যত্ব অনুভব করিতে পারিবেন।

গণিতশাস্ত্রের অলৌকিক, অস্বাভাবিক ও কাল্পনিক একত্বের ধারণা এবং পারমার্থিক ধর্ম্ম-তত্ত্বে একত্বের ধারণা সম্পূর্ণ পৃথক। দার্শনিক একত্ব নির্ব্বিশিষ্ট্য নহে—ইহা পূর্ব্বে নিবেদন করিয়াছি। মদীয় গুরুপাদপদ্ম শ্রীল প্রভুপাদ **"সাংখ্য-বাণী"**র প্রথমেই ১ (এক) বলিতে কি বুঝায়, তাহা পারমার্থিক একতত্ত্বের অপ্রাকৃত বৈশিষ্ট্যের দ্বারা নিরূপণ করিয়াছেন। 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' এই বৈদিকমন্ত্রের একায়নশাখীগণের পক্ষে যাহা এক বলিয়া প্রতিপন্ন হয় তাহা সর্ব্বপ্রথমেই মঙ্গলাচরণ, ভূমিকা বা গ্রন্থ-প্রারম্ভে প্রদর্শিত হইয়াছে। পাঠকগণ এই গ্রন্থখানি যত্নের সহিত পাঠ করিয়া কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিলে বহুবিধ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবেন, সন্দেহ নাই। অলমতিবিস্তরেণ।

—১৯ ফাল্গুন, ১৩৭০ (ইং ৩৩।১৯৬৪)

'মায়াবাদের জীবনী'-গ্রন্থের ভূমিকা

প্রবন্ধ-সূচনা

বিদ্যোৎসাহী ও কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের পুনঃ পুনঃ অনুরোধসত্ত্বেও "মায়াবাদের জীবনী" গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিবার সুযোগ হয় নাই। কারণ কলিকাল অত্যন্ত প্রবল; তন্মধ্যে ঈশ্বর-বিরোধী নাস্তিক্য চিন্তাস্রোত, সর্ব্বোপরি আসুরিক শিক্ষার প্রভাব অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় দেশের গতিবিধি ও গবেষণা-ক্ষেত্র এত অধিক পরিমাণে নিম্নগতিতে প্রধাবিত হইতেছে, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। শাস্ত্রকর্ত্তা-শিরোমণি ভগবদবতার শ্রীশ্রীল বেদব্যাস শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধে কলির অবস্থা সম্বন্ধে যেরূপ বর্ণনা দিয়াছেন তাহাতে সত্য প্রচারে যে বিশেষ বাধা জন্মিবে, তাহা তিনি ৫।৬ হাজার বৎসর পূর্ব্বেই ভবিষ্যদ্বাণী-স্বরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমরাও তাহা প্রত্যক্ষ অনুভব করিতেছি। প্রথম হইতেই এই প্রবন্ধ প্রকাশে নানাপ্রকার বাধাবিঘ্ন-অসুবিধা হইয়াছে, তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিম্নে সংক্ষেপে প্রবন্ধসূচনার ইতিবৃত্ত-স্বরূপ জানাইতেছি।—

১৯১৫ খৃষ্টাব্দে আমি গৌরজন্মস্থান শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিয়া জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদের দর্শনলাভ করিয়া হরিকথা শ্রবণের সুযোগ লাভ করি। আমার হরিকথা শ্রবণের প্রথম ভূমিকাতেই মায়াবাদের বিরুদ্ধে বহুকথা শুনিবার সুযোগ হয়। তৎপরে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ হইতে **জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের** সম্পূর্ণ আনুগত্য-বুদ্ধিতে দীক্ষিত হইয়া শ্রীচৈতন্যমঠ ব্রজপত্তনে স্থায়ীভাবে অবস্থান করিয়া তাঁহার

নিকট ধর্ম্মতত্ত্ব ও শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করি। তিনি কথাপ্রসঙ্গে বহুদিন বলিয়াছেন—**"যতদিন পৃথিবীতে শঙ্কর-দর্শন প্রচলিত থাকিবে, ততদিন শুদ্ধা-ভক্তির ব্যাঘাত জন্মিবে।"** সুতরাং শঙ্করের অদ্বৈতবাদ বা মায়াবাদ সমূলে উৎপাটন করিতে হইবে। ইহা তিনি তাঁহার পত্র, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, 'অনুভাষ্য', 'বিবৃতি' প্রভৃতি লেখনীর মধ্যে পরিস্ফুট করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদের এই শিক্ষা আমার হৃদয়ে বিশেষ দৃঢ়তা লাভ করিয়া বদ্ধমূল হইয়াছে। তদনুকূলে আমি বেদান্তদর্শনের ১০।১২ খানি বিভিন্ন ভাষ্যকারগণের ভাষ্য সংগ্রহ করি। ঐগুলি আলোচনা করিয়া Cuttack Ravanshaw Collegeএ ও বহু বিদ্বৎসমাজে শঙ্কর-দর্শনের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিয়াছি। বক্তৃতার সারমর্ম্ম "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" পত্রিকায়ও কিছু কিছু প্রকাশিত হইয়াছে। মূলতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নামভজন-শিক্ষা অবলম্বন করিয়াই ব্রহ্মসূত্রের বিচার প্রদর্শন করিয়াছি। **আচার্য্য শঙ্করের ব্রহ্মসূত্রের মৌলিক সিদ্ধান্ত বেদান্ত দর্শনের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। 'ব্রহ্ম' বলিতে নিরাকার, নির্ব্বিশেষ, নির্গুণ-স্বরূপ ব্রহ্ম নহেন। যেহেতু উক্ত শব্দত্রয় ব্রহ্মসূত্রের আনুমানিক ৫৫০ সূত্রের মধ্যে কুত্রাপি উল্লিখিত হয় নাই। ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ নহেন, নিরাকার নহেন, নিঃশক্তিক নহেন, নির্গুণও নহেন।** ব্রহ্ম যদি নির্গুণ হন, তবে ব্রহ্মে দয়াগুণ কখনই থাকিতে পারে না ; ইহাই নাস্তিক্য বা আসুরিক চিন্তার মূল উপাদান। শ্রীবেদব্যাস উক্ত শব্দত্রয় বেদান্তের কোনস্থলেই উল্লেখ করেন নাই। আচার্য্য শঙ্কর উক্ত নাস্তিকতা ও আসুরিক চিন্তাপূর্ণ শব্দত্রয় অন্য কোথাও হইতে উদ্ধার করিয়া ব্রহ্মসূত্রের ব্রহ্মের স্কন্দে অযথা চাপাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। সুতরাং অদ্বৈতবাদ বা মায়াবাদের ব্রহ্ম প্রকৃত ব্রহ্ম নহে, উহা শূন্যেরই ন্যায় মিথ্যা কল্পনা। ইহা জীবনী-পাঠকগণ গ্রন্থ-পাঠের মুখেই বিস্তৃত জানিতে পারিবেন।

'ব্রহ্ম' বলিতে 'শব্দব্রহ্ম'কে লক্ষ্য করে। এই শব্দব্রহ্মই শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শ্রীনাম-ব্রহ্ম। যাহারা এই নাম-ব্রহ্মের অনুসন্ধান করেন না বা নামতত্ত্ব জানেন না, তাহাদের বিশুদ্ধভাবে নাম-ভজন হইতে পারে না। এইজন্যই আমি ১৯৪০ সালে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি স্থাপন করিয়া 'শ্রীমন্মহাপ্রভুর নাম-প্রেমধর্ম্মই বেদান্তের প্রতি-পাদ্য বিষয়' বলিয়া সর্ব্বত্র প্রচার করিতেছি। ভগবদিচ্ছা হইলে বেদান্তের শব্দবাদ-তত্ত্ব-মূলক নামপর ভাষ্য প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল।

শ্রীচৈতন্যমঠে অবস্থানকালীন শ্রীগুরুপাদপদ্মের ইচ্ছা ও আশীর্ব্বাদে উক্ত মঠের পরিচালক সেবকগণের মধ্যে প্রধান সেবকসূত্রে (Manager) কাঁঠালতলার অফিসে বসিয়া আছি, এমন সময়ে (অনুমান ১৯৩৪।১৯৩৫ সালে) দুই ব্যক্তি আমার নিকট আসিয়া নিবেদন করে যে, "আপনি ত' বেদান্তের পণ্ডিত, আমরা গৌড়ীয় মিশনের মুখপত্র

সাপ্তাহিক "গৌড়ীয়ে"র একটী বার্ষিক বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করিব; আপনি তাহাতে **'মায়াবাদ'**-সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ দিবেন।" আমি তৎক্ষণাৎ তাহাতে রাজী হইয়া বলি—"আচ্ছা, একটা প্রবন্ধ দিব।" উক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের নামোল্লেখ করিয়া আমি আমার বক্তব্য কলুষিত করিতে ইচ্ছা করি না; তথাপি সত্যের খাতিরে তাহাদের এস্থলে উল্লেখ না করিলে সত্য গোপন করা হইবে। তজ্জন্য ইঙ্গিতে তাহাদের পরিচয় দিতেছি। উহাদের মধ্যে একজন 'বিদ্যাভূষণ'-উপাধিধারী ও অপর ব্যক্তি 'বিদ্যাবিনোদ'-নামে খ্যাত। যাহা হউক, ইহাদের প্রার্থনায় **"মায়াবাদের-জীবনী"** রচনা করিয়াছিলাম। বিদ্যাবিনোদ মহাশয় কয়েক মাস পরে আসিয়া আমার নিকট হইতে প্রবন্ধটী লইয়া গেলেন। বার্ষিক বিশেষ সংখ্যা ক্রমশঃ প্রকাশিত হইল, কিন্তু তাহাতে আমার প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় নাই দেখিয়া উক্ত বিদ্যাবিনোদকে জিজ্ঞাসা করি—"আমার প্রবন্ধটী প্রকাশিত হয় নাই দেখিলাম, ব্যাপার কি?" তখন তিনি বলেন—"প্রবন্ধটী খুব বড় হইয়া গিয়াছে, বার্ষিক সংখ্যায় স্থানাভাব হইল। সুতরাং ঐ প্রবন্ধটী গ্রন্থাকারে (Pamphlet) প্রকাশ করিব স্থির করিয়াছি।" আমি বলিলাম—"শ্রীল প্রভুপাদ কি এই প্রবন্ধ দেখিয়াছেন?" বিদ্যাবিনোদ তদুত্তরে বলেন—"আমি নিজেই প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া শ্রীল প্রভুপাদকে শুনাইয়াছি। তিনি উহা শুনিয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।" প্রবন্ধটী বিদ্যাবিনোদের নিকটই থাকিয়া গেল।

১৯৩৭ সালের ১লা জানুয়ারী আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্মের অপ্রকট-লীলাবিষ্কারের পর গৌড়ীয় মিশনে নানাপ্রকার গোলমাল উপস্থিত হয়। তাহাতে ৩।৪ বৎসর কাটিয়া যায়। ইতোমধ্যে মিশনের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, দলিল-প্রবন্ধাদি ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়, কে কোথায় লইয়া গেল তাহার কোন সন্ধান মিলিল না। আমি এই বিবাদ-বিসম্বাদ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ১৯৩৯ সালের জুনমাসে শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে চলিয়া আসি। ১৯৪০ সালে বাগবাজার কলিকাতায় ৩৩।২, বোসপাড়া-লেনস্থ ভাড়া-বাড়ীতে বৈশাখ মাসে অক্ষয়-তৃতীয়া দিবসে "শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি" স্থাপন করি। তৎপরে ১৯৪১ সালে ভাদ্র-মাসের পূর্ণিমায় (অনুমান সেপ্টেম্বর মাসে) শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-ক্ষেত্র কাটোয়ায় শ্রীল প্রভুপাদের অনুগৃহীত ত্রিদণ্ডি-যতি পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজের নিকট ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নবদ্বীপ নিজমঠে ফিরিয়া আসিয়া বিভিন্ন স্থানে প্রচার করিতে থাকি।

পরে ১৯৪২ সালের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত নবদ্বীপ-মণ্ডলের নৈঋর্ত-সীমায় চাঁপাহাটী-সমুদ্রগড়-গ্রামে "শ্রীশ্রীগৌর-গদাধর মঠে" এক মাসকাল যাবৎ কার্ত্তিকব্রত পালন করিতেছিলাম। সেই সময়ে শ্রীল প্রভুপাদের অনুগৃহীতা শিষ্যা শ্রীযুক্তা উষালতা দেবীর গৃহে অনেকগুলি কাগজ-পত্র পাওয়া যায়। সৌভাগ্যক্রমে হারানিধি "মায়াবাদের জীবনী"-গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিখানি প্রাপ্ত হইয়া যারপরনাই আনন্দিত ও উল্লসিত হইলাম।

১৯৪৩ **সালে** চুঁচুড়া-সহরে "শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ" স্থাপন করি। ক্রমশঃ তথা হইতে চুঁচুড়ার নিকটবর্ত্তী শ্রীরামপুর-সহরে মাননীয় উকিল **শ্রীযুত** * * **চক্রবর্ত্তী, শাস্ত্রী এম, এ, বি, এল** মহোদয়ের সংস্কৃত টোলে ৭ দিন ভাগবত পাঠ করিয়াছিলাম। সেই সময়ে তাঁহার বাড়ীতে একটা বিরাট্ লাইব্রেরী দেখিয়া বহু গ্রন্থাদি অনুসন্ধানের সুযোগ পাই। তন্মধ্যে **"লঙ্কাবতার-সূত্রম্" গ্রন্থখানি** আমার বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমি সেই গ্রন্থখানি আলোচনা করিবার জন্য তাঁহার নিকট হইতে চাহিয়া লইলাম। তাহার একস্থলে বর্ণিত আছে—"রাবণ ব্যোমযানে করিয়া তথাগত বুদ্ধের নিকট সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বতোপরি অদ্বৈতবাদ আলোচনা করিবার জন্য যাইতেন।" "মায়াবাদের জীবনী" গ্রন্থের মধ্যে এই লঙ্কাবতার-সূত্র হইতে গৃহীত প্রমান উদ্ধার করিয়াছি (১)। ইহা হইতেই ত্রেতাযুগের অদ্বৈতবাদিগণের ইতিহাস সংগৃহীত হইয়াছে। এই মূলগ্রন্থ পাঠ করিলেই পাঠকবর্গ তাহার পরিচয় পাইবেন। এই সমস্ত ঘটনা বিদ্যাবিনোদকে প্রদত্ত "মায়াবাদের জীবনীর" পাণ্ডুলিপির মধ্যে ছিল না, পরে সংযোজিত হইয়াছে।

১৯৪৬ সালে কাশী-মহানগরীতে উর্জ্জব্রত-পালনকালে আমি বুদ্ধগয়ায় গিয়াছিলাম। তথায় গিয়া দেখিলাম—বুদ্ধগয়ার মন্দিরাদি প্রাচীনকাল হইতেই অদ্বৈতবাদি-সম্প্রদায়ের একজন বিশিষ্ট শঙ্করাচার্য্য মোহন্তের কর্ত্তৃত্ব ও পরিচালনাধীনে রহিয়াছে। তিনিই বুদ্ধ-গয়ার স্বত্বাধিকারী। ইহা দেখিয়া আমি অত্যন্ত কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া শঙ্করাচার্য্য মোহন্ত-মহারাজের দ্বিতলগৃহোপরি যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। আমি তাঁহাকে বিনয়-নম্রভাবে প্রশ্ন করিলাম—**"বুদ্ধগয়া ত' বৌদ্ধদের স্থান, আপনি শঙ্কর-সম্প্রদায়ের একজন প্রসিদ্ধ আচার্য্য হইয়া বৌদ্ধমঠের অধিপতি হইলেন কি-প্রকারে? শঙ্কর-সম্প্রদায় কি বৌদ্ধ?"** ইহাতে তিনি অসন্তুষ্ট হইয়া আমাকে বলিলেন—"আচার্য্য শঙ্কর বৌদ্ধ হইবেন কেন? বৈষ্ণবগণ আমাদের বিরুদ্ধে অযথা শ্লেষ-উক্তি করেন। আপনি '**ললিতবিস্তার**'-গ্রন্থ দেখিয়াছেন?" আমি দেখি নাই বলিয়া

১। অথ রাবণো লঙ্কাধিপতিঃ তোটকবৃত্তেনানুগায্য পুনরপি গাথাগীতেন অনুগায়তি স্ম

*　　*　　*　　লঙ্কাবতারসূত্রং বৈ পূর্ব্ববুদ্ধানুবর্ণিতম্।
স্মরামি পূর্ব্বকৈঃ বুদ্ধৈর্জিনপুত্রপুরস্কৃতৈঃ॥
সূত্রমেতন্নিগদ্যন্তে ভগবানপি ভাষতাম্ঃ
ভবিষ্যন্ত্যনাগতে কালে বুদ্ধা বুদ্ধসুতাশ্চ যে॥

—অনন্তর লঙ্কাধিপতি রাবণ 'তোটক'বৃত্তে অনুকীর্ত্তন করিয়া পুনরায় গাথাগীত-দ্বারা অনুগান করিয়াছিলেন—জিনপুত্ররূপে অগ্রে আগত পূর্ব্ববুদ্ধ-কর্ত্তৃক অনুবর্ণিত 'লঙ্কাবতার-সূত্র আমি স্মরণ করিতেছি। অনাগত কালে যে-সকল বুদ্ধ এবং বুদ্ধসুতগণ আবির্ভূত হইবেন, সেই শূন্যবাদ আলোচনাকারিগণের জন্য ভগবান্ বুদ্ধ এই সূত্র প্রকাশ করিয়াছেন।

জানাইলাম। তখন তিনি বলিলেন—"আপনি আমাদের পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত আলোচনা করুন।" তিনি তাঁহাদের সভাপণ্ডিতকে ডাকিয়া আনাইলেন এবং আমার সহিত আলোচনা-প্রসঙ্গে 'ললিতবিস্তার'-গ্রন্থখানি আমার হস্তে দিলেন। এই গ্রন্থের প্রমাণ মূলগ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে(২)। এই প্রসঙ্গও বিদ্যাবিনোদকে প্রদত্ত প্রবন্ধের মধ্যে ছিল না, পরে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

কয়েক বৎসর অতীত হইবার পর (ইং) ১৯৪৯ সালে সমিতির মুখপত্র হিসাবে মাসিক "শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা" প্রকাশ করিবার প্রস্তাব হয়। পরে উক্ত শ্রীপত্রিকার সম্পাদক পূজ্যপাদ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীমদ্ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজের উৎসাহে ১৯৫৩ সালে শ্রীপত্রিকার ৫ম বর্ষের ১ম সংখ্যা হইতে "মায়াবাদের জীবনী" ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতে থাকে। উহা ৫ম বর্ষের ১১টি সংখ্যা ও ৬ষ্ঠ বর্ষের ৯টী সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ইহাই এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ।

এই প্রবন্ধটী গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিবার জন্য বহু শিক্ষিত ব্যক্তি নানাপ্রকার অনুরোধ-উপরোধ করা সত্ত্বেও উহা বহু বাধাবিঘ্নের জন্য এতদিন যাবৎ কার্য্যে পরিণত করিতে পারা যায় নাই। ইহার মৌলিক কারণ অনুসন্ধান করিলে মনে হয়, ভগবদিচ্ছাই প্রবল। কারণ, বেদব্যাসের বর্ণনানুসারে কলিকাল চলিতেছে এবং কলির স্বরূপ-ধর্ম্ম এখনও সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি না। বিশেষতঃ কলিকালকে প্রবল করিবার ইচ্ছা স্বয়ং ভগবানেরই। মানুষ আচার-বিচার ও শিক্ষায় যে কত নীচে নামিতে পারে তাহার উদাহরণ বিশ্বে থাকা প্রয়োজন। এই ইচ্ছা পূরণকল্পে ভগবান্ তাঁহার নিজসেবক শ্রীশিব বা শম্ভুকে ব্রাহ্মণগৃহে প্রেরণ করিয়া জগতে মায়াবাদ-শিক্ষা প্রচার করাইলেন।

মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণ-মূর্ত্তিনা॥

* * *

স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্মদ্বিমুখান্ কুরু।
মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা॥

* * *

২। এষ ধরণীমণ্ডে পূর্ব্ববুদ্ধাসনস্থঃ, সমর্থ-ধনুর্গৃহীত্বা শূন্য-নৈরাত্মবাণৈঃ।
ক্লেশরিপুং নিহত্বা দৃষ্টিজালঞ্চভিত্বা, শিব-বিরজমশোকাং প্রাপ্স্যতে বোধিমগ্র্যাম্॥
—ধরণীতলে আবির্ভূত পূর্ব্ববুদ্ধের আসনে স্থিত এই বুদ্ধ উপযুক্ত ধনু ধারণ করিয়া শূন্যবাদরূপ আত্মবিনাশকর বাণদ্বারা ক্লেশরূপ শত্রু নিহত করিয়া এবং দৃষ্টিজাল ভেদ করিয়া মালিন্য-শূন্য মঙ্গলময় ও শ্রেষ্ঠ 'বোধি' লাভ করিয়াছিলেন।

বেদার্থবন্মহাশাস্ত্রং মায়াবাদমবৈদিকম্ ।
ময়ৈব কথিতং দেবি ! জগতাং নাশকারণাৎ ॥

মানুষকে নাস্তিক বা আসুরিক-ভাবাপন্ন হইতে হইলে তাহাদের মস্তিষ্কের কিছু আহার প্রয়োজন। এইজন্যই শঙ্করাচার্য্য ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে বৈদিকশাস্ত্রের সাহায্য লইয়া আসুরিক ধর্ম্ম ও নাস্তিকতা স্থাপন করিয়াছেন। এস্থলে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, স্বয়ং শিব বা রুদ্র সংহার-দেবতা। ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা ও শিব সংহার-কর্ত্তা—এই ঐতিহ্য আমাদের দেশে সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে। রুদ্র কলির প্রবলতা বৃদ্ধিকল্পে আসিয়া 'জগৎ মিথ্যা', 'বিশ্ব নাই' বলিয়া সর্ব্বতোভাবে জগদ্ধ্বংসমূলক শিক্ষাই দিয়াছেন। তিনি বাহ্যতঃ জ্ঞানের আবরণে অজ্ঞান-তমোধর্ম্ম প্রবলভাবে প্রচার করিয়াছেন। সাধারণ লোক ইহা বুঝিতে না পারায় তাহাতে মুগ্ধ হইয়া অধঃপতিত হইয়া যাইতেছে।

বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ব্রহ্মসূত্র বেদান্ত-দর্শনের মধ্যে যে-সকল শব্দ, সিদ্ধান্ত বা কথা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তাহাই বলপূর্ব্বক শঙ্করাচার্য্য স্থাপন করিয়াছেন—ইহা আমি পূর্ব্বেই নিবেদন করিয়াছি। বিশেষতঃ আচার্য্য শঙ্করের জ্ঞানবাদ মৌলিক তত্ত্বহিসাবে গৃহীত হইলেও **এই 'জ্ঞান'-শব্দটী ব্রহ্মসূত্রের কুত্রাপি উল্লিখিত হয় নাই। তজ্জন্যই 'ব্রহ্মবাদ'কে কখনও 'জ্ঞানবাদ' বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায় না।** ইহা শুধু আমারই বক্তব্য এরূপ নহে, স্বয়ং শাণ্ডিল্য ঋষি তাঁহার "শাণ্ডিল্য-সূত্রের" দ্বিতীয় আহ্নিকের (অধ্যায়ের) শেষ সূত্র অর্থাৎ ২৬ সূত্রে ব্রহ্মকাণ্ডকে ভক্তিকাণ্ড বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—

"ব্রহ্মকাণ্ডং তু ভক্তৌ তস্যানুজ্ঞানায় সামান্যাৎ।" অর্থাৎ ব্রহ্মকাণ্ড ভক্তির নিমিত্তই হইয়াছে, জ্ঞানের জন্য নহে। ইহাদ্বারা জ্ঞানের অসারতা প্রদর্শিত হইয়াছে।

উক্ত সূত্রের আচার্য্য স্বপ্নেশ্বর বিবুধবর-বিরচিত ভাষ্য এস্থলে বিশেষভাবে আলোচ্য। ভাষ্য, যথা—"জ্ঞানাপ্রাধান্যে জ্ঞানকাণ্ডমিত্যুত্তরকাণ্ড-প্রসিদ্ধির্ন স্যাদিতি মন্বানং প্রত্যুচ্যতে। ভক্ত্যর্থং ব্রহ্মকাণ্ডং শ্রূয়তে ন জ্ঞানার্থম্ * * তস্মাজ্জ্ঞানকাণ্ডমিতি ভ্রমঃ।"(৩)

এস্থলে ভাষ্যকার আচার্য্য স্বপ্নেশ্বর স্বয়ং শাণ্ডিল্য-সূত্রের (ভাষ্যের) শেষে তাঁহার নিজের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তাহাতে প্রমাণিত হয়, তিনি ৫০০।৬০০ বৎসর পূর্ব্বে বিশেষ

৩। জ্ঞানের অপ্রাধান্য-হেতু উত্তর-কাণ্ড অর্থাৎ উত্তর-মীমাংসা তথা ব্রহ্মসূত্রের জ্ঞানকাণ্ড বলিয়া প্রসিদ্ধি নাই—ইহা জ্ঞানকাণ্ড-রূপে মননকারীদিগের প্রতি উক্ত হইয়াছে। ভক্তির জন্য ব্রহ্মকাণ্ড শ্রুত হয়, জ্ঞানার্থ নহে। অতএব 'ব্রহ্মসূত্রই জ্ঞানকাণ্ড' —ইহা একটী ভ্রম।

বিদ্বৎপরিবারে গৌড়মণ্ডলে রাজসেনাপতির পুত্ররূপে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি আধুনিক ভাষ্যকার নহেন।

শাণ্ডিল্যঋষির পরিচয় ভারতীয় হিন্দুসমাজে শাস্ত্রজ্ঞ সকলেই অবগত আছেন। তথাপি এস্থলে তাঁহার কিছু পরিচয় প্রদান করা আবশ্যক মনে করি। বেদব্যাস স্বয়ং তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ স্কন্দপুরাণের বহুস্থানে শাণ্ডিল্যঋষির নামোল্লেখ করিয়াছেন। স্কন্দপুরাণের বিষ্ণু-খণ্ডে শ্রীভাগবত-মাহাত্ম্যের ১ম অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে—

ইত্যুক্তো বিষ্ণুরাতস্তু নন্দাদীনাং পুরোহিতম্।
শাণ্ডিল্যমাজুহাবাশু বজ্র-সন্দেহনুত্তয়ে ॥১৬॥
অথোটজং বিহায়াশু **শাণ্ডিল্যঃ** সমুপাগতঃ।
পূজিতো বজ্রনাভেন নিষসাদাসনোত্তমে ॥১৭॥

অর্থাৎ রাজা বিষ্ণুরাত বজ্রনাভ-কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহার সন্দেহ দূরীকরণজন্য নন্দগোপাদির পুরোহিত "ঋষি শাণ্ডিল্যকে" আহ্বান করিলেন। রাজার আহ্বানে "ঋষি শাণ্ডিল্য" পর্ণকুটীর পরিত্যাগপূর্ব্বক সত্বর তথায় আসিয়া উপনীত হইলেন। অনন্তর বজ্রনাভ তাঁহাকে পূজা করিয়া উপবেশনার্থ উত্তম আসন দান করিলে ঋষি তাহাতে উপবেশন করিলেন।

এতদ্ব্যতীত বেদব্যাসের গুরুদেব শ্রীনারদ-ঋষিও বিশেষ গৌরবের সহিত শাণ্ডিল্য-ঋষির নামোল্লেখ করিয়াছেন। নারদসূত্রের শেষদিকে ৮৩ সূত্রে শাণ্ডিল্যঋষির নাম উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সূত্রগুলি সাধারণতঃ "নারদ-ভক্তিসূত্র" বলিয়া আখ্যাত। তাহাতে লিখিত হইয়াছে—

"ওঁ ইত্যেবং বদন্তি জনজল্পনির্ভয়া একমতাঃ কুমার-**ব্যাস**-শুক-**শাণ্ডিল্য**-গর্গ-বিষ্ণু-কৌণ্ডিন্য-শেষোদ্ধবারুণি-বলি-হনূমদ্বিভীষণাদয়ো ভক্ত্যাচার্য্যাঃ ॥৮৩॥ —(বারাণসী হইতে মুদ্রিত ৮২ বৎসরের প্রাচীন সংস্করণ)

অর্থাৎ কুমার (সনকাদি চতুঃসন), **বেদব্যাস**, শুকদেব, **শাণ্ডিল্য**, গর্গাচার্য্য, বিষ্ণু (স্মৃতিকার ঋষি), কৌণ্ডিন্য, শেষ, উদ্ধব, আরুণি, বলি, হনূমান, বিভীষণাদি **ভক্তিতত্ত্বের আচার্য্যগণ** কর্ত্তৃক ভক্তিমার্গ প্রদর্শিত হইয়াছে। তাঁহারা যেন আমার এই সূত্রগ্রন্থ দর্শন করিয়া আমাকে উপহাস না করেন (দৈন্যোক্তি)। এস্থলে শ্রীনারদ ব্রহ্মসূত্র-লেখক বেদব্যাস ও শাণ্ডিল্যঋষিকে ভক্তিশাস্ত্রপ্রণেতা বলিয়া বিশেষ গৌরবের সহিত উল্লেখ করিয়াছেন। শাণ্ডিল্যঋষিও ব্রহ্মসূত্রকে ভক্তিশাস্ত্র বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন—ইহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। **নারদ-ঋষিও ব্যাসসূত্রকে ভক্তিগ্রন্থ বলিয়াই নির্দ্দেশ দিয়াছেন।** এরূপস্থলে শঙ্করাচার্য্যের জ্ঞানবাদ স্থাপনকল্পে নিরাকার, নির্ব্বিশেষ,

নির্গুণ, নিঃশক্তিক ব্রহ্ম নিরূপণ কোনক্রমেই অনুমোদন করা যাইতে পারে না। পরিশেষে ইহাই আমার নিবেদন—যাঁহারা কলির কবল হইতে মুক্তিলাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কখনই শঙ্কর-ভাষ্য অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিবেন না।

আমি যে "প্রবন্ধ-সূচনা"-শেষে শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদের পঠন-পাঠন নিষেধ করিয়া পাঠকবর্গকে অনুরোধ জানাইয়াছি, তাহার কারণ এই যে,—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী মধ্যলীলা ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে লিখিয়াছেন—

জীবের নিস্তার লাগি' সূত্র কৈল ব্যাস।
মায়াবাদি-ভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ ॥১৬৯॥

সুতরাং পরমমুক্ত-পুরুষগণের শিক্ষা ও উপদেশ অবলম্বন করিয়াই আমি মায়াবাদ আলোচনা ও পঠন-পাঠন নিষেধ করিয়াছি। এতদ্ব্যতীত শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শিক্ষাও আমাদের বিশেষ অনুসরণীয়।—

বিষয়বিমূঢ় আর মায়াবাদী জন।
ভক্তিশূন্য দুঁহে প্রাণ ধরে অকারণ ॥
সে-দুয়ের মধ্যে **বিষয়ী তবু ভাল।**
মায়াবাদী-সঙ্গ নাহি মাগি কোনকাল ॥
মায়াবাদ-দোষ য'ার হৃদয়ে পশিল।
কুতর্কে হৃদয় ত'ার বজ্রসমভেল ॥
ভক্তির স্বরূপ আর **'বিষয়' 'আশ্রয়'।**
মায়াবাদী 'অনিত্য' বলিয়া সব কয় ॥
ধিক্ তার কৃষ্ণসেবা-শ্রবণ-কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ-অঙ্গে বজ্র হানে তাহার স্তবন ॥
মায়াবাদ-সম ভক্তি-প্রতিকূল নাই।
অতএব মায়াবাদী সঙ্গ নাহি চাই ॥

সুতরাং আমাদের পারমার্থিক জীবন প্রস্তুত করিতে হইলে মহাজনগণের নির্দ্দোষ শিক্ষাই একমাত্র অবলম্বন করা প্রয়োজন। বেদব্যাস জীবের সর্ব্বাপেক্ষা উন্নততম মঙ্গলের চিন্তা করিয়া ব্রহ্মসূত্র রচনা করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রের অপর নাম—ভক্তিসূত্র। ইহা আমি নারদঋষি ও শাণ্ডিল্য-ঋষির গ্রন্থ হইতে পূর্ব্বেই প্রদর্শন করিয়াছি। ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত-দর্শনে ভক্তি বা নাম-ভজনের প্রসঙ্গ আলোচনা ব্যতীত অন্য কোন চিন্তা বা শিক্ষা বিচার করিতে গেলে তাহা মহাজনগণের অনুমোদিত হইবে না। ভারতীয় শাস্ত্রকারগণ সকলেই ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব, এমনকি উহা পরামুক্তির একমাত্র উপায় বলিয়া নিরূপণ

করিয়াছেন। অন্যপ্রকার পথ নানাপ্রকার দোষযুক্ত, যুক্তিহীন ও প্রমাণহীন। বিশেষতঃ মায়াবাদ বা অদ্বৈতবাদ, সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে দেখা যায়, উহা **সিদ্ধ-সাধন-দোষ-যুক্ত ;** এমন কি, **'বাধিতানুবৃত্তি'-দোষেও** সম্পূর্ণ দোষী। জীব যদি সত্তাহীন ব্রহ্মই হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার ব্রহ্ম হইবার জন্য পুনরায় সাধন করিবার আবশ্যকতা কি ? তিনি যদি সর্ব্বক্ষণ বলিয়া বেড়ান—"অহং ব্রহ্মাস্মি" অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম, তজ্জন্য তাহাকে পুনরায় সাধন করিতে হইবে কেন! ইহাকেই 'সিদ্ধসাধন-দোষ' বলে। অদ্বৈতবাদ এই দোষে বিশেষভাবে দুষ্ট। সরল কথায় বলিতে গেলে আমার যাহা আছে, তাহা লাভ করিবার জন্য কোন্ মূর্খ যত্ন করিয়া থাকে ? **'বাধিতানুবৃত্তি'** আমি মূল গ্রন্থেই আলোচনা করিয়াছি। উপসংহার-প্রসঙ্গে "নির্ব্বাণরূপ ফল-নিরোধ" প্রসঙ্গ বিশেষ-ভাবে দ্রষ্টব্য। * * গ্রন্থের নামের সহিত **"বৈষ্ণব-বিজয়"** নামটী যুক্ত করিয়াছি, কারণ উহা না করিলে সত্য গোপন থাকিয়া যায় এবং 'উপসংহার অধ্যায়ে'ও বহু নূতন বিষয় লিপিবদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছি। আমি এস্থলে 'উপসংহারে' উল্লিখিত বিষয়গুলি পাঠকবর্গকে আলোচনা করিতে অনুরোধ করি।

—অক্ষয় তৃতীয়া

১৭ই বৈশাখ, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ (ইং ৩০।৪।১৯৬৮)